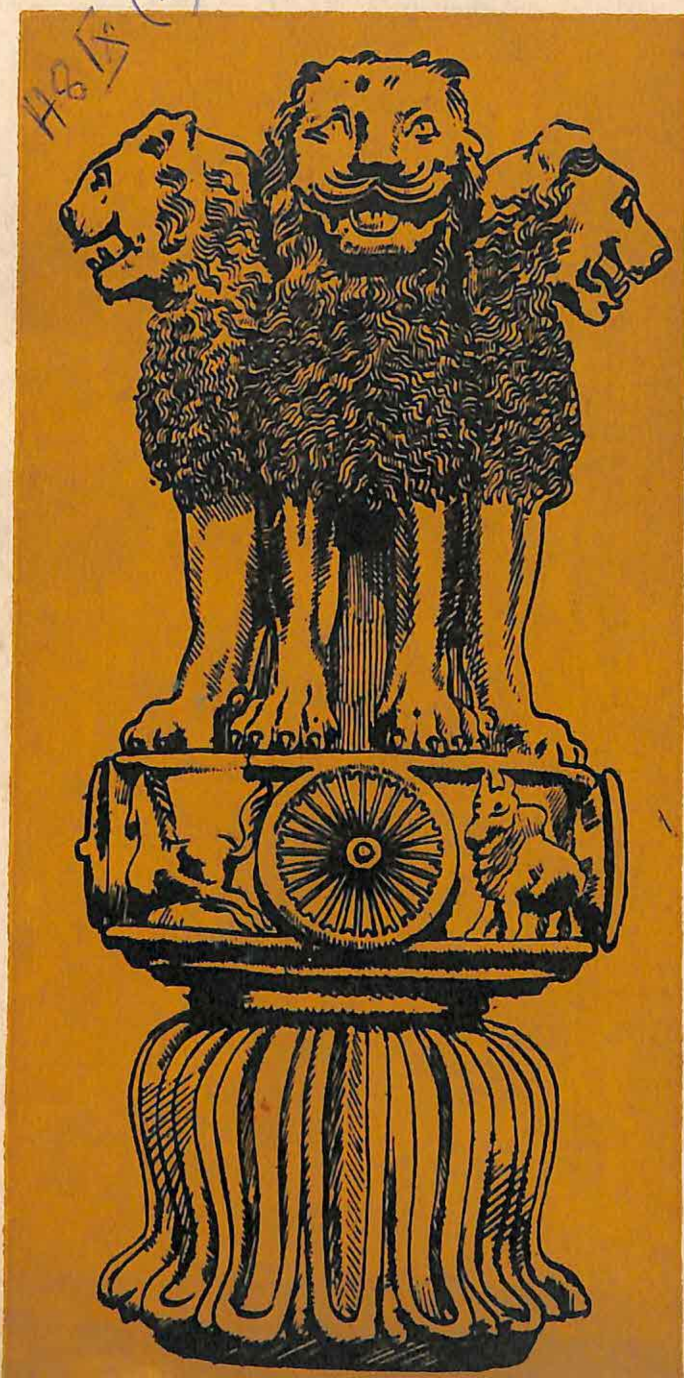
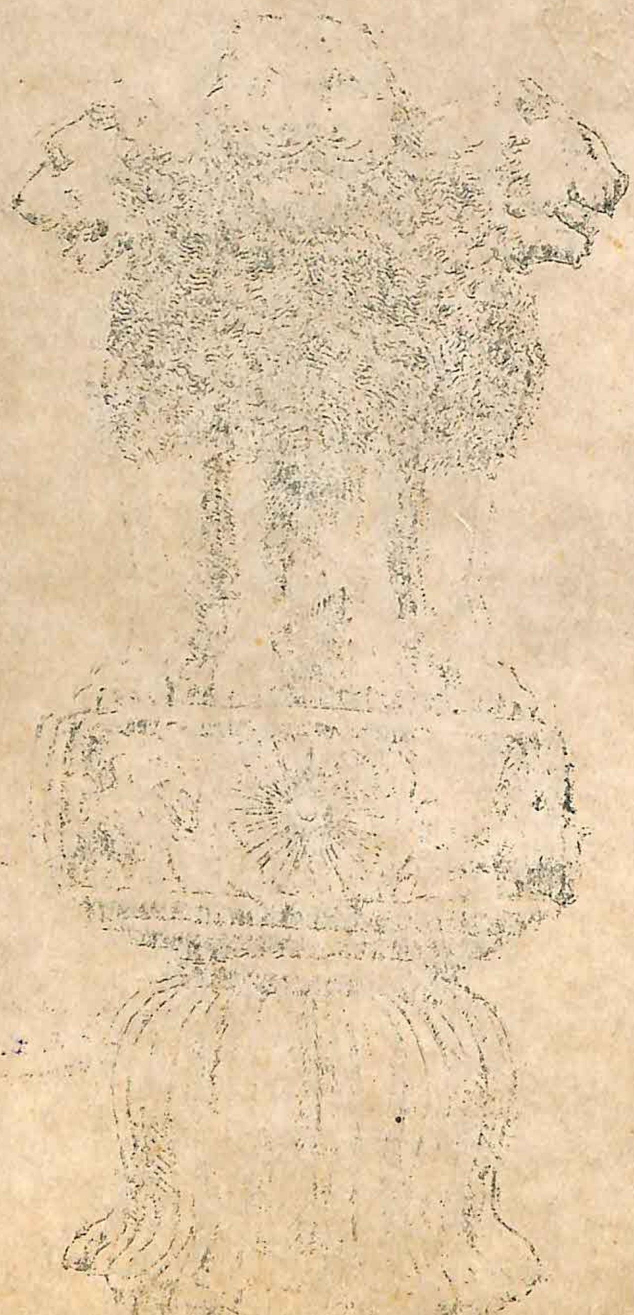
অধ্যাপক সন্দীপ গুপ্ত

স্বদেশের কথা





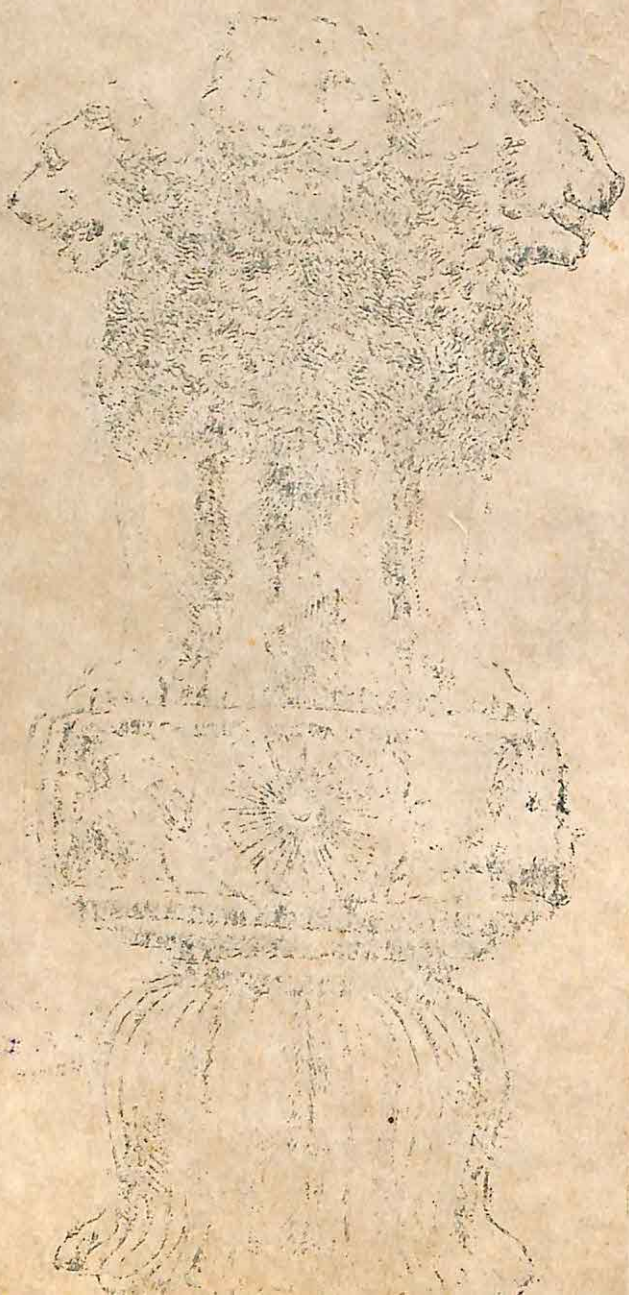
Recommended by the West Bengal Board of Secondary [illegible]
Education, as a Text Book [illegible]
[Vide Notification No. T.B. Syl [illegible]
under Board's Circular No. Syl [illegible]

স্বদেশের কথা

[নবম শ্রেণীর জন্য]

অধ্যাপক সন্দীপ গুপ্ত
দমদম মতিঝিল কলেজ (ইতিহাস বিভাগ)

মডেল পাবলিশিং হাউস
২এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা ৭০০০৭৩



Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education, as a Text Book for Class IX.
[Vide Notification No. T. B. Syll/H/IX/87/93, dated 18.11.87 under Board's Circular No. Syll/86/2, dated 1. 8. 86]

স্বদেশের কথা

[নবম শ্রেণীর জন্য]

অধ্যাপক সন্দীপ গুপ্ত
দমদম মতিঝিল কলেজ (ইতিহাস বিভাগ)

মডেল পাবলিশিং হাউস
২এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা ৭০০০৭৩

জয়দেব ঘোষ কর্তৃক ২এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩ থেকে প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ ১৫ই মে ১৯৮৭

প্রচ্ছদ পূর্ণেন্দু পত্রী

ফটোসেটিং প্রতিক্ষণ
৭ নং জহরলাল নেহেরু রোড
কলিকাতা-১৩

মূল্য পঁচিশ টাকা

নবজীবন প্রেস
৬৬ গ্রে স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত

ভূমিকা

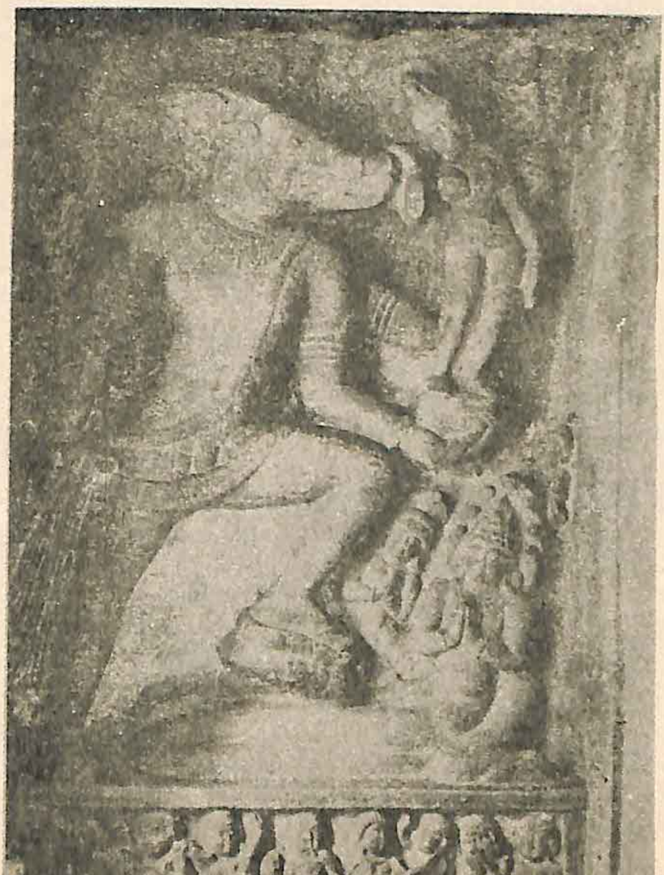
ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে 'পশ্চিমবঙ্গ মধ্য-শিক্ষা পর্ষৎ' আগামী শিক্ষাবর্ষ (১৯৮৮) হইতে নবম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রিদের জন্য ইতিহাসের নূতন পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করিয়াছেন। এই পাঠ্যসূচী প্রণয়নে চিরাচরিত রীতি পরিত্যাগ করিয়া ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হইয়াছে। ইতিহাসের ধারা সঠিকভাবে অনুধাবন করাইবার জন্য রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের ধারাও সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, ইহাই হইল ইতিহাস আলোচনার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। পাঠ্যসূচীর মূল লক্ষ্যের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া 'স্বদেশের কথা' রচিত হইয়াছে। পুস্তকটিকে আরও মূল্যবান করিবার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের সহযোগিতা কামনা করি।

ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও অধ্যাপকগণের লিখিত বহু পুস্তক ইতিপূর্বেই ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য রচনায় পূর্বসূরীদের সাহায্য বিশেষভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাঁহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

পুস্তকটি প্রকাশনার জন্য প্রকাশক শ্রীজয়দেব ঘোষ এবং মডেল পাবলিশিং হাউসের সকল কর্মীদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। শ্রদ্ধেয় সহকর্মী অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীমান শমী ও সৌগত, অধ্যাপক শঙ্কর কুমার গুপ্ত এবং শ্রীমতী স্বাগতা গুপ্তর সহযোগিতাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি।

সন্দীপ গুপ্ত
১৫ই মে, ১৯৮৭
কলিকাতা

ভারত ইতিহাসের প্রাচীন যুগ



WEST BENGAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

HISTORY SYLLABUS FOR CLASS IX

ANCIENT PERIOD

Chapter – I : Geography & History :

(a) Chief physical features of the Indian subcontinent and its main othnic elements; (b) Influence of Geography on History; (c) The Fundamental unity; (d) Source of ancient Indian History.

Chapter – II : Dawn of Indian Civilisation :

(a) Palaeolithic, Mesolithic and Neolithic stages of cultures; (b) Harappan Civilisation (Chalcolithic) chief features—its antiquity (with special reference to its extent, urban character, town planning, and social, economic and religious life), relations with outside world.

Chapter – III : The Vedic Age :

(a) The "Aryans"—their original homeland, Their first literary work in India—the Rig-Veds; (b) Vedic literature; Later *Samhitas, Brahmans, Aranyakas, Upanishadas* and *Sutras;* (c) Life of the people as reflected in the Vedic literature—(i) Social, economic and religious life and political and administrative activities of the people as known from the Rig-Veds; (ii) later developments; (d) Expansion of Vedic culture in the subcontinent; (e) Beginning of the Iron Age.

Chapter – IV : Protest Movement :

(a) Social, economic and religious causes of the beginning of the movements protesting against the dominance of the age-old Vedic or Brahmanical culture; (b) Jainism and Buddhism; (c) Lives and techings of the Buddha and Mahavir.

Chapter – V : The Age of Imperialism and Political Unification

(a) Reference to sixteen Mahajanapadas

(b) A bare outline of the history of the growth of the power of Magadha from the days of Bimbisara to the rise of the Mauryas;

(c) History of the Maurya empire—with special reference to the periods of Chandragupta (his achievements, administration of the age as known from the account of Megasthenes and the Arthasastra of Kautilya dated generally to the Maurya Age) and Asoka (his conquest of Kalinga, limits of his empire, propagation of Buddhism and his own Dharma, his humanitarian, his contacts with outside world and his place in world history)

(d) Invasions of India by foreigners –

(i) Reference only to the extension of the Achaemenid empire to parts of the Indian subcontinent Alexandar's invasion and its effects. (ii) After the fall of the Mauryas –reference to the rule of the Indo-Greeks,

Sakas and Pahlavas; (iii) Social and economic condition – with reference to agriculture, trade and industry—foreign elements in the population—contacts with the outside world—Mauryan Art.

(e) History of the Kushana empire with special reference to the reign of Kaniskha (his probable date, his conquests, limit of his empire, his patronage of Buddhism and Indian art and culture) and to India's contact with the outside world in the Kushana age; cultural importance of the Kushana period in Indian History;

(f) the Satavahana empire—
(i) Its extent, (ii) The achievements of its greatest ruler—Gautamiputra Satakarni;

(g) History of the Gupta empire—with special reference to (i) The periods of Sumudragupta (his conquests and achievements, war against the Saka Kshatrapas; (his other achievements) Chandragupta II a legendary figure. Evidence of Fa-Hien. Kumargupta I and Skandhagupta (his success against the Hunas) (ii) Causes of the downfall of the Gupta Empire. Distinctive features of the Gupta culture.

Chapter – VI : Struggle for Domination :

(a) North India (i) Reference to the Hunas—Yasodharman (ii) Rise of Gauda under Sasanka, his relations with Bhaskarvarman of Kamarupa and Harshavardhana of Thaneswar and Kanauj; (iii) Conquests of Harshavardhana, limits of his kingdom,—account of Huan-tsang; (iv) Rise of the Pratihara and Pala empires—brief reference—to the tripartite struggle and its outcome; (v) Important Pala and Sena rulers—Dharmapala, Devapala, Mahipala I, Ramapala, Vijayasens and Lakshmansens.

(b) Deccan—(i) The early Chalukyas of Badami; (ii) Achievements of Pulakesi II (iii) The Rashtrakutas (iv) Achievements of Govinda III and Krishna III. Later Chalukyas and Kalyans; and achievements of Vikramaditya VI (A.D. 1076-1128)

(c) South India—(i) The Pallavas of Kanchi—some notable rulers and their achievements—the Longdrawn conflict between the Pallavas and Chalukays; (ii) The Cholas of Tanjore; (iii) Achievements of Rajaria I and Rajendra I with special reference to their overseas compaigns.

Chapter – VII :

(a) Social, economic and cultural life from the 7th Century to the 12th Century A.D. under the Palas, the Senas, the Chalukyas, the Rashtrakutas, the Chandellas, the greater Ganges of Orissa and the Pallavas and the Cholas of the far South; (b) Commercial and cultural contacts with outside world.

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রবর্তিত ইতিহাস পাঠ্যক্রম

প্রাচীন যুগ

প্রথম অধ্যায় ঃ ভূগোল এবং ইতিহাস

(ক) ভারতীয় উপ-মহাদেশের ভূ-প্রকৃতি ও তাহার জাতি পরিচয়।

(খ) ইতিহাসের উপর ভূ-প্রকৃতির প্রভাব।

(গ) মূলগত ঐক্যবোধ।

(ঘ) প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ভারতীয় সভ্যতায় সূচনাপর্ব

(ক) পূরা প্রস্তর যুগ, মধ্য প্রস্তরযুগ এবং নব্য প্রস্তর যুগের সভ্যতা।

(খ) হরপ্পা সভ্যতা (প্রত্নতাত্ত্বিক) প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলী—ইহার প্রাচীনতা (সভ্যতার বিস্তার, শহুরে প্রভাব, নগর পরিকল্পনার এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন), বহির্বিশ্বের সহিত সম্পর্ক।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ বৈদিক যুগ

(ক) আর্য জাতি—তাহাদের আদি বাসভূমি ঃ ভারতে তাহাদের প্রথম সাহিত্য ঋগ্বেদ।

(খ) বৈদিক সাহিত্য, পরবর্তী সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ এবং সূত্রসমূহ।

(গ) বৈদিক সাহিত্যে প্রতিফলিত মানুষের জীবনধারা (১) ঋগ্বেদের যুগে আর্যদের সমাজ জীবন, অর্থনৈতিক জীবন ও ধর্মজীবন এবং রাজনৈতিক ও শাসনসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ।

(২) পরবর্তী উন্নয়ন।

(ঘ) উপ-মহাদেশীয় অঞ্চলে বৈদিক সংস্কৃতি বিস্তার।

(ঙ) লৌহ যুগের সূচনা।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ প্রতিবাদী আন্দোলন

(ক) প্রাচীন বৈদিক অথবা ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু হওয়ার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় কারণ।

(খ) জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম

(গ) বুদ্ধ এবং মহাবীরের জীবন ও শিক্ষা।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ সাম্রাজ্যের উদ্ভব ও ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য

(ক) ষোড়শ মহাজনপদ।

(খ) বিম্বিসার হইতে মৌর্য অভ্যুত্থান পর্যন্ত মগধের ক্ষমতা বৃদ্ধির অল্প রূপরেখা।

(গ) মৌর্য সাম্রাজ্যের ইতিহাস—বিশেষতঃ, চন্দ্রগুপ্ত (তাঁহার সক্রিয়তা, মৌর্যযুগে মেগাস্থিনীসের বিবরণ ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অনুসরণে তাঁহার শাসননীতি) এবং অশোক (তাঁহার কলিঙ্গ বিজয়, সাম্রাজ্যের সীমা, বৌদ্ধধর্ম প্রচার এবং তাঁহার আচরিত ধর্ম, তাঁহার মানবতাবাদ, বহির্জগতের সহিত তাঁহার সম্পর্ক এবং পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁহার স্থান)।

(ঘ) বৈদেশিকগণ কর্তৃক ভারত অভিযান।

(১) আকামেনিড রাজত্বের বিস্তার, ভারতীয় উপ-মহাদেশে আলেকজান্ডারের অভিযান ও ইহার ফলাফল।

(২) মৌর্য সাম্রাজ্য পতনের পর ইন্দো-গ্রীক, শক ও পল্লবগণের উত্থান।

(৩) মৌর্যযুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা—কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য-বৈদেশিক নীতিতে জনগণের প্রভাব—বহির্জগতের সহিত সম্পর্ক—মৌর্যকলা।

(ঙ) কুষাণ সাম্রাজ্যের ইতিহাস বিশেষত কণিষ্কের রাজত্বকাল (তাঁহার রাজত্বের তারিখ, তাঁহার বিজয়, তাঁহার রাজত্বের সীমা, বৌদ্ধধর্ম, ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতিতে তাঁহার অবদান) এবং কণিষ্ক যুগে বহিবিশ্বের সহিত ভারতের যোগাযোগ, কুষাণ যুগে ভারত ইতিহাসের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব।

(চ) সাতবাহন সাম্রাজ্য ঃ (১) ইহার বিস্তার, (২) গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী—শ্রেষ্ঠ শাসনকর্তারূপে সক্রিয়তা। (৩) গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস—বিশেষতঃ সমুদ্রগুপ্তের কাল (তাঁহার বিজয় ও সক্রিয়তা), শক-ক্ষত্রপগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (তাঁহার অন্যান্য সক্রিয়তা) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত-লোক কাহিনী। ফা-হিয়েনের প্রমাণ, প্রথম কুমার গুপ্ত এবং স্কন্দগুপ্ত হূণদের বিরুদ্ধে তাঁহার সাফল্য, গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ। গুপ্ত সংস্কৃতির পরিচ্ছন্ন পরিচিতি।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ শাসন কর্তৃত্বের সংগ্রাম

(ক) উত্তর ভারত (১) হূণদেরপরিচিতি—যশোধর্মণ।(২) শশাংকের নেতৃত্বে গৌড়ের উত্থান, কামরূপের ভাস্করবর্মণ এবং থানেশ্বর ও কনৌজের হর্ষবর্ধনের সহিত তাঁহার সম্পর্ক। (৩) হর্ষবর্ধনের বিজয়, তাঁহার রাজ্যসীমা, হিউয়েন সাং-এর বিবরণী। (৪) প্রতিহার ও পাল সাম্রাজ্যের উত্থান-সংক্ষিপ্ত পরিচিতি-ত্রিপাক্ষিক সংগ্রাম ও তাহার ফলাফল। (৫) পাল ও সেন বংশীয় প্রধান রাজগণ—ধর্মপাল, দেবপাল, প্রথম মহীপাল, রামপাল, বিজয়সেন এবং লক্ষ্মণসেন।

(খ) দাক্ষিণাত্য— (১) বাদামীর প্রথম চালুক্য (২) দ্বিতীয় পুলকেশীর সক্রিয়তা (৩) রাষ্ট্রকূট (৪) তৃতীয় গোবিন্দ ও তৃতীয় কৃষ্ণ, কল্যাণীর চালুক্যর সক্রিয়তা; ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের কীর্তি (১০৭৬—১১২৮ খ্রীষ্টাব্দ)।

(গ) দক্ষিণ ভারত—(১) কাঞ্চীর পল্লবগণ—কিছু স্মরণীয় রাজগণ এবং তাঁহাদের কীর্তি—পল্লব ও চালুক্যগণের মধ্যে দীর্ঘকাল ব্যাপী সংঘর্ষ। (২) তাঞ্জোরের চোলগণ (৩) প্রথম রাজরাজ ও প্রথম রাজেন্দ্রর কীর্তিসহ তাহাদের সমুদ্রবিজয়।

সপ্তম অধ্যায় ঃ (ক) সপ্তম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাল, সেন, চোল, রাষ্ট্রকূট, চন্দেল্ল উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠতর গঙ্গবংশ এবং সুদূর দক্ষিণে পল্লব ও চোলগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন।

(খ) বহির্বিশ্বের সহিত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক।

সূচীপত্র

ভারত ইতিহাসের প্রাচীন যুগ

প্রথম অধ্যায় □ ভারতের ভূ-পরিচয় ও ইতিবৃত্ত ১—৭

এক ● ভারতের ভূ-প্রকৃতি ও জাতি পরিচয় (১), ভারতীয় উপ-মহাদেশের ভূ-প্রকৃতি (১), ভারতের জাতি-গোষ্ঠীর উপাদান (১), **দুই** ● ভারত ইতিহাসের উপর ভূ-প্রকৃতির প্রভাব (২); **তিন** ● ভারতের বৈচিত্র্য ও মূলগত ঐক্যবোধ (৩), **চার** ● প্রাচীন যুগের ইতিহাসের উপাদান (৫)।

দ্বিতীয় অধ্যায় □ ভারত ইতিহাসের সূচনাপর্ব ৮—১৩

এক ● প্রাগৈতিহাসিক যুগ [পুরাপ্রস্তর যুগ, মধ্যপ্রস্তর যুগ, নব্য প্রস্তর যুগ] (৮), হরপ্পা সভ্যতার বিকাশ (৯), হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসের কারণ (১২), বহির্ভারতের সভ্যতার সহিত হরপ্পা সভ্যতার সম্পর্ক (১৩)।

তৃতীয় অধ্যায় □ বৈদিক যুগ ১৪—২৩

এক ● আর্যজাতির পরিচয় ও আদি বাসস্থান, **দুই** ● বৈদিক সাহিত্য (১৫) **তিন** ● বৈদিক সাহিত্যে প্রতিফলিত জনগণের জীবনযাত্রা (১৬), বৈদিক সমাজ (১৭), বৈদিক অর্থনীতি (১৮), বৈদিক ধর্মজীবন (১৯), আর্যদের রাজনৈতিক সংগঠন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা (১৯), পরবর্তী বৈদিক যুগের সভ্যতা (২১), **চার** ● আর্য সভ্যতার ক্রমবিস্তার (২২), সিন্ধু ও বৈদিক সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা (২৩), **পাঁচ** ● লৌহ যুগের সূচনা (২৩)।

চতুর্থ অধ্যায় □ ধর্মসংস্কার আন্দোলন ২৪—২৯

এক ● প্রতিবাদী ধর্মীয় আন্দোলনের পটভূমিকা (২৪), **দুই** ● মহাবীর ও জৈনধর্ম (২৫) [জীবনী (২৫), জৈনধর্মের মূলনীতি (২৬), জৈনধর্মের বিস্তার (২৬)], গৌতমবুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম (২৭) [জীবনী (২৭), বুদ্ধের উপদেশাবলী (২৮), বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি (২৮), বৌদ্ধধর্মের প্রভাব (২৯)।

পঞ্চম অধ্যায় □ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূচনা ও রাজনৈতিক ঐক্যের বিকাশ ৩০—৬০

এক ● ষোড়শ মহাজনপদ (৩০), **দুই** ● মগধের আধিপত্যের সূচনা (৩০), বিম্বিসার (৩০), অজাতশত্রু (৩২), মহাপদ্ম নন্দ (৩২), **তিন** ● মৌর্য সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় (৩২), চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (৩২), চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনব্যবস্থা (৪৩), বিন্দুসার (৩৬), সম্রাট অশোক (৩৬), **চার** ● ভারতে বিদেশী আক্রমণ (৪০), ইরানীয় বা পারসিক অভিযান (৪০), আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ (৪০), ইন্দো-গ্রীক, শক ও পহ্লব আধিপত্য (৪২), শক অনুপ্রবেশ ও আধিপত্য (৪২), মৌর্যোত্তর যুগে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর পুনর্গঠনে বিদেশী প্রভাব (৪৪), মৌর্য শিল্পকলা (৪৪), **পাঁচ** ● কুষাণ অনুপ্রবেশ ও কুষাণ আধিপত্য (৪৫), কণিষ্ক (৪৬), কুষাণযুগে বহির্ভারতের সহিত ভারতের সম্পর্ক (৪৭), **ছয়** ● সাতবাহন সাম্রাজ্য (৪৮), গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী (৪৯), **সাত** ● মগধের পুনরভ্যুদয় ঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান (৫১), প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (৫১),

সমুদ্রগুপ্ত (৫১), দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (৫৩), ফা-হিয়েনের বিবরণী (৫৫), প্রথম কুমারগুপ্ত (৫৫), স্কন্দগুপ্ত (৫৫), গুপ্ত শাসন ব্যবস্থা (৫৬), গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ (৫৬), গুপ্ত যুগের সমাজ ও সভ্যতা (৫৭), সাতবাহন শাসনের গুরুত্ব।

ষষ্ঠ অধ্যায় □ আঞ্চলিক আধিপত্যের সংগ্রাম ৬১—৭৯

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ উত্তর ভারত

এক ● হূণ আক্রমণ (৬১), যশোধর্মন (৬১), **দুই** ● শশাঙ্কের নেতৃত্বে স্বাধীন গৌড় রাজ্যের উত্থান (৬২), **তিন** ● কনৌজের উত্থান-হর্ষবর্ধন (৬৩), হিউয়েন সাঙ (৬৫); **চার** ● প্রতিহার রাজশক্তির বিকাশ (৬৬), ত্রিশক্তি সংগ্রাম (৬৬), **পাঁচ** ● পাল ও সেন শাসকবর্গ (৬৭), পাল সাম্রাজ্য (৬৭), গোপাল (৬৭), ধর্মপাল (৬৮), দেবপাল (৬৯), প্রথম মহীপাল (৬৯), রামপাল (৬৯), পাল শাসনের মূল্যায়ন (৭০), সেন সাম্রাজ্য (৭০), বিজয় সেন (৭০), বল্লাল সেন (৭০), লক্ষ্মণ সেন (৭০), সেন বংশের মূল্যায়ন (৭১)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস

এক ● বাতাপির চালুক্যবংশ (৭১), **দুই** ● দ্বিতীয় পুলকেশী (৭১), **তিন** ● রাষ্ট্রকূট (৭৩), **চার** ● তৃতীয় গোবিন্দ, তৃতীয় কৃষ্ণ, কল্যাণের চালুক্য এবং ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য (৭৪)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ দক্ষিণ ভারত

এক ● পল্লব বংশ; **দুই** ● চোল সাম্রাজ্য; **তিন** ● প্রথম রাজরাজ ও প্রথম রাজেন্দ্র চোল।

সপ্তম অধ্যায় □ সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ৮০—৯৫

এক ● বাংলা দেশের সমাজ ও সভ্যতা (৮০), সামাজিক অবস্থা (৮০), সাংস্কৃতিক জীবন (৮১),অর্থনৈতিক জীবন (৮২), দক্ষিণ ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি (৮৩), **দুই** ● বহির্জগতের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্র (৮৯)।

ভারত ইতিহাসের মধ্যযুগ

অষ্টম অধ্যায় □ সুলতানী যুগ (-১৫২৬ খ্রীঃ পর্যন্ত) ৯৬—১৩৫

এক ● মুসলীম যুগ পরিবর্তে মধ্যযুগ আখ্যা প্রদান (৯৬), **দুই** ● সুলতানী আমলে ভারত-ইতিহাসের উপাদান (৯৭), **তিন** ● ভারতবর্ষে ইসলাম আবির্ভাব (৯৮) [আরবদের সিন্ধুবিজয় (৯৮)] **চার** ● তুর্কী আক্রমণের প্রাক্কালে ভারত (৯৯) [সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণ (১০০), আক্রমণের ফলাফল (১০১)], ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি আলবেরুণীর অভিমত (১০১), **পাঁচ** ● মুসলিম শাসনের সূচনা (১০২), ভারতবর্ষে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা (১০২), কুতুবউদ্দীন আইবক (১০২), ইলতুৎমিস (১০৩), সুলতানা রাজিয়া (১০৪), গিয়াসউদ্দিন বলবন (১০৪) **ছয়** ● খলজী সাম্রাজ্যবাদ (১০৬), আলাউদ্দীনের শাসননীতি-কেন্দ্রীয় রাজশক্তির দৃঢ়ীকরণ (১০৭), আলাউদ্দীনের অর্থসংক্রান্ত বিধি-বিধান (১০৭), কৃতিত্ব (১০৯), **সাত** ● তুঘলক বংশ (১১০), গিয়াসুদ্দিন তুঘলক (১১০), মহম্মদ বিন তুঘলক (১১১), মহম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্র ও কৃতিত্ব বিচার (১১২), ফিরোজ শাহ তুঘলক (১১৩), ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসন সংস্কারের রূপ ও চরিত্র (১১৩), **আট** ● তৈমুরলঙ্গের ভারত

আক্রমণ (১১৫), ফলাফল (১১৫), সৈয়দবংশ (১১৬), লোদীবংশ (১১৬), **নয়** ● আঞ্চলিক শক্তির উত্থান (১১৭), (ক) বাংলা ইলিয়াস-শাহী রাজবংশ (১১৭), হুসেন শাহী রাজবংশ (১১৮), নসরৎ শাহ (১১৯), (খ) বাহমণী রাজ্য (১২০), (গ) বাহমণী বিজয়নগর সংগ্রাম (১২১), (ঘ) বিজয়নগর সাম্রাজ্য (১২২) সঙ্গম বংশ (১২৩), সালুভবংশ (১২৩), তুলুভ বংশ (১২৪), আরবিড়ু বংশ (১২৫), বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা (১২৫), বিজয়নগর রাজ্যের সমাজ সংস্কৃতি ও অর্থনীতি (১২৬) **দশ** ● ভারতীয় সভ্যতায় ইসলামের প্রভাব (১২৭) [প্রারম্ভিক মুসলিম সংকীর্ণতা ও হিন্দু প্রতিক্রিয়া (১২৭), সমন্বয়ী সংস্কৃতির বিকাশ (১২৮), মধ্যযুগের ধর্মসংস্কার আন্দোলন : ভক্তিবাদ (১২৯), রামানন্দ (১৩০), বল্লভাচার্য (১৩০), কবীর (১৩০), নানক (১৩১), নামদেব (১৩১), শ্রীচৈতন্যদেব (১৩১), মীরাবাঈ (১৩১), সূফী মতবাদ (১৩২), ধর্ম আন্দোলনের ফলাফল (১৩২), শিল্পকলা ও সাহিত্য (১৩৩), উর্দুভাষার উদ্ভাবন (১৩৫)।

নবম অধ্যায় □ মোগল যুগ [১৫২৬-১৭০৭] ১৩৬—১৭২

এক মোগল যুগের ইতিহাস রচনার উপাদান (১৩৬), **দুই** মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা (১৩৭) [বাবর (১৩৭), মোগল শাসনের সূচনা (১৩৭), বাবরের আত্মজীবনী (১৩৯), হুমায়ুন (১৩৯), মোগল আফগান সংঘর্ষ (১৩৯), শেরশাহ (১৪০), শেরশাহর শাসন ব্যবস্থা (১৪১), রাজস্ব ব্যবস্থা (১৪২), শেরশাহর অবদান (১৪২), হুমায়ুন কর্তৃক মোগল সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার (১৪২), আকবর (১৪৩), আকবরের শাসন পদ্ধতি (১৪৫), মনসবদারী প্রথা (১৪৭), আকবরের রাজস্ব ব্যবস্থা (১৪৭), আকবরের শাসনকালের সাংস্কৃতিক বিকাশ (১৪৮), আকবরের ধর্মমত—দীন-ইলাহি (১৪৮), আকবরের দরবার (১৪৯), আকবরের আমলে স্থাপত্য (১৪৯), জাহাঙ্গীর (১৫০), ইউরোপীয় বণিকদের সহিত জাহাঙ্গীরের সম্পর্ক (১৫১), শাহজাহান (১৫১), শাহজাহানের শাসনকালের শিল্পকলা (১৫২), মোগল পর্তুগীজ বিরোধ (১৫৩), আওরঙ্গজেব (১৫৪), দাক্ষিণাত্য নীতি (১৫৭), নীতির সমালোচনা (১৫৭), আওরঙ্গজেবের শাসনপদ্ধতি (১৫৮), ধর্মনীতি (১৫৯), চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব (১৬০), শাসক হিসাবে আওরঙ্গজেবের ভূমিকা (১৬১), শিবাজী ও মারাঠা শক্তির উত্থান (১৬২), শিবাজীর শাসনব্যবস্থা (১৬৩), শাসক হিসাবে শিবাজীর মূল্যায়ন (১৬৪), ইউরোপীয় বণিক সংস্থাসমূহের সক্রিয়তা (১৬৫), ভারতের পর্তুগীজ জাতি (১৬৫), ওলন্দাজ বণিকদের আগমন (১৬৬), ফরাসী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী (১৬৬), ইংরেজ বণিকদের আগমন (১৬৬), **তিন** মোগল আমলে ভারতবর্ষ (১৬৭) [রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন (১৬৭), রাজকীয় স্বৈরাচারী ক্ষমতার দূরীকরণ (১৬৮), মোগল আমলে জায়গিরদারি ব্যবস্থা (১৬৮), ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা (১৬৯), সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা : বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী (১৬৯), শিল্পকলা ও সাহিত্য (১৭০)।

ভারত ইতিহাসের আধুনিক যুগ

দশম অধ্যায় □ মোগল রাজশক্তির অবক্ষয় ১৭৩-১৮০

মোগল সাম্রাজ্যের পতন (১৭৩), মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ (১৭৪)

একাদশ অধ্যায় □ আঞ্চলিক শক্তির অভ্যুত্থান ১৮১-১৮৯

প্রথম পরিচ্ছেদ॥ কয়েকটি রাজ্যের উদ্ভব
এক বাংলা,হায়দ্রাবাদ ও অযোধ্যা (১৮১) দুই ● মহীশূর রাজ্যের উত্থান (১৮৩), তিন ● শিখ জাতির অভ্যুত্থান (১৮৪) ; গুরু হরগোবিন্দ (১৮৪), গুরু তেগবাহাদুর (১৮৫)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ পেশোয়া তন্ত্রের উত্থান
বালাজী বিশ্বনাথ (১৮৬), প্রথম বাজীরাও (১৮৭), বালাজী বাজীরাও (১৮৮)।

দ্বাদশ অধ্যায় □ ইঙ্গ ফরাসী দ্বন্দ্ব ১৯০-১৯৭
ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রসার (১৯০), দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধ (১৯২), কর্ণাটকের প্রথম যুদ্ধ (১৯৩), দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৯৩), কর্ণাটকের যুদ্ধের ফলাফল (১৯৫), ফরাসীদের বিফলতার কারণ (১৯৬)।

ত্রয়োদশ অধ্যায় □ বাংলায় ইংরেজ শক্তির উত্থান ১৯৮—২০৬
অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভগ পর্যন্ত বাংলায় ইংরেজ বাণিজ্যের প্রসার (১৯৮), মীরজাফরের শাসনকাল (২০৩), মীরকাশিম (২০৩) ; বক্সারের যুদ্ধ (২০৪), কোম্পানীর দেওয়ানী পদলাভ ও দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা (২০৫), ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (২০৫)।

চতুর্দশ অধ্যায় □ ১৭৬৭ হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ইতিবৃত্ত
প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার ২০৭-২২১
ইঙ্গ-মারাঠা সম্পর্ক (২০৭), মারাঠা শক্তির কারণ (২১০) ইঙ্গ-মহীশূর সম্পর্ক (২১১) ; সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা, নেপাল, ব্রহ্মদেশ ও আফগানিস্থান (২১৫) ; শিখ শক্তির উত্থান : মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহ (২১৭), ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ ও পাঞ্জাব অধিকার (২১৯), লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার (২১৯)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থার গোড়াপত্তন ২২২-২২৯
এক দেওয়ানী ও দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা, (২২২) দুই প্রশাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীকরণ নীতির প্রবর্তন ও প্রসারণ ঃ হেস্টিংস ও কর্নওয়ালিশের ভূমিকা (২২৩) ; তিন ● বিচার ও পুলিসী ব্যবস্থার সংগঠন (২২৪) ; চার ● ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন (২২৬) [রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত (২২৮) মহলওয়ারি বন্দোবস্ত (২২৯)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ বাণিজ্য ও শিল্পনীতি ২৩০-২৩৩
কোম্পানীর আমলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য (২৩০), ভারতীয় শিল্পের ধ্বংসসাধন (২৩২)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ কোম্পানীর আমলে ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতির রূপরেখা ২৩৪-২৪৩
এক ● পুরানো শিক্ষা পদ্ধতির আলোচনা (২৩৪), নূতন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন (২৩৪), কোম্পানীর আমলে ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা ও

বিকাশ (২৩৮), দুই ● ধর্মান্ধতা ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন (২৩৮), নারীমুক্তির আন্দোলন (২৪১), সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে অগ্রগতি (২৪২)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ২৪৪-২৪৯

এক ● ফরাজি ও ওয়াহাবি আন্দোলন (২৪৪) তীতুমীরের আন্দোলন (২৪৬) ; দুই ● কোল ও সাঁওতাল বিদ্রোহ (২৪৭) [উপজাতি অভ্যুত্থান (২৪৭), কোল বিদ্রোহ (২৪৭), সাঁওতাল বিদ্রোহ (২৪৮)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭-২৫০

মহাবিদ্রোহের কারণ (২৫০), মহাবিদ্রোহের সূচনা (২৫৩), মহাবিদ্রোহের নেতৃবৃন্দ (২৫৪), মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ (২৫৫), মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি (২৫৬)।

অনুশীলনী ------------------------------------ ২৫৮–২৭৪

প্রথম অধ্যায়॥ ভারতের ভূ-পরিচয় ও ইতিবৃত্ত

ইতিহাস মানবসমাজের ক্রমবিবর্তনের কাহিনী। পর্ব হইতে পর্বান্তরে সংগ্রাম ও নবসৃষ্টির মধ্য দিয়া সমাজের যে উত্তরণ ঘটে তাহারই ধারাবাহিক বিবরণ ইতিহাসের বিষয়বস্তু। পৃথিবীর সর্বত্র কিন্তু এক-ই গতিতে বা এক-ই ধারায় সমাজের এই বিবর্তন ঘটে নাই। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের ভিন্নতার ফলে পরিবর্তনের মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা যায়। যদিও সমাজ বিকাশের মূল চালিকাশক্তি হইল মানুষ, সেই মানুষ কিন্তু পরিবেশ-বিচ্ছিন্ন কোন নিঃসঙ্গ জীব নহে। তাই ইতিহাসের আলোচনায় পরিবেশ তথা ভূগোলের প্রভাবকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসেও ভৌগোলিক অবস্থিতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

এক □ ভারতের ভূ-প্রকৃতি ও জাতি পরিচয়

● **ভারতীয় উপ মহাদেশের ভূ-প্রকৃতি ঃ**এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত ভারতবর্ষ। ইহা উত্তরে সুবিস্তৃত হিমালয় পর্বতমালা এবং পূর্বে, দক্ষিণে ও পশ্চিমে সমুদ্র পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাচীনকাল হইতেই বিদেশী প্রভাবমুক্ত স্বতন্ত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহার বিশালতার জন্যই অনেকে ইহাকে উপ-মহাদেশ নামে অভিহিত করেন। হিমালয় হইতে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত প্রায় ৩৫০০ কিমি এবং পশ্চিমে আরব হইতে পূর্বে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রায় ৩০০০ কিমি পর্যন্ত ভারত-ভূখণ্ডের বিস্তৃতি। কোন মহাদেশ বা উপ-মহাদেশ সভ্যতাই সম্পূর্ণভাবে একক ও বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না। সেই কারণে ভারতীয় সভ্যতাও স্বাতন্ত্র্য ও সমন্বয়ের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। যে হিমালয় পর্বতশ্রেণী ভারতবর্ষকে মধ্য, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহারই অসংখ্য গিরিশ্রেণীর (খাইবার, বোলান প্রভৃতি) মধ্য দিয়া প্রাচীনতম আর্যগণ হইতে শুরু করিয়া গ্রীক-শক-কুষাণ-হূণ এবং পাঠান, মোগল প্রভৃতি জাতি ভারতের মাটিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ও সাহচর্যে ভারতের কৃষ্টি পরিবর্ধিত হইয়াছে। আবার ঐ একই পথ ধরিয়া যুগ-যুগান্তরে ভারতীয় মনীষা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে আফগানিস্থান, তিব্বত, চীন প্রভৃতি প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহে।

হিমালয়ের প্রভাব

ভারতীয় সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য ও সমন্বয় বোধ

বৈদেশিক সংযোগ স্থাপনে ভারতের সমুদ্রপথও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছে। ভারতবর্ষের দুঃসাহসী নাবিক ও বণিকগণ প্রাচীনকাল হইতেই রোম, চীন, মালয়, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই বাণিজ্যপথ ধরিয়াই একদিন ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক প্রাধান্য পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেও প্রসারিত হইয়াছিল।

বহির্জগতের যোগাযোগ

● **ভারতের জাতি গোষ্ঠীর উপাদান ঃ** ভারতীয় জনসমাজের উপাদান সংক্রান্ত আলোচনায় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছেন, ভারতীয় জাতি নিম্নোক্ত জাতিগুলির সংমিশ্রণে গড়িয়া উঠিয়াছে।

(১) দ্রাবিড় পূর্ববর্তী (২) দ্রাবিড় (৩) আর্য (৪) ইরানীয় (৫) গ্রীক (৬) শক (৭) কুষাণ (৮) হূণ

(৯) ইসলামীয়-পাঠান ও মোগল (১০) ইউরোপীয়। ভারত-ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে এই জাতিগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

নৃতাত্ত্বিক দিক দিয়া ঐতিহাসিকগণ ভারতবাসীদের নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করিয়াছেন –

নিগ্রিটো জাতি ঃ আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, কেরালার পার্বত্য অঞ্চল এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগারা এই পর্যায়ভুক্ত।

মঙ্গোলীয় জাতি ঃ নেপালী, ভুটিয়া, খাসিয়া, গারো প্রভৃতি জাতি মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

আর্য বা নর্ডিক জাতি ঃ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত (বর্তমানে পাকিস্তান), পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং গাঙ্গেয় উপত্যকার দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ উন্নতনাসা মানুষ নর্ডিক জাতিভুক্ত।

ভূমধ্যসাগরীয় জাতি ঃ বর্তমানে দক্ষিণ-ভারতীয় জনগোষ্ঠী এই শ্রেণীভুক্ত।

দুই □ ভারত ইতিহাসের উপর ভূ-প্রকৃতির প্রভাব

হিমালয়ের দক্ষিণ পাদদেশ হইতে বিন্ধ্য পর্বতের উত্তর সানুদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত 'আর্যাবর্ত' নামে পরিচিত সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-বিধৌত সমভূমি অঞ্চল ভারতীয় সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই অঞ্চলেই আর্যসভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটিয়াছিল। শুধু সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসাবেই নয়, আবহমানকাল ভারতীয় রাজনীতিতেও এই বিশাল সমভূমি অঞ্চল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ভারত-ইতিহাসের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ—দুইটি তরায়ুনের ও তিনটি পানিপথের—এই অঞ্চলেই সংঘটিত হইয়াছিল।

নদনদীর প্রভাব

ভারতের উত্তর দিকে এক বিশাল অঞ্চল জুড়িয়া অবস্থান করিতেছে হিমালয় পর্বত। শুধুমাত্র ভারতবর্ষই নহে, প্রতিটি ভারতবাসীর সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে হিমালয় পর্বতের যোগসূত্র রহিয়াছে। যে কোন বাহিরের জাতি আমাদের ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে পারে না কারণ সেখানে হিমালয় তাহার বিরাট উচ্চশিখরগুলির দ্বারা ভারতকে বহিঃশত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিতেছে। ইহা ছাড়াও উত্তর ও উত্তর-পূর্বে যে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে উহা শুধু হিমালয় পর্বতের জন্যই। সারা ভারতবর্ষ যে সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা হইয়া থাকে তাহার একমাত্র কারণ হইল সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদনদীর প্রভাব, এবং এই নদীগুলি হিমালয়েরই বক্ষঃনিঃসৃত। এই বিরাট সুউচ্চ পর্বতের জন্যই আমাদের আবহাওয়াও নাতিশীতোষ্ণ।

সমুদ্রের প্রভাব

হিমালয়ের ন্যায় সমুদ্রের প্রভাবও ভারতবর্ষে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষে তিনটি দিক সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত। ইহার দক্ষিণে রহিয়াছে ভারত মহাসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে রহিয়াছে আরবসাগর এবং দক্ষিণ-পূর্বে রহিয়াছে বঙ্গোপসাগর। আজ হইতে বহু বৎসর পূর্বে যে সময় যানবাহনের কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল না সেই সময় সমুদ্রের মাধ্যমেই বাণিজ্য, শিল্প সম্পর্ক স্থাপন করা হইত। একটি দেশের সহিত অপর দেশের যোগাযোগ রক্ষা সম্ভব হইত এই সমুদ্রের মাধ্যমেই। সেই সময় নাবিকেরাও ছিলেন অত্যন্ত সুদক্ষ, সুচতুর। বহিঃভারতের বহু জাতি যথাক্রমে ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ-এঁরা ভারতবর্ষের ধনসম্পদ লুণ্ঠনের জন্য ভারতে সামুদ্রিক বাণিজ্যে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত একমাত্র ইংরাজ জাতি ভারতের সহিত যোগাযোগ সুদৃঢ় করিয়াছিল।

বিন্ধ্য পর্বতের প্রভাব

হিমালয়ের ন্যায় বিন্ধ্যপর্বতও ভারত-ইতিহাসের ধারায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত বিন্ধ্যপর্বতের আড়ালে থাকিয়া দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় জাতি আর্যদের আগমনের পূর্ব হইতেই একটি বিশিষ্ট সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়া উত্তর ভারতের প্রভাব হইতে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে সক্ষম হইয়াছিল। কালক্রমে অবশ্য সমগ্র ভারতব্যাপী অখণ্ড রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাঞ্জাবের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া গুজরাটের সীমা পর্যন্ত প্রসারিত মরুঅঞ্চল ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্গম ও দুর্লঙ্ঘ্য। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রাম করিয়া এই অঞ্চলের অধিবাসীরা সামরিক বিদ্যায় নিপুণ ও দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসে বীরত্ব ও আত্মত্যাগে সমুজ্জ্বল রাজপুত জাতি মূলতঃ এই অঞ্চলের অধিবাসী।

মরু অঞ্চলের প্রভাব

জাতিগত বৈশিষ্ট্য গঠনে ও ইতিহাসের গতি নির্ধারণে তাই ভূগোল তথা প্রকৃতির প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

তিন □ ভারতের বৈচিত্র্য ও মূলগত ঐক্যবোধ

● **বৈচিত্র্য** ঃ আয়তনের বিশালতা, জনসংখ্যার বিপুলতা, জাতি-ভাষা ও ধর্মের বিভিন্নতা এবং প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে ভারতবর্ষ এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

প্রাকৃতিক ঃ কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত মহাদেশ সদৃশ বিশাল ভারতবর্ষে প্রকৃতির নানা বিচিত্ররূপ দেখা যায়। একদিকে যেমন নদী জলধারা-স্নাত উর্বর, শস্যশ্যামল আর্যাবর্ত, অন্যদিকে তেমন সমুদ্র-তরঙ্গপ্লাবিত উপকূলভূমি। কোন কোন অঞ্চলে বৎসরব্যাপী হিম-প্রবাহ, আবার কোন কোন স্থানে অসহনীয় গ্রীষ্মতাপ। কোথাও পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ বারিপাত, কোথাও বৃষ্টিপাতের নিতান্ত স্বল্পতা।

জাতিগত ঃ ভারতের অধিবাসীদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া ঐতিহাসিক ডঃ স্মিথ ভারতবর্ষকে 'বিভিন্ন জাতির জাদুঘর' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

ভাষাগত ঃ ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় আধুনিক ভারতবর্ষে প্রচলিত ২২৫টি ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতের প্রধান প্রধান কথ্য ভাষার সংখ্যা অবশ্য ১৪টি। অষ্ট্রিক, তিব্বতী, চৈনিক, দ্রাবিড়ীয় এবং আর্য (Indo-European)—পৃথিবীর বৃহৎ চারিটি ভাষাগোষ্ঠীর মানুষই ভারতে আছেন।

ধর্মগত ঃ বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলির সব কয়টি—হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্ম ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত। খাদ্য, পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যেও বিভিন্নতা রহিয়াছে।

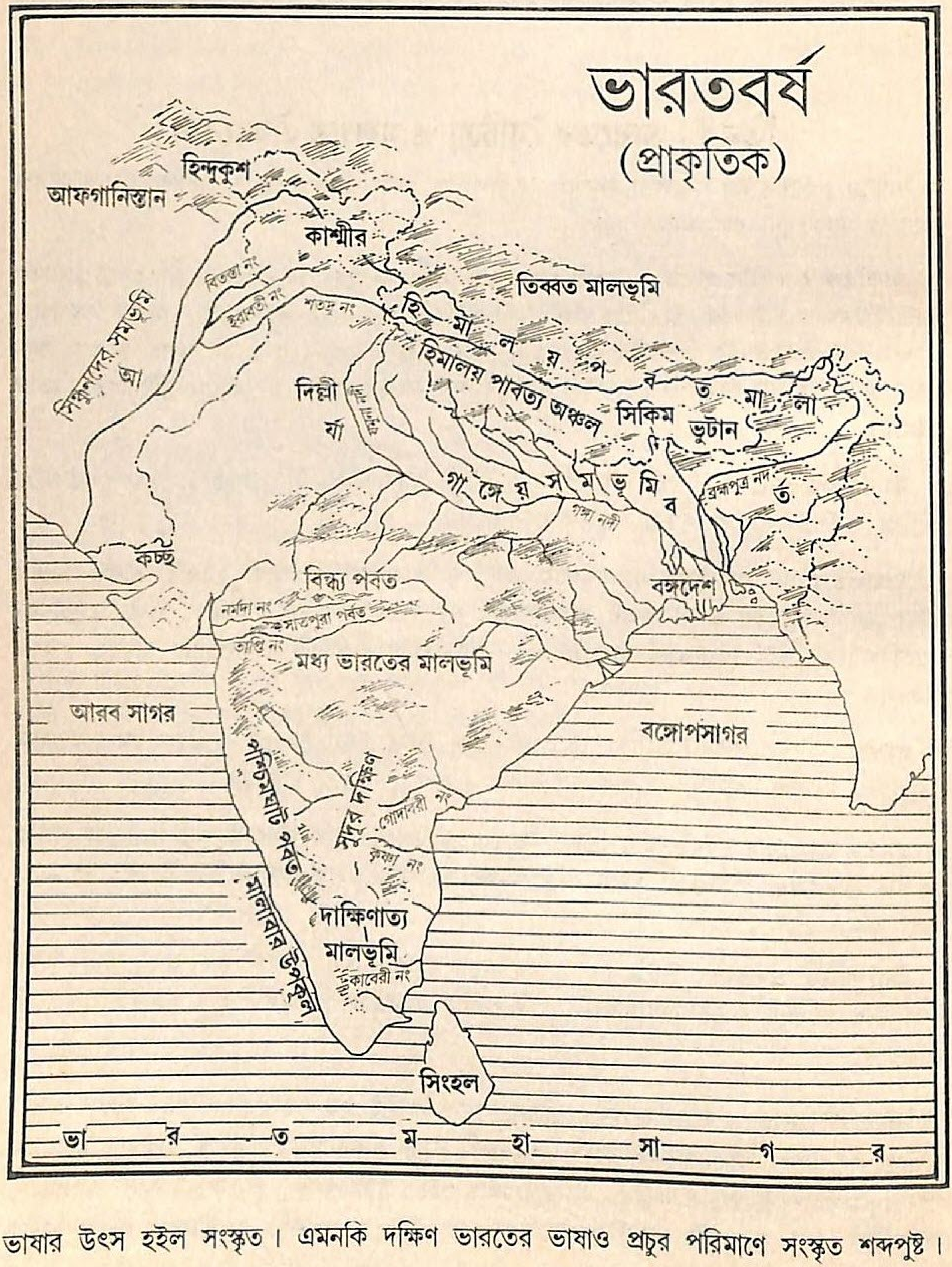
● **মূলগত ঐক্যবোধ** ঃ বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূলগত সত্য এক গভীর সহজাত ঐক্যবোধ। কবিগুরুর কথায়, 'ভারতবর্ষের চিরদিন একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা।'

ভৌগোলিক অখণ্ডতা ঃ প্রাচীনশাস্ত্র ও মহাকাব্যে আসমুদ্র-হিমাচলব্যাপী এক অখণ্ড ভারতবর্ষের কথা বলা হইয়াছে। এই ভৌগোলিক অখণ্ডতাবোধ ভারতবাসীর মনে গভীর একত্ববোধের সৃষ্টি করিয়াছে।

ধর্মীয় ঐক্যচেতনা ঃ ভারতীয় হিন্দুর চেতনার মধ্যে সর্বদাই এক গভীর নৈকট্যবোধ বিরাজ করে। বিশাল ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে ছড়াইয়া থাকা কাশী কাঞ্চী মথুরা প্রমুখ সপ্ততীর্থ, সর্বদিকে প্রবহমান গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী প্রভৃতি সপ্তনদী, আবহমানকাল হইতে সাধারণ হিন্দু ভক্তজনের কাছে প্রবলভাবে আকর্ষণীয়। এই ধর্মানুভূতি ভারতীয় জনসংখ্যার এক বিশাল অংশকে আত্মীয়তার বন্ধনে গ্রথিত করিয়াছে।

ভাষাগত ঐক্য ঃ বহুভাষাভাষী ভারতবর্ষে ভাষাগত ক্ষেত্রেও নিবিড় মিল রহিয়াছে। 'দেবভাষা' সংস্কৃতকে আশ্রয় করিয়া এই ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতের ধর্মসূত্রসমূহ, মহাকাব্য ও দর্শন—সমস্ত কিছুই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। তক্ষশিলা, বারাণসী, মথুরা, নালন্দা, নবদ্বীপ সর্বত্রই বিদ্যার্চর্চার ভাষা ছিল সংস্কৃত। এই সংস্কৃত ভাষা হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে পরবর্তিকালের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা। উত্তর ভারতের অধিকাংশ প্রচলিত

সংস্কৃত ভাষার আশ্রয়



ভাষার উৎস হইল সংস্কৃত। এমনকি দক্ষিণ ভারতের ভাষাও প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত শব্দপুষ্ট।

মহাকাব্য আশ্রিত মানসিক ঐক্য ঃ রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী ভারতবাসীর জীবনধারাকে

গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। ভারতবর্ষের মানসিক গঠনে তাই মহাকাব্য দুইটির দান অপরিসীম।

সাংস্কৃতিক একতা ঃ ইতিহাসের পর্বে পর্বে ভারতের কৃষ্টি পরিবর্ধিত হইয়াছে বিদেশাগত সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে। 'শক হূণদল পাঠান মোগল' হইতে আরম্ভ করিয়া ফরাসী ইংরেজ সব জাতির মিলিত অবদানে গড়িয়া উঠিয়াছে ভারতের সমন্বয়বাদী জাতীয় সংস্কৃতি।

সুদূর অতীতকাল হইতেই আসমুদ্র হিমাচল এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডটিকে একই সূত্রে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য দীর্ঘ প্রয়াস চলিতেছে। পূর্বের নৃপতিবর্গ তাঁহাদের নিজ কৃতিত্বের ও দক্ষতার ফলে বহু রাজ্য শাসনাধীনে আনিতেন এবং সেইসময় নানা উপাধি গ্রহণ করিতেন। সেইসময় 'সম্রাট', 'একরাট', 'রাজ-চক্রবর্তী' প্রভৃতি উপাধি দেওয়া হইত। রাজনৈতিক ঐক্য

উপাধি প্রদান'

স্থাপনের উদ্দেশ্যে তুঘলক-সুলতান বর্গ, খলজী, গুপ্ত ও মৌর্যগণ বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশেষে ব্রিটিশের সময়কালে একই আইন, একই মুদ্রা, একই শাসন ব্যবস্থা, একই রাষ্ট্রভাষা প্রচলনের মাধ্যম ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্যবোধে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল।



ভারতে বিভিন্ন জাতির ছবি

রাষ্ট্রীয় ঐক্য ঃ প্রাচীনকাল হইতে রাজনৈতিক ঐক্যের আদর্শ ভারতীয় মনকে আকর্ষণ করিয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে একরাট, সম্রাট প্রভৃতি রাজপদের উল্লেখ এবং অশ্বমেধ, রাজসূয়, বাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান একটি প্রবল রাজশক্তির অধীনে দেশের বিভিন্ন অংশকে ঐক্যবদ্ধ করিবার প্রচেষ্টার প্রমাণ। আদি পর্বে মৌর্য ও গুপ্ত যুগে এবং মধ্য পর্বে মোগল আমলে এই রাজনৈতিক ঐক্য সাময়িক কালের জন্য হইলেও বাস্তবরূপ ধারণ করিয়াছিল।

শাসনতান্ত্রিক ঐক্য ঃ ইংরেজ আমলে প্রতিষ্ঠিত শাসনতান্ত্রিক ঐক্য সর্বভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের সূচনা করে। স্বাধীনতা সেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের চরম পরিণতি।

ভারতের জাতীয় সংগীত 'জনগণমন' এবং জাতীয় ধ্বনি 'জয়হিন্দ' জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ভারতবাসীর গৌরবদৃপ্ত আত্মপ্রকাশের অমোঘ মন্ত্র ! এই মন্ত্রে উজ্জীবিত ভারতবাসীর জাতি-ধর্ম-প্রথা-আচার-বিচারে কৃত্রিম বিভেদ সত্ত্বেও এক মহান ঐক্য আজিও বিদ্যমান।

চার □ প্রাচীন যুগের ইতিহাসের উপাদান

প্রাচীন যুগের ভারতীয় মনীষিরা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। একাদশ শতকের বিখ্যাত পর্যটক আল্‌বেরুনী হইতে শুরু করিয়া কর্ণেল টড, ফ্লীট, কীথ প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ মন্তব্য করিয়াছেন যে, তথ্যনিষ্ঠ বিবরণের গুরুত্ব সম্পর্কে ভারতীয়রা ছিলেন অনেকটাই উদাসীন। ফলে, ভারতীয় সভ্যতার পূর্ণ ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত এখনও পর্যন্ত উদঘাটিত হয় নাই।

স্বল্পতা সত্ত্বেও, কিছু কিছু উপাদানের ভিত্তিতে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের রূপরেখা নির্ণয় করা সম্ভব

হইয়াছে। এই উপাদানগুলির মধ্যে (১) প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, (২) স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও অন্যান্য প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন, (৩) শিলালেখ ও তাম্রশাসন, (৪)মুদ্রা, (৫) বিদেশীদের বিবরণ উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্য : প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদ হইতে আর্যদের আদি ইতিহাস ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থ হইতেও তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য আহরণ করা যায়। রামায়ণ ও মহাভারত—এই মহাকাব্য দুইটিতে ভারতীয় ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থে শুধুমাত্র বুদ্ধ ও মহাবীরের জীবনকাহিনী বিবৃত হয় নাই, মৌর্য ইতিহাস রচনায় উহা এক মূল্যবান উপকরণ। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' মৌর্য শাসনব্যবস্থার ইতিবৃত্ত রচনার অপরিহার্য গ্রন্থ। ভাস, কালিদাস, অশ্বঘোষ প্রমুখ সাহিত্যিকের রচনা হইতেও বহুমূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা যায়। বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিত', বিহ্লনকৃত 'চালুক্যরাজ বিক্রমাঙ্কদেব চরিত', সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' প্রভৃতি জীবনীগ্রন্থও ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে মূল্যবান। ইতিহাসগত মূল্যের দিক হইতে কল্হণের 'রাজতরঙ্গিনী' বিশিষ্টতার দাবি করিতে পারে।

বেদ, মহাকাব্য, আর্যশাস্ত্র, জীবনচরিত ইত্যাদি

প্রত্নতত্ত্ব : প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বিশেষ মূল্যবান। প্রাচীন মন্দির, মঠ, বিহার, স্তূপ, চৈত্য, প্রাসাদ, দুর্গ ইত্যাদি ইতিহাস রচনার প্রামাণিক উপাদান।

মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। তক্ষশিলা, পাটলীপুত্র, সাঁচি, সারনাথ, নালন্দা, রাজগীর, পাহাড়পুর, অমরাবতী, নাগার্জুনকুণ্ড প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাচীন ভারতের শিল্প, ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষাপদ্ধতির বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। অজন্তা ও ইলোরার গুহাচিত্রগুলি খাজুরাহো ও আবুপর্বতের মন্দির-গাত্রের চিত্রগুলি শুধুমাত্র শৈল্পিক উৎকর্ষতা প্রমাণ করে না, তৎকালীন ভারতবর্ষের ধর্ম, দর্শন ও সমাজজীবনের ধারাও উহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে।

নগর প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ

লিপিমালা : ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রথম লিপিমালা পাওয়া যায় পারস্যের 'বোঘাজ কয়' (এশিয়া মাইনরে প্রাপ্ত) এবং 'নাকসি রুস্তমে' (ইরানে প্রাপ্ত) হইতে। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রাচীনতম শিলালিপি হইল মহামতি অশোকের ধর্ম ও নীতি সম্পর্কিত অনুশাসনগুলি। অন্যান্য শিলালিপিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল কলিঙ্গরাজ খারাভোলার হাতিগুম্ফা, শকক্ষত্রপ রুদ্রদামনের 'গিরনার' শিলালিপি, সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণ বিরচিত 'এলাহাবাদ প্রশস্তি', চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশির 'আইহোল প্রশস্তি', সাতবাহনরাজ গৌতুমীপুত্র-সাতকর্ণীর 'নাসিক প্রশস্তি' ইত্যাদি। তাম্রফলকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইল 'খালিমপুর তাম্রশাসন'—যাহার মধ্য হইতে পালরাজ ধর্মপাল সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে।

পাথর ও ধাতুর উপর খোদিত লিপি

মুদ্রা : প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে মুদ্রার সাক্ষ্য বিশেষ মূল্যবান। বিভিন্ন যুগের মুদ্রা পরীক্ষা করিয়া প্রাচীন রাজন্যবর্গের নাম, বংশপরিচয়, রাজত্বকাল, ধর্ম, আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য লাভ করা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ভারতে প্রাপ্ত গ্রীক মুদ্রা হইতে ব্যাকট্রীয় গ্রীক শাসনের এবং কণিষ্কের মুদ্রার মাধ্যমে তাঁহার সাম্রাজ্য, শাসননীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য জানা গিয়াছে। সমুদ্রগুপ্তের বীণাবাদনরত মুদ্রা ও অশ্বমেধ মুদ্রা প্রভৃতি হইতে তাঁহার সঙ্গীতানুরাগ ও দিগ্বিজয় সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যায়।

রাজন্যবর্গের মুদ্রা হইতে প্রাপ্ত তথ্য

ভাস্কর্য ও স্থাপত্য নিদর্শন : ভারতবর্ষের মধ্যে বহু স্থানে স্থাপত্য, ভাস্কর্যের এবং শিল্পকলার সুনিপুণ নিদর্শন আমাদের চোখে পড়িয়াছে। এই শিল্প কলাগুলির মাধ্যমেই আমরা পূর্বেকার অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থার কথা জানিতে পারি। ভারতবর্ষের মধ্যে মথুরা, নাগার্জুন, অজন্তা, ইলোরার গুহাচিত্র

মানুষের দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। ইহা ছাড়াও ভারতীয় মূর্তি নির্মাণের কৌশল, সাঁচী, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতিচিহ্নগুলি ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া থাকে।

বৈদেশিক বিবরণ ঃ বৈদেশিক বিবরণীর মধ্যেও ভারতের ইতিহাস রচনার বহু উপাদান সংরক্ষিত আছে। আরিয়ান, কার্টিয়াস, প্লুটার্ক প্রভৃতি গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকদের রচনা হইতে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সমকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সামরিক, সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়। গ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণী 'ইন্ডিকার' মাধ্যমে মৌর্যবংশের, চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের ভ্রমণকাহিনীতে গুপ্তবংশের এবং হিউয়েন সাঙের বিররণীতে হর্ষবর্ধনের ইতিহাস রচনার উপাদান নিহিত আছে। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং-এর রচনায় প্রাচীন বাংলাদেশের উল্লেখ আছে। পরবর্তিকালে আরবদেশীয় পর্যটক সুলেমান এবং বিশেষ করিয়া বিখ্যাত আলবেরুনীর বিবরণীতে ভারতীয় আচার-ব্যবহার জ্যোতিষশাস্ত্র, ধর্ম, আয়ুর্বেদ ইত্যাদি নানা বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে।

পর্যটকগণের বিবরণী



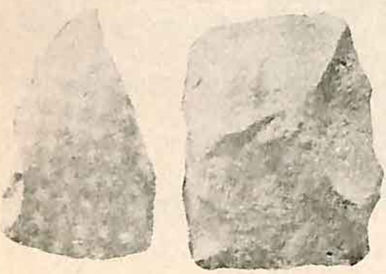
দ্বিতীয় অধ্যায়|| ভারত ইতিহাসের সূচনাপর্ব

এক □ প্রাগৈতিহাসিক যুগ

ভূ-তত্ত্ব, নৃ-তত্ত্ব ও প্রত্ন-তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া ঐতিহাসিকগণ প্রাগৈতিহাসিক যুগকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা পুরাপ্রস্তর যুগ, মধ্যপ্রস্তর যুগ ও নব্যপ্রস্তর যুগ।

● **পুরাপ্রস্তর যুগ ঃ** প্রাচীনতম যুগকে বলা হয় পুরাতন অথবা প্রাচীন প্রস্তর যুগ। ভারতের আদিম অধিবাসীরা ছিল পুরাতন প্রস্তর যুগের (Palaeolithic Age) মানুষ। পাথরের তৈয়ারি নানাবিধ স্থূল হাতিয়ারের সাহায্যে তাহারা বন্যপশু বধ করিয়া খাইত। খাদ্য তাহারা উৎপাদন করিতে পারিত না, কেবল সংগ্রহ করিত। ইহাদের থাকিবারও কোন নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না। ধাতুর ব্যবহার বা আগুন জ্বালাইতে ইহারা জানিত না। পূর্বভারতে শোন নদীর উপত্যকায়, উত্তর ভারতে পাঞ্জাবে শতদ্রু নদীর তীরে এবং দক্ষিণ ভারতে কৃষ্ণা-গোদাবরী অঞ্চলে ভারতের আদিম অধিবাসীদের বসবাস ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। ইহারা ছিল খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ এবং নেগ্রিটো জাতিভুক্ত।

● **মধ্যপ্রস্তর যুগ ঃ** বহুদিন ধরিয়া এই আদিম অবস্থা চলিবার পর মানুষ নব্যপ্রস্তর যুগে প্রবেশ করে। পুরাতন হইতে নব্যপ্রস্তর যুগে পৌঁছাইতে সময় লাগিয়াছিল কয়েক সহস্র বৎসরেরও অধিক। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদরা এই দুই যুগের মধ্যবর্তী সময়কে বিশেষ যুগ হিসাবে চিহ্নিত করিয়া নামকরণ করিয়াছেন মধ্য প্রস্তরযুগ। (Mesolithic Age)। ভারতে এই যুগের সুপরিচিত নিদর্শন ক্ষেত্র হইল গুজরাটের লাঙ্ঘনাজ বসতি। এই বসতিতে মাটি খুঁড়িয়া উদ্ধার করা দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে দেখা গিয়াছে যে, এই সময়ে মানুষের ব্যবহৃত প্রধান হাতিয়ার ছিল পাথরের তৈয়ারী অস্ত্র ফলক এবং তীরের ফলা হিসাবে ব্যবহৃত ষড়ভুজ বা অষ্টভুজ বিশিষ্ট জ্যামিতিক আকারের ছোট-ছোট প্রস্তরখণ্ড। এই যুগে হস্ত নির্মিত মাটির বাসনের উদ্ভব ঘটে এবং নব্য প্রস্তর যুগের সূচনায় কুমোরের চাকে-গড়া ও অলঙ্করণ করা তৈজসপত্রের ব্যবহার ঘটে। এই যুগে পশুশিকার, মাছ ধরা ছিল প্রধান উপজীবিকা। অবশ্য মধ্যপ্রস্তর যুগের শেষে মানুষের কৃষিকার্যে মনোনিবেশ লক্ষ্য করা যায়। লাঙ্ঘনাজ এলাকার খননকার্যে মধ্যপ্রস্তর যুগের নমুনারূপে হরিণ, কৃষ্ণসার মৃগ, গণ্ডার, বুনো শুয়োর ও ষাঁড়ের অস্থি পাওয়া গিয়াছে।



প্রাগৈতিহাসিক যুগের অস্ত্রশস্ত্র

● **নব্যপ্রস্তর যুগ ঃ** মধ্যপ্রস্তর যুগের মন্থর জীবনযাত্রার অবসানে শুরু হইল নব্য প্রস্তর যুগ। এই যুগের মানুষও পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিত। তবে তাহা পূর্বের তুলনায় অনেক সূক্ষ্ম ও মসৃণ ছিল। এই সময় কৃষিকার্যেরও সূত্রপাত হয়। কৃষির সহিত পশুপালন এই যুগের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। আগুন জ্বালানোর পদ্ধতি এবং কুমোরের চাকার আবিষ্কারের কৃতিত্বও তাহারা দাবি করিতে পারে। অনুমান করা

হয়, বয়নবিদ্যার সহিতও তাহাদের পরিচয় ছিল। ঘর-বাড়ি নির্মাণ কৌশলও তাহাদের অজানা ছিল না। ইহারা মৃতদেহ সমাধিস্থ করিত এবং সমাধি-সৌধও নির্মাণ করিতে জানিত। নব্যপ্রস্তর যুগে মানুষরা গুহার দেওয়ালে ছবি আঁকিবার কৌশলও আয়ত্ত করিয়াছিল। শিকার ও নৃত্যের বেশ কিছু গুহাচিত্র পাওয়া গিয়াছে। দক্ষিণ ভারতে নব্যপ্রস্তর যুগের বহু নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে ; উত্তর ভারতেও কিছু মিলিয়াছে। বর্তমানের কোল, ভীল, মুণ্ডা প্রভৃতি জাতি ইহাদের বংশধর।

দুই □ হরপ্পা সভ্যতার বিকাশ

পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্য দেশগুলির অন্যতম হইল ভারতবর্ষ। বর্তমান শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত ঐতিহাসিকদের ধারণা ছিল যে, বৈদিক যুগ হইতে ভারতের সভ্যতার সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পুরাতত্ত্ব বিভাগের তৎকালীন পরিচালক স্যার জন মার্শালের সহযোগিতায় সিন্ধু প্রদেশের মহেঞ্জোদাড়ো অঞ্চলে মাটির নীচে একটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। 'মহেঞ্জোদাড়ো' শব্দটির অর্থ হইল 'মৃতের স্তূপ'। পাঞ্জাবের 'মন্টগোমারী' জেলায় হরপ্পা নামক স্থানেও একই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সময়ের বিচারে এই নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা ঋগ্বেদেরও পূর্ববর্তিকালের। অনুমান করা হয়, সিন্ধুনদের তীরে অবস্থিত এই সিন্ধু সভ্যতার উন্মেষ খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দেরও পূর্ববর্তী। মিশরের নীল নদ এবং পশ্চিম এশিয়ার টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপর নির্ভরশীল যেমন এক ব্যাপক সভ্যতার উদ্ভব ঘটিয়াছিল, তেমনি ভারতবর্ষেও প্রায় সমসাময়িক কালে এক স্মরণীয় সভ্যতা বিকশিত হয়। ইহাই সিন্ধু সভ্যতা। হরপ্পা অঞ্চলে এই সভ্যতা হরপ্পা সভ্যতা নামেই প্রসিদ্ধ।

ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা—সিন্ধু সভ্যতা

● **সভ্যতার বিস্তৃতি :** মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা বাদে ভারতের আরও কিছু কিছু জায়গায় খননকার্যের ফলে সিন্ধু সভ্যতার অনুরূপ নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। গুজরাটের রংপুর, লোথাল প্রভৃতি নর্মদা নদীর উপত্যকা অঞ্চলে, উত্তর-পূর্ব পাঞ্জাবে অবস্থিত রুপার নামক স্থানে, রাজস্থানের বিকানীরের কাছাকাছি অঞ্চলে, মীরাটের নিকটবর্তী আলমগীর প্রভৃতি স্থানে মহেঞ্জোদাড়োর ধ্বংসাবশেষের অনুরূপ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং ব্যাপ্তির দিক হইতে সিন্ধু সভ্যতা সিন্ধুনদের এলাকা হইতে বহুদূরবর্তীস্থানেও বিস্তৃত ছিল। প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ অধ্যাপক ব্যাশামের মতে, সিন্ধু সভ্যতা উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রায় ৯৫০ মাইল ব্যাপী অঞ্চলে প্রসারিত হইয়াছিল।

সিন্ধু সভ্যতার ব্যাপ্তি

সিন্ধু সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতবিরোধ আছে। পশ্চিম এশিয়ার সুমেরীয় সভ্যতার সহিত সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ মনে করেন, সুমেরীয়গণই সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা। আবার কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে দ্রাবিড় জাতিই এই গৌরবের অধিকারী। অধ্যাপক ব্যাশাম মনে করেন, সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টারা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় ছিলেন।

ভারতের স্বকীয় সভ্যতা

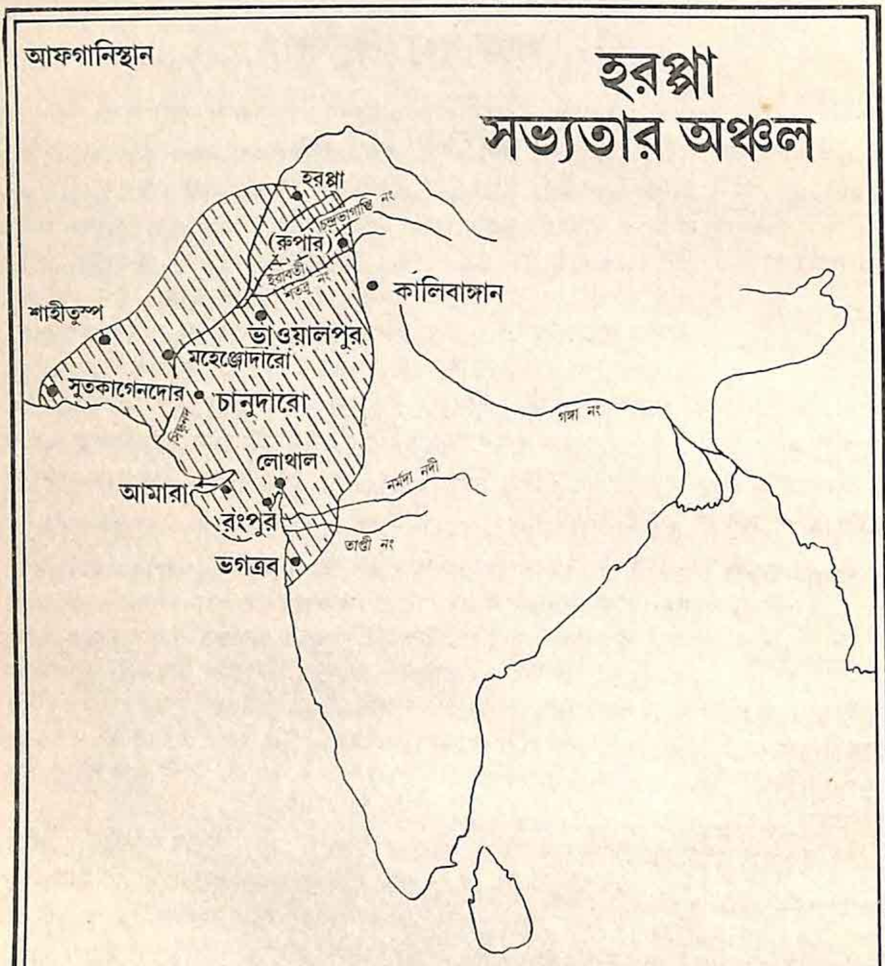
সিন্ধু সভ্যতার সমকালীন সময়কে বলা হয় ধাতুর যুগ। এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল প্রস্তরের পরিবর্তে ধাতুর ব্যবহার। ধাতু হিসাবে সর্বপ্রথম তামার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষে তাম্র যুগে তাম্রের সহিত টিন মিশ্রিত করিয়া ব্রোঞ্জ-নামক ধাতু ব্যবহৃত হইত। এই ব্রোঞ্জ ধাতু ব্যবহারের সময়েই মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার নাগরিক সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছিল।

তাম্র ও ব্রোঞ্জ ব্যবহারের যুগ

● **মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পার নগর পরিকল্পনা :** ধ্বংসাবশেষ হইতে অনুমান করা যায়, মহেঞ্জোদাড়ো ছিল বহু অট্টালিকা পূর্ণ একটি বৃহৎ নগর। দুই কক্ষের বাসগৃহ হইতে আরম্ভ করিয়া ৮০ ফুট দীর্ঘ ও ৯৭ ফুট

প্রশস্ত অট্টালিকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কোনটি ছিল একতল আবার কোনটি ছিল বহুতলবিশিষ্ট। অধিকাংশ গৃহ ও অট্টালিকা পোড়া ইষ্টক দ্বারা নির্মিত। প্রতিটি আবাসিক গৃহ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। গৃহগুলিতে স্নানাগার ও জল নিকাশের সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। গৃহদ্বার, গৃহতল ও গবাক্ষ এবং সোপান শ্রেণী সুন্দরভাবে নির্মিত ও সুরুচির পরিচায়ক। নগরের প্রধান প্রধান রাজপথ ছিল সরল ও সুপ্রশস্ত। সরু গলিও ছিল, তবে তাহা

নগর বিন্যাস



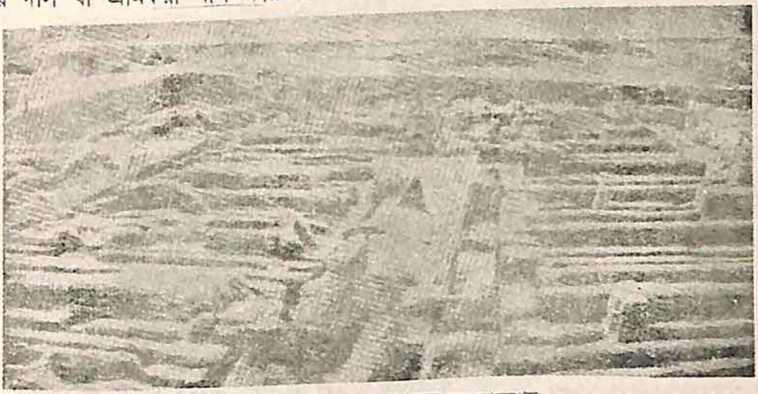
সোজা আসিয়া প্রধান রাজপথের সহিত মিশিত। রাজপথেও জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত ছিল। পোড়া মাটির নল বা নালা দিয়া আবাসিক গৃহের নোংরা জল রাজপথের আচ্ছাদিত নর্দমায় পড়িত। জঞ্জাল ফেলিবার জন্যও বড় বড় আবর্জনাকুণ্ড থাকিত। অধ্যাপক ব্যাশাম মন্তব্য করিয়াছেন যে, রোমানদের পূর্বে প্রাচীনকালে আর কোন জাতি সিন্ধু উপত্যকার মানুষের মত নাগরিক সচেতনতার পরিচয় দিতে পারেন নাই।

মহেঞ্জোদাড়ো নগরীতে একটি বিরাট স্নানাগার আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ৩৯ ফুট, প্রস্থে ২৩

ফুট এবং গভীরতায় ৮ ফুট ছিল। ইহা সর্বসাধারণের ব্যবহার্য ছিল। হরপ্পায় একটি বিশাল ইমারতের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ ওই অট্টালিকাটি পৌরসভাগৃহ, প্রার্থনা মন্দির অথবা শস্য ভাণ্ডাররূপে ব্যবহৃত হইত। নগর দুইটি দুর্গ ও প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল।

শ্রেণীগত তারতম্য

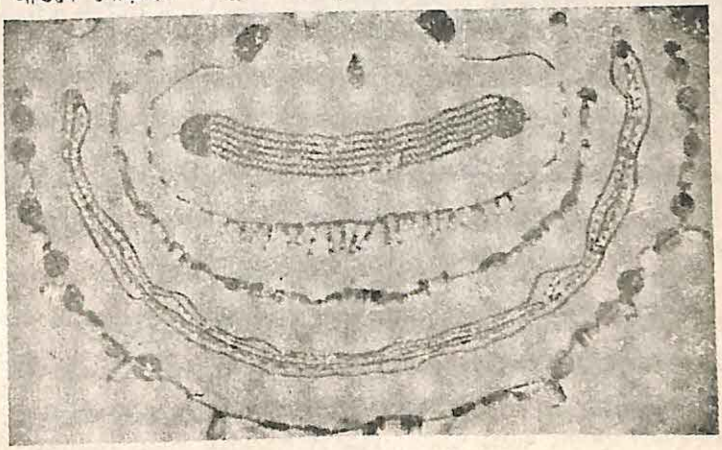
নগর গঠনের ধরন দেখিয়া অনুমান করা হয়, নাগরিকদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল। কিন্তু অধ্যাপক কোশাম্বী মন্তব্য করিয়াছেন, সিন্ধু সমাজ ব্যবস্থায় ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ছিল। বড় বড় অট্টালিকার পার্শ্বে ব্যারাকের মত ছোট ছোট বাড়িও দেখা গিয়াছে। সম্ভবতঃ তথায় দাস বা শ্রমিকরা বাস করিত।



হরপ্পায় প্রাপ্ত শস্যাগারের ধ্বংসাবশেষ

খাদ্য ও তৈজস দ্রব্য

● **সামাজিক জীবন ঃ** অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ছিল গম। যব, খেজুর, মাছ, মাংসেরও অবশিষ্টাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। রন্ধনের জন্য সাধারণতঃ মৃৎপাত্র ব্যবহৃত হইত। অবশ্য তাম্র, ব্রোঞ্জ এমনি কি রৌপ্য নির্মিত পাত্রেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। মৃৎপাত্রগুলি আগুনে পোড়াইয়া মজবুত করা হইত।



হরপ্পা সভ্যতায় ব্যবহৃত অলংকার

পোশাক পরিচ্ছেদ

নগরবাসিগণ তুলা ও পশমের পোশাক ব্যবহার করিতেন। দেহের উর্ধ্বাংশ ও নিম্নাংশের জন্য দুই প্রস্থ কাপড় আলাদাভাবে ব্যবহার করা হইত। অলঙ্কার ছিল সর্বজনপ্রিয়। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও গজদন্ত নির্মিত অলংকার পাওয়া গিয়াছে। মার্শালের মতে, প্রাপ্ত অলংকারাদি তৎকালীন ভারতবর্ষের শিল্প-জ্ঞান, সৌন্দর্যপ্রীতি ও মার্জিত রুচির পরিচয় বহন করে।

দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জিনিসের মধ্যে হাড় ও হাতীর দাঁতের চিরুনী, সূচ, ছুরি, কাঁচি, শিশুর খেলনা ও পাশার ঘুঁটি প্রচুর পরিমাণে আবিকৃত হইয়াছে।

● **অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঃ** নগরকেন্দ্রিক হইলেও, কৃষি ও বাণিজ্য-উভয় ক্ষেত্রেই নগরদ্বয় বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। গম, যব, কার্পাসের চাষ খুব বেশী হইত। কৃষির প্রয়োজনে গরু, ছাগল, ভেড়া, ষাঁড়, মহিষ, উট প্রভৃতি জন্তু পালন করা হইত। এমন কি উট, হাতি প্রভৃতি জন্তুকেও পোষ মানান হইয়াছিল। পশ্চিম এশিয়ার সুমেরু ও মেসোপটেমিয়ার সহিত সিন্ধু উপত্যকার মানুষের বাণিজ্যিক আদানপ্রদান চলিত। ওই সব অঞ্চলে সিন্ধুতে ব্যবহৃত সীলমোহরের অনুরূপ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সূতীবস্ত্র ও গজদন্ত নির্মিত শিল্প দ্রব্য ছিল প্রধান পণ্য সামগ্রী। সমাজে নানা প্রকার শিল্পীগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল। ইহাদের মধ্যে কর্মকার, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, সূত্রধর রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কৃষি ও বাণিজ্য

সাধারণ মানুষ ছিলেন শান্ত ও আরামপ্রিয়। তেমন কোন উন্নত যুদ্ধাস্ত্র পাওয়া যায় নাই। অস্ত্রশস্ত্র বলিতে ছিল, তাম্র আর ব্রোঞ্জের তৈয়ারী কুঠার, কাস্তে, ছুরি, ক্ষুর ইত্যাদি। লৌহের ব্যবহার তখনও আরম্ভ হয় নাই।

● **ধর্মীয় জীবন ঃ** সিন্ধুবাসীদের ধর্মবিশ্বাস কয়েকটি সূত্র হইতে অনুমান করা যায়। বৃক্ষ, প্রস্তর ও বৃষ তখন পবিত্র বলিয়া মনে করা হইত এবং প্রতীক হিসাবে উহাদের পূজা হইত। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার উপাস্য দেবতাদের মধ্যে প্রধান স্থান ছিল মাতৃদেবীর। প্রকৃতিই মাতৃরূপে বন্দিতা হইতেন বলিয়া অনুমান করা হয়। পোড়ামাটির নির্মিত বেশ কয়েকটি মাতৃমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া, একটি সীলমোহরের উপরে যোগাসনে উপবিষ্ট তিনটি মস্তক বিশিষ্ট ও পশুপরিবৃত এক পুরুষদেবতার মূর্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনুমান করা হয়, ইনিই হইলেন পশুপতি মহাদেব। প্রস্তর নির্মিত শিবলিঙ্গও এখানে পাওয়া গিয়াছে। সিন্ধুবাসীরা মৃতদে: াধারণতঃ সমাধিস্থ করিতেন। শবদাহও আংশিক ভাবে প্রচলিত ছিল। সিন্ধু সভ্যতার বহু আচার ও বিশ্বাস পরবর্তী যুগের ধারার সহিত মিলিয়া গিয়াছে।

ধর্মবোধ



সীলমোহর

হরপ্পায় ও মহেঞ্জোদাড়োতে প্রায় দুই হাজার সীলমোহর পাওয়া গিয়াছে। উহাদের উপর লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। লিপিমালাগুলির পাঠোদ্ধার আজিও সম্ভব হয় নাই। সীলমোহরগুলির উপর নানারকম জীবজন্তু ও নৌকার ছবিও অংকিত আছে। সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধার ঘটিলে সিন্ধু সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাইবে। সিন্ধু লিপিতে মিশরীয় লিপির কিছু সাদৃশ্য আছে। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন সিন্ধুলিপি হইল ভারতবর্ষের আদিলিপি।

● **হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংসের কারণ ঃ** হরপ্পার ধ্বংসের কারণ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ মনে করেন, কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে নগরটি ধ্বংস হইয়া যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে উল্লেখ করা যায়, বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা, কৃষিকার্য ও পানীয় জলের অভাব, সিন্ধু নদের বন্যা এবং ভূমিকম্প। অধ্যাপক ব্যাশাম অনুমান করেন, পশ্চিম হইতে আগত অশ্বারোহী বৈদেশিকগণের আক্রমণে সম্ভবতঃ নগরীটি ধ্বংস হইয়াছিল।

ভারতীয় সভ্যতার বিকাশে হরপ্পা তথা সিন্ধু সভ্যতার অবদান অবিস্মরণীয়। পরবর্তিকালের ভারতীয় সভ্যতার বহু মূল বৈশিষ্ট্য এই সময় দেখা গিয়াছিল। ভারততত্ত্ব বিশেষজ্ঞ, অধ্যাপক ব্যাশামের মতে, নাগরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানে এই প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা আধুনিক যুগের কৃতিত্ব দাবি করিতে পারে।

● বহির্ভারতের সভ্যতার সহিত হরপ্পা সভ্যতার সম্পর্ক ●

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ পরীক্ষা করিয়া আধুনিক ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন, সমকালীন পশ্চিম এশিয়ার সভ্যতার সহিত সিন্ধু সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সিন্ধু উপত্যকায় ব্যবহৃত বহু সীলমোহর মেসোপটেমিয়ায় পাওয়া গিয়াছে। ইহা ব্যতীত, পশ্চিম এশিয়ার কোন কোন অঞ্চলের সীলমোহরে মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার সীলমোহরের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গিয়াছে। এই সব সাক্ষ্যের উপর

বাণিজ্যিক সম্পর্ক

নির্ভর করিয়া গবেষকরা অনুমান করেন, মেসোপটেমিয়ার সহিত ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ছিল। ভারতীয় বণিকগণ টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপকূলে বাণিজ্য সম্ভার লইয়া উপস্থিত হইতেন। তাহাদের প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য ছিল সূতীবস্ত্র ও গজদন্ত নির্মিত শিল্পদ্রব্য। অন্যদিকে ভারত আমদানি করিত কয়েকটি বিশেষ ধরনের কাঁচামাল ও দামী পাথর। সুমেরীয় শিল্পজাত বিলাসদ্রব্যও সিন্ধু উপত্যকায় জনপ্রিয় ছিল। ভারতে এই সব প্রসাধন সামগ্রী নকল করা হইত।

সিন্ধু ও সুমেরীয় এবং আসিরিয়া-ব্যবিলনিয়ার সভ্যতার কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। নাগরিক সভ্যতার বিকাশ, চিত্রমূলক লিপিমালা, ধাতুর ব্যবহার ইত্যাদির দিক হইতে সাদৃশ্য দেখিয়া অনুমান করা যায় সাংস্কৃতিক ও মানসিক দিক হইতেও সমকালীন সভ্যতাগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ।



তৃতীয় অধ্যায়॥ বৈদিক যুগ

এক □ আর্যজাতির পরিচয় ও আদি বাসস্থান

আনুমানিক ২০০০ হইতে ২৫০০ খ্রীষ্ট পূর্ব অব্দে উত্তর ভারতের এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে আর্যজাতির নেতৃত্বে যে কালজয়ী সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাই বৈদিক (আর্য) সভ্যতা নামে পরিচিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, সুপণ্ডিত ভারততত্ত্ববিদ অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের মতে, আর্য বলিতে কোন জাতি বুঝায় না। 'আর্য' একটি ভাষার নাম এবং এই ভাষায় যাঁহারা কথা বলিতেন তাঁহারাই সাধারণভাবে আর্য নামে পরিচিত হন।

আর্য কথার অর্থ

মূলতঃ আর্য শব্দটি 'অরি' শব্দ হইতে প্রকাশ ঘটিয়াছে। বৈদিক যুগে 'অরি' বলিতে বুঝাইত 'সাহসী' অথবা 'বিদেশী'। আবার 'আর্য' অর্থে 'নবাগত' অথবা 'নবাগতের প্রতি পক্ষপাতী' এইরূপও অনেকে ধারণা করিয়া থাকেন। ইহার কিছু কাল পরে 'আর্য' শব্দটির অর্থ 'মহৎ বংশোদ্ভূত ব্যক্তি' এই প্রকার প্রতিপন্নও করা হইতে থাকে।

আর্যদের বসতি বিতর্ক

আর্যদের আদি বাসভূমি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। ডঃ পুসলকর, ডঃ এ· সি·দাস প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিত মনে করেন, আর্যরা বহিরাগত নহেন। কিন্তু ভারতের কোন্ অঞ্চল তাঁহাদের আদি বাসভূমি সেই সম্পর্কে সকলেই একমত পোষণ করেন না। আর্যদের ভারতীয় উৎপত্তি সম্পর্কে অনুকূল প্রমাণ উত্থাপন প্রসঙ্গে তাঁহারা মন্তব্য করিয়াছেন যে, ঋগ্বেদে কোথায়ও পূর্বতন কোন পিতৃভূমি সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ নাই। ইহা ব্যতীত, আর্যদের পবিত্র স্থানগুলির সব কয়টিরই অবস্থান ভারতের অভ্যন্তরে। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে 'দাস,' 'দৈত্য', 'রাক্ষস,' 'নাগ' ইত্যাদি যে সব শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা ভারতের প্রাক-আর্য অধিবাসী-শত্রু অনার্য প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা হইয়াছে। আপন গাত্রবর্ণ ও দৈহিক সৌন্দর্যগত স্বতন্ত্রতার জন্যও তাঁহারা এই সব দেশের পূর্বতন অধিবাসী সম্পর্কে অবজ্ঞাসূচক শব্দ যেমন 'কৃষ্ণত্বচ' (কৃষ্ণাঙ্গ), 'অনাসা' (ভোঁতা নাক) ইত্যাদি ব্যবহার করিতেন। সুতরাং ভারতভূমি আর্যদের আদি বাসভূমি—এই কথা ভাবিবার কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নাই।

আর্যদের পিতৃস্থান নির্দেশ

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ আর্যদের আদি বাসস্থান হিসাবে ইউরোপের স্থান বিশেষকে চিহ্নিত করিতে প্রয়াসী হন। তাঁহাদের একটি অংশের মতে, আর্যদের পিতৃস্থান ছিল দক্ষিণ রাশিয়া (ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এই মতের সমর্থক) আবার কাহারো কাহারো মতে ঐ স্থানটি হইল হাঙ্গেরী অথবা চেকোশ্লোভাকিয়া। অধিকাংশ ঐতিহাসিক (অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার প্রমুখ) অবশ্য মনে করেন যে, মধ্য এশিয়ার কোন অঞ্চল হইতে আর্যগণ হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। বিদেশাগত হইলেও, ভারতীয় হিন্দুগণ আর্যদের আপন পূর্বপুরুষ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

অনুমান করা হয়, স্বচ্ছল জীবনযাত্রার সন্ধানে আর্যগণ পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্ন শাখায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহারই একটি শাখা উত্তর-পশ্চিম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া সিন্ধু উপত্যকার উত্তর ভাগে বসতি স্থাপন করেন। কালক্রমে আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আর্যদের অনুপ্রবেশ ঘটে। বৈদিক সাহিত্য হইতে আর্যদের জীবনযাত্রা ও কর্মকৃতির ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায়। আর্যদের আদি গ্রন্থের নাম ঋগ্বেদ।

দুই □ বৈদিক সাহিত্য

বেদকে আশ্রয় করিয়া আর্যসভ্যতা গড়িয়া উঠে। ভারতের ইতিহাসে বেদের গুরুত্ব অপরিসীম। হিন্দুরা মনে করেন, এই পবিত্র গ্রন্থ কোন মানুষের রচনা নহে। সত্যদ্রষ্টা মুনি ও ঋষিগণ সাধনার মাধ্যমে বিশ্বরহস্যের যে মূলমন্ত্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন, শিষ্য পরম্পরায় তাহা শ্রুত হইয়া বেদ নামে পরিচিত হইয়াছে। তাই বেদের অপর নাম 'শ্রুতি'। বেদ মানুষের রচনা নয়—এ জাতীয় বিশ্বাস কিন্তু যুক্তি ও বাস্তবতার বিরোধী। উনিশ শতকের বিখ্যাত যুক্তিবাদী লেখক 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত এই ধারণার তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। অবশ্য, অতীত ও বর্তমান ভারতের বহু খ্যাতনামা মনীষীর বেদের অপৌরুষেয় তত্ত্বের প্রতি আনুগত্য প্রশ্নাতীত।

বেদ রচনা

বেদ চারিভাগে বিভক্ত—ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব। ইহার মধ্যে ঋক্ বেদ শুধুমাত্র ভারতীয় নয়, সম্ভবতঃ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাপুঞ্জের মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থ। ইহাতে বরুণ, মিত্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে বিবিধ ছন্দে রচিত দশটি মণ্ডলে ১০১৭টি সূক্ত আছে। ঋগ্বেদের বহু সূক্ত যজ্ঞকালে সুর সহযোগে গীত হইত। এই সুর-সংযোজিত উক্তি লইয়া সামবেদ রচিত। যজুর্বেদে রহিয়াছে যজ্ঞের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত মন্ত্র। আর অথর্ববেদে আছে চিকিৎসা পদ্ধতি, মারণ ও বশীকরণ মন্ত্র, যাদুবিদ্যা প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়সমূহ। প্রতিটি বেদ আবার চারি খণ্ডে বিভক্ত। যথা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। বেদের কিছু অংশ গদ্যে রচিত যাহাকে বলা হয় 'সংহিতা', আর কিছুটা ছন্দে রচিত যাহা হইল 'ব্রাহ্মণ'। সংহিতায় স্তব-স্তুতি ও মন্ত্রাদি এবং ব্রাহ্মণ অংশে মন্ত্রগুলির টীকা ও যাগযজ্ঞের বিধিনিয়ম সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণের শেষ ভাগ 'আরণ্যক' নামে অভিহিত। ইহাতে দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে যাহা বৈদিক সাহিত্যের শেষ অংশ 'উপনিষদে' পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। উপনিষদ বেদের শেষ বা অন্ত বলিয়া ইহা 'বেদান্ত' নামেও পরিচিত। ঈশ, কেন, কঠ, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি শতাধিক উপনিষদে হিন্দু ধর্মতত্ত্ব ও ঈশ্বর চিন্তা এক বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

বেদ বিভাগ

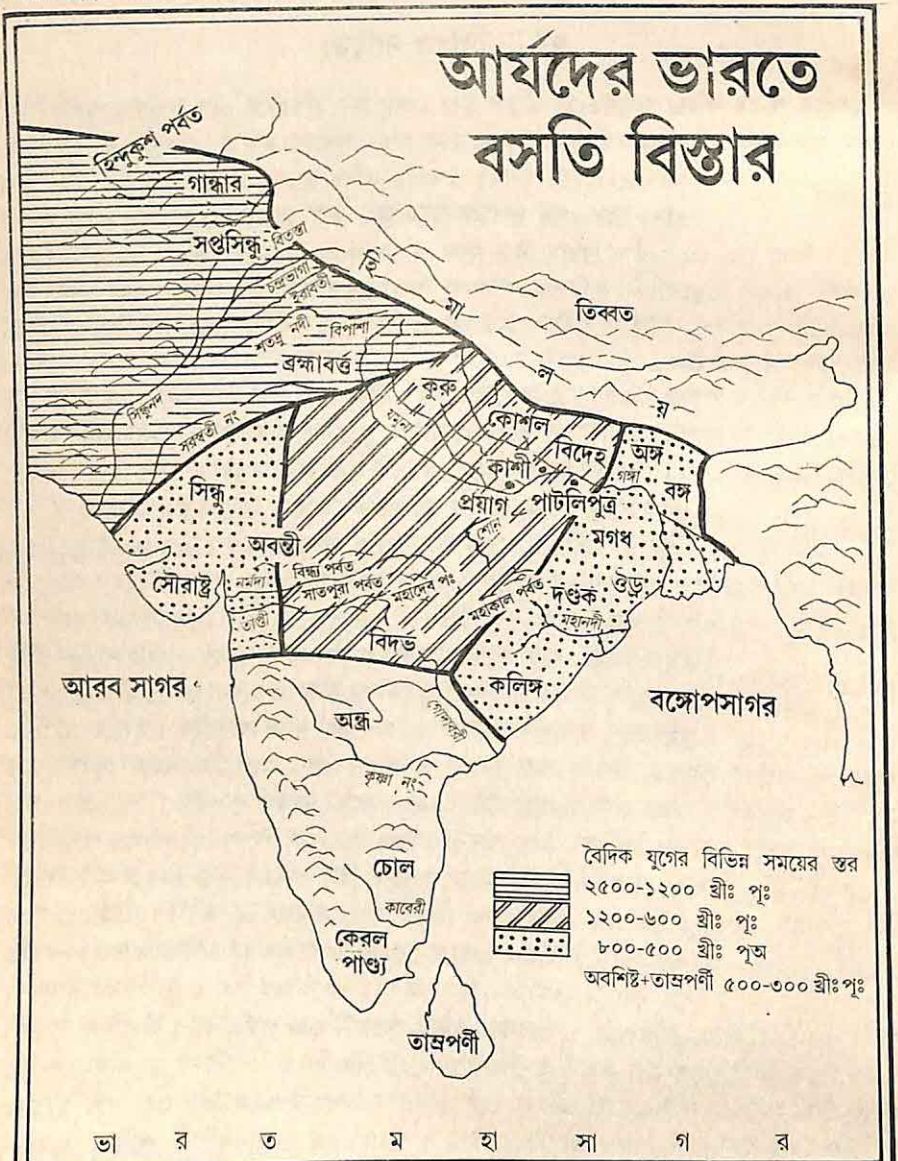
সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ

বেদপাঠবিধি, বেদমন্ত্রের তাৎপর্য ও যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান বিধি ব্যাখ্যার জন্য পরবর্তিকালে গড়িয়া উঠে 'বেদাঙ্গ'। বেদাঙ্গের ছয় ভাগ—শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দ, ব্যাকরণ ও জ্যোতিষ। ইহাদের মধ্যে 'কল্প' সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। সূত্রাকারে বিভক্ত কল্পসূত্র চারিভাগে বিভক্ত—শ্রৌত সূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র ও শূল্যসূত্র। বৈদিক যজ্ঞের বিধি ও অনুষ্ঠানের নির্দেশ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে শ্রৌতসূত্রে। অন্নপ্রাশন হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত গার্হস্থ জীবনের পালনীয় আচার বিবৃত আছে গৃহ্যসূত্রে। সামাজিক রীতিনীতি, লোকাচার বিষয়ে বিধিনিষেধ যে গ্রন্থে সংকলিত তাহার নাম ধর্মসূত্র। যজ্ঞের নানা মাপের বেদি নির্মাণের জন্য মাপ-জোকের কথা বলা হইয়াছে শূল্যসূত্রে। এই শূল্যসূত্রেই বৈদিক জ্যামিতির আভাস পাওয়া যায়। অপরদিকে, কপিল, পতঞ্জলি, গৌতম, কণাদ, জৈমিনি এবং ব্যাস-ভারতের এই ছয় জন বিশিষ্ট ঋষি বৈদিক দর্শনের ব্যাখ্যা করেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যা গ্রন্থাকারে ষড়দর্শন নামে পরিচিত, যথা-সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা।

সূত্র বিভাগ

তিন □ বৈদিক সাহিত্যে প্রতিফলিত জনগণের জীবনযাত্রা

বেদ নিছক ধর্মগ্রন্থ নয়। ইহা একদিকে যেমন বিভিন্ন দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্পশাস্ত্রের মূল উৎস, অপরদিকে তেমন প্রধান ভারতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের আধার। আর্যসভ্যতার পরিচয় প্রদানে ইহা পরম নির্ভরযোগ্য উপাদান।



সিন্ধুসভ্যতা ও দ্রাবিড় সভ্যতার পরবর্তিকাল হইতে ভারতে যে সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল, তাহা আর্য সভ্যতা নামে পরিচিত। কোন্ কোন্ কারণ হইতে সিন্ধু সভ্যতার বিকাশ ও বিনাশ ঘটিয়াছিল, তাহা

সুনিশ্চিত ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নহে। অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন যে, প্লাবন বা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফল হইতে এই সভ্যতার বিনাশ ঘটিয়াছিল। একথা বলা যাইতে পারে, আর্যদের ভারত আগমনের সময় ভারতের প্রাচীন সভ্যতা একরূপ ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় ছিল। যুদ্ধ কৌশলে সুনিপুণ ও উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত আর্যদের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে আর্যপূর্ব সভ্যতা বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছিল মোঘলদের নিকট চীন ও খিলাফৎ এবং তুর্কীদের নিকট বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের যেরূপে পতন ঘ. ..ছিল, ভারতে আর্যদের নিকট আর্যপূর্ব সভ্যতার সেইরূপ বিনাশ ঘটিয়াছিল।

বেদগ্রন্থগুলি ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন লিখিত সাহিত্য। অবশ্য সেইগুলির বিষয়বস্তু যেরূপ বহু বিচিত্র সেরূপ একাধিক ঐতিহাসিক কালপর্বের লিখিত পাঠ তাহার অন্তর্ভুক্ত।

কৃষিভিত্তিক গ্রামকেন্দ্রিক সমাজজীবন

● **বৈদিক সমাজ ঃ** পশুপালক যাযাবর জাতি হিসাবে আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করেন। ভারতের অনুকূল পরিবেশে ক্রমে ক্রমে তাঁহারা স্থিতিশীল হইয়া কৃষিবৃত্তি গ্রহণ করেন এবং গ্রামকেন্দ্রিক এক নূতন সভ্যতা গড়িয়া তোলেন। খাদ্য ও আশ্রয়ের প্রাথমিক প্রয়োজন মিটাইয়া তাঁহারা বিভিন্ন শিল্পকর্মে মনোনিবেশ করেন। বৈদিক সাহিত্যে কর্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধর, চর্মকার, তন্তুবায়, স্বর্ণকার, রথনির্মাতা প্রভৃতি শিল্পী গোষ্ঠীর উল্লেখ আছে। বৈদিক যুগে প্রতিটি গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভর। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে পল্লীস্থ সকলের যৌথ অধিকার সাব্যস্ত ছিল।

নারীর স্থান

আর্য সমাজ ছিল পিতৃতান্ত্রিক ও পরিবারভিত্তিক। পুরুষ ছিলেন গৃহপতি। পরিবার তাঁহারই নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইত। পিতৃশাসিত হইলেও সমাজে নারীর স্থান সম্মানজনক ছিল। গৃহকর্ম ভিন্ন শাস্ত্র ও বিদ্যালোচনা, সংগীত ও নৃত্যচর্চার প্রতি তাঁহাদের আগ্রহ ও পারদর্শিতা পরিলক্ষিত হইত। যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে তাঁহারা স্বামীর সহযোগিনী হইতেন, আবার এককভাবে অবিবাহিতা থাকিয়া ব্রহ্মবাদিনী হিসাবেও শাস্ত্রাদির চর্চা করিতেন। ঘোষা, বিশ্বরূপা, অপালা, লোপামুদ্রা ছিলেন প্রাচীন বৈদিক যুগের মনস্বিনী মহিলা।

গৃহস্থের পক্ষে বিবাহ অবশ্যকর্তব্য ছিল। বাল্য বিবাহ তখনও প্রচলিত হয় নাই। সাধারণতঃ একটিমাত্র বিবাহই রীতি ছিল। তবে পুরুষের ক্ষেত্রে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। স্বামী নির্বাচনে নারী স্বাধীনতা ভোগ করিতেন।

আমোদপ্রমোদ, খাদ্য, বেশভূষা

বৈদিক আর্যরা স্বচ্ছ, সুস্থ, ও প্রাণোচ্ছল জীবন যাপন করিতেন। নৃত্য, গীত, শিকার, রথচালনা ও দ্যূতক্রীড়ায় তাঁহারা প্রতিনিয়ত অংশগ্রহণ করিতেন। খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবহারে কোন গোঁড়ামি ছিল না। ধান, যব, গম, দুধ এবং ঘি প্রধান খাদ্য হইলেও গোমাংস ভক্ষণে অরুচি ছিল না। সোমরস ও সুরাপান অবাধে চলিত। সোমরস পান বিশেষতঃ যজ্ঞানুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হইত। স্বর্ণালংকার ও পুষ্পভূষণ ব্যবহারে পুরুষ ও নারীর সমান অনুরাগ দেখা যায়। সৌন্দর্যের অঙ্গ হিসাবে কেশ বিন্যাসের প্রতিও নারীর আন্তরিক যত্ন ছিল। বেশভূষাতেও তাঁহারা অমনোযোগী ছিলেন না। রেশম ও পশম নির্মিত পরিধেয় তাঁহারা ব্যবহার করিতেন। তিন প্রকার আবরণের প্রচলন ছিল—দেহের উপরের অংশের জন্য 'উত্তরীয়', নিম্নাংশের জন্য 'নিবি' আর নিবির উপরে 'পরিধান'।

আর্যদের মধ্যে শবদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। দাহ অন্তে অস্থি সমাধিস্থ করা হইত এবং অনেক সমাধির উপর স্তূপ নির্মাণ করা হইত।

বর্ণ-বিভাগ ও জাতিভেদ প্রথার অস্তিত্ব আমরা আর্যদের সময়কালে দেখিতে পাই। ভারতের মধ্যে এই বর্ণ বা জাতিভেদের সৃষ্টি সম্পর্কে পণ্ডিতমহলে নানা প্রশ্নের সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রশ্নের উত্তরে বিবিধ অর্থনৈতিক, সামাজিক অবতারণা দেখা যায়। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের

বিকাশের ধারাটিকেও ইহার পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তরের স্বপক্ষে কার্ল মার্কসের উক্তিটি বিশেষভাবে গ্রহণীয়। তিনি বলিয়াছেন যে,'জাতিভেদ বলিতে বুঝায় পূর্ববর্তী উপজাতীয় সমাজ সংগঠনেরই একটি স্মারক-চিহ্ন। পূর্ববর্তী উপজাতীয় সমাজ বন্ধনের একটি চরম ও নিদারুণ কঠোর চেহারা এই জাতিভেদের মধ্যেই সুপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে'। এই জাতির সমসাময়িক পূর্ববর্তী ভারতীয় সমাজে ছিল আর একটি 'বর্ণ' বা গোষ্ঠীর অস্তিত্ব। আবার এই বর্ণের উদ্ভব ঘটিয়াছিল প্রাক-শ্রেণীবিভক্ত সমাজ হইতে। পরবর্তিকালে উহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে বিবেচিত হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে এই বর্ণগুলি একটি প্রকৃত জাতির রূপ নেয়। ইহার ফলেই সমাজে বহুক্ষেত্রে 'বর্ণ'কে জাতি বলিয়া বিবেচিত করা হইয়া থাকে।

বর্ণ ও জাতি ভেদ

আর্য সমাজের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা। গুণ, কর্ম ও বৃত্তি অনুযায়ী জনগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ বা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যাঁহারা শাস্ত্রপাঠ ও যাগযজ্ঞ করিতেন তাঁহারা হইলেন ব্রাহ্মণ, যাঁহারা যুদ্ধ ও রাজ্যশাসন করিতেন তাঁহাদের বলা হইত ক্ষত্রিয়, যাঁহারা কৃষিকার্য, পশুপালন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকর্মে নিযুক্ত থাকিতেন তাঁহারা ছিলেন বৈশ্য। অনার্য জাতির মধ্যে যাহারা বশ্যতা স্বীকার করিয়া আর্য সমাজভুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা হইলেন শূদ্র। প্রথমে এই বর্ণভেদ জন্মগত ছিল না। পরবর্তী বৈদিক যুগে শ্রেণীভেদের কঠোরতা বৃদ্ধি পায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের মধ্যে উপনয়নের মাধ্যমে 'দ্বিজ' অর্থাৎ দ্বিতীয় জন্মের প্রতীক একটি অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল। এই তিন জাতির সকলের জীবনকে 'চতুরাশ্রমে' বিভক্ত করা হইত। প্রথম বয়সে প্রত্যেক আর্যসন্তান গুরু গৃহে ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিত। পাঠ সমাপনান্তে বিবাহ করিয়া আর্য যুবককে গৃহস্থের জীবন যাপন দ্বারা গার্হস্থ ধর্ম পালন করিতে হইত। জীবনের তৃতীয় স্তরে পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে অরণ্যে যাইয়া 'বানপ্রস্থ' অবলম্বন এবং চতুর্থ বা শেষ স্তরে 'সন্ন্যাস' গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর চিন্তায় কালাতিপাত করা আর্যদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ছিল। এইভাবে চাতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রম আর্যজাতির জীবনকে যেমন সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছিল তেমনি ইহা আর্য সমাজকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করিয়াছিল।

শ্রেণীভেদ ব্যবস্থা

চতুরাশ্রম

● **বৈদিক অর্থনীতি ঃ** গ্রামকেন্দ্রিক বৈদিক সমাজে কৃষিই ছিল প্রধান উপজীবিকা। পরিপূরক বৃত্তি হিসাবে ছিল পশুপালন ও নানাবিধ শিল্পকর্ম। গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে গরু, মেষ, কুকুর ও অশ্বের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। গোধন ছিল সমৃদ্ধির চিহ্ন। সম্পত্তির পরিমাণ করা হইত গরুর সংখ্যা অনুযায়ী। ঋগ্বেদে বাণিজ্যপোত ও সমুদ্রযাত্রার এবং 'বণিক' শব্দের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, কৃষির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সূত্রপাত হইয়াছিল। সমকালীন সভ্য দেশগুলির সঙ্গে এবং ভারতের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জাতির সহিত আর্যদের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চলিত। প্রথম দিকে অর্থের প্রচলন ছিল না। বিনিময় প্রথাই ছিল সাধারণ রীতি। ক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রার উদ্ভব ঘটে। বৈদিক সাহিত্যে 'নিষ্ক' ও 'মানা' নামে মুদ্রার উল্লেখ আছে।

বিভিন্ন জীবিকা

আগেই বলা হইয়াছে, বৈদিক সমাজে প্রথমে জমির উপর যৌথ মালিকানা কায়েম ছিল। পরবর্তিকালে ভূসম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

বৈদিক সাহিত্য বেশ কিছু সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, শুভ ও অশুভ শক্তির মধ্যে, দেবতা ও দানবদের মধ্যে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের কাহিনী। বৈদিক যুগের মানুষের প্রধান দুইটি জীবিকা ছিল, কৃষিকাজ ও পশু পালন। কৃষির অগ্রগতি এবং জনসমষ্টির অধিকাংশের পক্ষে জমি আবাদ করিবার ভিত্তিতে সুস্থিত জীবনযাত্রায় উত্তরণ যখন সম্ভব হয় তখন লোহার তৈয়ারী হাতিয়ার আবির্ভাবের ফলে উৎপাদনে নানা ধরনের কাজে লোহার ব্যবহার দেখা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার করিলে, বলিতে

হয়, খৃষ্টপূর্ব এগারো শতকেও উত্তর ভারতে স্বল্প পরিমাণ লোহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তথাপি এই ধাতুর ব্যবহার বহুল প্রচলিত হয় না। তাহারও বেশ কয়েক শতাব্দী পরে সম্ভবতঃ ঋগ্বেদের রচয়িতারা লোহার ব্যবহার সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। তবে সেই সময় লোহাকে যেরূপে আখ্যাত করা হইত তাহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে বর্তমানেও মতভেদ বিদ্যমান। সম্ভবতঃ তখনই অয়স শব্দে লোহা বোঝাইত। পরবর্তী বেদগুলিতে অবশ্য ব্যবহৃত হইয়াছে শ্যাম বা কৃষ্ণবর্ণ এবং অয়স শব্দ দুইটি। লৌহ তৈয়ারী হাতিয়ার গড়িবার পর আর্য-উপজাতিগুলির পক্ষে গঙ্গা উপত্যকার অরণ্য অঞ্চলে বসতি স্থাপন করা, জমির চাষ আবাদ করা এবং যেস্থানে প্রয়োজন সেস্থানে জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা সহজ হইয়া দাঁড়াইল।

● **বৈদিক ধর্মজীবন ঃ** বেদে আর্যগণের ধর্ম চেতনা ও ধর্ম আচরণের চিত্র পাওয়া যায়। প্রথম দিকে আর্যগণ প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেন। পূজ্য দেবতাদের মধ্যে ছিলেন 'দ্যৌঃ' অর্থাৎ আকাশের দেবতা সূর্য, অন্তরীক্ষের দেবতা অগ্নি, বৃষ্টি ও বজ্রের নিয়ামক ইন্দ্র, বরুণ, মরুৎ ও বায়ু, যম প্রভৃতি। অদিতি, উষা প্রমুখ নারী দেবতাদেরও উপাসনা হইত। দেবতার সংখ্যা প্রচুর হইলেও আর্যগণ মনে করিতেন, বিভিন্ন দেবতা একই পরমাত্মার বিভিন্ন প্রকাশ। প্রাচীন আর্যরা পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না।

উপাসনা

বৈদিক যুগের ভারতীয়রা নানান প্রাকৃতিক ব্যাপারেও দেবদেবীদের ওপর মানসিক গুণাবলী আরোপ করিতেন, তাহাদের ভূষিত করিতেন মানসিক দোষত্রুটি ও গুণ দিয়া। ঋগ্বেদে ইহা ছাড়াও বহু দেবতার দর্শন পাওয়া যায় যাহাদের উপর আরোপিত হইয়াছে পার্থিব অন্যান্য প্রাণীর আকার প্রকার। ইহারা দেখা দিয়াছেন মানবেতর প্রাণীর রূপ ধরিয়া এবং প্রাকৃতিক নানা ব্যাপারের সহিত মৌল সম্পর্ক যুক্ত হইয়া আছেন। যেমন দেবতা ইন্দ্র কখনও কখনও উপস্থিত হইয়াছেন যণ্ডের মূর্তিতে এবং অগ্নিদেবতা অশ্বের রূপ ধরিয়া। দেবতাদের উদ্দেশে বৈদিক আর্যরা নিবেদন করিয়াছেন প্রার্থনা স্তোত্র, ইহা তাহাদের উদ্দেশেই উৎসর্গ করিয়াছে। বৈদিক যুগে দেব পূজার জন্য দেবতাদের প্রতিকৃতি বা কল্পনাভিত্তিক ছবি ব্যবহৃত হইত কিনা ইহা লইয়া পণ্ডিতগণ একমত হইতে পারেন নাই।

আর্যদের ধর্মীয় জীবনের প্রধান অঙ্গ ছিল শক্তিমান দেবতাদের তুষ্টিবিধানের জন্য স্তবপাঠ ও যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন। ঘৃত, দুগ্ধ, তণ্ডুল, সোমরস ইত্যাদি অগ্নিতে আহুতি দিয়া মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে দেবতাদের আহ্বান করা হইত। বিশেষ বিধি অনুসারে বেদী নির্মাণ করা হইত। সমিধ দিয়া আগুন জ্বালান হইত। সেই যুগের আর্যদের কোন মন্দির ছিল না। কালক্রমে অবশ্য বৈদিক ধর্মের রূপান্তর ঘটে।

স্তব ও যজ্ঞক্রিয়া

বৈদিক সাহিত্য এবং ঋগ্বেদেও নাটকীয় উপস্থাপনার বহু লক্ষণ নজরে পড়িয়া থাকে। পরবর্তী সাহিত্যে এই লক্ষণগুলিই পুরোদস্তর নাটকের আকারে বিকশিত হইয়া উঠে। ইহার একটি আগ্রহোদ্দীপক উদাহরণ হইল ঋগ্বেদের তথাকথিত স্তোত্রে কথোপকথন অংশগুলি। অনুমান করা হয় এগুলি শুধু ধর্মীয় মন্ত্র ছিল না, নাটকীয় উপস্থাপনার জন্যও লিখিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদের কিছু কিছু উপাখ্যান পরবর্তিকালে, ভারতীয় কবি-নাট্যকারদের নাটক রচনার বিষয়বস্তু যোগাইয়াছে। যেমন, মহাকবি কালিদাস তাহার বিক্রমোর্বশী নাটকের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীর প্রতি রাজা পুরুরবার উপাখ্যানটি।

● **আর্যদের রাজনৈতিক সংগঠন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঃ** ঋগ্বেদের যুগে আর্যরা গোষ্ঠীপতির নেতৃত্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া বসতি স্থাপন করে এবং পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে সর্বদাই সংঘর্ষে লিপ্ত থাকিত। এই সব সংগ্রামশীল গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রধান ছিল—অহ্, যদু, পুরু, ভরত প্রভৃতি। পরস্পর বিরোধী সংগ্রাম ব্যতীত আর্যগণকে ভারতের আদিম অধিবাসীদের সহিতও নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহ করিতে হইত। যুদ্ধ বিগ্রহ পরিচালনা ও শান্তি কায়েম করিবার

রাজতন্ত্রের উৎপত্তি

প্রশ্নে স্বাভাবিক ভাবেই গোষ্ঠীপতিদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে তাঁহারা প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হইয়া পড়িলেন। এই ভাবে রাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে।

বৈদিক সাহিত্যে রাজ চক্রবর্তীর অভিষেক উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠান, রাজসূয় যজ্ঞের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠানে রাজার ব্যক্তিত্বে আরোপিত হইত দেবত্ব। রাজার প্রধান' পুরোহিতের ভূমিকা উক্ত সময় হইতেই অত্যন্ত প্রকট হইতে থাকে। পুরোহিত রাজার জ্যোতিষী ও উপদেষ্টার ভূমিকাতেও অধিষ্ঠিত হইতে থাকেন। রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে সাহায্যকারী ব্যক্তিদের নামের কিছু কিছু তালিকা তখনও পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইত। এগুলিও বেশ আগ্রহোদ্দীপক। এই ব্যক্তিদের আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল রাজ নির্বাচক। রাজার নির্বাচকদের এই তালিকায় গ্রামনী বা গ্রামের মোড়লগণেরও নামের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে ধারণা করা যাইতে পারে যে, তখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শাসনকার্যের ব্যাপারে গ্রামের স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের কিছুটা সম্পর্ক ছিল। তবে ক্রমশঃ নির্বাচিত রাজার স্থান লইলেন বংশানুক্রমিক রাজা। সেই সময় হইতেই রাজশক্তি নিয়মিত ভাবেই পিতা হইতে পুত্রে হস্তান্তরিত হইয়া চলিল।

ঋগ্বেদে আর্যজাতির অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে 'দশ রাজার যুদ্ধ' নামে একটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধের কথা বলা হইয়াছে।

প্রথম সম্রাট কথার উল্লেখ

ভরত-গোষ্ঠীর রাজা সুদাস বশিষ্ঠের আশীর্বাদ লইয়া দশটি আর্যগোষ্ঠীর রাজাকে পরাভূত করেন। সুদাস পরাজিত রাজ্যগুলি অধিকার করিয়া ক্ষমতা প্রসারিত করেন। তাঁহাকে রাজাধিরাজ সম্রাট বলিয়া অভিনন্দিত করা হয়। ঋগ্বেদে এই প্রথম 'সম্রাট' কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য পরবর্তী বৈদিক যুগে আর্যদের অন্তর্দ্বন্দ্ব আরও বাড়িয়া গিয়াছিল।

ঋগ্বেদে আর্যদের সহিত দাসগণের বিরামহীন যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই দাসগণই অনার্য নামে খ্যাত। আর্যগণ অনার্যদিগকে পরাজিত করিয়া খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ হইতে ৮০০ অব্দের অন্তবর্তিকালে সরস্বতী নদী হইতে গঙ্গা উপত্যকা পর্যন্ত নিজেদের অধিকারে আনিতে সমর্থ হইয়াছিল, একথা বেদের ব্রাহ্মণ অংশে উল্লিখিত আছে। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কুরুক্ষেত্রে, মগধ, কাশী প্রভৃতি স্থানে আর্যদের গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল।

বৈদিক যুগে রাজপদ সাধারণতঃ বংশানুক্রমিক ছিল। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে রাজা প্রজাদের দ্বারা নির্বাচিত হইতেন—এইরূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈদিক যুগের প্রথম পর্বে 'রাজন্' বা রাজার

সভা সমিতি

ক্ষমতা সীমাহীন ছিল না। 'সভা' ও 'সমিতি' নামে প্রতিষ্ঠানদ্বয় রাজকীয় ক্ষমতাকে সংযত রাখিত। সমিতি ছিল জনসাধারণের সমাবেশ আর সভায় বর্ষীয়ান বা অর্থবান ব্যক্তিদের সমাগম হইত। সমিতির ক্ষমতা সভা অপেক্ষা বেশী ছিল বলিয়া ঐতিহাসিকরা মনে করেন। পরবর্তী বৈদিক আমলে সভা-সমিতির গুরুত্ব হ্রাস পায়।

ঋগ্বেদের আমলে রাজা অভ্যন্তরীণ শাসনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য দুই শ্রেণীর পদস্থ কর্মচারীদের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। ইহারা হইলেন 'পুরোহিত' ও 'সেনানী'। ধর্ম ও শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে পুরোহিত রাজাকে পরামর্শ দান করিতেন আর সৈন্য পরিচালনা এবং সামরিক বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন সেনানী।

বৈদিক যুগে রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল গ্রাম। কতকগুলি গৃহপতিশাসিত পরিবার লইয়া গঠিত ছিল গ্রাম।

গ্রামনী, বিশ,জন

গ্রামের প্রধান ছিলেন গ্রামনী। কয়েকটি গ্রাম একত্রিত হইয়া সংগঠিত হইত 'বিশ' বা 'জন'। বিশের শাসনকর্তাকে বলা হইত 'বিশপতি'।

বৈদিক রাষ্ট্র মূলতঃ রাজতান্ত্রিক হইলেও 'গণ' ও 'বিশ' প্রভৃতি রাজনৈতিক পারিভাষিক শব্দ হইতে অনুমান করা যায়, কোথাও কোথাও প্রজাতন্ত্র প্রচলিত ছিল।

● পরবর্তী বৈদিক যুগের সভ্যতা ●

প্রথমে আর্যরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল ও পাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করেন। কালক্রমে তাঁহারা সমগ্র উত্তর-ভারতে ছড়াইয়া পড়েন। দক্ষিণ ভারতে আর্যদের বসতি বিলম্বে ঘটে, ফলে তথায় বৈদিক সভ্যতা কোনদিনই ব্যাপক বা গভীর হয় নাই। বসতির সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে আর্যদের সমাজ ও অর্থনীতিতে, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে গুণগত পরিবর্তন ঘটিতে শুরু করে এবং স্থিতিশীলতার মাধ্যমে রাজকর্তৃত্ব ও রক্ষণশীলতা শক্তিশালী ও দৃঢ় হয়।

● **সামাজিক ব্যবস্থা** ঃ ঋগ্বেদের সময় আর্যদের বসতি ছিল গ্রামে। পরবর্তিকালে নগরের উদ্ভব ঘটে। অভিজাতগণসহ রাজা নগরে বাস করিতে শুরু করেন।

নারীর অধিকার সংকোচন

বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে নারীর অধিকার সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহারা সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন, রাজসভায় উপস্থিত হইবার স্বাধীনতা হারাইলেন। কিন্তু পূর্বতন মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইলেও নারীর জ্ঞানচর্চা অব্যাহত থাকিল। এই যুগের বিশিষ্ট ব্রহ্মবাদিনী মহিলাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেন গার্গী ও মৈত্রেয়ী।

পরবর্তী বৈদিক আমলে সমাজে জটিলতা দেখা দিলে বর্ণভেদ জাতিভেদে পরিণত হয়। জন্মের ভিত্তিতে শ্রেণী নির্ণীত হইল। সামাজিক রীতি-নীতির কঠোরতা বৃদ্ধি পাইল। এক শ্রেণীর সহিত অপর শ্রেণীর আহার ও বিবাহ নিষিদ্ধ হইল। সমাজে জাতিগত বৈষম্য আত্মপ্রকাশ করিল।

● **অর্থনীতি** ঃ ঋগ্বেদের সময়কালে স্বর্ণ, তাম্র ও ব্রোঞ্জের প্রচলন ছিল। পরবর্তী বৈদিক যুগে বিশেষ করিয়া লৌহের ব্যবহার শুরু হইলে কৃষি ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। কৃষি-যন্ত্রপাতির ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু ভূসম্পত্তিতে পূর্বতন যৌথ মালিকানার পরিবর্তে ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় হইতে অবশ্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় বাণিজ্যেরই বিকাশ ঘটিল। 'শতপথ ব্রাহ্মণের' কাহিনী হইতে অনুমান করা যায় যে, পশ্চিম এশিয়ার সহিত বৈদিক আর্যদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেষ্ঠীদেরও বিকাশ ঘটিল।

লৌহের প্রচলন ও কৃষির উন্নতি

● **ধর্মজীবন** ঃ বৈদিক যুগের শেষভাগে ধর্মক্ষেত্রেও পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল। প্রথম পর্বের দেবতাদের পরিবর্তে রুদ্র (পশুপতি শিব) ও বিষ্ণুর উপাসনা প্রাধান্য লাভ করে। সিন্ধু সভ্যতায় মাতৃপূজার অনুরূপ শক্তি আরাধনারও সূচনা দেখা দেয়। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্যের মধ্য দিয়া দার্শনিক তত্ত্বের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইল। অন্যদিকে, যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান জটিল হইয়া উঠে, পশুবলি প্রথা বৃদ্ধি পায় এবং পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অনার্য ধারার প্রভাবও নূতন যুগের পূজাপদ্ধতি ও রীতিনীতিতে ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠে।

রুদ্র, বিষ্ণু ও শক্তির আরাধনা

● **বিজ্ঞান-বিকাশ**—বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈদিক সমাজ এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। ঋগ্বেদ পাঠে জানা যায়, সেই সময় চিকিৎসা বিজ্ঞান বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে লতাপাতা-শিকড়বাকড়, বিশেষ ধরণের মলম, জল-চিকিৎসা প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য। উপরিউক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সেই সময়কার ভারতীয়রা বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। পরবর্তিসময়ে বেদের চারিটি ভাগের মধ্যে অথর্ব বেদে ঔষুধপত্র সম্পর্কে নানা তথ্যাদি জানা যায়। রোগ দূরীকরণের নানান মন্ত্রাদিরও (মারণ, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদি) উল্লেখ এখানে পাওয়া যায়।

বৈদিক যুগের ভারতীয়রা মানুষের রোগকে দেবদেবীর রাগ এবং রোগ নিরাময়কে তাঁহাদের সন্তুষ্ট হইবার সুলক্ষণ বলিয়া বিবেচিত করিতেন। সেই সময় রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে যাদুবিদ্যা এক বিশেষ

ভূমিকা গ্রহণ করিত। ইহা ছাড়া লতাপাতা-শিকড়বাকড়ের গুণাবলী ও সেগুলি কি প্রকারে ব্যবহার করিতে হইবে তাহাও জানা ছিল। উক্ত সময়ের চিকিৎসকরা চোখ, পাকস্থলী, ফুসফুস ও চর্মের বিভিন্ন প্রকার রোগের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন একথা আমরা সংহিতাগুলি হইতে জানিতে পাই। বৈদিক যুগের প্রাচীন ভারতীয়দের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা সম্পর্কেও আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য ও লিখিত রচনার সূত্রের মাধ্যমেই কিছু কিছু তথ্য জানিতে পারি।

রোগ নিরাময়

● **রাজনৈতিক অবস্থা** ঃ ঋগ্বেদের যুগে আর্যদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষ দেখা দিয়াছিল, পরবর্তিকালে তাহা আরও ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল এবং ক্রমে ক্রমে আর্য রাষ্ট্রে সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাব ঘটিল। রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান ও সম্রাট, একরাট প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ এই শক্তিদ্বন্দ্বের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব

ভারতবর্ষে আর্যজাতির আগমন এক যুগান্তকারী ঘটনা। আর্য সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করিয়াই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্র, দর্শন ও বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সঙ্গীত, শিল্প ও নাট্যশাস্ত্র—সমগ্র বিষয়ই বেদ-নির্ভর। বেদ ও উপনিষদকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে ভারতীয় গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্র এবং সাংখ্য, যোগ, ন্যায় প্রভৃতি ষড়দর্শন। উপনিষদ ও বেদান্ত আজিও হিন্দু চিন্তাশীলতার মূলভিত্তি।

বৈদিক সভ্যতার অবদান

দেবার্চনায় মন্ত্রোচ্চারণ ও যজ্ঞানুষ্ঠানের বৈদিক ঐতিহ্য এখনও বর্তমান। হিন্দু বিবাহ, উপনয়ন ও শ্রাদ্ধের মন্ত্র আজও বৈদিক। আর্য বর্ণাশ্রম প্রথাকে অবলম্বন করিয়া হিন্দু সমাজে এখনও জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত আছে। এক কথায় বলিতে গেলে, বেদের চিরন্তন প্রেরণাতেই হিন্দু মনন ও মানসের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটিয়াছে।

চার □ আর্য সভ্যতার ক্রমবিস্তার

ঋগ্বেদের যুগে আর্যদের বসতি ছিল আফগানিস্থানের সীমান্ত হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত। সিন্ধু ও তাহার শাখা-প্রশাখা বিধৌত পাঞ্জাব ছিল সমকালীন ভারতীয় আর্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থল। গঙ্গা-যমুনা-নর্মদার কোন উল্লেখ ঋগ্বেদে নাই।

আর্যবসতির সম্প্রসারণ কিন্তু কখনও থামিয়া থাকে নাই। ক্রমশঃ তাঁহারা উত্তর ভারতে ছড়াইয়া পড়েন। বৈদিক সাহিত্যের ভৌগোলিক উল্লেখ হইতে জানা যায় খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম অব্দ হইতে গাঙ্গেয় উপত্যকার অধিকাংশ অঞ্চল আর্যদের অধিকারে চলিয়া আসিতে থাকে। কুরু-পঞ্চাল, (দিল্লী ও মীরাট অঞ্চল), কোশল (অযোধ্যা), কাশী (বারাণসী), বিদেহ (উত্তর বিহার), মগধ (দক্ষিণ-বিহার), অঙ্গ (পূর্ব-বিহার) প্রভৃতি স্থানে আর্যশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে আর্যসভ্যতার প্রসার ঘটিয়াছিল বৈদিক যুগের শেষভাগে। আর্যসংস্কৃতি-পুষ্ট সিন্ধু-গঙ্গা-উপকূল অঞ্চল 'আর্যাবর্ত' নামে পরিচিত।

আর্যাবর্ত অঞ্চল

দাক্ষিণাত্যেও ক্রমশঃ আর্য বসতি স্থাপিত হইতেছিল। বৈদিক যুগের শেষ দিকে, আর্যগণ দক্ষিণে বিদর্ভ (বেরার) অতিক্রম করিয়া গোদাবরী নদীর উপত্যকা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন। এই সময়কার বৈদিক সাহিত্যে গোদাবরী উপত্যকার অন্ধ্র ও বিন্ধ্য অরণ্যের পুলিন্দগণের নাম পাওয়া যায়। অনুমান করা হয়, ঐসব অঞ্চলে আর্য রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে আর্য শক্তির অখণ্ড প্রতিপত্তি কখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যাহা হউক, আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হইতে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম বা চতুর্থশতক পর্যন্ত ক্রমশঃ সমগ্র ভারতবর্ষে আর্যসভ্যতার বিস্তার সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

● সিন্ধু ও বৈদিক সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা ●

সিন্ধু সভ্যতার সহিত বৈদিক সভ্যতার কতকগুলি পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমতঃ, সিন্ধু সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে নাগরিক সভ্যতা, বৈদিক সভ্যতা গ্রাম-কেন্দ্রিক। দ্বিতীয়তঃ, সিন্ধু সভ্যতার সমাজব্যবস্থা ছিল মাতৃকেন্দ্রিক, বৈদিক সমাজব্যবস্থা ছিল পিতৃতান্ত্রিক। তৃতীয়তঃ, মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার নাগরিকগণের সহিত লৌহের পরিচয়ের কোন প্রমাণসূত্র পাওয়া যায় নাই, বৈদিক সভ্যতায় লৌহের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। চতুর্থতঃ, সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে অশ্বের দেহাবশেষ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু আর্যদের গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে অন্যতম ছিল অশ্ব। পঞ্চমতঃ, ধর্মমতের দিক হইতে দুই সভ্যতার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ছিল। সিন্ধু সভ্যতায় লিঙ্গ পূজার প্রচলন ছিল, বৈদিক সভ্যতায় লিঙ্গ পূজা নিন্দিত ছিল। মূর্তিপূজার প্রচলন সিন্ধু সভ্যতায় দেখিতে পাওয়া যায়, আর্যদের মধ্যে প্রথমে উহা অজানা ছিল। সিন্ধু সভ্যতায় উপাস্য দেবতাদের মধ্যে প্রধান স্থান ছিল মাতৃদেবীর, বৈদিক যুগে পুরুষ দেবতাদের প্রাধান্য। সর্বশেষে বলা যায়, ঐতিহাসিকদের অভিমতে বৈদিক যুগ অপেক্ষা সিন্ধু সভ্যতার আমলে শিল্প-বাণিজ্যের অধিকতর প্রসার ঘটে।

পাঁচ □ লৌহ যুগের সূচনা

ভারতে সর্বপ্রথম তামা-ব্রোঞ্জ ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। ফলে বৈদিক যুগের প্রথম পর্বে লৌহের ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ইহার কিছু কাল পরে খ্রীষ্ট পূর্ব ১০০৩ অব্দে লৌহের ব্যবহার শুরু হয় এবং যেদিন হইতে মানুষ লৌহের ব্যবহার শিখিল সেইদিন হইতেই ক্রমে ক্রমে সে সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তবে ঠিক কোন সময় ইহারা লৌহের ব্যবহার শিখিয়াছিল তাহা কিন্তু সঠিক করিয়া বলা সম্ভব নহে। এই প্রসঙ্গে বহু মতামতের সম্মুখীন হইতে হয়। অনুমান করা যায় যে, সিন্ধুদেশে ঋগ্বেদের আর্যরাও লৌহের ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহারা লৌহকে অয়স শব্দে বুঝাইতেন। ইহার পরে বেদসমূহতে লৌহ বলিতে 'শ্যাম' এবং 'অয়স' এই দুইটি শব্দের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে।



চতুর্থ অধ্যায় ‖ ধর্মসংস্কার আন্দোলন

এক □ প্রতিবাদী ধর্মীয় আন্দোলনের পটভূমিকা

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক প্রাচীন এশিয়ার সভ্যতার ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই শতাব্দীতেই চীনে কনফুসিয়াস, পারস্যে জরাথ্রুষ্ট এবং ভারতে মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। মহাবীর ও বুদ্ধ যে নূতন ধর্মমতের সূচনা করেন তাহাই যথাক্রমে জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম নামে পরিচিত।

এইসময়ে লৌহ নির্মিত যন্ত্রপাতি (যেমন লাঙলের ফলা) বিশেষ করিয়া কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হইতে থাকে। ফলে কৃষি ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিল। উৎপাদনের পরিমাণ বিপুলভাবে বাড়িয়া উদ্বৃত্তের সৃষ্টি করিল। এই নূতন উৎপাদন রীতিকে আশ্রয় করিয়া বৈদিক সমাজ পশুপালন পর্ব হইতে কৃষিভিত্তিক পর্বে রূপান্তরিত হইল। নূতন কৃষি অর্থনীতিতে নিধন অপেক্ষা পশুসংরক্ষণ অধিকতর প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইল, অথচ তখনও পর্যন্ত যাগযজ্ঞে নির্বিচারে পশুহত্যার রেওয়াজ বজায় থাকিয়া চলিল। সম্পদের এই অপচয়ে কৃষিজীবী মানুষের সমর্থন থাকিল না। অন্যদিকে, উদ্বৃত্ত উৎপাদন বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটাইল। বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিতে নূতন নূতন নগর ও শহর গড়িয়া উঠিল। নাগরিক অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেন বণিক বা শ্রেষ্ঠী এবং শিল্পী বা কারিগরশ্রেণী। আপন অর্থনৈতিক স্বার্থে ইহারা নিজস্ব 'সংঘ' গড়িয়া তোলেন। প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রের অনেক বিধান কিন্তু বাণিজ্যপ্রসারের ব্যাপারে উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না। সুদে অর্থ লগ্নী করা, গৃহের বাহিরে আহার গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ব্রাহ্মণদের মনোভাব উদার ছিল না। অথচ এইগুলি ছিল বাণিজ্যিক ক্রিয়া-কলাপের স্বাভাবিক অঙ্গ।

লৌহের প্রয়োগের ফলে কৃষি ব্যবস্থায় পরিবর্তন

ধর্মের বিধানের সহিত স্বার্থের সংঘাত

লোহার ব্যবহারে ক্ষত্রিয়রাও লাভবান হইয়াছিলেন। লৌহনির্মিত অস্ত্রশস্ত্রের অধিকারী হইয়া তাহারা পূর্বের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু অস্ত্রক্ষমতার অধিকারী ক্ষত্রিয় অথবা বাণিজ্য সম্পদে বলীয়ান বৈশ্যদের সামাজিক পদমর্যাদার কোন পরিবর্তন ঘটিল না। সামাজিক কর্তৃত্ব তখনও ব্রাহ্মণদের হাতে অটুট ছিল। অর্থনীতি ও সমাজ-সংগঠনের মধ্যকার এই অসামঞ্জস্য বৈদিক সমাজে আলোড়ন তুলিল। এই আলোড়ন বিশেষ করিয়া অনুভূত হইল পূর্বভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকায় (বিহার অঞ্চলে) যেখানে আর্যসভ্যতার প্রভাব অপেক্ষাকৃত বিলম্বে ঘটিয়াছিল। অভ্যস্ত ধর্মীয় রীতিনীতি উপরিউক্ত তিনটি শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছিল না। ফলে ধর্মের ক্ষেত্রে নূতন চিন্তা-ভাবনা শুরু হয় যাহার মধ্য হইতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। এই নবীন ধর্ম-দর্শনের বহু তত্ত্ব নূতন পটভূমির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ

বর্ণাশ্রম প্রথা বংশানুক্রমিক হইয়া কঠোর জাতিভেদে পরিণত হইল। পুরোহিত-নিয়ন্ত্রিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম

হইয়া উঠিল প্রাণহীন অনুষ্ঠানসর্বস্ব। সামাজিক বিধি-নিষেধ, মন্ত্রতন্ত্র ও অনুষ্ঠান-বাহুল্য ভারতীয় ধর্ম ও অধ্যাত্ম চেতনাকে করিয়া তুলিল নিষ্প্রাণ ও গতানুগতিক। সমাজের স্থিতিশীলতার নামে সমস্ত রকম স্বকীয় চিন্তার প্রকাশ রুদ্ধ করা হইল। ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের অনুশাসনে আর্যসভ্যতার দীপ্তি ক্রমশঃ স্তিমিত হইয়া সমাজকে এক অনড় প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করিল কিন্তু কোন সমাজেই মানুষের মনকে চিরকাল শৃংখলিত করিয়া রাখা যায় না। আচারের আতিশয্য ও পশুবলির পাশবিকতা প্রচলিত ধারণার প্রতি ভারতীয় জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিল। অতৃপ্ত ধর্মজিজ্ঞাসা ও সন্দেহ অভ্যস্ত ধর্মবোধের বিরুদ্ধে মানুষের মনকে আলোড়িত করিয়া তুলিল।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জটিলতা ও অন্তসারশূন্যতা

সুতরাং জৈন ও বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। ভারতবর্ষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিতেছিল ধর্মজীবনেও তাহার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই পরিবর্তিত বাস্তব পরিস্থিতিতেই নূতন ধর্ম চেতনার বিকাশ।

বৈদিক যুগের শেষ পর্বের আর্য-সামাজিক পরিবেশে ধর্মীয় রক্ষণশীলতার প্রতিবাদী হিসাবে ভারতীয় মননের নব উত্থান ঘটিল। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ ছিলেন এই সমাজ-বিপ্লবের অগ্রদূত।

বুদ্ধ ও মহাবীর প্রবর্তিত ধর্মমতের উদ্ভবের পূর্বেই ভারতবর্ষে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ দেখা দিয়াছিল। আজীবক নামে পরিচিত ক্ষুদ্র সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নেতা মকখালি গোসাল, লোকায়ত দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূদের মধ্যে অন্যতম মনীষী অজিত কেশকম্বল এবং নির্ভীক প্রচারক পুরাণ কাশ্যপের নেতৃত্বে ভারতের ভাবজগতে নূতন যুগের সূচনা দেখা দেয়। কর্মফল ও পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে ইঁহারা বিদ্রোহের ধ্বজা উড়াইয়াছিলেন। মৃত্যুর পরও আত্মা অবিনশ্বর থাকে—এই অলীক কল্পনাকে যুক্তির আঘাতে তাঁহারা ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইঁহাদের কর্মধারার বিস্তৃত তথ্য এখনও সংগ্রহ করা যায় নাই।

বুদ্ধ ও মহাবীর পূর্ববর্ত্তী লোকায়ত দর্শন

দুই □ মহাবীর ও জৈন ধর্ম

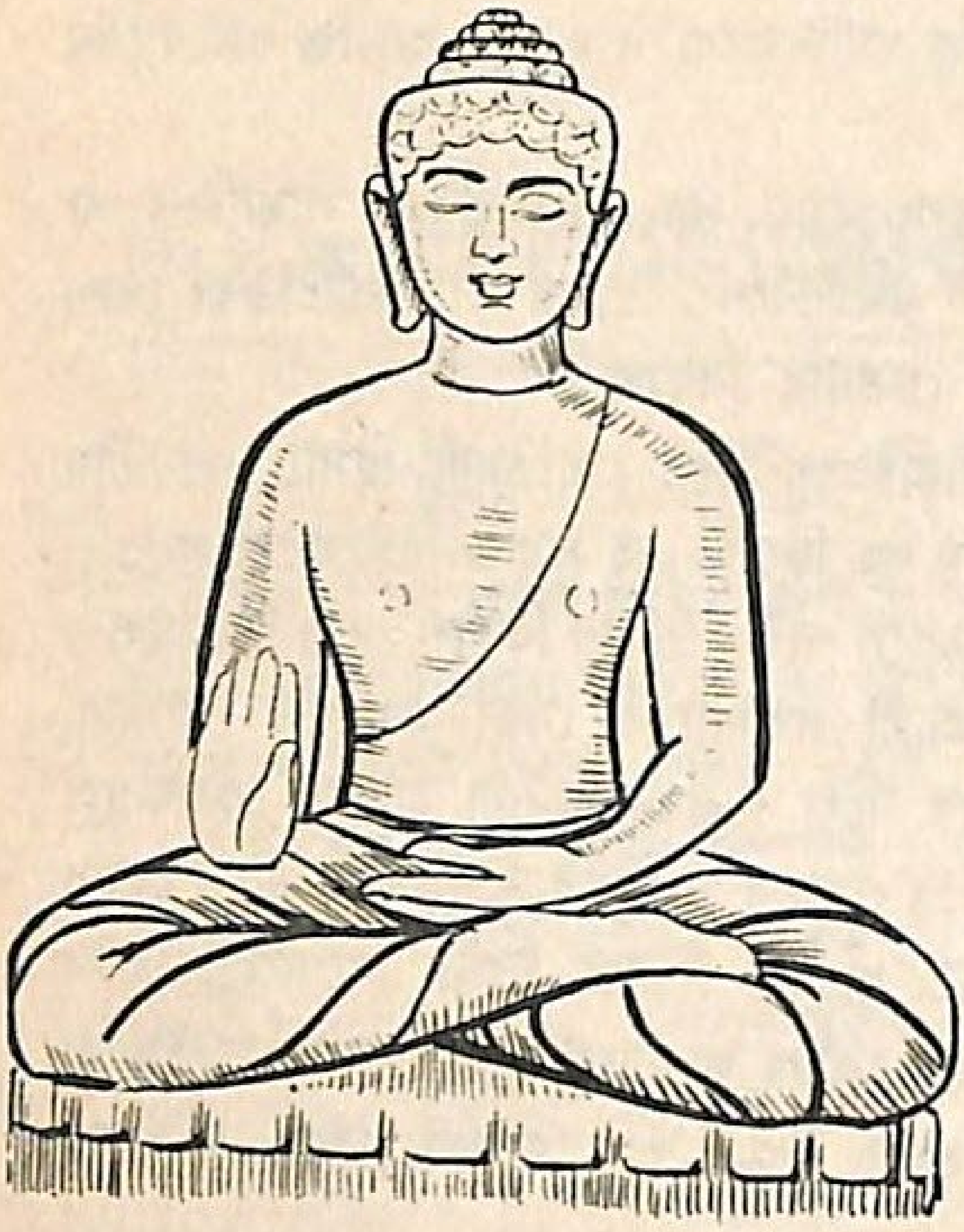
বর্ধমান মহাবীর জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা—সচরাচর এইরূপ মনে করা হয়। কিন্তু জৈন মতে, চব্বিশ জন 'তীর্থংকর' বা সত্যদ্রষ্টার প্রয়াসে জৈন ধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে শেষতম ছিলেন মহাবীর এবং তাঁহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী তীর্থংকর ছিলেন পার্শ্বনাথ।

● **জীবনী ঃ** আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৫৪০ সালে বৈশালীর এক অভিজাত ক্ষত্রিয় বংশে মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। যথাসময়ে যশোদা নাম্নী এক মহিলার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং তিনি একটি কন্যার পিতাও হইয়াছিলেন। কিন্তু সংসারে আবদ্ধ থাকিবার ইচ্ছা তাঁহার কোনদিনই ছিল না। মুক্তির উপায় অনুসন্ধানই তাঁহার জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল। ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি সংসার পরিত্যাগ করেন এবং দ্বাদশ বর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যায় লিপ্ত থাকেন। দীর্ঘ সাধনার পর তিনি 'কৈবল্য' বা সত্যজ্ঞান লাভ করেন। তাঁহার নাম হয় 'জিন' (ইন্দ্রিয়জয়ী) অথবা 'নির্গ্রন্থ' অর্থাৎ সাংসারিক গ্রন্থবন্ধন বিমুক্ত। এই 'জিন' হইতে 'জৈন' শব্দটির উদ্ভব হইয়াছে। সত্যজ্ঞান লাভ করিবার পর তিনি ত্রিশ বৎসর কাল কোশল, মগধ প্রভৃতি স্থানে ধর্মপ্রচার করেন। অতঃপর ৭২ বৎসর বয়সে পাটনার নিকট 'পাবা' নামক স্থানে আনুমানিক ৪৬৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

গৃহত্যাগ, তপশ্চারণ

মহাবীর সর্বপ্রকার আসক্তি ও বন্ধন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এমন কি, পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত তিনি পরিত্যাগ করেন এবং আমৃত্যু উলঙ্গ অবস্থায় বিচরণ করেন। পরবর্তিকালে যখন জৈনদের মধ্যে বিভেদ

উপস্থিত হইল, তখন মহাবীরের মত অনুযায়ী যাঁহারা নগ্নতাকে সাধনার অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহাদের বলা হইল 'দিগম্বর'। অন্য পক্ষে যাঁহারা মহাবীরের নির্দেশ ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিতেন তাঁহারা পরিচিত হইলেন 'শ্বেতাম্বর' রূপে।



মহাবীর

● **জৈনধর্মের মূলনীতি ঃ** মহাবীর পূর্ববর্তী জৈনধর্মে চারিটি মূলনীতি (চতুর্যাম) প্রচলিত ছিল—সত্য, অহিংসা, অচৌর্য (অপরের সম্পত্তি হরণ না করা) এবং অপরিগ্রহ (সম্পত্তির লোভ হইতে মুক্ত হওয়া) মহাবীর এই নীতিসমূহের সহিত যুক্ত করিয়া দিলেন ব্রহ্মচর্য। বৌদ্ধদের মত জৈন ধর্ম-বিশ্বাসের মূল ভিত্তি ছিল অহিংসা। মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর প্রাণী হইতে শুরু করিয়া জল ও ধাতুদ্রব্য ইত্যাদি অচেতন পদার্থের প্রতিও ইহারা অহিংসা নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। জৈন ধর্মাবলম্বিগণ যাগযজ্ঞ ও পশুবলি প্রথা বর্জন করিলেও হিন্দু কর্মবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। জৈন মতে 'মুক্তি' বলিতে বুঝায়—গত জন্ম পরম্পরায় প্রাপ্ত সমস্ত 'কর্মের' বন্ধন হইতে পরিপূর্ণ অব্যাহতি। এই মুক্তি লাভের উপায় তথাকথিত 'ত্রিরত্নের' সাধনা (প্রকৃত ভক্তি, যথার্থ জ্ঞান ও সম্যক আচরণ)। জৈনধর্মে বলা হইয়াছে, প্রায়শ্চিত্ত ও সংযমের সাহায্যে দুঃসহ ব্রত উদ্‌যাপনের পর মানুষ যখন কর্মের বন্ধন হইতে মুক্তি অর্থাৎ 'নির্বাণ' লাভ করেন, তখন তাহার স্থান 'দেবতারও উর্দ্ধে—কারণ দেবতা কর্মের অধীন, কিন্তু সে নয়'।

জৈনধর্মে কীট-পতঙ্গাদির ক্ষেত্রেও অহিংস নীতি অনুসরণ করিবার কথা বলায় কৃষকদের নিকট তাহা জনপ্রিয় হয় নাই। কিন্তু সততা, মিতব্যয়িতার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া এই ধর্ম বণিক শ্রেণীর উদ্যোগকে স্বাগত জানাইয়াছিল। ফলে জৈন ধর্ম বণিক শ্রেণীর মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়।

● **জৈনধর্মের বিস্তার ঃ** মহাবীরের মৃত্যুর পর জৈনধর্মে পরিবর্তন আসে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উহা বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠে। অজাতশত্রুর পুত্র উদয়ি এবং নন্দরাজগণ জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। আনুমানিক ৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দক্ষিণ বিহারে এক দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে মগধের জৈন সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ ভদ্রবাহু দক্ষিণ ভারতের মহীশূরে অবস্থান করিতে থাকেন। তাঁহার আন্তরিক প্রচেষ্টায় ওই অঞ্চলে জৈনধর্মের প্রসার ঘটে। দাক্ষিণাত্যের বিশিষ্ট রাজপরিবারসমূহ, যথা চালুক্য, রাষ্ট্রকূট ও গঙ্গা বংশ জৈনধর্মের প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। উত্তর ভারতে মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য জৈনধর্ম গ্রহণ করেন এবং ধর্মের বিধান অনুযায়ী প্রায়োপবেশন করিয়া শ্রবণবেলগোলায় প্রাণ বিসর্জন দেন। পরবর্তিকালে ওই স্থানে গোমতেশ্বরের একটি বিরাট প্রস্তরমূর্তি নির্মিত হইয়াছিল। স্থাপত্য শিল্পের ইহা একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। পশ্চিম ভারতের গুজরাট ও পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে জৈনধর্মের বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল। কিন্তু জৈনধর্ম ভারতের বাহিরে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই।

ভদ্রবাহুর প্রচেষ্টায় দক্ষিণ ভারতের প্রসার

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে পাটলীপুত্র নগরীতে ভদ্রবাহুর শিষ্যদের উদ্যোগে জৈনদের একটি মহাসভা আহূত হয়। এই সম্মেলনে মহাবীরের উপদেশাবলী বারটি (১২) অঙ্গে বিভক্ত করা হয়। সভায় কিন্তু গ্রন্থ-সম্পাদনা লইয়া তীব্র মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। পরে, পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতকে গুজরাটের এক ধর্মসভায় জৈন ধর্মনীতি নূতন করিয়া সংকলিত হয়। নীতিগুলি অঙ্গ, উপাঙ্গ, মূল, সূত্র ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করা হয়। দিগম্বর মতাবলম্বী জৈনগণ অবশ্য 'দ্বাদশ অঙ্গ' প্রামাণ্য ধর্মশাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। জৈন ধর্মসাহিত্য সাধারণের সহজবোধ্য প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। পরে জৈনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা সংস্কৃত ভাষায় সংকলিত হয়। জৈন দার্শনিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ভদ্রবাহু, সিদ্ধসেন ,হেমচন্দ্র,হরিভদ্র প্রমুখ। শিল্পের প্রসারেও জৈনধর্মের অবদান আছে। গোমতেশ্বরের প্রস্তর মূর্তির বিশালতা আজিও বিস্ময় উৎপাদন করে।

দ্বাদশ অঙ্গ সংকলন

জৈনরা বেদের অপৌরুষেয় তত্ত্ব স্বীকার করেন না। ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের প্রাধান্যও তাঁহারা মানিয়া লন নাই। জৈনগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বেও বিশ্বাসী নন। জাতিভেদ ব্যবস্থার প্রতিও তাহাদের সমর্থন নাই। কিন্তু কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে তাঁহারা পরিপূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। সুতরাং জৈন ও হিন্দুধর্মে সাদৃশ্য ও পার্থক্য দুই-ই আছে। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যেও মিল ও পার্থক্য আছে। অহিংসা, বিরোধিতা ইত্যাদি ব্যাপারে উভয় ধর্মের মধ্যে ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জৈনরা 'মুক্তি' অর্জনের ক্ষেত্রে শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধনের উপর গুরুত্ব দেন। বৌদ্ধরা সেখানে মধ্যম পন্থা গ্রহণই শ্রেয় মনে করেন।

জৈন ও হিন্দুধর্ম এবং জৈন ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে পার্থক্য

● গৌতম বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম ●

● **জীবনী ঃ** বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ আনুমানিক ৫৬৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নেপালের তরাই অঞ্চলের কপিলাবস্তু নামে এক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে ক্ষত্রিয় শাক্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্যকালের নাম ছিল সিদ্ধার্থ। পিতা শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থকে অভিজাত বংশীয়ের উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা দিতে প্রথম হইতেই সচেষ্ট থাকিলেও ক্ষত্রিয়সুলভ আলাপ আচরণে তাঁহার বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিল না। পুত্রের এই অনীহা লক্ষ্য করিয়া রাজা শুদ্ধোদন বিচলিত হইলেন এবং সিদ্ধার্থকে সংসার ধর্মে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই গোপা বা যশোধরা নামে এক সুন্দরী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। উনত্রিশ বৎসর বয়সে সিদ্ধার্থ রাহুল নামে এক পুত্রের জনক হন। কিন্তু পত্নীপ্রেম বা অপত্যস্নেহ সংসার জীবনে তাঁহার অনুরাগ সৃষ্টি করাইতে পারিল না। জাগতিক দুঃখ কর্ম হইতে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায়-এই অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসায় তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। কথিত আছে, একদিন নগর পরিভ্রমণকালে তিনি জনৈক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ও একটি মৃতদেহ দেখিয়া সারথিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। যখন জানিতে পারিলেন সাধারণ মানুষের পক্ষে ইহাই ভবিতব্য তখন এক প্রশান্ত সন্ন্যাসীর সৌম্য মূর্তি দর্শনে তিনি পরিত্রাণের পথ খুঁজিয়া পাইলেন। মুক্তির সন্ধানে তাঁহার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং একদিন গভীর রাত্রে তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। অতঃপর তিনি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন অবলম্বন করিয়া গুরুর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইলেন এবং কিছুকাল রাজগৃহে (বর্তমান রাজগীর) দুইজন বিশিষ্ট গুরুর নিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। পরে বর্তমান বুদ্ধগয়ার নিকটস্থ উরুবিল্ব নামক স্থানে কঠোর তপশ্চর্যায় লিপ্ত হইলেন। ছয় বৎসর ধরিয়া শরীরকে নিগ্রহ করিয়াও যখন মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাইলেন না তখন গভীর মনোসংযোগ সহকারে গয়ার নিকট বোধিবৃক্ষতলে তিনি নূতন করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন। সেখানে বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রে সহসা গভীর সত্য তাঁহার নিকট উদ্‌ঘাটিত হইল। তিনি

জন্ম বাল্য জীবন

অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা

দিব্যজ্ঞানের অধিকারী হইলেন। 'বোধি' প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইল 'বুদ্ধ' বা জ্ঞানী। তাঁহার বয়স তখন মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর।


গৌতম বুদ্ধ

বুদ্ধের জীবনের অবশিষ্ট বৎসরগুলি অতিবাহিত হয় তাঁহার এই নবলব্ধ সত্যের মন্ত্র প্রচারে। কাশীর নিকট সারনাথ নামক স্থানে এক মৃগবনে তিনি পাঁচজন শিষ্যের নিকট তাঁহার উপদেশ প্রদান করেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই ঘটনাকে 'ধর্মচক্র প্রবর্তন' বলা হইয়া থাকে। পরবর্তিকালে তিনি কাশী, কোশল, মগধ, অবন্তী, মিথিলা, কৌশাম্বী সর্বত্রই ধর্মপ্রচার কার্যে ব্রতী থাকেন। অবশেষে আশী বৎসর বয়সে বর্তমান উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার কুশীনগরে তাঁহার 'মহাপরিনির্বাণ' ঘটে। অধিকাংশ পণ্ডিতদের মতে তাঁহার মৃত্যুর তারিখ ৪৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। শোনা যায়, একদিন যেমন তিনি বৈশাখী পূর্ণিমায় দিব্যজ্ঞান লাভ করেন, তেমনি তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুও ঘটে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে।

● **বুদ্ধের উপদেশাবলী ঃ** শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও ক্ষত্রিয় রাজন্য হইতে শুরু করিয়া অগণিত সাধারণ মানুষ, এমন কি, অন্ত্যজ চণ্ডালের কাছেও বুদ্ধ তাঁহার ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। সমস্ত মানুষের মুক্তি তাঁহার কাম্য ছিল। আশ্চর্য সহজ ও সরল পদ্ধতিতে, সাধারণের কথ্য ভাষায় তিনি তাঁহার বক্তব্য উপস্থাপিত করিতেন। বিদ্বজ্জনের ভাষা সংস্কৃতের পরিবর্তে জনসাধারণের ভাষা পালিতেই তাঁহার বাণী সংকলিত হইয়াছে। সাধারণের সহিত আলোচনায় তিনি জটিল ও দুরূহ তত্ত্বের অবতারণা করিতেন না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের প্রশ্ন লইয়া মাথা ঘামাইতেন না। যাগযজ্ঞ ও কৃচ্ছ্রসাধন মুক্তির জন্য অপরিহার্য বলিয়া তিনি মনে করিতেন না। অন্যদিকে বিলাসব্যসনও তিনি বর্জনীয় মনে করিতেন না। সংক্ষেপে তাঁহার নির্দেশিত পথকে বলা যায় 'মঝ্‌ঝিম' বা 'মধ্যম' পন্থা। অসত্য, অন্যায়, অসদাচরণ, চৌর্য ও জীবহিংসা পরিহার—এই পাঁচটি নীতির (পঞ্চশীল) উপর বুদ্ধ বিশেষ জোর দিয়াছিলেন।

পঞ্চশীল

● **বৌদ্ধ ধর্মের মূল নীতি ঃ** বুদ্ধদেব হিন্দু কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করিতেন, কর্মফল অনুযায়ী দুঃখভোগ করিবার জন্যই মানুষ বারেবারে জন্মগ্রহণ করে এবং 'তন্‌হা' (তৃষ্ণা) বা আকাঙ্ক্ষাই হইতেছে দুঃখ ও রোগশোকের মুখ্য উৎস। সুতরাং কামনা বাসনার নিবৃত্তি না ঘটাইতে পারিলে দুঃখভোগের অবসান হইবে না। যতদিন তৃষ্ণার অতৃপ্তি থাকিবে, ততদিন জন্মান্তরের চক্র হইতেও পরিত্রাণ নাই। 'নির্বাণ' বা মুক্তি লাভ করিতে হইলে তাই বাসনাকে জয় করিতে হইবে। বুদ্ধের মতে সম্যক দৃষ্টি, সৎকর্ম, সৎ বাক্য, সৎ সংকল্প, সৎ চেষ্টা, সৎ জীবন, সৎস্মৃতি, এবং সম্যক সমাধি-এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা আটটি উপায় অবলম্বন করিলেই মানুষ আকাঙ্ক্ষার বন্ধন হইতে উর্ধ্বে উঠিতে পারিবে।

অষ্টাঙ্গিক মার্গ

বৌদ্ধ ধর্মের মূল বিষয়রূপে 'চতুরার্যসত্য' মানুষকে মুক্তির পথ দেখাইয়াছে। চারিটি আর্য সত্য এইপ্রকার—(১) জীবনে দুঃখ আছে, (২) দুঃখের মূল বা কারণ আছে (৩) কারণ অনুসন্ধানের দ্বারা দুঃখ হইতে নিবৃত্তির উপায় অবলম্বন প্রয়োজন (৪) যথার্থ উপায় নিরূপণ করিতে পারিলেই দুঃখ হইতে নিবৃত্তি সম্ভব।

তৎকালীন ভারতীয় সমাজে বুদ্ধের উপদেশ বিপ্লবাত্মক প্রতিক্রিয়া মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই যাগযজ্ঞ ও পূজার্চনার পরিবর্তে আপন প্রয়াসে সৎ ভাবে জীবন যাপন করিয়া

নির্বাণ বা মুক্তিলাভ করিতে পারিবে এই শিক্ষা যথার্থভাবে সার্বজনীন ও লৌকিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধের মন্ত্রে গুরুবাদ বা পুরোহিত তন্ত্রের প্রাধান্য নাই। মানুষের চিন্তা ও কর্মশক্তির উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়াছিলেন। নারীর ভূমিকা সম্পর্কেও তিনি মোহমুক্ত ছিলেন, বৌদ্ধসংঘে (মঠ) নারীর প্রবেশাধিকার তিনি রুদ্ধ করেন নাই। সংঘের পরিচালন ব্যবস্থায় একক প্রাধান্যের পরিবর্তে তিনি যৌথ নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক

বৌদ্ধ সংঘের গণতান্ত্রিক রূপ



সিদ্ধার্থের মহানিক্রমণ

পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন। মঠবাসী ভিক্ষু ও গৃহী শিষ্যদের জন্য তিনি প্রয়োজনভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন আচরণবিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁহার প্রধান শিষ্যবর্গ রাজগৃহে এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া তাঁহার উপদেশাবলীর এক পূর্ণাঙ্গ সংকলন প্রস্তুত করেন। এই সম্মেলন প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি নামে পরিচিত। পরবর্তিকালে বৌদ্ধ ধর্ম লইয়া নানাবিধ প্রশ্ন ও বিতর্কের মীমাংসার জন্য বৈশালীতে, অশোকের রাজত্বকালে পাটলীপুত্রে ও কণিষ্কের আমলে কাশ্মীর অথবা জলন্ধরে আরও তিনবার বৌদ্ধ মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শেষ বৌদ্ধ সঙ্গীতির সময় বৌদ্ধগণ 'হীনযান' ও মহাযান' নামে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়েন। হীনযানবাদিরা মূল বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং মূর্তির পরিবর্তে প্রতীক পূজা করিতেন। মহাযানবাদিগণ বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি পূজা ও তান্ত্রিক আচার পদ্ধতি পালন করিতেন।

বৌদ্ধ সঙ্গীতি

ঐতিহাসিকরা মনে করেন, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে 'ত্রিপিটক' নামে পরিচিত পালিভাষায় রচিত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি সংকলিত হইয়াছে। প্রথম অংশ 'সূত্র পিটকে' বুদ্ধের ধর্ম উপদেশাবলী ও দ্বিতীয় অংশ 'বিনয় পিটকে' বৌদ্ধ সন্ন্যাসী–সন্ন্যাসিনীদের পালনীয় কর্তব্যগুলি লিপিবদ্ধ আছে। শেষ অংশ অভিধম্ম পিটকে আছে বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বাদি ও দার্শনিক আলোচনা।

ত্রিপিটক

বুদ্ধের বাণী শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অশোক হইতে আরম্ভ করিয়া হর্ষবর্দ্ধন ও বাংলার পাল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া পরিব্যাপ্ত হয় এশিয়ার বিভিন্ন দেশে। স্থানীয় নয়, বৌদ্ধধর্ম আজ বিশ্বধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

● **বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ঃ** শুধু ধর্মে ও দর্শনে নয়, ভারতীয় শিল্প-সাহিত্যের উন্মেষ ও বিকাশসাধনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ঐতিহাসিক সত্য। বুদ্ধদেবের জন্মস্থান লুম্বিনীতে অশোক নির্মিত শিলাস্তম্ভ, ভারহুত, সাঁচী প্রভৃতি স্থানে ভাস্কর্যে খোদিত জাতকের কাহিনী সমূহের চিত্ররূপ বিভিন্ন সম্রাটের আমলে নির্মিত অগণিত স্তম্ভ ও মঠ (সারনাথ, সাঁচী, পুরুষপুর বা পেশোয়ার প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত), নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বিশ্বশ্রুত শিক্ষাকেন্দ্র সমূহ এবং অজন্তার গুহাচিত্র বৌদ্ধ সংস্কৃতির ও সভ্যতার সাক্ষ্য বহন করিয়া চলিয়াছে। বস্তুতপক্ষে বুদ্ধের আবির্ভাব ও বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুদয় প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূচনা ও রাজনৈতিক ঐক্যের বিকাশ

এক □ ষোড়শ মহাজনপদ

দুইটি প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থপ্রদত্ত তথ্য হইতে জানা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ে উত্তর ভারতে 'ষোড়শ মহাজনপদ' অর্থাৎ ষোলটি শক্তিশালী বৃহৎ রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিয়াছিল। 'মহাজন পদ' অর্থে বৃহৎ রাষ্ট্রকে বুঝিতে হইবে। 'ষোড়শ মহাজনপদ' বলিতে তৎকালীন উত্তর-ভারতে মাত্র ষোলটি রাষ্ট্র ছিল—এইরূপ বুঝায় না ; বরং বুঝায়, সেই সময়ে উত্তর-ভারতে ছোট-বড় অনেক রাষ্ট্র ছিল—তাহাদের মধ্যে ষোলটি বৃহৎ এবং প্রধানরূপে চিহ্নিত হইয়া আছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ছিল গণজ্যেষ্ঠদের দ্বারা পরিচালিত, অপরগুলিতে প্রচলিত ছিল রাজতন্ত্র। এই মহাজনপদগুলির মধ্যে বৃজি (উত্তর-বিহার), মল্ল (উত্তর প্রদেশের গোরখপুর জেলা) এবং কম্বোজ (কাশ্মীরের এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের অংশবিশেষ) ছিল গণতন্ত্রশাসিত রাষ্ট্র। অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি হইল—অঙ্গ (পূর্ব বিহার); মগধ (দক্ষিণ বিহার), কাশী, কোশল (অযোধ্যা) চেদী (বুন্দেলখণ্ড অঞ্চল), বৎস (এলাহাবাদ অঞ্চল), কুরু (দিল্লী, মীরাট, থানেশ্বর), পাঞ্চাল (রোহিলাখণ্ড ও মধ্যভারতের দোয়াব অঞ্চল), মৎস্য (জয়পুর), শূরসেন (মথুরা), অশ্মক (গোদাবরী তট), অবন্তী (মধ্য প্রদেশের মালব অঞ্চল), গান্ধার (উত্তর পশ্চিমের পেশোয়ার ও রাওয়ালপিণ্ডি অঞ্চল)। এই রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল মগধ। ইহার প্রাচীন রাজধানী অবস্থিত ছিল রাজগৃহে (পালিভাষায় রাজগেহ নামটি 'রাজগৃহ' তে পরিবর্তিত হইয়াছে ; বর্তমানে এই স্থানটি রাজগীর নামেই পরিচিত।) মগধের এই রাজনৈতিক ঐতিহ্যের সূচনা করেন বিম্বিসার।

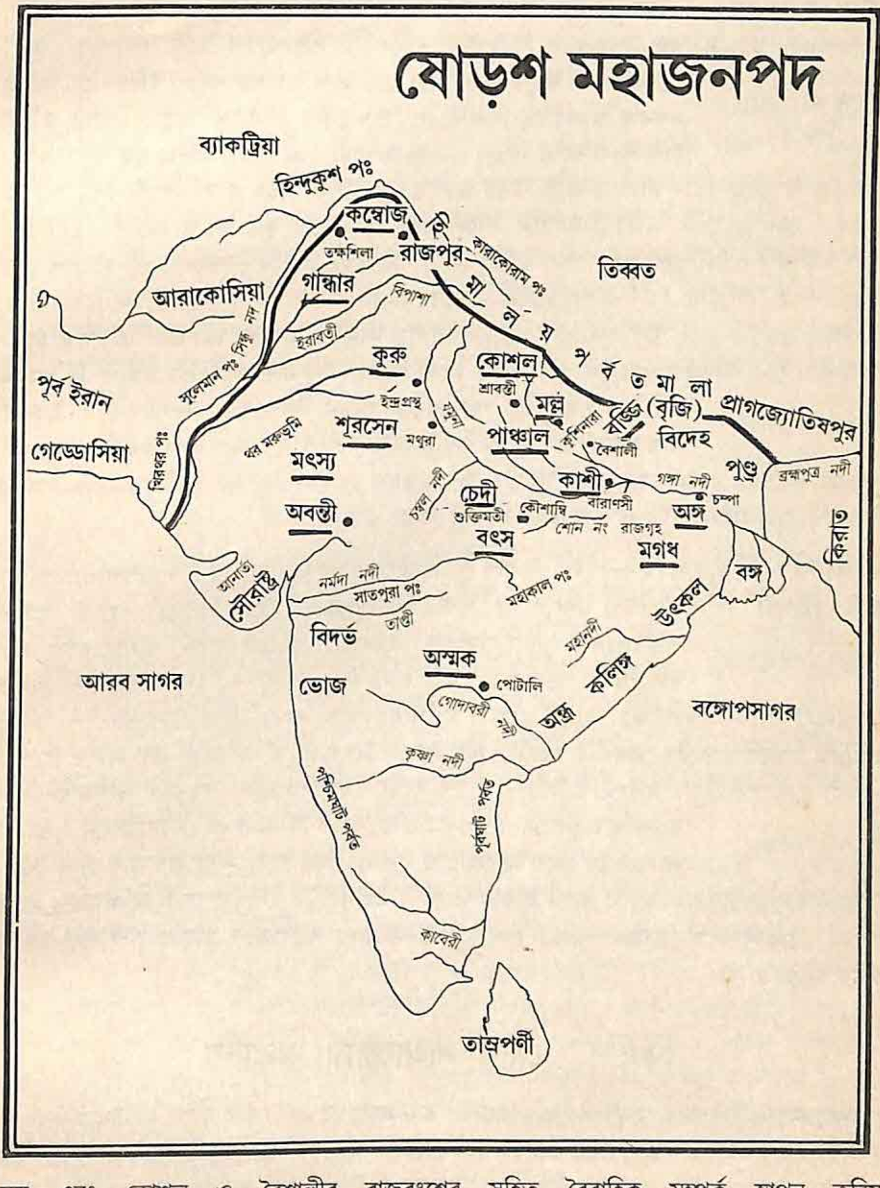
ষোড়শ বৃহৎ রাষ্ট্র

দুই □ মগধের আধিপত্যের সূচনা

বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর নেতৃত্বে মগধের উত্থান ভারত ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বিম্বিসারই প্রথম উত্তর ভারতে এক অখণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। অবশ্য কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা বৈদিক যুগেই অনুভূত হইয়াছিল। 'একরাট', 'রাজচক্রবর্তী' প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ এবং 'রাজসূয়' ও 'অশ্বমেধ' প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রচলন হইতে অনুমান করা যায় যে, রাজনৈতিক ঐক্যের আদর্শ প্রাচীন আর্যরাষ্ট্রের একটি সুপরিচিত ধারণা।

● বিম্বিসার ঃ বিম্বিসার গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক (সময়কাল ৫৪৫/৫৪৪—৪৯৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

ছিলেন। তিনি হর্যঙ্ক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে পরিচিত ছিলেন। আপন শক্তি ও কূটনীতির সাহায্যে বিম্বিসার মগধ রাজ্যের আয়তন ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। তিনি সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া



ষোড়শ মহাজনপদ

সামরিক শক্তি প্রয়োগ

অঙ্গ এবং কোশল ও বৈশালীর রাজবংশের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া কাশীরাজ্যের একাংশ মগধ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং ভবিষ্যতে হিমালয়ের পাদদেশে মগধরাজ্য বিস্তারের পথ সুগম করিয়া দেন। সমকালীন ভারতবর্ষে বিম্বিসার রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সমসাময়িক বুদ্ধ ও মহাবীর উভয়ের প্রতিই তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং উভয়েই মগধে ধর্মপ্রচার করেন। কিন্তু তিনি সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল

● **অজাতশত্রু ঃ** বিম্বিসারের পর মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু। (সময়কাল ৪৯৩—৪৬১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) বৌদ্ধ সাহিত্যে তিনি পিতৃহন্তারক, নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী বলিয়া নিন্দিত হইয়াছেন। তবে ঐতিহাসিকদের মতে এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত ও বহুলাংশে অসত্য। যাহা হউক, অজাতশত্রুর আমলে গঙ্গা-উপত্যকার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে কোশলের রাজা প্রসেনজিতের সহিত দীর্ঘকালের যুদ্ধে মগধ জয়লাভ করে। ইহার পরে, আরও একবার অজাতশত্রু লিচ্ছবিদের (প্রজাতন্ত্রীয় জোটবদ্ধ রাষ্ট্র পরাস্ত করিয়া বৈশালী অধিকার করেন। এক্ষেত্রে দীর্ঘ ষোল বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ চলিয়াছিল। যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া তিনি মগধ রাজ্যকে উত্তর ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেন। গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে পাটলীগ্রামে তিনি এক দুর্গ নির্মাণ করেন। সেইখানে ইতিহাসকীর্তিত পাটলীপুত্র নগরী গড়িয়া উঠে। শোনা যায়, প্রথম জীবনে বৌদ্ধদের বৈরী হইলেও শেষ জীবনে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অজাতশত্রুর পুত্র উদয়ীর (রাজা উদয়ন নামানুসারে, সময়কাল ৪৬১—৪৪৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) সময়ে পাটলীপুত্র নগরীতে মগধের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়।

মগধের আধিপত্যের বিস্তৃতি

উদয়ীর উত্তরাধিকারিগণের কুশাসনে বিক্ষুব্ধ হইয়া প্রজাগণ শিশুনাগ নামে এক মন্ত্রীকে সিংহাসনে বসান। শিশুনাগের পর রাজত্ব করেন কালাশোক বা কাকাবর্ণ। তাঁহারই রাজত্বকালে বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই শিশুনাগ বংশের (৪১৩—৩৪৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) শেষ রাজাকে হত্যা করিয়া এক শূদ্রবীর মহাপদ্ম মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়া নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠা

● **মহাপদ্ম নন্দ ঃ** পুরাণ, জৈন-কাহিনী ও গ্রীক রচনা হইতে জানা যায় মহাপদ্ম নীচ বংশজাত ছিলেন। তাহা হইলেও তিনি একজন নিপুণ ও পরাক্রান্ত শাসক হিসাবে ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। পুরাণে তাঁহাকে 'একরাট' (একচ্ছত্র সম্রাট) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বিভিন্ন সূত্র হইতে জানা যায়, কলিঙ্গ ও কোশল রাজ্য এবং অশ্মক (গোদাবরী তট) ও কুন্তলরাজ্য (বোম্বাই রাজ্য ও মহীশূরের দক্ষিণ ভাগ) তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। সঙ্গত কারণেই তাহাকে ভারতের 'প্রথম ঐতিহাসিক সাম্রাজ্য প্রবর্তক রাজা' বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে।

সাম্রাজ্য প্রবর্তক রাজা

মহাপদ্মের পর তাঁহার আটপুত্র একে একে রাজত্ব করেন। ইহাদের মধ্যে শেষ রাজা ছিলেন ধননন্দ। ইহার রাজত্বকালে আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। ধননন্দ শাসনকার্যে চরম অযোগ্যতার পরিচয় দিলে রাজ্য মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। ইহার সুযোগে চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া মগধে ইতিহাস-খ্যাত মৌর্য বংশের আধিপত্যের সূচনা করেন। তক্ষশিলাবাসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত চাণক্য এই ব্যাপারে চন্দ্রগুপ্তকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করিয়াছিলেন।

নন্দ বংশের পতন

তিন □ মৌর্য সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়

ভারতবর্ষের ইতিহাসে মৌর্যসাম্রাজ্যের অভ্যুদয় এক নবযুগের সূচনা করিয়াছিল। মৌর্য-রাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ মত প্রচলিত আছে। নন্দ-রাজবংশ হইতেই মৌর্যদের উৎপত্তি—এমন কথাও বলা হয়। অবশ্য বৌদ্ধ ও জৈন পুঁথিপত্রে মৌর্যদের মগধের একটি ক্ষত্রিয় বংশ রূপেই দেখানো হইয়াছে। শুধুমাত্র রাজনীতিক্ষেত্রে নয়, দেশশাসনে, অর্থনৈতিক জীবনের সংগঠন ও বিধি ব্যবস্থায়, সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশে মৌর্যযুগ ভারতবর্ষে নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী সাম্রাজ্যের যে স্বপ্ন বিম্বিসার হইতে মহাপদ্ম নন্দকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের নেতৃত্বে তাহার বাস্তব রূপায়ণ (সুদূর

মৌর্যযুগ—নূতন ইতিহাস

দক্ষিণের কিছু অংশ বাদে) ঘটিয়াছিল। আর অশোকের সাধনা তো কালোত্তীর্ণ। পৃথিবীর আর কোন সম্রাটের কালেই কি ধ্বনিত হইয়াছিল 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়'-এর অমৃতময় বাণী?

● **চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য** ঃ চন্দ্রগুপ্তর বংশপরিচয় সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। প্রাচীন হিন্দু কিংবদন্তীতে তাহাকে শূদ্রবংশজাত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই মত অনুসারে, চন্দ্রগুপ্তর মাতা (মতান্তরে মাতামহী) মুরা ছিলেন নন্দরাজের দাসী-পত্নী। মাতার নামানুযায়ী চন্দ্রগুপ্তর প্রতিষ্ঠিত বংশ মৌর্য বংশ নামে পরিচিত। কিন্তু বৌদ্ধ গ্রন্থ 'দিব্যবদানে' এবং 'মহাপরিনির্বাণ' সূত্রে চন্দ্রগুপ্তকে 'মোরিয়' বংশোদ্ভূত ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মোরিয়গণ হিমালয়ের পাদদেশে পিপ্পলী বনে (নেপালের তরাই অঞ্চলে) বাস করিতেন। জৈনগ্রন্থ 'পরিশিষ্ট-পার্বণে' চন্দ্রগুপ্তকে ময়ূর-পোষক বা ময়ূর-পালকদের দলপতির দৌহিত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বৌদ্ধ বা জৈন গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্তকে শূদ্রবংশজাত না বলা হইলেও, রাজনৈতিক মর্যাদার দিক হইতে তিনি যে সাধারণ পরিবারের সন্তান ছিলেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীক লেখক জাস্টিন প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ সম্ভবতঃ সেই কারণে তাঁহাকে সাধারণ বংশোদ্ভূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা হউক, আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বৌদ্ধ ও জৈন সূত্রের উপর ভিত্তি করিয়া চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত বলিয়া স্বীকৃতি দান করিয়াছেন।

বংশ পরিচয়

চন্দ্রগুপ্তর প্রথম জীবন সম্পর্কেও কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। কিংবদন্তী অনুসারে তাঁহার পিতা-মোরিয় বংশের শাসক সম্ভবতঃ নন্দরাজ ধননন্দের নিকট যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। বালকপুত্র শৈশব হইতেই পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর ছিলেন। গ্রীক লেখকদের রচনা হইতে জানা যায়, তরুণ চন্দ্রগুপ্ত কিছুকাল আলেকজান্ডারের শিবিরে আশ্রয় লইয়া গ্রীক যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করেন। কিন্তু কোন কারণে গ্রীক সম্রাটের বিরাগভাজন হইয়া প্রাণ রক্ষার্থে তিনি বনে পলায়ন করেন। সেই সময় তক্ষশীলাবাসী ব্রাহ্মণ চাণক্যের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। চাণক্য নন্দরাজ ধননন্দের নিকট অপমানিত হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে নন্দবংশ ধ্বংস করিতে উদ্যোগী হন। স্বাভাবিকভাবেই দুইজনের সংকল্প এক হওয়ায়, উভয়ে মিলিত হন এবং নন্দরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য এক শক্তিশালী বাহিনী গঠন করেন। অতঃপর 'মিলিন্দ পন্‌হো' নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায়, এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে চাণক্যের সহায়তায় চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশকে উচ্ছেদ করিয়া মগধের রাজসিংহাসন অধিকার করেন।

প্রথম জীবন

আনুমানিক ৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই চন্দ্রগুপ্ত সাম্রাজ্য বিস্তারে প্রয়াসী হইলেন। অবশ্য ভারতীয় বৌদ্ধ ও জৈন এবং ধ্রুপদী ইউরোপীয় সূত্রে পাওয়া তথ্যাদি হইতে অনেকে ৩১৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন। প্রথমেই তিনি উত্তর পশ্চিম ভারত হইতে বিদেশী আধিপত্যের অবসান করিতে উদ্যোগী হইলেন। এই সময়ে আলেকজান্ডারের মৃত্যু সংবাদ ভারতে আসিয়া পৌঁছাইলে চন্দ্রগুপ্ত পাঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চল হইতে গ্রীকদের বিতাড়িত করিয়া আপন আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা ভিন্ন, তিনি গ্রীক সেনাপতি সেলুকসকে পরাজিত করিয়া কাবুল, কান্দাহার, হিরাট ও বেলুচিস্তানের এক অংশ লাভ করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সন্ধির শর্তানুযায়ী সেলুকস নিজ কন্যার সহিত ভারতীয় সম্রাটের বিবাহ দেন এবং মেগাস্থিনীস নামে এক গ্রীক রাজদূতকে তাঁহার রাজসভায় প্রেরণ করেন। মেগাস্থিনীসের বিবরণী 'ইন্ডিকা' হইতে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

সেলুকসের সহিত যুদ্ধ

নন্দবংশের উচ্ছেদ এবং উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে বিদেশী আধিপত্যের অবসানের পর চন্দ্রগুপ্ত ভারতের অন্যান্য অংশে তাঁহার রাজ্য সম্প্রসারিত করেন। ছয় লক্ষ সৈন্যের এক বাহিনীর সাহায্যে তিনি

পশ্চিম ভারতের মালব ও সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত এবং দক্ষিণ ভারতের মহীশূর (কর্ণাটক) এবং মাদ্রাজের (তামিলনাড়ু) তিনেভেলি জেলা পর্যন্ত মৌর্য সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন। বাঁকুড়া জেলায় প্রাপ্ত মহাস্থনগড় শিলালিপি হইতে জানা যায়, বঙ্গদেশও তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে ধারণা করা যায় যে, তাঁহার রাজ্যসীমা উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে তামিলনাড়ুর তিনেভেলী এবং পূর্বে বাংলার পশ্চিম সীমানা হইতে পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সাম্রাজ্য বিস্তার

জৈন কিংবদন্তী অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত শেষ জীবনে জৈন ধর্মগ্রহণ করেন এবং এই ধর্মের নির্দেশ অনুযায়ী সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া মহীশূরের শ্রবণবেলগোলায় অনশনে দেহত্যাগ করেন (আনুমানিক ২৯৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে)।

অতি সামান্য অবস্থা হইতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য আপন প্রতিভাবলে (চাণক্যের সহায়তাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়) ভারতবর্ষের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন। ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে 'প্রথমঐতিহাসিক সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপয়িতা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে মহাপদ্মনন্দও এক বিস্তৃত অঞ্চল আপন অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু আয়তনের বিশালতায় এবং সামরিক সাফল্যের নিরিখে তাঁহার সাম্রাজ্য নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতর ছিল। উত্তরে পাঞ্জাব ও সিন্ধু হইতে দক্ষিণে মহীশূর ও মাদ্রাজের কিয়দংশ এবং পূর্বে বাংলার পশ্চিমাংশ হইতে পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত ভূখণ্ড অধিকার করিয়া চন্দ্রগুপ্ত সর্বপ্রথম ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য সম্পাদন করেন। তাঁহার রাজনৈতিক সাফল্যের অপর এক স্মরণীয় কীর্তি হইল সেলুকসকে পরাজিত করিয়া ভারত হইতে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটান।

কৃতিত্ব

চন্দ্রগুপ্ত শুধু একজন সফল বিজেতামাত্রই ছিলেন না। তিনি এক সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া সাম্রাজ্যের ঐক্য ও সংহতি দৃঢ় করেন। রাজকীয় কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রজাকল্যাণের দিকেও যত্নবান ছিলেন। মেগাস্থিনীসের বিবরণীতে তাঁহার জনকল্যাণমূলক ও সুসংহত শাসনব্যবস্থার উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যায়। সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রেও তাঁহার শাসনকাল উল্লেখযোগ্য। অর্থশাস্ত্রের লেখক কৌটিল্য (চাণক্য) এবং কল্পসূত্রের রচয়িতাগণ তাঁহার রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। এই সর্বাঙ্গীন সাফল্যের জন্যই ডঃ স্মিথ তাঁহাকে ইতিহাসের অন্যতম 'শক্তিমান ও সফল সম্রাট' আখ্যা দিয়াছেন।

● চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসন ব্যবস্থা ●

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে বলা হয়, 'প্রথম ঐতিহাসিক সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপয়িত্বা।' কিন্তু তিনি শুধুমাত্র একজন সার্থক বিজেতাই ছিলেন না। এক সুপরিকল্পিত শাসননীতির মাধ্যমে তিনি আপন সাম্রাজ্যকে দৃঢ় ও সংহত ভিত্তির উপর স্থাপন করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন। গ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনীসের বিবরণী (Indica) এবং কৌটিল্য (চাণক্য) রচিত 'অর্থশাস্ত্র' নামে প্রাচীন ভারতের বিশিষ্টতম রাষ্ট্রতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থ হইতে তাঁহার এই শাসন-ব্যবস্থার মূল্যবান ও তথ্যবহুল চিত্র পাওয়া যায়।

সার্থক শাসক

মৌর্য শাসনব্যবস্থায় সম্রাটগণ "সীমাহীন স্বেচ্ছাতন্ত্রে" বিশ্বাসী ছিলেন। শাসনের সমস্ত বিভাগেই সম্রাটের প্রভুত্ব ছিল অপ্রতিহত। কিন্তু রাজতন্ত্রের অমোঘশক্তি সততই প্রজাকল্যাণে নিয়োজিত হইত। অর্থশাস্ত্রে প্রজাহিতৈষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল।

মেগাস্থিনীসের বিবরণ অনুযায়ী সম্রাট স্বয়ং রাজসভায় উপস্থিত থাকিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হইলেও, অভিজ্ঞ মন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের সাহায্যেই তিনি এই কাজ সম্পন্ন করিতেন। মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। মন্ত্রিপরিষদে প্রধান ছিলেন মন্ত্রী, পুরোহিত,

মন্ত্রী পরিষদ

যুবরাজ ও সেনাপতি। অধ্যক্ষ, অমাত্য, সচিব, মহাপাত্র, গুপ্তচর প্রভৃতি রাজকর্মচারীরাও রাজ্যশাসনে সাহায্য করিতেন।

সাম্রাজ্যের বিভাগ

প্রশাসনিক সুবিধার জন্য মৌর্য সাম্রাজ্য চারিভাগে বিভক্ত ছিল। উহার আবার ক্রমবিকাশ ছিল। সর্বনিম্নে ছিল গ্রাম। কুমারামত্য, রাজুক, স্থানিক, গ্রামণী, গোপ নামক কর্মচারীরা ছিলেন প্রদেশ, জেলা ও গ্রামের শাসনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। কেন্দ্রশক্তির দৃঢ়তা সাধনের সঙ্গে সঙ্গে মৌর্যযুগে বিকেন্দ্রীভূত স্বায়ত্তশাসনমূলক ব্যবস্থারও বিকাশ ঘটিয়াছিল। মেগাস্থিনীসের বিবরণীতে পাটলীপুত্রের নগরশাসন সম্পর্কিত ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। মোট ত্রিশ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি সমিতি রাজধানীর কাজকর্ম পরিচালনা করিত। নগর-শাসন বোর্ডে পাঁচজন করিয়া সদস্য থাকিতেন। সম্ভবতঃ অন্য বৃহৎ শহরেও অনুরূপ বন্দোবস্ত ছিল। নগরগুলিতে শিল্পীসংঘ ও বণিক সমিতিও গড়িয়া উঠিয়াছিল।

স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা

মেগাস্থিনীসের বিবরণীতে ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি ও জমির উর্বরতা সম্বন্ধে সপ্রশংস উল্লেখ আছে। তিনি মৌর্য শাসনের জলসেচ ও পূর্তকর্মেরও সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

সেচ, পূর্ত, রাজস্ব ও শুল্ক

ভূমি-রাজস্ব ছিল রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস। রাজস্বের প্রধান ধরনটি 'রাজাকে দেওয়া অংশ বা ভাগ' নামে পরিচিত ছিল। সাধারণতঃ এই ভাগটি ছিল কৃষির উৎপাদনসমূহের এক-ষষ্ঠাংশ। এই এক-ষষ্ঠাংশ প্রাপ্তি হইতে তৎকালীন সময়ে রাজাকে 'ষড় ভাগিন' বলা হইত। ইহা ব্যতীত, বন, খনি, বাণিজ্য প্রভৃতি হইতে শুল্ক আদায় করা হইত। অনেক ঐতিহাসিক মন্তব্য করিয়াছেন যে,মৌর্যযুগে কর ভার যথেষ্ট পীড়াদায়ক ছিল। এই প্রসঙ্গে মহর্ষি পতঞ্জলি এক অসাধারণ উক্তি করিয়াছেন—স্বর্ণসংগ্রহের প্রয়াসে মৌর্য-রাজারা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতেন। প্রকৃতপক্ষে কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে ইহার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনে লিখিতেছেন,—অর্থনৈতিক সংকটের সময় রাজা রাজস্ব আদায়ের জন্য বিভিন্ন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ঐ সকল মূর্তির জন্য প্রাপ্ত মূল্যবান অলঙ্কার লইবার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু মেগাস্থিনীস, অর্থশাস্ত্র ও অশোকের অনুশাসন দ্বারা প্রমাণিত হয়, রাজ্যের অর্থ বিশেষভাবে জনকল্যাণেই নিয়োজিত হইত।

বিচার ব্যবস্থা

মৌর্য বিচারব্যবস্থা সুসংগঠিত ছিল। দণ্ডবিধি কঠোর থাকিলেও, মেগাস্থিনীসের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, রাজ্যে অপরাধের সংখ্যা যথেষ্ট অল্প ছিল। বিভিন্ন জাতির মধ্যে মৈত্রী স্থাপনেও মৌর্যশাসন বিশেষ রূপে সজাগ ছিল। গ্রীক রাষ্ট্রদূতের রচনা হইতে জানা যায় যে, বৈদেশিকগণের তত্ত্বাবধানের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল।

দেশরক্ষা সম্বন্ধেও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। মেগাস্থিনীসের মতে যুদ্ধবিভাগ ছয়টি শাখায় বিভক্ত ছিল—যথা, পদাতিক, অশ্বরোহী, রথ, নৌ ও হস্তিবাহিনী এবং সরবরাহ ও যোগাযোগ বিভাগ। প্রতিটি শাখার শাসনভার ছিল পাঁচজনের এক কমিটির উপর। দেশরক্ষার যাবতীয় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে রাজা তাঁহার গোপন সংবাদবাহকগণের সহিত রাত্রিতে সাক্ষাৎ করিতেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র আমাদের আরও জানায় যে, দিনের বেলায় রাজা রাষ্ট্র পরিচালন সংক্রান্ত কাজকর্ম লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। রাজাকেই সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাধ্যক্ষ হিসাবে গণ্য করা হইত। মেগাস্থিনীসের বিবরণানুসারে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সৈন্যশিবিরে দেশরক্ষার জন্য সর্বদা চার লক্ষ সৈন্য প্রস্তুত থাকিত।



প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (মুদ্রা)

ধর্ম মহামাত্র

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনব্যবস্থা মোটামুটি অবিকৃতভাবে অশোকের রাজ্যকালেও অনুসৃত হইয়াছিল। অবশ্য, তাঁহার আমলে ধর্মশিক্ষার জন্য 'ধর্মমহামাত্র' নামে এক নূতন শ্রেণীর কর্মচারীর সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত, অশোক দণ্ডসমতা ও ব্যবহার সমতার নীতিও প্রবর্তন করেন।

বৈদিক যুগের 'চতুর্বর্ণ' ও 'চতুরাশ্রমে'র ঐতিহ্য মৌর্য আমলেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অভ্যুদয় ও বিদেশী আক্রমণ এবং বসবাসের প্রভাবে জাতিভেদের কঠোরতা হ্রাস পাইয়াছিল। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, মেগাস্থিনীস জন্মসূত্রের পরিবর্তে জীবিকা বা বৃত্তিকেই শ্রেণী বিভাগের ভিত্তি মনে করিয়া ভারতীয় সমাজকে সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন যথা, দার্শনিক (ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ শ্রমণ) অমাত্য (রাজকর্মচারী), পরিদর্শক (গুপ্তচর) সৈনিক, কৃষক, শিকারী ও পশুপালক এবং শিল্পী ও বণিক।

সমাজ গঠন

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দাসত্ব প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়, যদিও মেগাস্থিনীস বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে কোন ক্রীতদাস ছিল না। সম্ভবতঃ গ্রীসে প্রচলিত দাস প্রথার অনুরূপ কঠোরতা বা শাস্তি ভারতবর্ষে ছিল না বলিয়াই মেগাস্থিনীস ইহার গুরুত্ব বুঝিতে পারেন নাই। মেগাস্থিনীসের মতে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ ছিলেন, শান্ত; সত্যবাদী ও সরল। চুরি প্রায় হইত না, যজ্ঞকাল ব্যতীত তাঁহারা সুরাপান করিতেন না। বেশভূষা ও রূপচর্চার বিষয়ে অবশ্য তাঁহারা যত্নবান ছিলেন। মৌর্যযুগের সমাজে নারীর স্থান সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। কিন্তু মেগাস্থিনীসের বিবরণীতে উল্লেখ আছে, শুধুমাত্র রাজা চন্দ্রগুপ্ত যখন শিকারে বাহির হইতেন তখন তিনি নারীবাহিনী দ্বারা পরিবৃত থাকিতেন। অবশ্য ইহাদেরও বর্শাধারী দেহরক্ষীদের ব্যূহ ঘিরিয়া থাকিত।

ক্রীতদাস প্রথা

ভারতীয় চরিত্রের প্রশংসা

● **বিন্দুসার ঃ** চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিন্দুসার মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। গ্রীকদের নিকটে ইনি আমিট্রোকেটিস (সংস্কৃত কথা—অমিত্রঘাত, অর্থাৎ শত্রু নিধনকারী) নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে তক্ষশিলায় এক বিদ্রোহ দেখা দিলে যুবরাজ অশোক তাহা দমন করেন। সিরিয়ার গ্রীক রাজাগণের ও মিশরের রাজা টলেমীর সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব সম্পর্ক ছিল'। বিন্দুসার যুগের (২৯৩-২৬৮ খৃষ্টপূর্বাব্দ) রাজত্বকালে দক্ষিণাপথের কিছু কিছু ভূখণ্ড মৌর্য সাম্রাজ্যের অধিকৃত হইয়াছিল। বিন্দুসারও পিতার ন্যায় চব্বিশ-পঁচিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিন্দুসারের মৃত্যুর পর ক্ষমতার দখল লইয়া তাঁহার পুত্রদের মধ্যে কলহ বাঁধে। অবশেষে মগধের সিংহাসনে 'অশোক' আরোহণ করেন।

● সম্রাট অশোক ●

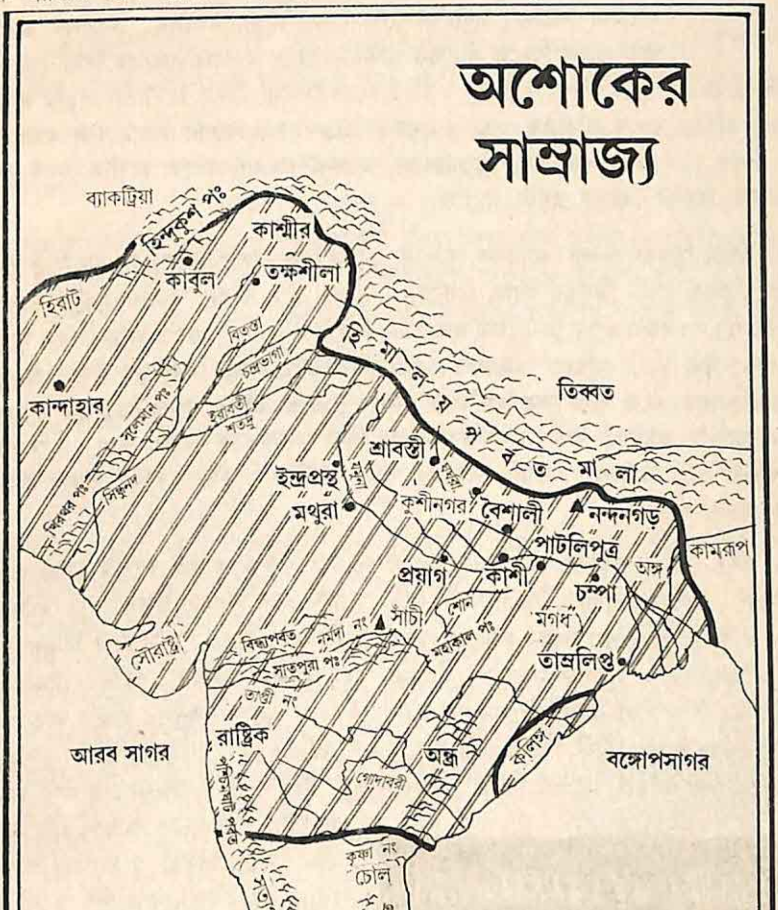
বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অশোক **২৭৩** খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (সিংহলী ইতিবৃত্ত এবং অশোকের রাজ্যাভিষেকের বারো বৎসর পরে পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপি অনুসারে) মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্যাভিষেক ঘটে আরও চারি বৎসর পরে। সিংহলীয় ইতিকথা অনুযায়ী সিংহাসন লইয়া ভ্রাতৃবিরোধই এই বিলম্বের কারণ।



মহামতি অশোক

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অশোক চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী সাম্রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট হন। এই সময় স্বাধীন কলিঙ্গরাজ্য শক্তি বৃদ্ধি করিয়া মৌর্য সাম্রাজ্যের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা ছাড়া স্থল ও জলপথে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের পথগুলিও নিয়ন্ত্রণ করিত কলিঙ্গ। সুতরাং রাজ্যটিকে মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিল। স্বাভাবিকভাবেই সাম্রাজ্যবাদী অশোকের দৃষ্টি কলিঙ্গর উপর ন্যস্ত হইল। অভিষেকের নবম বর্ষে—২৬১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে তিনি কলিঙ্গ রাজ্যের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান করিয়া

রাজ্যটিকে প্রায় ধ্বংস করিয়া দিলেন। এই যুদ্ধে প্রায় দেড় লক্ষ কলিঙ্গবাসী বন্দী হইলেন এবং প্রায় এক লক্ষ নরনারী প্রাণ হারান এবং এই সংখ্যার অনেকগুণ মানুষ নানাভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন।



কলিঙ্গ যুদ্ধ মৌর্য আমলের শেষ বৃহৎ যুদ্ধ। এই যুদ্ধের ফলে, তামিল অঞ্চল বাদে অবশিষ্ট ভারত ঐক্যবদ্ধ হয়। কিন্তু যুদ্ধের বিপুল ধ্বংসলীলা ও অজস্র লোকক্ষয়ে তাঁহার হৃদয় মথিত হইয়া উঠে এবং পরম অনুশোচনায় তিনি চিরকালের জন্য যুদ্ধনীতি পরিত্যাগ করেন। সাফল্যের উল্লাসের মধ্যে যুদ্ধনীতি ত্যাগের এই দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসের বিরলতম ঘটনা। ত্রয়োদশ শিলালিপিতে অশোকের এই হৃদয় পরিবর্তনের ঘটনা উৎকীর্ণ আছে। অতঃপর তিনি উপগুপ্ত নামে জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিকট বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তখন হইতেই

অশোকের মর্মবেদনা ও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ

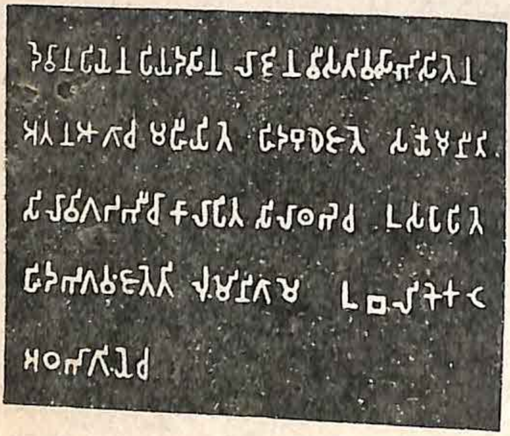
অহিংসাকে পরম ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করিয়া অশোক ধর্মবিজয়ের উদার নীতি অনুসরণ করিতে থাকেন।

অশোকের ধর্মবিজয়

দিগ্বিজয়ের পরিবর্তে ধর্মবিজয়ের বাণী ঘোষণা করিয়া অশোক সর্বভারতে মৈত্রীর বাণী ছড়াইয়া দিলেন। সুদূর দক্ষিণের চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র প্রভৃতি রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান প্রেরণ করিবার পরিবর্তে তিনি তাহাদের সহিত শান্তি ও মৈত্রীর বন্ধন গড়িয়া তুলিলেন। বহির্ভারতের সিরিয়া, মিশর, ম্যাসিডন প্রভৃতি রাষ্ট্রের সহিতও তিনি প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য অশোক আপন বংশধরগণকেও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত থাকিবার জন্য ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'এখন হইতে আমার পুত্র, প্রপৌত্র কেহই নূতন কোন সামরিক বিজয়ে অগ্রসর হইবে না।'

আধুনিক ঐতিহাসিকগণ অবশ্য (অধ্যাপক কোশাম্বী, ডঃ রোমিলা থাপার) অশোকের যুদ্ধ নীতি ত্যাগ ও ধর্মবিজয় নীতির একটি ভিন্নতর ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, "অশোক যুদ্ধকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় হিসাবে বর্জন করেন নি। মৌর্য সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সাধন পূর্ণ হওয়ায় আক্রমণাত্মক যুদ্ধের আর প্রয়োজন ছিল না।" সুতরাং সমকালীন রাজনীতির প্রয়োজনেই 'ধর্মবিজয় নীতি' অনুসৃত হইয়াছিল। আক্ষরিক অর্থে, অশোকের 'ধর্মবিজয়' বলিতে বুঝিতে হইবে, ধর্মের নীতিসমূহ প্রচারের উদ্দেশ্যে পরিচালিত রাষ্ট্রনীতি যাহা ন্যায়নিষ্ঠতার মধ্য দিয়া জয়লাভকে নির্দেশ করে। অশোকের সামরিক শক্তির ভয়ে তামিল রাজ্যগুলি সহজেই আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার নীতির যৌক্তিকতা প্রমাণ করে।

বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া কিছুদিন গৃহী উপাসকের জীবন যাপন করিবার পর অশোক বৌদ্ধ সংঘে যোগদান করেন। অতঃপর পূর্বতন 'বিহার যাত্রা' অর্থাৎ প্রমোদ ভ্রমণ পরিহার করিয়া তিনি 'ধর্মযাত্রা' অর্থাৎ তীর্থ পরিক্রমা ও বুদ্ধের শিক্ষা প্রচারের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্নস্থানে, পর্বতগাত্রে ও প্রস্তর স্তম্ভে সাধারণ মানুষের বোধগম্য সহজ প্রাকৃত ভাষায় তিনি বৌদ্ধধর্মের সার উপাদেশাবলী উৎকীর্ণ করিয়া দিলেন এবং জনগণকে তাহা অনুসরণ করিতে আহ্বান করিলেন। বুদ্ধের বাণীর উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিলেও তাঁহার ধর্মমতে কোন গোঁড়ামি ছিল না। বস্তুতঃ উহা ছিল কতকগুলি নৈতিক আচরণ বিধির সমষ্টি—যেমন, পিতামাতা ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা, সকলের প্রতি সম্যক আচরণ এবং দয়া, জ্ঞান, সত্য, শুচিতা ও সাধুতার আদর্শ পালন। দ্বিতীয়তঃ, ক্রোধ-ঈর্ষা ও নিষ্ঠুরতা হইতে এবং অপরের বিরূপ সমালোচনা হইতে বিরত থাকা। অশোকের ধর্ম-নীতিতে অহিংসার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল, তাঁহার অহিংসা আদর্শের অন্তর্ভুক্ত ছিল যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্য জয় পরিহার করা এবং প্রাণী হত্যা হইতে বিরত থাকা। অশোকের ধর্মমতের অপর বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মসহিষ্ণুতা তিনি বলেন, 'আপন ধর্মকে শ্রেষ্ঠ এবং অপর ধর্মকে হীন মনে করা পাপ'।



অশোকের শিলালিপি

'যুত', 'রাজুক', 'প্রাদেশিক' প্রভৃতি রাজকর্মচারিদের অশোক আপন ধর্মাদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া কর্তব্য

পালনে ব্রতী করাইয়াছিলেন। অহিংসা ও প্রেমের দ্বারা রাষ্ট্রনীতিকে কিভাবে পরিচালিত করা যায়, তাহাই শিক্ষা দিবার জন্য এবং ভগবান্ বুদ্ধের বাণী দেশে দেশে, নগরে নগরে প্রচার করিবার জন্য অশোক পরবর্তিসময়ে 'ধর্মমহামাত্র' নামে একশ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও রাজকর্মচারিগণের ধর্মনীতি-পালন পর্যবেক্ষণ স্বার্থে 'প্রতিবেদক' নামে একশ্রেণীর কর্মচারী থাকিত।

বৌদ্ধধর্মের প্রচার

বৌদ্ধধর্ম প্রচারে ও প্রসারে অশোক অনন্যসাধারণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই অক্লান্ত চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র ও কন্যা (মতান্তরে ভ্রাতা ও ভগিনী) মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রাকে তিনি সিংহলে বুদ্ধের বাণী প্রচারের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। সিংহল ব্যতীত পশ্চিম এশিয়া মিশর, গ্রীস ও ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশেও তিনি প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। দেশের অভ্যন্তরে বৌদ্ধসংঘকে সংহত ও ঐক্যবদ্ধ করিবার মানসে তিনি রাজধানী পাটলীপুত্রে এক বৌদ্ধ মহাসম্মেলন—তৃতীয় বৌদ্ধমহাসঙ্গীতি আহ্বান করিয়াছিলেন।

জনহিতকর কার্যাবলী

বহুবিধ কল্যাণ কর্মের আয়োজনে ও প্রবর্তনেও তাঁহার শাসনকাল স্মরণীয়। সারা জীবন ধরিয়া তিনি অসংখ্য বৃক্ষরোপণ, কূপ খনন, ঔষধির বিস্তার, মানুষ ও পশুর জন্য চিকিৎসা ও শুশ্রূষাগার স্থাপন, দীর্ঘবিস্তৃত রাজপথের পার্শ্বে অতিথিশালা ও বিশ্রামাগার সমূহ স্থাপন ইত্যাদি জনহিতকর কার্যাবলী অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে বহু স্তূপ, স্তম্ভ ও বহুবিধ ভাস্কর্য শিল্পের বিকাশ ঘটিয়াছিল।

ধর্ম ও সদাচারের আদর্শ প্রচারে এবং প্রজাহিতৈষণা ও মানব-কল্যাণের মহৎ দৃষ্টান্তে অশোকের রাজত্বকাল স্বমহিমায় প্রদীপ্ত। বিপুল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াও অননুকরণীয় সংযমের মাধ্যমে তিনি আপন ক্ষমতা ও ভোগোলিপ্সাকে সংযত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বৌদ্ধসংঘে যোগদান করিয়া ধর্ম প্রচারে ব্রতী থাকিয়াও তিনি রাজকার্য পালনে সতত প্রবৃত্ত থাকিতেন। রাজকার্য সাধন ও ধর্মপালনের এই অপূর্ব সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। নিজে সক্রিয় বৌদ্ধ-মতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও অশোক কখনও মঠবাসী ভিক্ষু হন নাই কিংবা রাজ্যের শাসনভার অপর কাহারও হাতে অর্পণ করেন নাই। ভারতীয় ধর্মে 'কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম' দর্শনের তিনিই যোগ্য ছিলেন। সম্রাট হইয়াও তিনি ঋষি ; মহামতি অশোক সার্থকভাবেই রাজর্ষি। "সবে মুনিষে পজা মমা' (সকল মানুষই আমার সন্তান)—শুধু চেতনায় নয়, কৃতকর্মেও এই আদর্শ অনুসৃত হইয়াছিল। মনুষ্যেতর জীবের প্রতি তাঁহার যে মমতা ছিল, ইতিহাসে তাহারও তুলনা নাই। দেশে ও বিদেশে বুদ্ধের বাণী প্রচারে প্রচেষ্টা এবং উদারতা ও সহিষ্ণুতা তাঁহার ধর্মনীতিকে মহিমান্বিত করিয়াছে। ইতিহাসে তাই তিনি অনন্য ও কালোত্তীর্ণ।



অশোকস্তম্ভ

কৃতিত্ব

রোমান সম্রাট কনষ্টান্টইন, মধ্যযুগের সম্রাট শার্লেম্যান ও ভারতের ইতিহাসের আকবর—সকলেই খ্যাতকীর্তি শাসক, কিন্তু প্রতিভা ও কর্মোদ্যোগের সামগ্রিকতার বিচারে মহামতি অশোক ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

ইংরেজ লেখক এইচ· জি· ওয়েলসের ভাষায়—'সহস্র সহস্র নৃপতি যাঁহারা পৃথিবীর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ভিড় করিয়া আছেন তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র সম্রাট অশোকের নামই তারকার ন্যায়

ভারতীয়গণ গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যা, মুদ্রা ও শিল্পরীতি গ্রহণ করেন। ভারতের নৃপতিগণ সুন্দর ও মসৃণ গ্রীক মুদ্রা অনুকরণ করিয়া নির্দিষ্ট ওজন ও নির্দিষ্ট আকারের মুদ্রা প্রবর্তন করেন। মৌর্যোত্তর যুগে (গ্রীক ও রোমান) শিল্পের প্রভাবে গান্ধার শিল্প নামে এক নূতন শিল্পরীতির জন্ম হয়। মহাযান ধর্মমতের উদ্ভবের পশ্চাতেও গ্রীক প্রভাব কার্যকরী ছিল। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সূত্র ধরিয়া বাণিজ্যের ও সামুদ্রিক ক্রিয়াকলাপের নূতন পথ উন্মুক্ত হয়। সর্বশেষে বলা যায়, গ্রীক ঐতিহাসিকদের রচনা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের মূল্যবান সূত্র।

● ইন্দো-গ্রীক, শক ও পহ্লব আধিপত্য ●

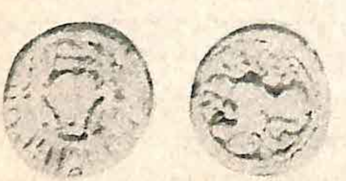
● **ব্যাকট্রীয় বা বাহ্লিক গ্রীক আক্রমণ ঃ** আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতিগণ বিশাল সাম্রাজ্য নিজেদের ক্ষমতা অনুসারে ভাগ করিয়া লন। সেলুকস সিরিয়া সহ এশিয়াস্থিত গ্রীক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। কিন্তু খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় দশকের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়ে এবং একে একে পার্থিয়া, ব্যাকট্রীয় বা বাহ্লিক দেশ (আফগানিস্থানের উত্তরাঞ্চল) প্রভৃতি প্রদেশগুলি স্বাধীন হইয়া যায়। কাবুল, হিরাট, কান্দাহার প্রভৃতি স্থানও সেলুকসকে সন্ধির শর্তানুসারে চন্দ্রগুপ্তকে ফিরাইয়া দিতে হয়। ইহাদের মধ্যে ব্যাকট্রীয়গণ মৌর্যোত্তর যুগে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে হিন্দুকুশ পর্বত ও অক্ষু নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে কিছু পরিমাণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন। ব্যাকট্রীয় গ্রীক শাসকদের মধ্যে প্রথমে ইউথিডিমস্ একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তবে শাসকরূপে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইউথিডিমস্-এর পুত্র ডেমেট্রিয়াস ও জনৈক গ্রীক সেনাপতি ইউক্রেটাইডিস। সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যাকট্রীয় গ্রীক রাজা ছিলেন মিনান্দার। খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতকে তিনি মধ্য আফগানিস্থান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, রাজপুতনা, কাথিয়াওয়াড় ও উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল আপন অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাকে 'মিলিন্দপান্হো' নামক পালিগ্রন্থে উল্লিখিত রাজা মিলিন্দ বলিয়া মনে করা হয়। সমসাময়িক অপর একজন গ্রীক রাজার দূত হেলিওডোরাস বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়া বিদিশার নিকট বেসনগরে একটি গরূড় স্তম্ভ নির্মাণ করেন। অতঃপর ব্যাকট্রীয় গ্রীকগণ আত্মকলহে ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়েন।



মিনান্দার (মুদ্রা)

হেলিওডোরাস

● **শক (সিরিয়) অনুপ্রবেশ ও আধিপত্য ঃ** মধ্যএশিয়ার সিরদরিয়া অঞ্চল হইতে শকগণ উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রবেশ করিয়া ইন্দো-গ্রীক রাজ্যের বশ্যতা প্রথমে স্বীকার করে। পরে বহুবিধ ইন্দো-শক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। ইন্দো-শক রাজ্যের বিখ্যাত রাজা মাউয়েস বা মোগ খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রাজত্ব করিতেন। তিনি গান্ধারে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার উত্তরাধিকারী হন 'আজেস' এবং নিজেই উপাধি গ্রহণ করেন মহারাজাধিরাজ। শকদের অপর একটি শাখা 'ক্ষহরত' নামে পরিচিত, ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত শাসক নহপান্ ছিলেন সৌরাষ্ট্র ও গুজরাটের অধিকর্তা। কিন্তু তিনি সাতবাহন রাজ গৌতমী পুত্র সাতকর্ণীর নিকট পরাজিত ও নিহত হন।



পল্লব মুদ্রা

ইহার পর দাক্ষিণাত্যে ও উজ্জয়িনীতে নূতন শক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উজ্জয়িনীর শক ক্ষত্রপদের (শাসক) মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন রুদ্রদামন।

জুনাগড় শিলালিপি হইতে জানা যায়, তিনি মালব, কাথিয়াওয়াড়, গুজরাট, মাড়বার, উত্তর কোঙ্কণ ও সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ধর্মভীরু, সুশাসক, প্রজাহিতৈষী সুপণ্ডিত এবং সংগীতানুরাগী হিসাবেও ইতিহাসে তাঁহার খ্যাতি আছে। ইহার পর গুপ্ত সম্রাটদের আমলে শক শাসনের সম্পূর্ণ অবসান ঘটে।

রুদ্রদামন

● **পার্থিয়ান বা পহ্লব অনুপ্রবেশ ঃ** খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে শকদের পতন ঘটাইয়া কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব তীরে পার্থিয়া হইতে আগত পহ্লব নামে আর এক বিদেশী জাতি উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু অংশ জয় করেন। ইহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ ছিলেন গণ্ডোফার্নিস। কাবুল, কান্দাহার, তক্ষশিলা প্রভৃতি অঞ্চল স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া তিনি সম্রাট উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। গণ্ডোফার্নিসের মৃত্যুর কিছুদিন পরে কুষাণ জাতির আক্রমণে পহ্লব শাসনের অবসান ঘটিয়াছিল। কথিত আছে, যীশুখ্রীষ্টের প্রত্যক্ষ শিষ্য সাধু টমাস এই সময় ভারতে আসেন এবং খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন।


গন্ডোফার্নিস (মুদ্রা)

● মৌর্য যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ●

● **সমাজজীবন** : কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' এবং গ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনীসের বিবরণ (ইন্ডিকা) হইতে মৌর্যযুগের সমাজব্যবস্থার সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়।

বৈদিক সমাজের ঐতিহ্যানুসারে মৌর্য সমাজ ব্যবস্থাও চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রথম দিকে এই সামাজিক বিন্যাস দৃঢ় ছিল। বর্ণের বাহিরে বিবাহ করা বা বৃত্তি ত্যাগ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অভ্যুদয় এবং বিদেশী আক্রমণ ও বসবাসের প্রভাবে জাতিভেদের কঠোরতা হ্রাস পাইল। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, মেগাস্থিনীস জন্মসূত্রের পরিবর্তে জীবিকা বা বৃত্তিকেই শ্রেণী বিভাগের ভিত্তি মনে করিয়া ভারতীয় জনগণকে সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন—যথা, দার্শনিক (ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ শ্রমণ), অমাত্য (রাজকর্মচারী), পরিদর্শক (চর), সৈনিক, কৃষক, শিকারী, পশুপালক, শিল্পী ও বণিক।

মেগাস্থিনীসের শ্রেণীবিভাগ

মৌর্যযুগে নারীর সামাজিক মর্যাদা স্বীকৃত হইত। তবে পুরুষদের মধ্যে বহু বিবাহ ও নারীর বৈধব্য চালু ছিল। সতীদাহ প্রথাও বর্তমান ছিল।

মৌর্যযুগে দাসত্বপ্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও মেগাস্থিনীস বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে কোন ক্রীতদাস ছিল না। সম্ভবতঃ গ্রীসে প্রচলিত দাসপ্রথার অনুরূপ কঠোরতা বা শাস্তি ভারতবর্ষে ছিল না বলিয়াই মেগাস্থিনীস ইহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

মেগাস্থিনীসের মতে, ভারতবর্ষের মানুষ ছিলেন শান্ত সত্যবাদী সরল। চুরি প্রায় ঘটিতই না এবং পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়া মানুষ বিবাদের মীমাংসা করিত। গ্রীকভাষায় রচিত 'ইন্ডিকা' গ্রন্থে তিনি ভারতবাসীর জীবনযাত্রার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। মৌর্যযুগে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম প্রবল থাকিলেও সম্রাটগণ ধর্মসহিষ্ণুতায় ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়াছিলেন।

শিক্ষাদীক্ষায় মৌর্যযুগের ইতিহাস সমুজ্জ্বল। তক্ষশিলা, বারাণসী, উজ্জয়িনী ছিল তৎকালীন ভারতবর্ষের শিক্ষার প্রধান প্রধান কেন্দ্র। কিছু জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্র রচিত হইলেও, মৌর্য আমলের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ হইল 'কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র'।

● **অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঃ** মৌর্য যুগে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার অর্থনৈতিক জীবনে সমৃদ্ধি

আনিয়া দিয়াছিল। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় বাণিজ্য হইতেই সাম্রাজ্যে প্রচুর অর্থাগম হইত। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য প্রধানতঃ নদীপথেই পরিচালিত হইত। অবশ্য স্থলপথে বাণিজ্যের সুবিধার জন্যও বহু রাজপথ নির্মিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিল পেশোয়ার হইতে পাটলীপুত্র পর্যন্ত প্রসারিত ১২০০ মাইল দীর্ঘ এক রাজপথ। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বাণিজ্যের প্রয়োজনে নৌপথ ও স্থলপথ তত্ত্বাবধান করিবার জন্য বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অন্যদিকে, চন্দ্রগুপ্তর শাসনকাল হইতেই সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসার শুরু হয়। কলিঙ্গ বিজয়ের পর নূতন বন্দর অধিকৃত হওয়ায় এই বাণিজ্যের আরও অগ্রগতি ঘটে। বড় বড় নৌযান এমন কি ছোট ছোট জাহাজও নির্মিত হইতে থাকে। পূর্ত কর্মের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হইল।

অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য

মৌর্য যুগে বস্ত্রশিল্প ও ধাতুশিল্প প্রধান পণ্যদ্রব্য ছিল। অর্থশাস্ত্রে পূর্ববাংলা ও গাঙ্গেয় উপত্যকার বস্ত্রশিল্প প্রশংসিত হইয়াছে। দারু, চর্ম ও হস্তিদন্ত নির্মিত পণ্য দ্রব্যও বাণিজ্যের প্রসার ঘটাইয়াছিল। ভারতীয় পণ্যদ্রব্য, বিশেষ করিয়া রেশম পশম ও সূতীবস্ত্র বিদেশে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। এই সময় স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রার প্রচলন ছিল। বাণিজ্য রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ও ব্যক্তিগত—উভয় প্রকারই ছিল। রাষ্ট্রের তরফে শিল্প পরিচালনার জন্য যেমন বিশেষ বোর্ড বা সমিতি ছিল, তেমনি শিল্প-কারিগরদেরও ছিল নিজস্ব গিল্ড বা বণিক সংঘ।

মৌর্যযুগে শিল্প

মৌর্য যুগের অর্থনীতি প্রধানতঃ কৃষিভিত্তিক। বেশির ভাগ মানুষ ছিলেন গ্রামে বসবাসকারী কৃষিজীবী। রাজা ছিলেন সমস্ত জমির মালিক। নূতন অঞ্চল কৃষির উপযোগী করিয়া তোলা ছিল রাজার অন্যতম কর্তব্য। কলিঙ্গযুদ্ধে ধৃত মানুষদের নূতন কৃষিজমিতে নিয়োগ করা হইয়াছিল। মেগাস্থিনীসের মতে, তৎকালীন ভারতে কোন দুর্ভিক্ষ ঘটে নাই। সুতরাং অনুমান করা যায় দেশে খাদ্যসামগ্রীর প্রাচুর্য ছিল।

কৃষির প্রাচুর্য

● **মৌর্যোত্তর যুগে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর পুনর্গঠনে বিদেশী প্রভাব ঃ** উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হইতে ভারতবর্ষে একের পর এক বৈদেশিক আক্রমণ ও অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। এইসব বিদেশী জাতির সহিত সংঘর্ষে ও সমন্বয়ে ভারতীয় জনগোষ্ঠী পুনর্গঠিত হয়। মৌর্যশাসনের শুরু হইতেই ভারতীয়দের সহিত বৈদেশিকগণের সামাজিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইতেছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সহিত গ্রীক সেনাপতি সেলুকসের কন্যার বিবাহ এই সামাজিক মিলনের সূচনা করিয়াছে। শক রাজা রুদ্রদামনের পরিবারের সহিত সাতবাহন রাজবংশের বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রকৃতিগত দিক হইতে সমকালীন ভারতীয় সমাজ রক্ষণশীল হইলেও মিলনের পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করা হয় নাই। ভারতে আগত বিদেশী জাতিগুলি প্রথম দিকে তাহাদের বিদেশী স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিলেও, কালক্রমে ভারতীয় ধর্ম ও নাম গ্রহণ করেন এবং ধীরে ধীরে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সমাজে মিশিয়া যান। নবাগত বিদেশীদেরও বর্ণাশ্রম প্রথা অনুযায়ী বিভক্ত করা হয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সর্দার ডঃ কে· এম· পাণিক্কর মন্তব্য করিয়াছেন, শক, পহ্লব, কুষাণগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন নাই, তাহারা এই দেশকে তাহাদের নূতন বাসভূমি হিসাবে গ্রহণ করিয়া অনুপ্রবেশ করিয়াছেন।

ভারতীয় ও বিদেশীদের মধ্যে জাতিগত সমন্বয়

● **মৌর্য শিল্পকলা ঃ** মৌর্যযুগে ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বহুমুখী বিকাশ দেখা যায়। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার অপেক্ষাকৃত অপ্রতুল শিল্প নির্দশনের পর প্রায় দুই হাজার বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে আর কোন শিল্পচিহ্নের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। অনেক শিল্প ঐতিহাসিক তাই মনে করেন, মৌর্য যুগের শিল্পকলাই ভারতীয় শিল্পসৃষ্টির প্রথম গৌরবময় অধ্যায়।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প

মেগাস্থিনীসের বর্ণনায়, মৌর্য আমলের স্থাপত্য কলার অসামান্য সাফল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কাষ্ঠনির্মিত রাজপ্রাসাদের স্থাপত্য সৌন্দর্যে গ্রীক রাষ্ট্রদূত অভিভূত হইয়াছিলেন। প্রায় সাতশত বৎসর পরে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন পাটলীপুত্র নগরীতে প্রস্তরনির্মিত অশোকের রাজপ্রাসাদের গঠন-নৈপুণ্যে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। শিল্প-সাফল্যে সম্রাট অশোকের শাসনকাল বিশেষভাবে স্মরণীয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে অশোক মোট ৮৪,০০০ স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে সাঁচী স্তূপ সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। মৌর্যস্থাপত্য শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল স্তম্ভ। এক একটি অখণ্ড পাথর দিয়া স্তম্ভগুলি নির্মিত হইত। প্রতিটি স্তম্ভের আলংকারিক কারুকার্য শিল্পরসিকদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। নন্দনগড়, এলাহাবাদ, সারনাথ প্রভৃতি স্থানে এইরূপ অসংখ্য স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সারনাথের স্তম্ভশীর্ষের সিংহমূর্তি ভাস্কর্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। ডঃ স্মিথের মতে, 'ইহাতে আদর্শ ও বাস্তবের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে।' মার্শাল, হ্যাভেল প্রমুখ শিল্পপণ্ডিতগণও মৌর্যভাস্কর্য শিল্পের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।



সাঁচিস্তুপের তোরণ

মৌর্য শিল্পরীতি

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে মার্শাল প্রমুখ কয়েকজন মনে করেন; মৌর্য শিল্পকলা গ্রীক ও পারসিক শিল্পরীতি দ্বারা প্রভাবিত। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহারা বলেন, অশোকের প্রস্তর নির্মিত রাজপ্রাসাদ এবং সারনাথের স্তম্ভশীর্ষের সিংহমূর্তি ইত্যাদি শিল্পকৃতিতে বিদেশী প্রভাবের চিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু প্রখ্যাত শিল্প-পণ্ডিত হ্যাভেল এবং কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ এই মতকে অস্বীকার করিয়া বলেন, মৌর্য শিল্পকলায় আর্য ও অনার্য শিল্পরীতির সমন্বয় ঘটিয়াছে। শিল্পে বিদেশীধারার প্রভাব কুষাণ আমলে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। মৌর্য শিল্প বৌদ্ধধর্ম দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল।

পাঁচ □ কুষাণ অনুপ্রবেশ ও কুষাণ আধিপত্য

মৌর্যোত্তর যুগে যে বিদেশী জাতির অনুপ্রবেশ ও আধিপত্য ভারতবর্ষের ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল তাহারাই হইতেছে কুষাণ জাতি। কুষাণ মধ্য এশিয়ার (চীনদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত) ইউ-চি নামক একটি যাযাবর জাতির শাখা। খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে হিউংনু নামে এক তুর্কী যাযাবর জাতির আক্রমণে তাহারা পিতৃভূমি পরিত্যাগ করে এবং বহু দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের ভিতর দিয়া অবশেষে আমুদরিয়া অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। সেখানে বসবাসকালে তাহারা যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য গ্রহণ করিয়াছিল। ক্রমে তাহারা পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া যায়।এই পাঁচটি শাখার মধ্যে কুষাণ শাখাই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়া উঠে।

পূর্ব পরিচয়

কুষাণ বংশের প্রথম রাজা কুজুল কদফিসিস অপর চারিটি শাখাকে অধীনস্থ করিয়া নিজেকে 'ওয়াং'

বা রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। ইনি কাবুল ও কিপিন নামক স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক কিপিন স্থানটিকে গান্ধার অঞ্চল বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম কদফিসিসের পুত্র বীম কদফিসিস ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পাঞ্জাব ও গাঙ্গেয় উপত্যকার এক বিরাট অংশ আপন রাজ্যভুক্ত করেন। সমকালীন চৈনিক সম্রাটের সহিত তাহার সংঘর্ষের কাহিনী কোন কোন ঐতিহাসিক কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। তাঁহার আমলে চীন ও পশ্চিম এশিয়া এবং রোমান সাম্রাজ্যের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার মুদ্রায় অঙ্কিত শিবের মূর্তি এবং 'মাহেশ্বর' উপাধি গ্রহণের উপর ভিত্তি করিয়া অনুমান করা হয় তিনি শিবের উপাসক ছিলেন।

কুজুল কদফিসিস ও বীম কদফিসিস

● **কণিষ্ক ঃ** কুষাণ বংশের তৃতীয় শাসক ছিলেন সম্রাট কণিষ্ক। তিনি ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা এবং প্রাচীন ভারতের খ্যাতকীর্তি শাসকদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার সিংহাসন আরোহণকাল লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাঁহার রাজত্বকাল নির্ণীত হয়। অধিকাংশ ঐতিহাসিক অবশ্য মনে করেন তিনি ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং 'শকাব্দ' নামে এক নূতন অব্দের প্রচলন করেন। তদানীন্তন শিলা, তাম্রলিপি এবং মুদ্রা, চৈনিক সূত্র, হিউয়েন সাঙের বিবরণী, কল্হণের রাজতরঙ্গিনী এবং আলবেরুনীর গ্রন্থ ইত্যাদি উপাদান হইতে কণিষ্কের রাজত্বকাল সম্পর্কিত বহু মূল্যবান ও বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে।

কণিষ্কের শাসনকালে কুষাণ সাম্রাজ্য বহুধা বিস্তৃত হইয়াছিল। বিভিন্ন সূত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহার সাম্রাজ্য উত্তরে খোটান হইতে দক্ষিণে কোঙ্কণ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সাম্রাজ্যসীমার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্তমান উত্তরপ্রদেশ পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, মথুরা, অযোধ্যা, মগধ, মালব, সৌরাষ্ট্র, রাজস্থান, কাশ্মীর ইত্যাদি স্থানসমূহ। ভারতবর্ষের বাহিরে কাশগড়ও তাঁহার সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল। জনৈক চৈনিক সম্রাটের সহিতও তাঁহার সংঘর্ষ হইয়াছিল। চৈনিক ঐতিহাসিকদের মতে, এই যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় ঘটিয়াছিল। ভারতীয় সূত্রে ইহা প্রমাণিত হয় নাই। পুরুষপুর বা পেশোয়ার ছিল কণিষ্কের রাজধানী।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে কণিষ্ক নিছক সাম্রাজ্য সংগঠকই ছিলেন না, ধর্মসংগঠকরূপেও তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। কণিষ্ক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার মুদ্রা হইতে বলা যায়, ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উদার ও সর্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অবশ্য বৌদ্ধধর্মের প্রতিই তাঁহার সর্বাপেক্ষা অনুরাগ ছিল। অশোকের মত তিনিও বৌদ্ধধর্ম প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে গান্ধার নতুবা জলন্ধরে চতুর্থ বা শেষ বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহূত হইয়াছিল। বৌদ্ধ পণ্ডিত বসুমিত্র ও অশ্বঘোষ যথাক্রমে অধিবেশনের সভাপতি ও সহ-সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। এই সভায় বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন শাস্ত্র গভীরভাবে আলোচিত হয়। অধিবেশনের ব্যাখ্যা ও টীকা সম্বলিত করিয়া একটি গ্রন্থ রচিত হয় ; উহার নাম 'মহাভিভাষ্য'। অন্যদিকে, সমস্ত প্রতিবেদন একটি তাম্রফলকে উৎকীর্ণ করা হয়। এই মহাসম্মেলনে বৌদ্ধগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। যাঁহারা বুদ্ধের বাণী ও দর্শন অবিকৃত রাখিবার পক্ষপাতী তাঁহারা 'হীনযান' নামে পরিচিত হইলেন। অপরপক্ষে, নূতনকালের পরিপ্রেক্ষিতে বৌদ্ধ ও দর্শনের নূতনতর (এবং অপেক্ষাকৃত সরলতর) ব্যাখ্যাকারিগণ 'মহাযান' বলিয়া আখ্যাত হইলেন। কণিষ্ক মহাযান ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় মহাযান বৌদ্ধ ধর্মমত মধ্য এশিয়া ও চীনে প্রচারিত হয়। ভারতের উত্তরে তিনি এই ধর্মমতের ব্যাপক প্রসার ঘটান। তিনি একদিকে পুরাতন বৌদ্ধ বিহারগুলির সংস্কারসাধন, অন্যদিকে বহু নূতন বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। রাজধানী পেশোয়ারে তিনি এক বিশাল চৈত্য নির্মাণ করেন। পেশোয়ারের এই বৌদ্ধমঠ সমকালীন বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রধান পীঠস্থানে পরিণত হইয়াছিল।

বৌদ্ধ দর্শনের অন্যতম পুরোধা নাগার্জুন, চিকিৎসা শাস্ত্রের আচার্য চরক প্রমুখ পণ্ডিতগণ কণিষ্কের রাজসভা অলঙ্কৃত রাখিতেন। ইঁহাদের রচনার মাধ্যমে সাহিত্য ও দর্শন, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রের স্মরণীয় সমৃদ্ধি ঘটে। কণিষ্কের আনুকূল্যে সংস্কৃত ভাষার চর্চা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহার আমলে শিল্পেরও ব্যাপক বিকাশ ঘটে। কাশ্মীরে বারামূলার নিকট কণিষ্কপুর নামে এবং মথুরায় তিনি দুইটি নগর নির্মাণ করেন। মথুরার মিউজিয়ামে রক্ষিত কণিষ্কের মস্তকবিহীন প্রস্তর মূর্তি একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প নিদর্শন হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।


কণিষ্ক কবন্ধ মূর্তি

কণিষ্কের রাজত্বকাল তেইশ বৎসর চলিয়াছিল। আনুমানিক ১০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে কণিষ্কের শাসনকাল এক স্মরণীয় অধ্যায়। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে কোন কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা গড়িয়া উঠে নাই। ইহার ফলে, যে রাজনৈতিক অনৈক্য ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়, তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন বৈদেশিক জাতি ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ করেন। কুষাণগণও ছিলেন এইরূপ একটি আক্রমণকারী জাতি। কিন্তু বিদেশাগত হইলেও কণিষ্ক ভারতীয় মূলস্রোতের সহিত আপনাকে অঙ্গীভূত করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল বাদে তিনি ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে একটি অখণ্ড রাষ্ট্র স্থাপন করিয়া রাজনৈতিক ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই ভারতের প্রথম শাসক যাঁহার সাম্রাজ্য ভারতের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করিয়া মধ্য এশিয়াতে বিস্তৃত হইয়াছিল। মৌর্য ও গুপ্তযুগের মধ্যবর্তী সময়ে কণিষ্ক ছিলেন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক এবং সামরিক নেতা।

বিজেতারূপে কণিষ্ক যে যশ অর্জন করিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি অনেক উচ্চে ছিল। অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, বসুবন্ধু, চরক প্রমুখ মনীষিগণ কণিষ্কের অকৃত্রিম পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধি ঘটে। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে কণিষ্কের রাজত্বকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম পুনরুজ্জীবিত হয় এবং বহির্ভারতে বিস্তৃত হয়। বুদ্ধের উপাসক হইলেও কণিষ্ক ছিলেন একজন উদার ও পরধর্মসহিষ্ণু শাসক। তাঁহার মুদ্রা হইতে এই ধর্মীয় উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়।

কণিষ্কের শাসনকালে কুষাণ সাম্রাজ্য সাফল্যের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যের পতন সূচিত হয়। পরবর্তী কুষাণ শাসকদের রাজত্বকালের ঐতিহাসিক তথ্যাদিও পর্যাপ্ত নয়। এই বংশের কণিষ্ক পরবর্তী শাসকদের মধ্যে ছিলেন বসিষ্ক হবিষ্ক এবং দ্বিতীয় কণিষ্ক। শেষতম কুষাণ রাজা ছিলেন বাসুদেব। তাঁহার পরে কুষাণ শক্তির বিলুপ্তি ঘটিল।

● **কুষাণযুগে বহির্ভারতের সহিত ভারতের সম্পর্ক ঃ** কুষাণ যুগে বহির্বিশ্বের সহিত ভারতবর্ষের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়। কণিষ্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কাশগড়, খোটান প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া ওঠে। ওই সব স্থানের ভারতীয় সংস্কৃতির অনেক নিদর্শন বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ অরেলষ্টাইনের আবিষ্কারের মধ্য দিয়া পাওয়া গিয়াছে। এই মধ্য এশিয়ার পথ ধরিয়াই ভারতের বাণিজ্য চীনদেশে পৌঁছিয়াছিল। পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকার যে সব অঞ্চল তখন রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, সেই সব স্থানের সহিতও ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সময় পশ্চিম উপকূলের বন্দর হইতে পশ্চিম

বহির্ভারতে বাণিজ্যিক সম্পর্ক

এশিয়া এবং পূর্ব উপকূলের তাম্রলিপ্তি বন্দর হইতে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মালয় ও চীনে পণ্য রপ্তানি হইত। পণ্যদ্রব্যের মধ্যে ছিল অগরু ও চন্দন, রেশম ও সূতীবস্ত্র, লবঙ্গ ও অন্যান্য মশলা এবং হাতীর দাঁতের শিল্প দ্রব্য। বাণিজ্যের বিনিময়ে সমকালীন ভারতবর্ষে আর্থিক সমৃদ্ধি দেখা দিয়াছিল। বাণিজ্যিক আদান প্রদানের ফলে সাংস্কৃতিক সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ হয়। কিংবদন্তী মতে, ভারতীয় কাশ্যপ মাতঙ্গ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন।

● **ভারতীয় সংস্কৃতিতে কুষাণযুগের অবদান ঃ** ভারতবর্ষের শিল্প সাহিত্যের ইতিহাসে কুষাণযুগ এক স্মরণীয় অধ্যায়। বিদেশাগত হইলেও কুষাণরাজগণ ভারতীয় সমাজের মূলধারার সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গিয়াছিলেন। প্রথম দিকে, বিদেশী নামকরণ অবিকৃত রাখিয়া আপন স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিলেও, কালক্রমে তাঁহারা ভারতীয় নাম গ্রহণ করেন। শেষ কুষাণ রাজার নাম বাসুদেব। অবশ্য, বিদেশী নাম থাকিলেও, ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে কণিষ্ক এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।



গান্ধার শিল্প (বোধিস্বত্ত্বের মূর্তি)

কুষাণযুগ ছিল সংস্কৃত সাহিত্যের অগ্রগতির যুগ। কণিষ্কের আমলে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মমতকে কেন্দ্র করিয়া বৌদ্ধ দর্শনের ব্যাপক আলোচনা হয়। চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতিতে সমকালীন বৌদ্ধ দার্শনিকগণ অংশগ্রহণ করেন। মহাযানবাদীরা সংস্কৃত ভাষাকে ধর্ম ও দর্শনের আলোচনা ও ব্যাখ্যার বাহক হিসাবে গ্রহণ করেন। তৎকালীন বৌদ্ধ দার্শনিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অশ্বঘোষ, নাগার্জুন ও বসুবন্ধু। অশ্বঘোষ রচিত 'বুদ্ধচরিত' ও 'সূত্রালঙ্কার' প্রভৃতি জীবনী ও দর্শনগ্রন্থ, নাগার্জুন রচিত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ 'মধ্যমিকা সূত্র' এবং বসুবন্ধুর দর্শন-গ্রন্থ 'মহাভিভাষ্য' কুষাণ যুগের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-কীর্তি। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের মনীষীদ্বয় চরক ও শুশ্রুত এবং যোগবিদ পতঞ্জলিও কুষাণযুগের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেন।

শিল্পকলার বিকাশের ক্ষেত্রেও কুষাণ যুগের অবদান উল্লেখযোগ্য। মথুরা, পুরুষপুর, কণিষ্কপুর, অমরাবতী প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাপ্ত মঠ ও মূর্তি হইতে কুষাণ আমলের স্থাপত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মথুরায় প্রাপ্ত কণিষ্কের মূর্তি শিল্পকলার চরম নিদর্শন। কুষাণ আমলে গ্রীক এবং (রোমান) ভাবধারার প্রভাবে 'গান্ধার শিল্পরীতি' নামে ভারতবর্ষে এক নূতন শিল্পকলার জন্ম হইয়াছিল। গান্ধার অঞ্চলে অর্থাৎ তক্ষশিলা ও বর্তমান আফগানিস্থানে এই শিল্পরীতির সর্বাপেক্ষা বেশী নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া ইহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছিল। ডঃ মজুমদারের ভাষায়, "The Gandhara artist had the hand of a Greek but the heart of an Indian.

ছয় □ সাতবাহন সাম্রাজ্য

"খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে সাতবাহন বংশের উত্থানের সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাসে উত্তর-দাক্ষিণাত্য পূর্ণভাবে ভূমিকা গ্রহণ শুরু করিল" (রোমিলা থাপার)। বস্তুতপক্ষে, মৌর্য-পরবর্তী এবং গুপ্ত-পূর্ববর্তী

যুগের ইতিহাস প্রধানতঃ সাতবাহন ও কুষাণযুগের দ্বারা চিহ্নিত। বর্তমান নাসিককে কেন্দ্র করিয়া দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিমাংশে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ঘটে এবং খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত সাতবাহন শাসন স্থায়িত্ব লাভ করে। পুরাণে সাতবাহনদের 'আন্ধ্র' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল 'অন্ধ্র' নামে পরিচিত। কোন কোন ঐতিহাসিক কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদী দুইটির বদ্বীপ অঞ্চলকেই সাতবাহনদের আদি বাসস্থান বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। অপর দিকে, কয়েকজন পণ্ডিত মন্তব্য করিয়াছেন, এই পরিবার পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব উপকূলে আসে এবং নিজেদের নামানুসারে অঞ্চলটির নাম দেয় অন্ধ্র। 'বাসস্থানের নামানুসারে তাহাদের আন্ধ্র বলা হয় নাই, জাতিরূপেই তাহাদের আন্ধ্র বলা হইয়াছে।' গোদাবরীর উত্তরে প্রতিষ্ঠান (বর্তমান পৈথান) ছিল সাতবাহনের রাজধানী।

ভূমিকা

বাসস্থান

সাতবাহন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সিমুক সম্ভবতঃ কণ্বদের অধীনে এক সামন্ত শাসক ছিলেন। কাণ্ববংশের বিলোপসাধন করিয়া তিনি মধ্য ভারতের বিদিশা অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করেন। এই বংশের তৃতীয় রাজা সাতকর্ণী ক্ষুদ্র সাতবাহন রাজ্যের বিস্তৃতি সাধন করেন। পশ্চিমে কাথিওয়াড় ও মালব হইতে পূর্বে কলিঙ্গ রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত অংশ এবং দাক্ষিণাত্যের উত্তরাংশ উত্তর কোঙ্কণ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'নানাঘাট-লেখ" হইতে জানা যায়, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ পালন করিয়া 'দক্ষিণাপথপতি' উপাধি গ্রহণ করেন। কলিঙ্গরাজ খারবেলের 'হাতীগুম্ফা শিলালিপি'তে তাঁহার নামের উল্লেখ থাকিলেও তিনি যে কলিঙ্গ অধিপতির নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। ইহার পর সাতবাহন ক্ষমতার সাময়িক অবনতি ঘটে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে সাতবাহন শক্তির পুনরুত্থান ঘটে। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী শক, যবন, পহ্লব প্রভৃতিকে বিধ্বস্ত করিয়া উত্তরে মালব হইতে দক্ষিণে বর্তমান কর্ণাটক পর্যন্ত, পূর্বে বেরার হইতে পশ্চিমে কোঙ্কণ অঞ্চল পর্যন্ত অর্থাৎ সাধারণভাবে প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ভারতে তাঁহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। বশিষ্ঠীপুত্র পুলমায়ীর আমলে সর্বপ্রথম বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশে সাতবাহন রাজ্যসীমা বিস্তৃত হয়। সাতবাহন বংশের শেষ শক্তিমান সম্রাট যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণীর শাসনকালে মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রদেশে সাতবাহন আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহার পর খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে সাতবাহন শক্তির পতন ঘটে। অতএব, চরমতম বিস্তৃতির সময় এই রাজ্য উত্তরে মালব ও বিন্ধ্যপর্বত হইতে দক্ষিণে কৃষ্ণা নদীর তীর, পূর্বে কলিঙ্গ ও পশ্চিমে সমুদ্রতীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল।

সাতকর্ণী

● **গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী** ঃ প্রথম সাতকর্ণীর মৃত্যুর পর সাতবাহন ক্ষমতার সাময়িক পতন ঘটে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করিয়া সাতবাহন রাজবংশের শক্তি, ক্ষমতা, আয়তন ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তিনি সম্ভবতঃ ১০৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় বিদেশী জাতির আক্রমণে দক্ষিণভারত খণ্ড-বিখণ্ড হইতেছিল। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী শক-যবন (গ্রীক) ও পহ্লব শক্তিকে বিধ্বস্ত করেন। সিংহাসন আরোহণের অষ্টাদশ বৎসরে (আঃ ১২৪ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি শককে (ক্ষহরত) রাজকে পরাজিত ও নিহত করিয়া সৌরাষ্ট্র ও গুজরাট, পূর্ব ও পশ্চিম মালব ও উত্তর কোঙ্কণ অধিকার করেন। ইহা ছাড়া, দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী ও পূর্বে বেরার অঞ্চলেও তিনি রাজ্য বিস্তার করেন। অতএব পূর্বে বেরার পশ্চিমে কোঙ্কণ, উত্তরে সৌরাষ্ট্র এবং দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগে তাঁহার কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় এবং সাধারণভাবে প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ভারতে তাঁহার প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছিল। গৌতমী পুত্রকে 'ত্রি-সমুদ্র-তোয় পিত-বাহন' বা 'তিন সমুদ্রের জল পানকারী'রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, তাঁহার প্রাধান্য পূর্বে বঙ্গোসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর ও দক্ষিণে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।"

রাজ্যের সীমা

গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী সম্ভবতঃ শেষ জীবনে শকক্ষত্রপ রুদ্রদামনের নিকট দুইবার পরাজিত হইয়াছিলেন। জুনাগড় শিলালিপি হইতে জানা যায়, 'কুটুম্ব' বলিয়া রুদ্রদামন পরাভূত অঞ্চল অধিকার করেন নাই। ইহা হইতে অনুমিত হয় গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী রুদ্রদামনের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। এই বিবাহ নিঃসন্দেহে বাস্তব রাজনীতিজ্ঞানের পরিচায়ক। যাহা হউক, গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী ১৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী শুধু সুযোদ্ধাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন যথার্থই প্রজাকল্যাণকামী শাসক। তিনি শত্রুর সহিতও সৎ ব্যবহার করিতেন। নাসিক-প্রশস্তি বিবরণ অনুযায়ী তিনি ক্ষত্রিয়দের দর্প চূর্ণ করিয়া ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। স্বার্থরক্ষা করিতে যত্নবান হইলেও তিনি বর্ণ সংমিশ্রণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক হইলেও তিনি বৌদ্ধদের প্রতি উদার মনোভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রজাকল্যাণকামী শাসক

গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর পর বশিষ্ঠীপুত্র পুলমায়ী সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে (১৩০-১৫৯ খ্রীষ্টাব্দ) সাতবাহন রাজ্য কৃষ্ণানদীর মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সাতবাহন বংশের শক্তিশালী রাজা ছিলেন যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী। তিনি শকদের বিতাড়িত করিয়া সৌরাষ্ট্র, কাথিওয়াড়, কোঙ্কণ প্রভৃতি অঞ্চল পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর অনতিকাল পরেই সাতবাহন সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। অবশেষে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে সাতবাহন শাসনের অবসান ঘটে।

● **সাতবাহন শাসনের গুরুত্ব ঃ** সাতবাহন রাজবংশের দীর্ঘ শাসনকাল ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। এই শাসনকালের মুখ্য বৈশিষ্ট্য ছিল রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে এক সমন্বয়ী সংস্কৃতির প্রবর্তন। ঐতিহাসিক সর্দার পাণিক্করের মতে, সাতবাহন রাজগণ ছিলেন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে মিলনের যোগসূত্র।

সাতবাহন রাজগণ দক্ষিণ ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করিয়া দাক্ষিণাত্যে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু দক্ষিণ ভারতে নয়, মধ্য ভারতেও সাতবাহন রাজশক্তি প্রসারিত হইয়াছিল। ইতিপূর্বে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে দক্ষিণ ভারতের কিয়দংশে উত্তর ভারতের শাসন আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু অশোকের মৃত্যুর পর তথায় মৌর্য কর্তৃত্বের অবসান ঘটে। ফলে, মৌর্য যুগে, রাজনৈতিক প্রভাবের সূত্র ধরিয়া উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র রচনার যে প্রয়াস শুরু হইয়াছিল তাহা পূর্ণতা লাভ করিবার পূর্বেই অসমাপ্ত থাকিল। পরবর্তিকালে সাতবাহন রাজগণ দক্ষিণ ভারতে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনঃস্থাপনে ব্রতী হন। "দাক্ষিণাত্যের স্থানীয় সভ্যতার সহিত (অনার্য সভ্যতা) আর্য সভ্যতার সংমিশ্রণ সাতবাহন শাসনকালে সার্থকতা লাভ করে। সংস্কৃত ভাষা ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া সাতবাহন রাজাগণ এই সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপন করিতে সক্ষম হন।"

রাজনৈতিক ঐক্য

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাতবাহন রাজবংশের অপর স্মরণীয় কীর্তি হইল বিদেশী আক্রমণকারিদের হস্তক্ষেপ হইতে ভারতীয় সংস্কৃতিকে অবিকৃত রাখা। অবশ্য, শক রাজাদের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তাঁহারা সামাজিক ক্ষেত্রে সমন্বয়বাদী ঐতিহ্যের অনুসরণ করেন। ধর্মের ক্ষেত্রেও তাঁহারা সহনশীলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বিশ্বাসী হইলেও সাতবাহন শাসকগণ বৌদ্ধধর্মের প্রতি উদার ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার প্রদর্শন করিতেন। সাতবাহন রাজগণের আনুকূল্য ব্যতীত, বৌদ্ধধর্ম দক্ষিণ ভারতে প্রসারিত হইতে পারিত না।

সমন্বয়বাদী ঐতিহ্যের অনুসরণ

সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রেও সাতবাহন রাজগণের স্বাতন্ত্র্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুণাঢ্য রচিত 'বৃহৎ-কথা' এই আমলের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নিদর্শন। সাতবাহন শাসনকালের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শনগুলি অধিকাংশই বিধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তথাপি অমরাবতী, গোলি, নাগার্জুনকোণ্ডা প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ বিহার ও চৈত্যগুলি অনুপম শিল্পসৃষ্টি

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

হিসাবে রসিকজনের সমাদর লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে, "ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের যে ধারাটি পল্লব ও রাষ্ট্রকূট রাজগণের শাসনকালে বিকশিত হইয়া উঠে তাহার প্রথম স্তর সাতবাহন আমলে রচিত হইয়াছিল।"

সাতবাহন রাজত্বকালে বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক বিকাশ দেখা দেয়। অর্থের প্রাচুর্য থাকার জন্যই ব্যবসায়িগণের পক্ষে মন্দির ও চৈত্য নির্মাণ সম্ভবপর হইয়াছিল।

সামাজিক ক্ষেত্রে সাতবাহন রাজবংশের একটি বৈশিষ্ট্য ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সাতবাহন রাজগণ মাতার নামেই পরিচিত ছিলেন (দ্রষ্টব্য—গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী, বশিষ্ঠীপুত্র পুলমায়ী, ইত্যাদি)।

সাত □ মগধের পুনরভ্যুদয় ঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান

ভূমিকা

অশোকের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরগণের অযোগ্যতার ফলে অতি বিস্তৃত মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন শুরু হইল। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। শেষপর্যন্ত খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের শেষদিকে পুষ্যমিত্র নামে এক ব্রাহ্মণ সেনাপতি শেষ মৌর্যরাজ বৃহদ্রথকে হত্যা করিয়া শুঙ্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবে মগধ আধিপত্যের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

সুবর্ণযুগ

দীর্ঘ শতাধিক বৎসর পরে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম পর্বে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থানের ভিতর দিয়া মগধ সাম্রাজ্যের পুনরভ্যুদয় ঘটিল। মৌর্যোত্তর যুগের বৈদেশিক আধিপত্যের অবসান করিয়া গুপ্ত সম্রাটগণ সামরিক দক্ষতা ও কূটনৈতিক প্রতিভার মাধ্যমে ভারতের রাজনীতিকে নূতন প্রাণ-চাঞ্চল্যে সঞ্জীবিত করিলেন এবং সমগ্র উত্তর ভারতে ও দক্ষিণ ভারতের এক বৃহৎ অংশকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া প্রাচীন ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। রাজনৈতিক ঐক্য ও শাসনতান্ত্রিক সংহতির ফলশ্রুতি হইল অভূতপূর্ব আর্থিক বিকাশ। এই রাষ্ট্রীয় সাফল্য ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি জাতীয় জীবনে যে উদ্দীপনা সঞ্চার করিল তাহাতে পুষ্ট হইয়া ভারতীয় মনীষা নূতন নূতন সৃষ্টির মাধ্যমে সংস্কৃতিকে করিয়া তুলিল সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত। সমাজ ও সভ্যতার সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্যই গুপ্ত যুগ ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'সুবর্ণ যুগ' বলিয়া পরিচিত।

গুপ্ত শিলালিপি অনুসারে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম মহারাজ শ্রী গুপ্ত। তিনি সম্ভবতঃ মগধ অথবা বঙ্গদেশের অন্তর্গত কোন ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন। পরবর্তী শাসকের নাম ঘটোৎকচ গুপ্ত। তিনিও সম্ভবতঃ স্বাধীন ছিলেন না।

মহারাজাধিরাজ

● **প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ঃ** প্রথম চন্দ্রগুপ্ত আনুমানিক ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিই ছিলেন গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। পাটলীপুত্রে রাজধানী স্থাপন করিয়া তিনি সমগ্র মগধে স্বীয় প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম শক্তির প্রতীক 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। চন্দ্রগুপ্ত প্রাচীন লিচ্ছবী বংশের কন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বৈবাহিক বন্ধন গুপ্তদের রাজনৈতিক প্রাধান্য ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জনে সাহায্য করিয়াছিল। পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি প্রয়াগ (এলাহাবাদ) অযোধ্যা, ও মগধ অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি পুত্র সমুদ্রগুপ্তকে আপন উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন।

● **সমুদ্রগুপ্ত ঃ** 'ভারতের নেপোলিয়ন' নামে খ্যাত সমুদ্রগুপ্ত হইলেন প্রাচীন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য সংগঠক। তাঁহার শাসনকাল আনুমানিক ৩৩০ হইতে ৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল।

সামরিক ক্ষমতার জোরে সমুদ্রগুপ্ত রাজক্ষমতার সাফল্যের উচ্চতম শিখরে উন্নীত হইয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণ রচিত 'এলাহাবাদ প্রশস্তিতে' তাঁহার দিগ্বিজয় কাহিনী উৎকীর্ণ রহিয়াছে। পরাজিত রাজাদের একটি দীর্ঘ তালিকাও সেখানে আছে। প্রশস্তিতে বলা হইয়াছে যে, সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ভারতের রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, নাগসেন, অচ্যুত, গণপতি নাগ, নন্দী, চন্দ্রবর্মণ প্রভৃতি রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিয়া গঙ্গা-যমুনা ও চম্বল নদীর মধ্যবর্তী আর্যাবর্তের এক বিশাল ভূখণ্ডে একচ্ছত্র প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি মধ্যভারতের অরণ্য অঞ্চলের রাজ্যগুলি জয় করিলেন।

দিগ্বিজয়

উত্তর ও মধ্য ভারতে অভিযান সমাপ্ত হইলে সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারতের দিকে দৃষ্টি দিলেন। দাক্ষিণাত্যের যে সকল রাজগণকে তিনি পরাজিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন দক্ষিণ কোশলের রাজা মহেন্দ্র, গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের সালঙ্কায়নরাজ হস্তীবর্মণ, কাঞ্চীর পল্লবরাজ বিষ্ণুগোপ, মহাকান্তারের (দণ্ডকারণ্য অঞ্চলের) ব্যাঘ্ররাজ, পিষ্ঠপুরের (গোদাবরী জেলার পিথাপুরমের) রাজা মহেন্দ্রগিরি প্রভৃতি। কিন্তু এই সকল বিজিত রাজাদের রাজ্য সমুদ্রগুপ্ত স্বীয় রাজ্যভুক্ত না করিয়া স্ব স্ব রাজ্য তাঁহাদের ফেরৎ দিয়া দিলেন। তিনি শুধুমাত্র তাঁহাদের আনুগত্য লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। চিত্তের ঔদার্যের চেয়ে বাস্তববোধ ও রাজনৈতিক জ্ঞানই সমুদ্রগুপ্তের দাক্ষিণাত্য নীতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল।" পাটলীপুত্র হইতে সুদূর দক্ষিণ ভারতকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার বাস্তব অসুবিধা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না।

দক্ষিণ ভারত

আনুগত্য লাভ

এইভাবে উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে নর্মদা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র এবং পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল নদীবেষ্টিত সমগ্র ভূ-ভাগে সমুদ্রগুপ্তের শাসন ও আধিপত্য বিস্তৃত হইল। তাহা ছাড়া, সমতট (দক্ষিণ পূর্ব বাংলা), দভাক (সম্ভবতঃ ঢাকা), কামরূপ (আসাম), নেপাল, কর্তৃপুর (কুমায়ুন ও গাড়োয়াল জেলা) ইত্যাদি সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহ এবং পাঞ্জাব ও মালব অঞ্চলের অর্জুনায়ন, মদ্রক, আভীর প্রভৃতি রাজ্যগুলি সমুদ্রগুপ্তের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিল।

রাজ্যগুলির আনুগত্য

হরিষেণ প্রশস্তি হইতে জানা যায়, সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম ও দক্ষিণে অবস্থিত বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সহিত সমুদ্রগুপ্তের মৈত্রীর সম্পর্ক ছিল। এই রাজ্যগুলির মধ্যে ছিল, পশ্চিম-পাঞ্জাব ও কাবুল উপত্যকার কুষাণ রাজগণ এবং মালব ও সৌরাষ্ট্রের শক-মুরন্দ রাজগণ। সুদূর সিংহলের বৌদ্ধ রাজা মেঘবর্ণ সমুদ্রগুপ্তের আনুগত্য মানিয়া লইয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে বুদ্ধগয়ায় একটি সংঘারাম নির্মাণ করিয়াছিলেন। শোনা যায়, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন শাসকও নাকি গুপ্ত সম্রাটের নিকট উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন।

শক—কুষাণদের সাথে মৈত্রী

সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় নীতি সম্পর্কে দুইটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ, কৌটিল্যের নীতি অনুযায়ী তিনি সকলের উপর সমানভাবে সাম্রাজ্যিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন নাই। দক্ষিণ ভারতের এবং সীমান্ত রাজ্যগুলিকে বিশ্বস্ত করদ রাষ্ট্ররূপে রক্ষা করিয়া তিনি গুপ্ত সাম্রাজ্যকে একটি দৃঢ় ও স্থায়ী ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছিলেন। অপরদিকে, উত্তর পশ্চিম ভারতের গণরাজ্যগুলির ক্ষমতা খর্ব করিয়া সমুদ্রগুপ্ত কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ বিপদের বীজ বপন করিয়াছিলেন। পরবর্তিকালে, হূণ আক্রমণের সময়, এই উপজাতি গণ-রাজ্যগুলি হূণদের বিরুদ্ধে গঙ্গা-উপত্যকার প্রয়োজনীয় রক্ষাব্যূহ হিসাবে তাহাদের দায়িত্ব পালন করিতে পারে নাই।

দিগ্বিজয় নীতির সমালোচনা

যাহা হউক, ভারতব্যাপী দিগ্বিজয় সমাপ্ত হইলে সমুদ্রগুপ্ত প্রাচীন ব্রাহ্মণ রীতি অনুযায়ী অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান পালন করেন। যজ্ঞের স্মারক হিসাবে তিনি এক বিশেষ প্রকারের স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেন। সাম্রাজ্য সংগঠক রূপে কৃতিত্বের পরিচায়ক হিসাবে তিনি 'পরাক্রমাঙ্ক' উপাধিও গ্রহণ করেন। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, কচের মুদ্রার 'সর্বরাজচ্ছেত্তা'রূপ সম্মানসূচক পদটি সমুদ্রগুপ্তের প্রতিই প্রযুক্ত করা হইয়াছে।

অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান ও পরাক্রমাঙ্ক উপাধিগ্রহণ।

সমুদ্রগুপ্ত শুধু একজন দিগ্বিজয়ী বীরই ছিলেন না। তিনি ছিলেন একাধারে সুদক্ষ রাষ্ট্রশাসক ও কূটনৈতিক নেতা এবং অন্যদিকে একজন বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ ও সাহিত্যরসিক পুরুষ। যে বিশাল সাম্রাজ্য তিনি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য তিনি সুষ্ঠু ও জনকল্যাণ মূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্য লিপ্সায় অপরিসীম আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তিনি বাস্তব বিবেচনা শক্তি কখনও পরিত্যাগ করেন নাই! অন্যদিকে, কাব্যসাহিত্যের প্রতিও তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। হরিষেণ তাঁহাকে 'কবিরাজ' (শ্রেষ্ঠ কবি) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। স্বর্ণমুদ্রায় অঙ্কিত তাঁহার বীণাবাদনরত মূর্তি সংগীতানুরাগের পরিচয় বহন করে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী হইলেও অন্যান্য ধর্মের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতার অভাব ছিল না। বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত বসুবন্ধু ছিলেন তাঁহার অন্যতম মন্ত্রী ও সুহৃদ। সংক্ষেপে বলা যায়, বহুগুণমণ্ডিত এক বীর্যবান, বুদ্ধিমান, সংস্কৃতিবান ব্যক্তিরূপে তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়।



সমুদ্রগুপ্ত (মুদ্রা)

কৃতিত্ব

● **দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ঃ** সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সম্ভবতঃ ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৪১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পিতামহের ন্যায় তিনিও বিবাহবন্ধনের মাধ্যমে শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি জনৈক নাগ রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারতের কুন্তল রাজবংশের সহিতও তাঁহার বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। ইহা ছাড়া, বর্তমান বেরার অঞ্চলের পরাক্রান্ত বাকাটক রাজ দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সহিত নিজকন্যা প্রভাবতীদেবীর বিবাহ দিয়াছিলেন। ইহার ফলে, তাঁহার রাজ্যের দক্ষিণসীমা সুরক্ষিত হয় এবং পশ্চিম ভারতের শক ক্ষত্রপগণের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনার পথ সুগম হয়। বিভিন্ন সূত্র হইতে জানা যায়, তিনি পশ্চিম ভারতের শক-শাসকদের পরাভূত করিয়া মালব, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করেন। পশ্চিম উপকূলের সমৃদ্ধিশালী বন্দরগুলি অধিকারভুক্ত হওয়ায় গুপ্ত সাম্রাজ্যের বাণিজ্য প্রসারিত হইয়াছিল। শকশক্তির উচ্ছেদ সাধন করিয়া দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'শকারি' উপাধি গ্রহণ করেন এবং প্রথমে বিদিশা পরে উজ্জয়িনী নগরে একটি বিকল্প রাজধানী স্থাপন করেন।

কূটনৈতিক বিবাহের মাধ্যমে শক্তি বৃদ্ধি।

শকদের বিরুদ্ধে সাফল্য— শকারি উপাধি গ্রহণ

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, বাংলা ও ব্যাকট্রীয় দেশও তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। দক্ষিণের কিছু অংশ বাদ দিলে, প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ এই সময় গুপ্ত সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত ছিল।



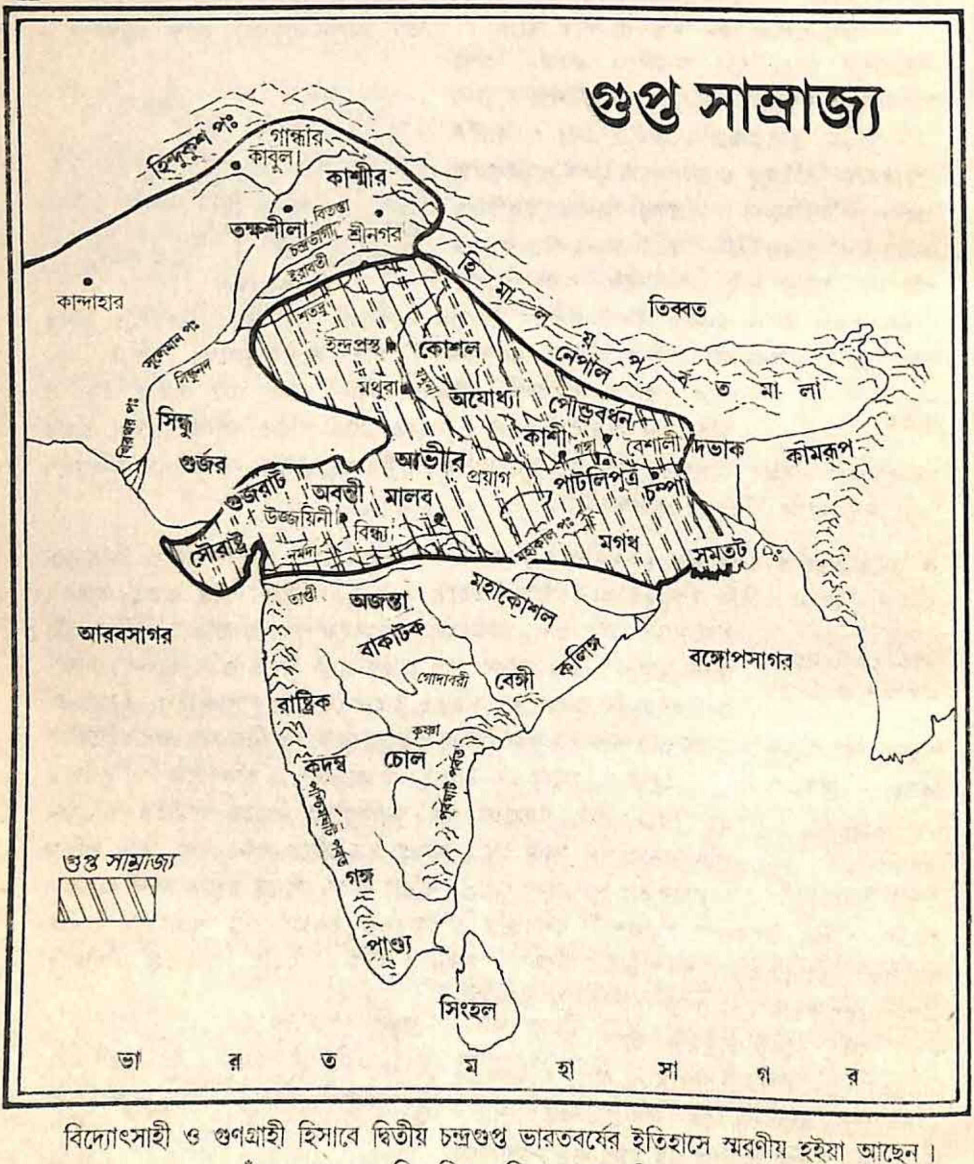
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (মুদ্রা)

সমসাময়িক কোন কোন মুদ্রায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে 'বিক্রমাদিত্য' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ভারতীয় কিংবদন্তীতেও বিক্রমাদিত্যের কীর্তিকাহিনী বর্ণিত

আছে। কিংবদন্তীর নায়ক বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী এবং তিনিও শকদের পরাভূত করিয়া 'শকারি' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নবরত্ন সভার পৃষ্ঠপোষক বলিয়াও পরিচিত ছিলেন। বহু ঐতিহাসিক মনে করেন, ভারতীয় ইতিহাসের

ভারত ব্যাপী সাম্রাজ্য
২য় চন্দ্রগুপ্ত ও বিক্রমাদিত্য একই ব্যক্তি

খ্যাতকীর্তি শাসক দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং উপাখ্যানের নায়ক বিক্রমাদিত্য এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি, কারণ উভয়ের সাফল্যের তালিকা একই রূপ।



বিদ্যোৎসাহী ও গুণগ্রাহী হিসাবে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন। তাঁহার রাজসভা ছিল শিল্প-সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মুখ্য কেন্দ্র। অনুমান করা হয়, প্রাচীন ভারতের কালোত্তীর্ণ কবি ও নাট্যকার কালিদাস তাঁহার রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। কালিদাসের রচনা শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের নয়, বিশ্বসাহিত্যেরও

কৃতিত্ব

অমূল্য সম্পদ। তাঁহার রচিত নাটকাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল, মেঘদূতম্, কুমারসম্ভবম্, রঘুবংশম্ প্রভৃতি কাব্য ও অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটক। কথিত আছে, কালিদাসের সহিত বরাহমিহির, বররুচি, বেতালভট্ট, ঘটকপুর, ধন্বন্তরী, ক্ষপণক, অমর সিংহ ও শংকু সর্বসমেত এই নয় জন মনীষী তাঁহার রাজসভায় উপস্থিত থাকিতেন। অবশ্য ইঁহারা সকলেই একই সময়ে অবস্থান করিয়াছিলেন কি না সেই বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে।

কালিদাস—নবরত্ন সভা

● **ফা-হিয়েনের বিবরণী** ঃ গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালেও চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি তৎকালীন ভারতের সমাজ ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বহুমূল্যবান তথ্য তাঁহার 'ফো-কুয়ো-কিং' গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে গুপ্ত শাসনব্যবস্থার সৌকর্য, সমাজজীবনের শান্তি, সৌষ্ঠব ও সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

ফা-হিয়েন তিন বৎসর রাজধানী পাটলীপুত্র নগরীতে বাস করিয়াছিলেন। সেখানে মৌর্য সম্রাট অশোকের রাজপ্রাসাদ তখনও সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যায় নাই। চৈনিক পরিব্রাজক এই প্রাসাদের গঠন-নৈপুণ্যে সপ্রশংস বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। অন্যদিকে, রাজধানীর সমকালীন নাগরিকদের স্বচ্ছল জীবনযাত্রার উজ্জ্বল চিত্রও ফা-হিয়েনের বর্ণনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। অর্থবান ব্যক্তিদের সামাজিক চেতনার কথাও তিনি বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি শহরের ধনীদের আর্থিক সাহায্যে নির্মিত ও পরিচালিত একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মথুরা নগরী দেখিয়াও ফা-হিয়েন মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধদের পীঠস্থান কপিলাবস্তু, কুশীনগর, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি স্থানের জনস্বল্পতা ও দুর্দশা দেখিয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন।

ফা-হিয়েনের মতে মধ্যদেশ (অর্থাৎ মথুরার দক্ষিণাঞ্চল) ছিল সুশাসিত। জনসাধারণ ছিলেন সুখী ও সমৃদ্ধশালী, জীবনযাত্রা ছিল নিরুপদ্রব, স্বাধীন এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত। দণ্ডবিধি তেমন কঠোর ছিল না। শুধু রাজদ্রোহের শাস্তি হিসাবে অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল, অন্যথায়, অপরাধের জন্য শুধু জরিমানা আদায় করা হইত। রাজস্বের চাপ ছিল। উৎপাদনের একাংশ কর হিসাবে ধার্য হইত। চণ্ডাল ব্যতীত অন্যান্য জনগণ ছিলেন নিরামিষভোজী এবং অহিংসনীতির অনুরাগী। চণ্ডাল ও নীচ জাতির উপর অবশ্য সামাজিক নিপীড়ন বজায় ছিল। ফা-হিয়েনের মতে, ভারতে অস্পৃশ্যতা ছিল এক অভিশাপ।

ফা-হিয়েন মোট এগার বৎসর ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বাংলার তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন।

● **প্রথম কুমারগুপ্ত** ঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রথম কুমারগুপ্ত 'মহেন্দ্রাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করিয়া দীর্ঘ ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। ৪১৫-৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দব্যাপী তাঁহার রাজত্বকালে অসামান্য গুরুত্বের কোনও ঘটনা ঘটে নাই। তাঁহার মুদ্রা ও অনুশাসনগুলির প্রাপ্তিস্থান বিচার করিয়া অনুমান করা হয় যে, তিনি সাম্রাজ্যের সীমা ও সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কুমারগুপ্ত ছিলেন শৈব-ধর্মাবলম্বী। তাঁহার রাজত্বকালে স্বর্ণমুদ্রায় শিবপুত্র কার্তিকের প্রতিকৃতি এবং রৌপ্য মুদ্রায় গরূড়ের পরিবর্তে ময়ূরের প্রতিকৃতি মুদ্রিত ছিল। তাঁহার রাজত্বের শেষদিকে 'পুষ্যমিত্র' নামে এক বর্বর জাতি গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত ইহা প্রতিরোধ করেন।

● **স্কন্দগুপ্ত** ঃ পরবর্তী রাজা স্কন্দগুপ্ত ছিলেন গুপ্তবংশের সর্বশেষ শক্তিশালী শাসক। সম্ভবতঃ ৪৫৫ হইতে ৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। যুবরাজ অবস্থায় তিনি পুষ্যমিত্রের আক্রমণ প্রতিহত করেন। অন্যদিকে, তাঁহার সিংহাসন আরোহণের অব্যবহিত পরে গুপ্ত সাম্রাজ্য এক বিপদের সম্মুখীন হয়। মধ্য এশিয়া হইতে আগত হূণ নামে এক দুর্ধর্ষ জাতি গুপ্ত সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন করিবার আশংকার সৃষ্টি করে। অসীম বীরত্বের সহিত স্কন্দগুপ্ত শক্তিশালী বিদেশী শত্রুকে পরাভূত করিয়া সাম্রাজ্যের শক্তি, সংহতি ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তর ন্যায় স্কন্দগুপ্তও 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিষ্ণুর উপাসক হইলেও পূর্বসূরীদের পরধর্মসহিষ্ণুতার নীতি তাঁহার রাজত্বকালেও অনুসৃত হইয়াছিল।

● **গুপ্ত শাসনব্যবস্থা** ঃ গুপ্তযুগের শিলালিপি, মুদ্রা ও ফ-হিয়েন-এর বিবরণ হইতে গুপ্ত শাসনব্যবস্থার তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইয়াছে।

শাসননীতির ক্ষেত্রে গুপ্ত সম্রাটগণ ঐশ্বরিক ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তকে ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবের প্রভৃতি দেবগণের সমতুল্য ('ধনদাবরুণেন্দ্র-অন্তকাসম') বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। রাজার ক্ষমতা ছিল সীমাহীন। নীতি নির্ধারণ, আইন প্রণয়ন, সামরিক বিভাগ পরিচালন ইত্যাদি সমস্ত দায়িত্ব ও অধিকার এককভাবে সম্রাটের হস্তে কেন্দ্রীভূত ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং তাঁহার নিকট দায়ী থাকিতেন। সম্রাটের পদ বংশানুক্রমিক ছিল। কিন্তু রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হইলেও গুপ্ত শাসকগণ রাজকর্তব্য পালনে ও প্রজাকল্যাণ সাধনে বিরত থাকিতেন না। শাসনবিভাগের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বহু রাজকর্মচারী ছিলেন। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মন্ত্রীন, মহাবলাধিকৃত (প্রধান সেনাপতি), মহাদণ্ডনায়ক (প্রধান বিচারপতি), মহাপ্রতিহার (প্রাসাদ-রক্ষক), সন্ধি বিগ্রহিক (পররাষ্ট্র বিভাগের অধিকর্তা) ইত্যাদি।

রাজপরিবারভুক্ত যুবরাজদের উপর নানা দায়িত্ব অর্পিত হইত। বস্তুতঃ গুপ্ত শাসনব্যবস্থায় সম্রাটের পরেই যুবরাজের স্থান ছিল।

গুপ্ত সাম্রাজ্য কেন্দ্রীভূত থাকিলেও শাসনকার্যের সুবিধার জন্য উহা আঞ্চলিকভাবে বিভক্ত ছিল—যথা 'দেশ', 'ভুক্তি', 'মণ্ডল', 'গ্রাম' ইত্যাদি। প্রদেশগুলিকে বলা হইত 'দেশ' বা 'ভুক্তি'। উহা বিভক্ত ছিল জেলা বা 'বিষয়ে'। কয়েকটি 'বীথি' বা মহারথ লইয়া বিষয় গঠিত ছিল, সর্বনিম্নে ছিল গ্রাম। প্রাদেশিক শাসন পরিচালিত হইত 'উপরিক', 'বিষয়পতি' প্রভৃতি উপাধিধারী রাজকর্মচারীদের সাহায্যে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের মধ্যে যোগসূত্র স্বরূপ ছিলেন 'কুমারামত্য' এবং 'অযুক্ত' নামধারী রাজকর্মচারিগণ। গুপ্ত যুগে সামরিক এবং বেসামরিক বিভাগে কোন পার্থক্য ছিল না। গুপ্ত যুগে গ্রামের শাসন পরিচালনায় জনসাধারণের অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা ও সুযোগ ছিল।

রাজস্বের হার বিশেষ উৎপীড়ক ছিল না। সমস্ত প্রকার সম্পত্তি এবং আয়ের উপর কর ধার্য করা হইলেও ভূমিরাজস্ব ছিল আয়ের প্রধান উৎস। উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ রাজকর-রূপে গৃহীত হইত। গুপ্ত যুগে দণ্ডবিধির কঠোরতাও হ্রাস পাইয়াছিল।

গুপ্ত যুগে জনগণের অর্থনৈতিক মান যথেষ্ট উন্নত ছিল। সুশাসন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলশ্রুতি ছিল এই সমৃদ্ধি। ফা-হিয়েন তৎকালীন ভারতের আর্থিক বিকাশের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

সংক্ষেপে বলা যায়, গুপ্ত শাসনব্যবস্থার চরিত্র ছিল প্রজাহিতৈষী স্বৈরতন্ত্র এবং শাসন প্রণালী ছিল সুনিয়ন্ত্রিত ও সুগঠিত। বিচার ব্যবস্থা ছিল উদার ও মানবধর্মী। কেন্দ্রীভূত শাসনের সঙ্গে সঙ্গে বিকেন্দ্রীকরণের এবং নিম্নতম পর্যায়ে শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের অংশগ্রহণের নীতিও অনুসৃত হইয়াছিল। ধর্মীয় উদারতা ও স্বাধীনতা এবং সাংস্কৃতিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনও গুপ্ত শাসনব্যবস্থার মূল্যবান বৈশিষ্ট্য।

● গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ●

স্কন্দ গুপ্তের মৃত্যুর পর হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। স্কন্দগুপ্তের পরবর্তী শাসক পুরগুপ্তের রাজত্বকালে সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে গুপ্ত আধিপত্য শিথিল হইয়া যায়। পুরগুপ্তের পর তাঁহার পুত্র নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য অল্প কিছুকাল শাসন করেন। পরবর্তী শাসক দ্বিতীয় কুমারগুপ্তও ছিলেন দুর্বল চিত্তের মানুষ। অতঃপর সিংহাসনে আরোহণ করেন বুধগুপ্ত। তিনি প্রায় বিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার

আমলে গুপ্ত সাম্রাজ্য উত্তরবঙ্গ হইতে মালব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সময় হইতে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ কেন্দ্রীয় শাসনকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে শুরু করেন। বুধগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন দ্রুততর হইতে থাকে। অযোগ্য শাসন, সিংহাসন লইয়া দ্বন্দ্ব এবং বৈদেশিক (হূণ) আক্রমণ সম্মিলিতভাবে একদা-সমৃদ্ধ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন সংঘটিত করিল।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের চারিটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, যথা—অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, বহিরাগত প্রচণ্ড আক্রমণ, প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের উত্থান এবং গুপ্ত রাজপরিবারের আত্মকলহ।

পুষ্যমিত্র জাতির আক্রমণকে ডঃ রায়চৌধুরী গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সূচনাকারী ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষদিকে নর্মদা উপত্যকার অধিবাসী দুর্ধর্ষ উপজাতি পুষ্যমিত্রগণ গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত এই আক্রমণকে প্রতিহত করিতে পারিলেও পুষ্যমিত্র-বিদ্রোহ সাম্রাজ্যের শক্তি ও ঐক্যের ভিত্তিকে গভীরভাবে নাড়া দিয়াছিল। স্কন্দগুপ্তের শাসনকালে হূণ জাতির আক্রমণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে আরও দুর্বল করিয়া দিয়াছিল। স্কন্দগুপ্ত হূণ আক্রমণ খর্ব করিতে সক্ষম হইলেও উহা সম্পূর্ণ নির্মূল করিতে পারেন নাই। পরবর্তিকালে তোরমান এবং মিহিরকুলের নেতৃত্বে হূণগণ বারংবার গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া সাম্রাজ্যের অর্থ ও শক্তি ক্ষুণ্ণ করিয়া দেয়। অবশ্য ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ আধুনিক ঐতিহাসিকগণ হূণ আক্রমণকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের মতে, আক্রমণকারিগণ ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইলেও, ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে বলা যায় হূণ আক্রমণ নিঃসন্দেহে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সংহতি ও একতাকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল।

স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত সম্রাটদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া শাসনাধীন অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত শাসকরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া স্বাধীন হইয়া যান। ইঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন মালবের যশোধর্মন এবং বলভীর মৈত্রক বংশ, কনৌজের মৌখরি রাজবংশ এবং গৌড়ের রাজবংশ। সর্বপ্রথম মৈত্রকগণ সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে গুপ্ত শাসন অগ্রাহ্য করিয়া নিজেদের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেন। কিন্তু মালবের শাসনকেন্দ্র মান্দাশোরের শাসনকর্তা যশোধর্মনের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনকে অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছিল। যশোধর্মন হূণদের পরাজিত করিয়া আপন সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসাবে 'বিজয়স্তম্ভ' নির্মাণ এবং স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। বিহার ও উত্তরপ্রদেশের গাঙ্গেয় উপত্যকায় মৌখরীগণ গুপ্ত শাসন অস্বীকার করিয়া স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশও গুপ্ত সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

এইভাবে নানাবিধ কারণে গুপ্ত সাম্রাজ্যে যখন চরম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত হইয়াছে, তখন স্কন্দগুপ্তের পরবর্তী শাসকগণ সাম্রাজ্যের শক্তির অবনমন রোধ করিবার পরিবর্তে সংকীর্ণ স্বার্থবোধ ও ষড়যন্ত্রে এবং কলহে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ফলে, যাহা অনিবার্য তাহাই ঘটিল। দুর্বল বংশধরদের অযোগ্যতায় প্রাচীন যুগের অন্যতম বৃহৎ এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা সাফল্যমণ্ডিত সাম্রাজ্যের পতন ঘটিল। "কৃষ্ণপক্ষে সূর্যাস্তের পর অন্ধকার যখন নামে, তখন তা অচিরেই গভীর অন্ধকারে পর্যবসিত হয়। গুপ্ত রাজ্যের গরিমা সেই ঘনান্ধকারে অবলুপ্ত হইয়া গেল।"

● গুপ্ত যুগের সমাজ ও সভ্যতা ●

"সুশাসন, সামাজিক সংহতি, মানসিক সম্পদ ও অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের ক্ষেত্রে গুপ্ত যুগ-প্রতিভার দীপ্তির ধারা বিশেষভাবে উজ্জ্বল।" সর্বক্ষেত্রে এই অসামান্য সাফল্যের জন্য গুপ্ত যুগকে ভারত-ইতিহাসের 'সুবর্ণযুগ' বলিয়া অভিহিত করা হয়। ঐতিহাসিক বার্নেট (Barnet) মন্তব্য করিয়াছেন, "গ্রীসের ইতিহাসে পেরিক্লিসের যুগ যে গৌরবময় আসনের অধিকারী, ভারতবর্ষের ইতিহাসে

গুপ্তযুগ সেই মহৎ ঐতিহ্যের অধিকারী।" ডঃ স্মিথ গুপ্তযুগকে ইংল্যান্ডের ইতিহাসের গৌরবদীপ্ত এলিজাবেথীয় যুগের গোত্রীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রোম সম্রাট অগাস্টাসের শাসনকালের সহিতও গুপ্তযুগকে তুলনা করা হইয়াছে। সাফল্যের নিরিখে, বিভিন্ন দেশের ও কালের শ্রেষ্ঠতম যুগের সহিত গুপ্তযুগের তুলনা অযৌক্তিক নয়। বস্তুতঃপক্ষে, ভারতীয় কৃষ্টির সফল, সার্থক, সুন্দর ও শোভন বিকাশের জন্য গুপ্তযুগ ভারতবর্ষের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

● **সমাজ ঃ** গুপ্তযুগের সমাজ বর্ণভেদ প্রথা ও চতুরাশ্রমের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিলেও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ ও আহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল না। বৃত্তির ক্ষেত্রেও সর্বদা জাতিগত জীবিকা গ্রহণ করা হইত না। ক্ষত্রিয় গুপ্ত বংশের সহিত ব্রাহ্মণ বাকাটক ও কদম্ব বংশের বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অপরদিকে ব্রাহ্মণগণ অনেক ক্ষেত্রে রাজকর্মচারীর পদগ্রহণ করিতেন এবং ক্ষত্রিয়গণও ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করিতেন।

গুপ্ত যুগে নারীর অধিকার পূর্বের তুলনায় সংকুচিত হইয়াছিল। কিন্তু সমাজে তাঁহারা বিশেষ মর্যাদা ও শ্রদ্ধার আসনে আসীন ছিলেন। রাজপরিবারে ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে নারী শিক্ষার প্রচলন ছিল। সমুদ্রগুপ্তের কন্যা প্রভাবতী দেবী ছিলেন সুশিক্ষিতা এবং স্বামীর মৃত্যুর পর নাবালক সন্তানের অভিভাবিকা হিসাবে তিনি শাসনকার্যও পরিচালনা করিয়াছিলেন। সতীদাহ প্রথা প্রচলিত থাকিলেও তাহা বিরল ছিল। বিধবা বিবাহ কদাচিৎ ঘটিত।

গুপ্ত যুগে দাস প্রথা চালু ছিল, যদিও তাহার কঠোরতা অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছিল। ফা-হিয়েনের বিবরণী হইতে জানা যায়, এই যুগের সমাজের অপর একটি প্রধান দুর্বলতা ছিল অস্পৃশ্যতা। নগরের বাহিরে বসবাসকারী চণ্ডালগণ শহরে প্রবেশ করিবার সময় কাষ্ঠখণ্ডে আওয়াজ করিয়া আপনাদের উপস্থিতি প্রকাশ করিত যাহাতে উহাদের স্পর্শ উচ্চবর্ণের মানুষকে অশুচি না করিতে পারে। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের উচ্চবর্ণের মানুষের মধ্যে অবশ্য সদ্ভাব ও সহনশীলতা বর্তমান ছিল।

গুপ্ত যুগে নাগরিক সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন সমকালীন ভারতবাসীর সত্যবাদিতা, দানশীলতা, সংযম ও চরিত্র মাধুর্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

● **অর্থনৈতিক বিকাশ ঃ** শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারে গুপ্ত যুগ অর্থনৈতিক প্রাচুর্যে বিকশিত হইয়াছিল। কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে হওয়ায় দেশে যেমন খাদ্যাভাব ছিল না, তেমনি বাণিজ্যেরও ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছিল। সুমাত্রা, জাভা, চীন এবং মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া এবং রোমান সাম্রাজ্যের সহিত এই সময় ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। গুপ্ত যুগের সমৃদ্ধ বন্দরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, পশ্চিম উপকূলে ভারত ও ক্যাম্বে এবং পূর্ব উপকূলে তাম্রলিপ্তি বন্দর।

গুপ্ত যুগে বিভিন্ন প্রকার শিল্পের বিকাশ ঘটিয়াছিল। বস্ত্রবয়ন ছিল প্রধানতম শিল্প। গুজরাট, বাংলা, দক্ষিণ ভারত প্রভৃতি অঞ্চল বস্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। ইহা ছাড়া, ধাতু, চর্ম ও লৌহ শিল্পও উল্লেখযোগ্য ছিল। দিল্লীর কুতুবমিনারের নিকটস্থ লৌহস্তম্ভ গুপ্ত ধাতবশিল্পের চরম উৎকর্ষতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া রৌদ্র ও বৃষ্টির আক্রমণ সত্ত্বেও আজিও ইহাতে মরিচা ধরে নাই। এই সময় বণিক ও শ্রমশিল্পীদের মধ্যে 'নিগম' অর্থাৎ 'শ্রেণী' বা 'সমিতি' বর্তমান ছিল। গুপ্তযুগে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রার প্রচলন ছিল। অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্মারক হিসাবে এই সময় বহু শহর ও নগরের উদ্ভব হইয়াছিল।

● **সংস্কৃতি ঃ** সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গুপ্তযুগ ছিল সুবর্ণযুগ। এই যুগে সংস্কৃত শিক্ষা ও সাহিত্যের চরম সমৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার কালিদাসের আবির্ভাব এই যুগে। তাঁহার রচিত 'রঘুবংশম', 'কুমারসম্ভবম', 'মেঘদূতম্' প্রভৃতি কাব্য এবং

'মালবিকা-অগ্নিমিত্রম', 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' প্রভৃতি নাটক ভারতীয় সাহিত্যের চিরায়ত সম্পদ। 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের রচয়িতা শূদ্রক, এবং 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকের লেখক বিশাখদত্তও এই যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, 'কিরাতার্জ্জুনীয়ম্' কাব্য রচনাকারী ভারবি এবং 'ভট্টিকাব্যে'র রচয়িতা ভট্টিও গুপ্তযুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণ এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভাকবি বীরষেণও খ্যাতনামা কবি হিসাবে প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন। হরিষেণ বিরচিত 'এলাহাবাদ প্রশস্তি' হইতে সমুদ্রগুপ্তের পরধর্ম-সহিষ্ণুতা, পরাক্রম ও বহুমুখী প্রতিভার কথা জানা যায়। স্বয়ং সমুদ্রগুপ্তও কবিতা রচনায় ও বীণাবাদনে যশ ও খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি 'কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। এই যুগেই রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণসমূহের নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। অনুমান করা হয়, সংস্কৃত গ্রন্থ 'পঞ্চতন্ত্র' এই সময়েই রচিত হইয়াছিল। সাহিত্যের এই ব্যাপক বিকাশের জন্যই গুপ্ত যুগকে গ্রীক ইতিহাসের 'পেরিক্লিয়াস' এবং ইংল্যান্ডের ইতিহাসের 'এলিজাবেথীয়' যুগের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, পেরিক্লিসের আমলে বিশিষ্ট মনীষিদের মধ্যে ছিলেন ইস্কাইলাস, সফোক্লিশ প্রমুখ নাট্যকার, সক্রেটিসের মত দার্শনিক এবং এলিজাবেথের রাজত্বকালেই ইংরেজী ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার উইলিয়াম সেক্সপীয়রের আবির্ভাব।

গুপ্ত যুগে দর্শন শাস্ত্রেরও ব্যাপক চর্চা হইয়াছিল যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ কাত্যায়ন ও বৃহস্পতি প্রণীত স্মৃতি শাস্ত্রগুলি সম্ভবতঃ এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। এই যুগের বিশিষ্ট দার্শনিকদের মধ্যে ছিলেন বসুবন্ধু।

বিজ্ঞানচর্চায়, গুপ্তযুগের কীর্তি বিশেষভাবে সমুজ্জ্বল। দশমিক অঙ্ক লিখন পদ্ধতি এই যুগেরই আবিষ্কার। আর্যভট্ট ও বরাহমিহির এই গণনা প্রণালীর প্রথম প্রয়োগ করিয়াছিলেন। বরাহমিহিরের রচিত বিশিষ্ট বিজ্ঞান গ্রন্থদ্বয়ের নাম, 'বৃহৎ-সংহিতা' ও 'পঞ্চসিদ্ধান্ত'। তিনি ছিলেন জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। পদার্থবিজ্ঞানী ও গণিতবিদ আর্যভট্ট ছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানের জন্মদাতা। তাঁহার 'আর্যভট্টিয়ম' একটি অসামান্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। তিনিই আবিষ্কার করিয়াছিলেন, পৃথিবী আপন কক্ষপথে সূর্যকে বৃত্তাকারে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের কারণও তিনি বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। গণিতবিদ ব্রহ্মগুপ্ত আধুনিক পাটিগণিতের অন্যতম স্রষ্টা ছিলেন। বিজ্ঞানের অভিধান রচয়িতা অমর সিংহ এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ধন্বন্তরীও গুপ্তযুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এককথায়, এই সময় পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, ধাতুবিদ্যা, আয়ুর্বেদশাস্ত্র প্রভৃতি বিজ্ঞানের সমস্ত চর্চারই অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটিয়াছিল। গুপ্তযুগের বিজ্ঞানীরা বিদেশী বৈজ্ঞানিক তথ্য বা তত্ত্ব হইতে জ্ঞান অর্জন করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না।

গুপ্ত যুগের শিল্পকলার প্রসঙ্গে ডঃ স্মিথ বলিয়াছেন, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কন তিনটি শিল্পকলাই উন্নতির শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। অধিকাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও দেওগড়ের (ঝাঁসি জেলায়) প্রস্তর নির্মিত দশাবতার মন্দির এবং ভিতরগাঁওয়ের (কানপুর জেলায়) ইষ্টক নির্মিত মন্দিরের নিদর্শন হইতে গুপ্ত স্থাপত্য শিল্পের চমকপ্রদ বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্প পণ্ডিতদের মতে, প্রস্তর দ্বারা মন্দির নির্মাণের কৌশল গুপ্ত যুগেই শুরু হয়। প্রখ্যাত শিল্প-সমালোচক পার্সী ব্রাউন (Percy Brown) অনুসরণ মূলক শিল্পসৃষ্টির পরিবর্তে সৃজনশীল স্বাধীন শিল্পের প্রবর্তনের জন্য গুপ্তযুগের শিল্পরীতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

শিল্পকথা

গুপ্ত সম্রাটদের আনুকূল্যে ভাস্কর্য শিল্পেরও অভাবনীয় বিকাশ ঘটে। গুপ্ত ভাস্কর্য শিল্পে সমকালীন আধ্যাত্মিক চেতনা প্রতিফলিত হইয়াছে। দেওগড়ের মন্দিরের গাত্রে শিবের যে যোগী মূর্তিটি রূপায়িত হইয়াছে, ডঃ স্মিথ তাহাকে 'ভারতীয় শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তিরূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। দেওগড় মন্দিরের এবং মথুরার বিষ্ণুমূর্তি দুইটি গুপ্ত ভাস্কর্যের অপরূপ নিদর্শন। সারনাথের ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ, মথুরার দণ্ডায়মান বুদ্ধ এবং সুলতানগঞ্জের ধাতব বুদ্ধ মূর্তি

অধ্যাত্মিক শিল্পবিকাশ

বৌদ্ধ ভাস্কর্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। গুপ্ত ভাস্কর্য শিল্প পূর্ববর্তী গান্ধার শিল্পের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। এই যুগের শিল্পীগণ একান্তভাবে ভারতীয় শিল্পধারা অনুসরণ করিয়াছিলেন।

গুহাচিত্র

পাহাড় খোদাই করিয়া গুহা নির্মাণ ছিল গুপ্ত ভাস্কর্যের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। গুহার দেওয়ালগুলি চিত্র দ্বারা সুশোভিত ছিল। বিশ্ববিশ্রুত অজন্তা গুহার যে সমস্ত চিত্রাবলী আবহমানকাল ধরিয়া শিল্পরসিকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া চলিয়াছে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ছিল গুপ্ত যুগের। বাঘ গুহার চিত্রেও গুপ্ত চিত্রশিল্পের গৌরবময় পরিচয় পাওয়া যায়। এই গুহা চিত্রগুলি ছিল বাস্তবের প্রতিচ্ছবি। ইউরোপীয় শিল্প-রসিকগণ মন্তব্য করিয়াছেন, "গুপ্তযুগের চিত্রগুলি রেনেসাঁস যুগের ইউরোপের শ্রেষ্ঠ প্রাচীর চিত্রগুলির সমতুল্য।"

উপাসনা

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিবর্তনের ইতিহাসে গুপ্তযুগ অবিস্মরণীয়। এই যুগে বৈদিক দেবতাদের পরিবর্তে বিষ্ণু, শিব, কার্তিকেয়, সূর্য, পার্বতী ও লক্ষ্মীর উপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল। ব্যক্তিগতভাবে গুপ্ত সম্রাটগণ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। তাঁহারা 'পরমভাগবত' বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়াছিলেন। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ অবশ্য বলেন, গুপ্ত শাসকরা শিব ও অন্যান্য দেবতাদেরও উপাসনা করিতেন। তাঁহাদের মুদ্রায় বিষ্ণুর বাহন গরুড় এবং শিবের বাহন বৃষের প্রতিচ্ছবি—দুইই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময় শক্তির আরাধনারও প্রচলন ছিল। গুপ্ত যুগেই আধুনিক ব্রাহ্মণ্য (হিন্দু) ধর্ম গড়িয়া উঠে। এই সময়ই স্মৃতিশাস্ত্রগুলি সংকলিত হইয়াছিল।

গুপ্তযুগের ধর্মজীবনে ভক্তিবাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে, ধর্মীয় উদারতা ও ধর্মসহিষ্ণুতার আদর্শও তৎকালে অনুসৃত হইয়াছিল। ফা-হিয়েনের বিবরণীতে ধর্মজীবনের সহিষ্ণুতার উল্লেখ আছে। চৈনিক পরিব্রাজক বলিয়াছেন, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত হিন্দু ধর্মাবলম্বী হইলেও, পরধর্মের প্রতি কোন বিদ্বেষ মনোভাব পোষণ করিতেন না। সমুদ্রগুপ্ত সিংহলরাজ মেঘবর্ণকে বুদ্ধগয়ায় বৌদ্ধবিহার নির্মাণের অনুমতি দিয়াছিলেন।

গুপ্ত সম্রাটগণের আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছিল। পাটলীপুত্র, উজ্জয়িনী প্রভৃতি স্থান ছিল সেই যুগের বিখ্যাত শিক্ষা-কেন্দ্র। গুপ্ত সম্রাটগণের বদান্যতাতেই বিশ্ব-খ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হয়।

সংস্কৃত সাহিত্যের বিকাশ

কোন কোন ঐতিহাসিক গুপ্তযুগকে সংস্কৃত সাহিত্যের ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনর্জন্মের যুগ (Renaissance) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই মূল্যায়ন ইতিহাস-সম্মত নয়। কারণ, প্রাক্ গুপ্ত যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা অব্যাহতভাবে চলিয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মৌর্য আমলের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'অর্থশাস্ত্র' (কৌটিল্য বা চাণক্য রচিত), মৌর্য পরবর্তী শুঙ্গ আমলের পতঞ্জলী শাস্ত্রীর 'মহাভাষ্য' এবং শক্‌রাজ রুদ্রদামনের 'জুনাগড় শিলালিপি' সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত হইয়াছিল। কণিষ্কের রাজত্বকালে আহূত বৌদ্ধ মহাসম্মেলনের আলোচনা ও বিতর্ক এবং বৌদ্ধ ধর্মের টীকা ও ব্যাখ্যা সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই পরিচালিত হইয়াছিল। কণিষ্কের সমসাময়িক সাহিত্যিক, দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের রচনা সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। সাহিত্য সমালোচকগণ মনে করেন, গুপ্ত যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের উৎকর্ষতা ধারাবাহিক চর্চার পরিশীলিত রূপ। অন্যদিকে, বৌদ্ধধর্মের চরম বিকাশকালেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিলুপ্তি ঘটে নাই। অশোকের প্রচারের দ্বারা হিন্দুধর্ম আক্রান্ত হয় নাই। মৌর্য পরবর্তী ভারতীয় রাজন্যবর্গ অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এইরূপ তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। শক, গ্রীক, পহ্লব ও কুষাণ শাসকগণের অনেকেই শিব ও বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। অবশ্য ইহা সত্য যে, গুপ্ত যুগে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিকাশের চরমে পৌঁছিয়াছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরও এই সময় নব রূপায়ণ ঘটিয়াছিল। এই সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে গুপ্তযুগকে সংস্কৃত সাহিত্যের ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের **'পুনর্বিকাশের যুগ'** না বলিয়া **'পূর্ণ বিকাশের যুগ'** বলা অধিকতর সঙ্গত।

ষষ্ঠ অধ্যায় আঞ্চলিক আধিপত্যের সংগ্রাম

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ উত্তর ভারত

এক □ হূণ আক্রমণ

হূণ আক্রমণ ঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে মধ্য এশিয়ার হিউংনু নামে এক বর্বর যাযাবর জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। ভারতীয় সাহিত্যে ইহারাই হূণ নামে পরিচিত ; কিন্তু গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্ত এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া আপন সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্কন্দগুপ্তর মৃত্যুর পর নানা কারণে গুপ্ত সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পাড়লে হূণগণ নূতন করিয়া ভারতবর্ষে অভিযান শুরু করিয়া দিল। অতঃপর পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে, তোরমান নামে এক নায়কের নেতৃত্বে হূণগণ ভারতে রাজ্যবিস্তারে প্রথম সাফল্য অর্জন করে। তাঁহার মুদ্রা হইতে জানা যায়, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের কতকাংশ তাহার রাজ্যভুক্ত ছিল।

তোরমান

তোরমানের পুত্র মিহিরকুল ভারতবর্ষে হূণ সাম্রাজ্যের বিস্তার সাধন করেন। সম্ভবতঃ গান্ধার, কাশ্মীর, দক্ষিণ ভারত ও সিংহল তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। সাকলা বা বর্তমান শিয়ালকোট ছিল মিহিরকুলের রাজধানী। মিহিরকুল নৃশংস স্বৈরাচারী শাসক হিসাবে ইতিহাসে কুখ্যাত। হিউয়েন সাং তাঁহাকে বৌদ্ধধর্মের শত্রু ও উৎপীড়ক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। শোনা যায়, গুপ্ত বংশীয় রাজা বালাদিত্য মিহিরকুলকে পরাজিত করিলে তিনি কাশ্মীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন. পরবর্তিকালে মধ্য-ভারতে রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হইলে মিহিরকুল মান্দাশোরের (মালব) অধিপতি যশোধর্মনের নিকট পুনরায় ৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পরাজিত হন। এই পরাজয়ের ফলে হূণশক্তি চূড়ান্তভাবে ধ্বংস হয়। কালক্রমে এই দুর্ধর্ষ বর্বরজাতি ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

মিহিরকুল

● **যশোধর্মন (আঃ ৫৩০-৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ** গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর হইতে আরম্ভ করিয়া হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত সেই যুগে দুইজন অনন্যসাধারণ পুরুষ ভারত-ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া অসামান্য প্রতিভার দীপ্তি বিকিরণ করিয়া ধূমকেতুর মত বিলীন হইয়া যান। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম হইলেন যশোধর্মন এবং দ্বিতীয় জন শশাঙ্ক।

মালবরাজ যশোধর্মন সমগ্র আর্যাবর্তে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল দশপুর (বর্তমান মান্দাশোর)। মান্দাশোরে প্রাপ্ত একটি অনুশাসন লিপি হইতে জানা যায়, ব্রহ্মপুত্র হইতে পশ্চিম সাগর এবং হিমালয় হইতে পূর্বঘাট পর্যন্ত এক বিস্তৃত অঞ্চলে তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার শক্তির নিকট 'অপরাজেয়' মিহিরকুলও মস্তক অবনত করিয়াছিলেন।

অনেকের মতে যশোধর্মন ও 'শকারি বিক্রমাদিত্য' ছিলেন অভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু এই ধারণা অমূলক।

কারণ, যশোধর্মন কখনও 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন শক হূণগণ। উজ্জয়িনীও কোনদিন তাঁহার রাজধানী ছিল না। যাহা হউক, যশোধর্মন দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য তাঁহার অন্তর্ধানের সহিত বিলীন হইয়াছিল।

দুই □ শশাঙ্কের নেতৃত্বে স্বাধীন গৌড় রাজ্যের উত্থান

● **শশাঙ্ক ঃ** ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলিয়াছেন যে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক হইতেই গৌড় জনপদ স্বাতন্ত্র্যাভিলাষী হইয়া উঠিয়াছিল। কালক্রমে সপ্তম শতকের প্রারম্ভে জনৈক শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্কর উত্থানে গৌড় স্বাধীন রাজ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং উত্তর ভারতের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট অধ্যায় রচনা করে। বাংলার এই প্রথম সার্বভৌম নরপতির জীবন ও কার্যক্রমের ইতিবৃত্তের সকল তথ্য এখনও উদ্ঘাটিত হয় নাই। যে সমস্ত উপাদানের ভিত্তিতে—সমসাময়িক লিপিমালা, বাণভট্টের 'হর্ষচরিত', হিউয়েন সাঙের বিবরণী ও বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে—শশাঙ্কর ইতিহাস রচনা করা হইয়াছে দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা তাঁহার কৃতিত্ব বিচারে নিরপেক্ষতার পরিচয় দিতে পারে নাই।

ভূমিকা

শশাঙ্কর প্রথম পরিচয় মহাসামন্তরূপে। সম্ভবতঃ মগধ ও গৌড়ের গুপ্তবংশীয় মহাসেন গুপ্ত তাঁহার অধিরাজ ছিলেন। যাহা হউক, খ্রীষ্টীয় ৬০৬-০৭ অব্দের পূর্বে কোন এক সময়ে শশাঙ্ক গুপ্ত অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া গৌড়কে কেন্দ্র করিয়া উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনে প্রয়াসী হন।

মহাসেন গুপ্ত

শশাঙ্ক স্থাপিত গৌড় রাজ্যের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ (বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটির নিকট)। বাহুবল ও কূটনীতির সাহায্যে তিনি ক্রমশঃ আপন রাজ্যের বিস্তৃতি সাধন করেন। প্রথমে তিনি 'বঙ্গ' রাজ্য অধিকার করিয়া সমগ্র বাংলাদেশে তাঁহার আধিপত্য স্থাপন করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চল লইয়া গঠিত ছিল বঙ্গরাজ্য এবং উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চল লইয়া গঠিত ছিল গৌড়রাজ্য। ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে গৌড় একটি বিশিষ্ট জনপদ ও রাজ্যরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। গুপ্ত রাজগণের দুর্বলতার সুযোগে প্রথমে শশাঙ্কের গৌড়ে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া পরে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হইলেন। তিনি দক্ষিণে দণ্ডভুক্তি (মেদিনীপুর জেলা), উৎকল ও কোঙ্গোদ রাজ্য (গঞ্জাম জেলা), জয় করেন। পশ্চিমে তিনি মগধও স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন। গৌড় রাজ্যের সীমানা মগধ পর্যন্ত বিস্তৃত হইলে কনৌজের মৌখরী রাজবংশ গৌড়-আধিপত্যের অবসানের জন্য সচেষ্ট হয়। ফলে, শশাঙ্ক মৌখরীগণের সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইলেন। মৌখরীরাজ গ্রহবর্মণ থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কনৌজ ও থানেশ্বরের এই মিলন মালবের রাজা দেবগুপ্তর অস্বস্তির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল, কেননা পুষ্যভূতি ও মালব রাজবংশের মধ্যে বংশানুক্রমিক শত্রুতা চলিয়া আসিতেছিল। কূটনীতিজ্ঞ শশাঙ্ক দেবগুপ্তর সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন। অন্যদিকে কামরূপ (আসাম) রাজ ভাস্করবর্মণ গৌড়াধিপতির ক্ষমতা বিস্তারে আতঙ্কিত হইয়া কনৌজ-থানেশ্বর মৈত্রীজোটে যোগদান করিলেন। এইভাবে উত্তর-পূর্বভারতে দুইটি বিরোধী শক্তি জোটের সৃষ্টি হইল। ইতিমধ্যে প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু ঘটিলে থানেশ্বরে সাময়িক বিশৃংখলা দেখা দেয়। এই সুযোগে শশাঙ্ক ও দেবগুপ্ত যুগ্মভাবে কনৌজ আক্রমণ করেন। যুদ্ধে গ্রহবর্মণ পরাজিত ও নিহত হইলেন। থানেশ্বরের বর্তমান রাজা রাজ্যবর্ধন এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য দেবগুপ্তকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে মালবরাজ নিহত হইলেন। অতঃপর রাজ্যবর্ধন শশাঙ্কর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি গৌড়াধিপতির হস্তে প্রাণ হারাইলেন। থানেশ্বরের পরবর্তী শাসক হর্ষবর্ধন 'ভ্রাতৃহন্তা' শশাঙ্ককে সমুচিত শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে গৌড়ের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। কিন্তু তাঁহার এই অভিযান ফলপ্রসূ হয় নাই। ডঃ রমেশচন্দ্র

কনৌজের উপর প্রাধান্য

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু

মজুমদারের মতে, শশাঙ্ক তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত (আনুমানিক ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) গৌড়, মগধ, দণ্ডভুক্তি, উৎকল ও কোঙ্গোদের অধিপতি ছিলেন।

শশাঙ্ক ছিলেন শিবের উপাসক। হিউয়েন সাঙ তাঁহাকে বৌদ্ধধর্মের শত্রু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং অভিযোগ করিয়াছেন যে, শশাঙ্ক বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত করিয়াছিলেন। পক্ষপাতদুষ্ট হিউয়েন সাঙের এই উক্তি আধুনিক ঐতিহাসিকগণ সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। চৈনিক পরিব্রাজকের রচনা হইতেই জানা যায় যে, রাজধানী কর্ণসুবর্ণে ও রাজ্যের অন্যত্র বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট মর্যাদা ছিল।

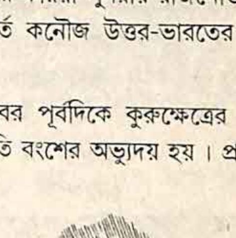
কৃতিত্ব

বাংলাদেশের ইতিহাসে শশাঙ্ক এক স্মরণীয় পুরুষ। "অজ্ঞাতকুলশীল মহাসামন্তরূপে জীবন আরম্ভ করিয়া তদানীন্তন উত্তর-ভারতের সর্বোত্তম রাষ্ট্রগুলির সমবেত শক্তির (কনৌজ-থানেশ্বর-কামরূপ মৈত্রী) বিরুদ্ধে সার্থক সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া, শেষ পর্যন্ত স্বতন্ত্র, স্বাধীন নরপতিরূপে তিনি সুবিস্তৃত রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। উত্তর ভারতের আধিপত্য লইয়া পালরাজ ধর্মপাল-দেবপাল প্রভৃতির আমলে গৌড়-কনৌজের যে সুদীর্ঘ সংগ্রাম পরবর্তিকালের বাংলার রাষ্ট্রীয় ইতিহাসকে উজ্জ্বল ও গৌরবান্বিত করিয়াছে তাহার প্রথম সূচনা শশাঙ্কর অমলেই দেখা দিল এবং তিনিই সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে উত্তর-ভারতের রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ করাইলেন।" (বাঙালির ইতিহাস—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়)

তিন □ কনৌজের উত্থান—হর্ষবর্ধন

গুপ্ত সম্রাটগণ উত্তর ভারতে যে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করিয়াছিলেন, গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক রাষ্ট্রের উদ্ভব সেই ঐক্যকে বিনষ্ট করিয়া দেয়। শতাধিক বৎসর পরে সপ্তম শতাব্দীতে হর্ষবর্ধন উত্তর-ভারতের এক বৃহৎ অংশ অধিকার করিয়া পুনরায় রাজনৈতিক সংহতি প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সময় হইতে কিছুকাল মগধের পরিবর্তে কনৌজ উত্তর-ভারতের প্রধানতম রাজনৈতিক শক্তিকেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইল।

হর্ষবর্ধন ছিলেন পুষ্যভূতি বংশীয় শাসক। বর্তমান পাঞ্জাবের পূর্বদিকে কুরুক্ষেত্রের অনতিদূরে থানেশ্বরকে কেন্দ্র করিয়া খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে পুষ্যভূতি বংশের অভ্যুদয় হয়। প্রভাকরবর্ধন ছিলেন এই বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা। ৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যবর্ধনের নিকট সংবাদ আসিল যে, তাঁহার ভগ্নিপতি কনৌজের মৌখরীরাজ গ্রহবর্মণ মালবরাজ দেবগুপ্ত কর্তৃক নিহত হইয়াছেন এবং ভগিনী রাজ্যশ্রী বন্দিনী হইয়াছেন। এই পরাজয় ও অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাজ্যবর্ধন মালবরাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। দেবগুপ্ত পরাজিত হইলেও তাঁহার মিত্র গৌড়াধিপতি শশাঙ্কর হস্তে রাজ্যবর্ধন নিহত হইলেন। এদিকে রাজ্যশ্রী কারাগার হইতে নিখোঁজ হইলেন। থানেশ্বর রাজ্যের এই সংকটময় মুহূর্তে হর্ষবর্ধন রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন (৬০৬ খ্রীঃ)।



হর্ষবর্ধন

হর্ষাব্দের প্রচলন

হর্ষবর্ধন রাজা হইয়া প্রথমেই ভগিনীর সন্ধানে বাহির হইলেন এবং অনুসন্ধানের পর বিন্ধ্যপর্বতের এক অরণ্যে রাজ্যশ্রীর সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিলেন। এই সময় কনৌজের অমাত্যগণের অনুরোধে তিনি তথাকার শাসনকার্য পরিচালনার ভারও গ্রহণ করিলেন। এইভাবে হর্ষবর্ধন থানেশ্বর ও কনৌজ এই উভয় রাজ্যেরই অধিপতি হইলেন। কনৌজ

হইল যৌথ রাজ্যের রাজধানী এবং এই সময় হইতেই কনৌজ নগরী উত্তর-ভারতের প্রধান রাজনৈতিক কেন্দ্ররূপে পাটলীপুত্রের মত প্রসিদ্ধি লাভ করিল। হর্ষবর্ধনের রাজ্য-দায়িত্ব গ্রহণের বৎসর (৬০৬ খ্রীঃ) হইতে 'হর্ষাব্দ' নামে এক নূতন অব্দের প্রচলন হইল।

বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে' বলা হইয়াছে যে, সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই হর্ষবর্ধন রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হইলেন। তাঁহার সামরিক অভিযানের সূচনা হয় ভ্রাতৃহন্তা গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের বিরুদ্ধে।

রাজ্যবিস্তার

এই উদ্দেশ্যে তিনি কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ না জানা গেলেও হিউয়েন সাঙের বিবরণী ও অন্যান্যসূত্র হইতে জানা যায়, আমৃত্যু শশাঙ্ক মগধের উপর আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর অবশ্য মগধ হর্ষবর্ধনের অধিকারে চলিয়া আসে। গৌড়ের পর হর্ষবর্ধন উড়িষ্যার বিরুদ্ধে সফল অভিযান চালাইয়া গঞ্জাম পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। পশ্চিমদিকে তিনি সৌরাষ্ট্রের মৈত্রকরাজ দ্বিতীয় ধ্রুব সেনকে পরাজিত করিয়া বলভী রাজ্যটি দখল করিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বলভীরাজ আপন রাজ্য পুনরধিকার করিলেন। পরবর্তিকালে ধ্রুব সেন ও হর্ষবর্ধনের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপিত হওয়ায় এই দুই রাজ্যের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। হর্ষবর্ধন সিন্ধুদেশ ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়াছিলেন। কিন্তু এইসব অভিযানের ফলাফল

দাক্ষিণাত্য অভিযান

সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। হর্ষবর্ধন দক্ষিণ ভারতে অভিযান চালাইয়াছিলেন। কিন্তু চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁহার আক্রমণ প্রতিহত করেন। ফলে হর্ষবর্ধনের দাক্ষিণাত্য অভিযান সাফল্য লাভ করে নাই। (আনুমানিক ৬৩৪ খ্রীঃ) আইহোল শিলালিপিতে পুলকেশীর সাফল্যের বিবরণী পাওয়া যায়।

'আইহোল শিলালিপি তে হর্ষবর্ধনকে 'সকলোত্তর-পথনাথ' (সমগ্র উত্তরাঞ্চলের প্রভু) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই শব্দটির উপর ভিত্তি করিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁহাকে 'হিন্দু ভারতের শেষতম সাম্রাজ্যসংগঠক' রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মতে, হর্ষবর্ধন এই গৌরবের অধিকারী নহেন। তাঁহার রাজ্য উত্তর ভারতের একটি সীমাবদ্ধ এলাকায় বিস্তৃত ছিল, সমগ্র উত্তর

রাজ্যসীমা

ভারতে নয়। সুতরাং ইহাকে 'সাম্রাজ্য' না বলিয়া 'রাজ্য' বলাই সঙ্গত। অন্যদিকে তাঁহার মৃত্যুর পর এবং মুসলমানগণ কর্তৃক ভারত অধিকৃত হইবার পূর্ব পর্যন্ত চোল, চালুক্য, গুর্জর, প্রতিহার, রাষ্ট্রকূট এবং পাল রাজবংশ হর্ষবর্ধনের অপেক্ষা স্থায়ী ও বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত, হর্ষবর্ধন যে দুইজন প্রথম শ্রেণীর শক্তি সম্পন্ন প্রতিদ্বন্দ্বীদের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন (দ্বিতীয় পুলকেশী ও শশাঙ্ক) তাঁহাদের কাহারও বিরুদ্ধে তিনি জয়লাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং হর্ষবর্ধন সম্পর্কে উপরিউক্ত মূল্যায়ন সঠিক নহে। অবশ্য, রাজনৈতিক বা সামরিক ক্ষেত্রে কোন বিরাট সাফল্য অর্জন করিতে না পারিলেও, তৎকালীন উত্তর-ভারতের তিনি যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। চীনদেশের সহিতও তাঁহার রাজদূত বিনিময় হইয়াছিল।

সাহিত্যানুরাগ

ভারতবর্ষের ইতিহাসে হর্ষবর্ধন একজন জ্ঞানী, গুণী, দানশীল ও মহানুভব শাসক বলিয়া খ্যাত। সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তিনি কবি বাণভট্টকে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। তিনি নিজে সংস্কৃতভাষায় তিনটি নাটক—'রত্নাবলী', 'প্রিয়দর্শিকা', 'নাগানন্দ' রচনা করিয়াছিলেন।

দানশীলতা

ব্যক্তিগতভাবে বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী হইলেও হর্ষ প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য অনুসারে ধর্মের উদারতা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হিউয়েন সাঙ কনৌজের ধর্মসভার বিবরণ প্রসঙ্গে ইহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। ভারতের তথা পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয় দানশীলতারও জন্য হর্ষবর্ধন সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। প্রয়াগের পঞ্চবার্ষিক উৎসবে দরিদ্র ও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সাধু-সন্ন্যাসী ও আতুরজনদের তিনি অকাতরে ধন

বিতরণ করিতেন। কথিত আছে, দান করিতে করিতে হর্ষবর্ধন নিজের রাজপোশাক ও পরিধেয় বস্ত্রও দান করিয়া ফেলিতেন।

মৌর্য বা গুপ্ত সম্রাটগণের মত প্রশাসনিক দক্ষতা না দেখাইতে পারিলেও হর্ষবর্ধনের আমলে রাজ্যে শাসন-শৃঙ্খলা বজায় ছিল। এই সময়েও কেন্দ্রীয় শাসনে সম্রাট সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। অবশ্য প্রাদেশিক শাসন পরিচালিত হইত রাজকর্মচারিগণের মাধ্যমে।

● **হিউয়েন সাঙ**ঃ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালের ইতিহাসের এক মূল্যবান উৎস হইল হিউয়েন সাঙের বিবরণী। চৈনিক পরিব্রাজকের গ্রন্থটির নাম 'সি-ইউ-কি' অর্থাৎ 'পশ্চিম জগতের বিবরণ', প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ভারতবর্ষ ছিল চীনদেশের পশ্চিমে। ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে উনত্রিশ বৎসর বয়সে হিউয়েন সাঙ ভারতবর্ষে আসেন। তাঁহার ভারতবর্ষে আগমনের প্রধান লক্ষ্য ছিল বিশ্ববিশ্রুত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করা। বস্তুতপক্ষে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ৮ বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহার পর, তিনি উত্তর ভারতের বহুস্থানে এবং নেপাল সিংহল প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। ভারতবর্ষে তিনি প্রায় চৌদ্দ বৎসর (৬৩০ খ্রীঃ হইতে ৬৪৪ খ্রীঃ পর্যন্ত) অতিবাহিত করেন।



হিউয়েন সাঙ্

হিউয়েন সাঙের মতে, ভারতবর্ষে তখন হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম প্রচলিত থাকিলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য ছিল; কিন্তু বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিদ্বেষভাব ছিল না। পরধর্মসহিষ্ণুতা ছিল ভারতীয়দের ধর্ম-আচরণের মূল ভিত্তি। হিউয়েন সাঙ একটি কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তৎকালীন ভারতবর্ষে বিভিন্ন বর্ণের



নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ

রাজবংশ ছিল—যেমন, পাঁচটি ক্ষত্রিয় রাজবংশ, চারিটি ব্রাহ্মণ রাজবংশ, দুইটি বৈশ্য ও দুইটি শূদ্র

রাজবংশ। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যাও খুব কম ছিল না। কাশ্মীর, জলন্ধর, কনৌজ, বৈশালী, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি স্থানে হর্ষবর্ধন বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পণ্ডিতের সমাবেশ দেখিতে পাইয়াছিলেন। বৌদ্ধ মঠের সংখ্যাও ছিল উল্লেখযোগ্য—প্রায় পাঁচ হাজার। অন্যান্য শিক্ষিত ভারতীয়দের ন্যায় বৌদ্ধ পণ্ডিতরাও সংস্কৃতভাষা ব্যবহার করিতেন।

হিউয়েন সাঙ 'মধ্যদেশ' সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। তথাকার অধিবাসীরা ছিলেন সভ্য, সংযমী ও মার্জিত রুচি। শহর ও গ্রামগুলি ছিল ঘনবসতিপূর্ণ। কিন্তু দেশে চোর-ডাকাতের উপদ্রব প্রবল ছিল। দণ্ডবিধিও বেশ কঠোর ছিল। অবশ্য, সাধারণ মানুষ ছিলেন শান্তিপ্রিয় ও নীতি পরায়ণ।

হিউয়েন সাঙের বিবরণী হইতে জানা যায়, ভারতবর্ষে তখন কৃষিজাত পণ্যের প্রাচুর্য ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যও বেশ উন্নত ছিল। মালব, গুজরাট প্রভৃতি বন্দর হইতে সমুদ্রপথে পশ্চিমে এবং তাম্রলিপ্ত হইতে পূর্বে বাণিজ্য পরিচালিত হইত।

হিউয়েন সাঙ ইতিহাসখ্যাত পাটলীপুত্র নগরীর ধ্বংসাবশেষও দেখিয়াছিলেন। হিন্দুদের প্রধান তীর্থ বারাণসীতেও তিনি কিছুকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। হিউয়েন সাঙের বিবরণী হইতে দক্ষিণের পহ্লব ও চালুক্য রাজ্য সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

চার □ প্রতিহার রাজশক্তির বিকাশ

ভূমিকা

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কনৌজের আধিপত্য হ্রাস পাইতে থাকে। ইহার পর প্রায় অর্ধশতাব্দী কনৌজের ইতিহাস অন্ধকারাবৃত। অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে যশোধর্মন নামে এক পরাক্রান্ত রাজা নূতন করিয়া কনৌজের গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষজীবনে তিনি কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন।

অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কনৌজের সিংহাসন একটি স্বল্পখ্যাত রাজবংশের অধীন ছিল। এই বংশের রাজাদের নামের সঙ্গে 'আয়ুধ' কথাটি যুক্ত ছিল। এই বংশেরই রাজা ইন্দ্রায়ুধকে বাংলার পালরাজা ধর্মপাল পরাজিত করেন এবং আপন আশ্রিত চক্রায়ুধকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

পাল-রাষ্ট্রকূট-প্রতিহার সংঘর্ষ

● **ত্রিশক্তি সংগ্রাম :** রাজপুতনার গুর্জর-প্রতিহার রাজবংশও কিছুদিন কনৌজে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। প্রথম নাগভট্ট এই বংশের স্থাপয়িতা হইলেও প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন বৎসরাজ (আনুমানিক ৭৩৮-৭৯৪ খ্রীঃ)। বৎসরাজের নেতৃত্বে প্রতিহার রাজবংশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইলে পাল ও রাষ্ট্রকূট রাজবংশের সহিত সংঘর্ষ বাধে। কনৌজ অধিকার ছিল এই সংগ্রামের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। 'তৎকালীন ভারতে কনৌজের মর্যাদা ছিল অনন্য ; ইউরোপে যেমন রোম বা কনষ্ট্যান্টিনোপল-এ অধিকারপ্রতিষ্ঠা করা ছিল শক্তির মানদণ্ড, তেমনই এদেশে তখন ছিল কনৌজের স্থান।' ফলে, একই সময়ে রাজপুতনার প্রতিহার বংশ, দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশ এবং পূর্বভারতের (বাংলার) পালবংশ কনৌজে আধিপত্যের মাধ্যমে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইলে ভারত ইতিহাসের তথাকথিত 'ত্রিশক্তি সংগ্রাম' শুরু হইয়া যায়। এই সংঘর্ষে প্রতিহারগণ সর্বদাই রাষ্ট্রকূট ও পালবংশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিত। কিন্তু পাল ও রাষ্ট্রকূট বংশ কোন কোন সময়ে প্রতিহারদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হইত। শেষ পর্যন্ত অবশ্য প্রতিহারগণই সাফল্য অর্জন করেন। যাহা হউক, বৎসরাজ পালরাজ ধর্মপালকে পরাজিত করিলেও রাষ্ট্রকূট অধিপতি ধ্রুব কর্তৃক পরাস্ত হন। ফলে, তাঁহার অভিযান ব্যর্থ হয়।

ইহার পরে আসেন দ্বিতীয় নাগভট্ট। সিন্ধু, অন্ধ্র, বিদর্ভ ও কলিঙ্গরাজ্যে শাসন বিস্তৃত করিবার পর তিনি পূর্বদিকে আসেন এবং ধর্মপালের আশ্রিত চক্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া কনৌজ অধিকার করেন। ধর্মপালও মুঙ্গেরের নিকট এক যুদ্ধে তাঁহার কাছে পরাজিত হন। কিন্তু প্রতিহারদের ক্ষমতায় ঈর্ষান্বিত হইয়া রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ উত্তরাপথে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। সম্ভবতঃ ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ রাষ্ট্রকূট রাজের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। যাহা হউক, দাক্ষিণাত্যের গোলযোগের জন্য তৃতীয় গোবিন্দকে অল্পকালের মধ্যেই উত্তর ভারত ত্যাগ করিতে হয়। এই সুযোগে প্রতিহার রাজবংশ কনৌজে তাহাদের লুপ্ত ক্ষমতা পুনঃস্থাপন করেন।

রাজ্যবিস্তার

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন প্রথম ভোজ। তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর রাজত্বকালে প্রতিহার রাজশক্তি গৌরবের উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল। তিনি বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য প্রসারিত করেন। বাংলার বিরুদ্ধেও তিনি সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র পাল সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি মগধ ও কিছুদিনের জন্য উত্তরবঙ্গও স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন।

ইহার পর রাজা হইলেন দ্বিতীয় ভোজ। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ভ্রাতা মহীপাল কর্তৃক তিনি সিংহাসনচ্যুত হন। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র মহীপালকে পরাজিত করিয়া কনৌজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। এইভাবে প্রতিহার রাজশক্তির পতন হয় এবং কনৌজের রাজনৈতিক গুরুত্বের অবসান ঘটে।

পাঁচ □ পাল ও সেন শাসকবর্গ

শশাঙ্কর মৃত্যুর পর পারস্পরিক হিংসা, বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসে 'গৌড়তন্ত্র' বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আনুমানিক ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন হিউয়েন সাঙ বাংলাদেশে ভ্রমণে আসেন, তখন এই দেশ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়— কজঙ্গল পুণ্ড্রবর্ধন কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত, সমতট। বাংলাদেশের এই অনৈক্য ও আত্মকলহের সুযোগে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণ এবং পরে কনৌজরাজ যশোধর্মন ও কাশ্মীরাধিপতি ললিতাদিত্য বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়া সাময়িকভাবে স্থানবিশেষ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। ফলে প্রায় এক শতাব্দীকাল ধরিয়া বাংলাদেশে সর্বব্যাপী বিশৃংখলা ও রাজনৈতিক অধোগতি প্রকট হইয়া উঠে। এই অরাজক অবস্থা 'মাৎস্যন্যায়' বলিয়া পরিচিত। শব্দটির রাজনীতিগত অর্থ হইল যে; বৃহৎ মৎস্য যেইরূপ ক্ষুদ্র মৎস্যকে গ্রাস করে, মানুষের সমাজেও সেইরূপ সবল দুর্বলকে ধ্বংস করিতে থাকে। বাংলাদেশের ইতিহাসের এই সংকটময় মুহূর্তে পালরাজশক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটিল।

মাৎস্যন্যায়

● পাল সাম্রাজ্য ●

● **গোপাল** ঃ খালিমপুর তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায় যে, অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার জনগণ অরাজকতার অবসানকল্পে গোপাল নামে জনৈক ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। গোপালই হইলেন পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সম্ভবতঃ ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। জনগণের স্বেচ্ছাকৃত রাজা নির্বাচন দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। ইহার ফলে, বাংলাদেশ নৈরাজ্যের অশান্তি ও বিশৃংখলা হইতে রক্ষা পাইল। 'শুধু বাংলার ইতিহাসে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই ধরনের শুভ সামাজিক বুদ্ধি এবং রাষ্ট্রীয় চেতনার দৃষ্টান্ত বিরল।' গোপালের কুলগৌরব মনে হয় কিছু ছিল না। তথাপি তাঁহার রাজপদে নির্বাচন সঠিক হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকাল ও রাজ্যবিস্তার সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। তবে ইহা সত্য যে, তিনি সমস্ত বঙ্গদেশ নিজশাসনাধীনে আনিয়া রাজশক্তিকে আবার সুদৃঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গোপাল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন।

ভূমিকা

কৃতিত্ব ও ধর্ম

● **ধর্মপাল ঃ** গোপালের মৃত্যুর পর ধর্মপাল বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। সমগ্র আর্যাবর্তে এক সার্বভৌম রাজশক্তি স্থাপন করাই ছিল তাঁহার জীবনের স্বপ্ন। এই সময় উত্তর ভারতের আধিপত্য লইয়া গুর্জর-প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট বংশের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। ধর্মপাল এই দ্বন্দ্বে যোগদান করিলে ত্রিশক্তি সংগ্রামের সূচনা হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই ত্রিশক্তি সংগ্রাম উত্তর ভারতের প্রধান রাজনৈতিক ঘটনায় স্থান অধিকার করিয়াছিল।

ত্রিশক্তি সংগ্রাম

ধর্মপাল আর্যাবর্তের দিকে অগ্রসর হইলে প্রতিহার অধিপতি বৎসরাজ কর্তৃক পরাজিত হন। কিন্তু অনতিকালের মধ্যেই বৎসরাজ রাষ্ট্রকূট বংশের রাজা ধ্রুবর নিকট পরাস্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই সুযোগে ধর্মপাল আবার অভিযান শুরু করিয়া মগধ, বারাণসী ও প্রয়াগ জয় করিলেন। কিন্তু এইবার ধ্রুব তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ধর্মপাল পরাজিত হইলেন। সৌভাগ্যবশতঃ ধ্রুব বাংলার দিকে অগ্রসর না হইয়া দক্ষিণ-ভারতে ফিরিয়া গেলে, ধর্মপাল পুনরায় রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি কনৌজরাজ ইন্দ্রায়ুধকে পরাস্ত করিয়া স্ব-মনোনীত 'চক্রায়ুধ'কে সেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন। কথিত আছে যে, চক্রায়ুধের অভিষেকের সময় ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন ও অবন্তী রাজ্যের নৃপতিগণ উপস্থিত ছিলেন। ইহা হইতে মনে হয় যে, ধর্মপালের প্রাধান্য উক্ত রাজন্যবর্গ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল। খালিমপুর তাম্রশাসনে ইহার উল্লেখ আছে। অতঃপর তিনি সিন্ধুনদ ও পাঞ্জাব পর্যন্ত অগ্রসর হন। সম্ভবতঃ দক্ষিণভারত অভিমুখে তিনি যাত্রা করিয়াছিলেন। সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হিসাবে তিনি 'পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার এই বিজয় গৌরব স্থায়ী হয় নাই। প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট ধর্মপালের আশ্রিত রাজা চক্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া কনৌজ অধিকার করিলেন এবং বাংলা অভিমুখে অগ্রসর হইয়া মুঙ্গেরের নিকট পালসম্রাটকেও পরাজিত করেন। পুনরায় রাষ্ট্রকূট হস্তক্ষেপে ধর্মপাল রক্ষা পাইলেন। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ প্রতিহার অধিপতি দ্বিতীয় নাগভট্টকে পরাজিত করিলে তিনি ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। রাষ্ট্রকূট অনুশাসনে আছে ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ তৃতীয় গোবিন্দর আনুগত্য স্বীকার করিলে রাষ্ট্রকূটরাজ দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া যান। ফলে ধর্মপাল উত্তর ভারতে প্রতিদ্বন্দ্বিহীন হইয়া কর্তৃত্ব করিতে থাকেন।

রাজ্যবিস্তার



পালযুগের মূর্তি

বাংলাদেশের ইতিহাসে ধর্মপালের রাজত্বকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সামগ্রিক উন্নতির বিচারে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ধর্মপালের রাজত্বকালকে 'বাঙালির জীবন প্রভাত' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সমগ্র আর্যাবর্তে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া তিনি বাংলার রাজনৈতিক শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। পাটলীপুত্র নগরীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া তিনি প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও রাজা ধর্মপালের স্মরণীয় অবদান আছে। মগধে গঙ্গাতীরে 'বিক্রমশীল' নামে এক বৌদ্ধ মঠ বা বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হিসাবে ইহার খ্যাতি নালন্দার ন্যায় বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহাছাড়া সোমাপুরী এবং কাহারো মতে ওদন্তপুরী নামক বৌদ্ধ বিহারদ্বয়ও তিনি নির্মাণ করিয়াছিলেন। ধর্মপাল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু অন্যান্য ধর্মের প্রতিও তিনি শ্রদ্ধাশীল

ঐতিহাসিক গুরুত্ব

ছিলেন। গর্গ নামে তাঁহার এক হিন্দু ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিলেন। ধর্মপাল সম্ভবতঃ ৭৭০ হইতে ৮১০ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

● **দেবপাল ঃ** ধর্মপালের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র দেবপাল বাংলার সিংহাসনে (আনুমানিক ৮১০ খ্রীষ্টাব্দ) আরোহণ করেন। দেবপালের রাজত্বকালে পাল-সাম্রাজ্য সর্বাপেক্ষা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার সভাকবি তাঁহাকে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভূখণ্ডের অধীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা অবশ্যই অতিশয়োক্তি। তবে লিপি হইতে জানা যায়, তিনি উড়িষ্যা রাজ্য জয় করেন এবং দ্রাবিড়, হূণ ও গুর্জরদের দর্প খর্ব করেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই দেবপাল আসাম ও উড়িষ্যার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। আসাম বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইয়া অব্যাহতি পাইল। ইহা একটি করদ রাজ্যে পরিণত হইল। কিন্তু উড়িষ্যা তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইল। সম্ভবতঃ হিমালয়ের পাদদেশে হূণদের কোন একটি রাজ্য অধিকার করিয়া তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত কাম্বোজ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার আমলেও গুর্জর-প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের (দ্রাবিড়) সহিত পালবংশের শত্রুতা ও সংঘর্ষ চলিয়াছিল। গুর্জররাজ প্রথমভোজ ও রাষ্ট্রকূট অধিপতি অমোঘবর্ষ সম্ভবতঃ দেবপালের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। এইভাবে তিনি উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত এবং পূর্বে বঙ্গোপসাগর হইতে পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন।

বহির্ভারতে প্রভাব

দেবপালের খ্যাতি ভারতের বাহিরেও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপের শৈলেন্দ্র-বংশীয় রাজা বালপুত্রদেব নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মঠ নির্মাণ করিয়া দিবার জন্য দেবপালের নিকট দূত পাঠাইয়া অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তথাকার ব্যয় নির্বাহার্থ পাঁচটি গ্রাম চাহিয়াছিলেন। দেবপাল তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিয়াছিলেন। দেবপাল নিজেও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত ছিলেন।

দেবপালও ধর্মে বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম নূতন করিয়া উত্তরভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তিনি সাহিত্য ও শিল্পকলারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নালন্দার সৌধাবলীর সংস্কার ও বুদ্ধগয়ার বৌদ্ধ-মন্দির নির্মাণ তাঁহার শাসনকালের স্মরণীয় কীর্তি। দেবপাল মুঙ্গেরে তাঁহার নূতন রাজধানী নির্মাণ করিয়াছিলেন।

আরব পর্যটক সুলেমানের গ্রন্থে দেবপালের সামরিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার মতে. পালসম্রাটের সৈন্যবাহিনী রাষ্ট্রকূট ও প্রতিহারগণের সামরিক বাহিনী অপেক্ষা সুদক্ষ ও শক্তিশালী ছিল।

দেবপালের মৃত্যুর (আনুমানিক ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ) পর উপযুক্ত রাজার অভাবে পাল সাম্রাজ্যের দ্রুত অধোগতির সূচনা হইয়াছিল।

● **প্রথম মহীপাল ঃ** অবশেষে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে প্রথম মহীপাল সাময়িকভাবে বংশের গৌরব পুনরুদ্ধার করেন এবং উত্তর ও পূর্ববঙ্গে পাল আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। সুশাসক হিসাবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। পরবর্তী শাসক নরপাল ও বিগ্রহপাল দুর্বল প্রকৃতির রাজা ছিলেন। ইহাদের সময় বিখ্যাত বাঙালি বৌদ্ধ পণ্ডিত অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন।


অতীশ দীপঙ্কর

● **রামপাল ঃ** পাল রাজবংশে দুর্বলচেতা কয়েকজন রাজার শাসনকালে দ্বিতীয় মহীপালের সময় দীব্য নামক কৈবর্ত জাতীয় এক রাজকর্মচারী উত্তরবঙ্গে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। দিব্যর পর রুদোক এবং ভীম উত্তরবঙ্গ শাসন করেন। শেষ পর্যন্ত রামপাল ভীমকে পরাজিত করিয়া পাল-রাজ্যকে আবার সংগঠিত করেন। তিনি উৎকল, কলিঙ্গ ও কামরূপ জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মদনপালের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত 'রামচরিত' কাব্যে তাঁহার এই

সাফল্যের কাহিনী বিবৃত আছে। রামপালের পরে এই বংশে আর কোন উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন না। কিছুদিনের মধ্যে পালবংশের পতনের সুযোগে সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেন পালবংশ ধ্বংস করিয়া স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করেন।

● **পাল শাসনের মূল্যায়ন ঃ** জনসমর্থনের ভিত্তিতে সিংহাসন অধিকার করিলেও পাল শাসনতন্ত্রে রাজার হস্তে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল। অবশ্য রাজশক্তি অপ্রতিহত থাকিলেও পাল সম্রাটগণ স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। জনগণের আর্থিক ও মানসিক বিকাশ সাধনে ইঁহাদের মূল্যবান অবদান রহিয়াছে। ধর্মীয় উদারতা ও শিক্ষার প্রসারের জন্য পাল শাসনকাল স্মরণীয়। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য পাল সাম্রাজ্য কতকগুলি অংশে বিভক্ত ছিল এবং দক্ষ ও বিশ্বস্ত রাজকর্মচারিগণ কর্তৃক সমস্ত বিভাগের পরিচালনা সূক্ষ্মভাবে সম্পাদিত হইত।

শাসন ব্যবস্থা

● সেন সাম্রাজ্য ●

ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক হইতে আগত সেন বংশের সামন্ত সেন এবং হেমন্ত সেন পাল রাজাদের সামন্ত হিসাবে প্রথমে রাঢ় অঞ্চলে প্রাধান্য স্থাপন করেন।

● **বিজয় সেন ঃ** রামপালের মৃত্যুর পর পাল বংশের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন প্রায় সমস্ত বাংলা ও মিথিলা জয় করিয়া সেন রাজ্যের পত্তন করেন। কলিঙ্গর বিরুদ্ধেও তিনি অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু সম্ভবতঃ কলিঙ্গরাজের সহিত তাঁহার মিত্রতা স্থাপিত হয়। প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিবার কালে তিনি বাংলার রাষ্ট্রীয় ঐক্য পুনঃস্থাপন করেন।

● **বল্লাল সেন ঃ** বিজয় সেনের পর তাঁহার পুত্র বল্লাল সেন আনুমানিক ১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার ন্যায় তিনিও রাজ্য বিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়া সেন সাম্রাজ্যের সীমা সম্প্রসারিত করেন। কিন্তু ধর্ম ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক এবং সমাজ-সংস্কারক হিসাবেই বল্লাল সেন ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন। তিনি তান্ত্রিক হিন্দুধর্মের অনুরাগী ছিলেন এবং হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য চট্টগ্রাম, আরাকান, উড়িষ্যা, নেপাল প্রভৃতি স্থানে ধর্মপ্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। সাহিত্যিক হিসাবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'দানসাগর', 'অদ্ভুতসাগর' স্মৃতিশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়গুলি বিশিষ্ট গ্রন্থরূপে পণ্ডিতদের সপ্রশংস স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। অন্যদিকে, হিন্দু সমাজকে নূতনভাবে সংগঠিত করিবার প্রয়াসে তিনি বাংলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ-এই তিনটি শ্রেণীর মধ্যে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন হইলেও বাংলার ইতিহাসে বল্লাল সেন একজন স্মরণীয় শাসক।

দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর গ্রন্থরচনা

কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন

● **লক্ষ্মণ সেন ঃ** আনুমানিক ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন বাংলার সিংহাসনে উপবেশন করেন। পিতা ও পিতামহের ন্যায় তিনিও ছিলেন সুদক্ষ যোদ্ধা এবং যুবা বয়সে যথেষ্ট রণনিপুণতা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার আমলেই গৌড়দেশ সম্পূর্ণভাবে বিজিত হয় এবং সাফল্যের স্মারক হিসাবে 'গৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণ করেন। উড়িষ্যা, বারাণসী, মগধ ও কামরূপও তিনি স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শোনা যায়, পুরী, কাশী ও প্রয়াগ—এই তিনটি জায়গায় লক্ষ্মণ সেন 'বিজয়স্তম্ভ' নির্মাণ করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ সেনের সামরিক সাফল্য

লক্ষ্মণ সেনের প্রধান রাজধানী বর্তমান মালদহ জেলার গৌড় নগরী তাঁহার নামানুসারে লক্ষ্মণাবতী নামে পরিবর্তিত হইয়াছিল। পরবর্তিকালে, গঙ্গার সান্নিধ্য পাইবার আশায় 'ভক্ত ও নিষ্ঠাবান হিন্দু' লক্ষ্মণ

সেন নদীয়াতে তাঁহার দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। এই নদীয়াই ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন বখ্‌তিয়ার খিলজি নামে মহম্মদ ঘুরীর এক তুর্কী সেনাপতি দ্বারা আক্রান্ত হয়। কথিত আছে, বখতিয়ার খিলজী মাত্র সতের জন অশ্বারোহী লইয়া রাজধানী আক্রমণ করিলে বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করিয়া নৌকাযোগে পূর্ববঙ্গে পলাইয়া যান। সুতরাং বিনা বাধায় বাংলায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

● **সেন বংশের মূল্যায়ন ঃ** মিনহাজউদ্দিনের রচনার (সেনবংশ পতনের ৪০ বছর পরে লিখিত) উপর ভিত্তি করিয়া লক্ষ্মণ সেনের বিরুদ্ধে পলায়নপরতার অভিযোগ আনা হইয়াছে। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিকই মনে করেন, কাহিনীটি অতিরঞ্জিত। অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায়ের কথায়—'এই ব্যক্তির দুর্ভাগ্য যে, ঘটনাক্রমে বাংলায় মুসলিম শক্তির অগ্রগতি রোধ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি বলে তাকেই দেশ সেই অপমানের প্রথম লজ্জাকর প্রতীক বলে ভাবতে শিখেছে।... অতর্কিত আক্রমণে সফলভাবে আত্মরক্ষা অসম্ভব জেনে পলায়ন করে থাকলে তা বেদনাদায়ক ছিল নিশ্চয়, কিন্তু তাতে অপমানের কালিমা তাঁর চরিত্রে পড়েনি।... কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, ধর্মপাল ও দেবপাল ভিন্ন বাংলার অন্য কোন রাজার কৃতিত্ব লক্ষ্মণ সেনের তুলনায় কম'।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস

এক □ চালুক্য বংশ

প্রথমে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ এবং পরে দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চালুক্যগণ দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন চালুক্য বংশের (মোট চারিটি ভাগ) ভিতর বিজয়পুর জেলার বাতাপিকে (বাদামি) কেন্দ্র করিয়া যে চালুক্য বংশ প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁহারাই এই প্রাধান্য অর্জনে সক্ষম হন।

● **প্রথম ভাগে বাতাপির (বাদামি) চালুক্যবংশ ঃ** চালুক্যগণ নিজেদের সূর্যবংশজাত বলিয়া দাবি করিয়াছেন। ডঃ স্মিথ তাঁহাদের রাজপুতনার গুর্জর জাতির একটি শাখা হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ অবশ্য মনে করেন, চালুক্যগণ ছিলেন দক্ষিণ ভারতের একটি স্থানীয় গোষ্ঠী এবং তাঁহাদের আদি বাসভূমি ছিল অন্ধ্রদেশ।

আদি বাসভূমি

রাষ্ট্রকূটরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া জয়সিংহ চালুক্যবংশের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু 'মহারাজ' উপাধিধারী প্রথম পুলকেশীই (আনুমানিক ৫৩৫—৫৬৬ খ্রীঃ) ছিলেন প্রথম যথার্থ স্বাধীন চালুক্য নৃপতি। তিনিই বাতাপি (বাদামি) দুর্গের পত্তন করেন এবং ক্রমে বিজাপুর অঞ্চলে স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীন রাজ্যস্থাপনের কৃতিত্বের পরিচায়ক হিসাবে পুলকেশী অশ্বমেধ যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

জয়সিংহ

দুই □ দ্বিতীয় পুলকেশী

প্রথম পুলকেশীর পুত্র প্রথম কীর্তিবর্মণ পিতার ন্যায় 'মহারাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন লিপিমালা হইতে জানা যায়, তিনি বোম্বাই (মহারাষ্ট্র), মহীশূর (কর্ণাটক) ও মাদ্রাজের (তামিলনাড়ু) এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রথম কীর্তিবর্মণের পর শাসক হইয়াছিলেন তাঁহার ভ্রাতা মঙ্গলেশ। কিন্তু শেষজীবনে ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশী সিংহাসন অধিকার করিয়া নেন।

প্রথম কীর্তিবর্মণ ও মঙ্গলেশ

● **দ্বিতীয় পুলকেশীর সক্রিয়তা ঃ** চালুক্যবংশের নরপতি দ্বিতীয় পুলকেশী (আঃ ৬১১-৬৪২ খ্রীঃ) ছিলেন প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট। রবিকীর্তি রচিত 'আইহোল লিপি' ও হিউয়েন সাঙের বিবরণী হইতে তাঁহার রাজত্বকালের পরিচয় পাওয়া যায়। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার পর প্রথমেই তাঁহাকে অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সম্মুখীন হইতে হয়। এই সময় মঙ্গলেশ ও দ্বিতীয় পুলকেশীর পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সুযোগ লইয়া চালুক্যদের অধীন রাজগণ সাময়িকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। অসাধারণ কর্মশক্তির মাধ্যমে দ্বিতীয় পুলকেশী এই বিদ্রোহ দমন করিয়া রাজ্যকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন।

দিগ্বিজয়—হর্ষবর্ধনের বিরুদ্ধে সাফল্য

অতঃপর তিনি দিগ্বিজয়ে বাহির হন। প্রথম আঘাতেই দক্ষিণের কদম্ব ও মহীশূরের গঙ্গবংশীয় রাজগণ এবং উত্তর কোঙ্কণ অঞ্চলের মৌর্যগণ চালুক্য শক্তির কাছে পরাজিত হন। পশ্চিমভারতে দ্বিতীয় পুলকেশীর ক্ষমতার সম্প্রসারণ ঘটিলে উত্তর ভারতের শাসক হর্ষবর্ধনের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ বাঁধে। হর্ষবর্ধন দক্ষিণ ভারত জয়ের জন্য অভিযান শুরু করিলেও, আইহোল লিপি হইতে জানা যায় তিনি যুদ্ধে পরাজিত হন।

দাক্ষিণাত্য অভিযান

হর্ষবর্ধনের সেনাবাহিনী ছিল বিশালাকার। তাঁহার সৈন্যবাহিনীর বিবরণী হিসাবে তখনকার দিনের লোকের মুখে শোনা গিয়াছিল যে, হর্ষবর্ধনের বিশ হাজার অশ্বারোহী, পঞ্চাশ হাজার পদাতিক এবং পাঁচ হাজার হাতি ছিল। অর্থাৎ হর্ষবর্ধন তৎকালীন যুগে এক বিশাল সৈন্যবাহিনীর অধিকারী ছিলেন। তবে এই বিশাল সৈন্যবাহিনী থাকা সত্ত্বেও, কেউ কেউ বলিয়াছেন তাঁহার দাক্ষিণাত্য অভিযান ব্যর্থ হইয়াছিল। নর্মদা নদীর তীরে এই অভিযানে সম্পূর্ণরূপেই তিনি ব্যর্থ হন পশ্চিম চালুক্য-রাজ্যের অধিপতি দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট পরাজয়ের মাধ্যমে।

ত্রয়োদশ শতকের সূচনার পূর্ব হইতেই হর্ষবর্ধনের রাজ্যকেই সর্ব শেষ সাম্রাজ্য বলিয়া অভিহিত করা হইত। হর্ষবর্ধনের রাজ্যের প্রধান অংশ ছিল ভারত উপ-মহাদেশ। তবে এই সাম্রাজ্য গুপ্ত-সাম্রাজ্যের আমল অপেক্ষা অধিক দুর্বলতর ছিল। সাম্রাজ্যের অতি ক্ষুদ্র অংশ ছিল কেন্দ্রের শাসনাধীন। ইহাছাড়া বাকী অঞ্চলগুলি শাসন করিতেন সামন্ত-রাজপুরুষেরা।

দ্বন্দ্ব ও শোষণ

হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ছিল আনুমানিক ত্রিশ বৎসর। কিন্তু পরবর্তিকালে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল রাজ্য পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও রাজনীতির শোষণে ক্রমে ক্রমে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হইতে থাকে। আনুমানিক প্রায় কয়েক শতাব্দী ধরিয়া সারা ভারতব্যাপী এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পারস্পরিক নির্ভরশীল রাজ্যগুলি টিকিয়া ছিল। যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল তাহার মধ্যেও ঘাত প্রতিঘাতে দুই-একটি বৃহৎ আকারের রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু কোন রাজ্যই মৌর্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের ন্যায় ভারত উপ-মহাদেশের বেশির ভাগ স্থান জুড়িয়া ছিল না। এই সমস্ত রাজ্যগুলির মধ্যে কোন সময়েই একতা থাকিত না। সর্বদাই এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিত। কোন কোন সময় দেখা যাইত যে নূতন কোন যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হইবার পূর্বে অল্প সময়ের জন্য তাহারা পরস্পরের মধ্যে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ থাকিত।

দ্বিতীয় পুলকেশীর মর্যাদা বৃদ্ধি

হর্ষবর্ধনের বিরুদ্ধে এই সাফল্য দ্বিতীয় পুলকেশীর ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিল। অতঃপর পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মণকে পরাস্ত করিয়া কাবেরী নদী অতিক্রম করিলে চোল, কেরল ও পাণ্ড্যরাজারা তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া নেন। অবশ্য পল্লবশক্তিকে দ্বিতীয় পুলকেশী সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করিতে পারেন নাই।

দক্ষিণ ভারতের প্রধান রাজ্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল তিনটি রাজ্য (১) চালুক্য রাজ্য (২) পল্লব রাজ্য (৩) পাণ্ড্য রাজ্য। এই সময় এই রাজ্যগুলি একে অপরের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিত। চালুক্য রাজ্যের রাজধানী ছিল বাতাপি। সেই সময় স্বয়ং সম্রাট ছিলেন দ্বিতীয় পুলকেশী। পুলকেশীর সর্বক্ষমতা

মানিয়া লইয়াছিলেন তাঁহার দুই ভ্রাতা। এই দুইজন বিক্রমশালী ভ্রাতা ছিলেন গুজরাট ও পূর্ব-দাক্ষিণাত্যের অধিপতি। ঠিক সেই সময় অন্য দুইটি রাজ্য বাতাপির চালুক্য রাজ্যকে আক্রমণ করিয়াছিল। এই দুইটি রাজ্য হইল পল্লব রাজ্য— রাজধানী কাঞ্চিপুরম এবং পাণ্ড্য রাজ্যের রাজধানী মাদুরা। ইহার পর ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে চালুক্যদের পরাক্রমশীলতায় পল্লবরা গুরুতরভাবে পরাস্ত হন এবং রাজধানী অবরুদ্ধ থাকাকালীন রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী মারা যান। দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরসুরী তাঁহারই রাজ্যের একটি বৃহৎ অংশের উপর কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন। পরবর্তিকালে অধিক সংখ্যায় সৈন্য পরিচালনা করিয়া কিছু কিছু রাজ্য অধিকার করিতে তাঁহারা সমর্থ হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পুলকেশীর পরাজয় ও মৃত্যু

পরবর্তী পল্লবরাজ নরসিংহবর্মণ একাধিক যুদ্ধের মধ্য দিয়া চালুক্য অধিপতিকে পরাজিত ও নিহত করেন (৬৪২ খ্রীঃ)। এই পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বাতাপির চালুক্যশক্তির পতন হয়।

দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকালে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করেন (৬৪১) খ্রীঃ)। তিনি চালুক্য রাজের সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক দক্ষতার এবং রাজ্যের সুশাসন ও জনগণের সমৃদ্ধির কথা সপ্রশংসভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

হিউয়েন সাঙের প্রশস্তি

তিন □ রাষ্ট্রকূট

অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে (৭৫২ খ্রীঃ) বাতাপির চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মণকে পরাজিত করিয়া রাষ্ট্রকূট বংশের নায়ক দন্তিদুর্গ দাক্ষিণাত্যে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। সামরিক ও রাজনৈতিক সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তিকালে এই রাজ্য সমগ্র ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূটরাজগণের সভাকবিরা এই বংশের রাজগণকে পৌরাণিক যদুবংশের বংশধররূপে উল্লেখ করিলেও, আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, ইঁহাদের আদি বাসস্থান ছিল কর্ণাটকে। পরে রাষ্ট্রকূটগণ মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়া চালুক্যদের অধীনে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন।

আদি বাসস্থান

রাষ্ট্রকূট রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা দন্তিদুর্গ মহারাষ্ট্র ব্যতীত কাঞ্চী, কলিঙ্গ, মালব, দক্ষিণ গুজরাট ইত্যাদি রাজ্যও অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী শাসক প্রথম কৃষ্ণ চালুক্যরাজকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিয়া রাজ্যের বিস্তৃতি সাধন করেন। তাঁহার আমলেই ইলোরার পর্বতখোদিত বিখ্যাত কৈলাস মন্দির নির্মিত হয়। প্রথম কৃষ্ণের পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় গোবিন্দ সিংহাসন আরোহণ করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এই অপদার্থ শাসককে অপসারিত করিয়া তাঁহার ভ্রাতা ধ্রুব সিংহাসন অধিকার করিয়া নেন।

প্রথম কৃষ্ণ

ধ্রুব (৭৮০-৭৯৩ খ্রীঃ) ছিলেন রাষ্ট্রকূট বংশের শ্রেষ্ঠ রাজাদের অন্যতম। মহীশূরের গঙ্গা-রাজ, বেঙ্গীর চালুক্য-রাজ এবং কাঞ্চীর পল্লব-রাজকে পরাজিত করিয়া তিনি দক্ষিণ-ভারতে রাষ্ট্রকূট শক্তি অপ্রতিহত করিয়া তোলেন। অতঃপর তিনি উত্তরভারতে রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হন। তাঁহার সময়েই উত্তর ভারতের আধিপত্য লইয়া রাষ্ট্রকূট-প্রতিহার-পাল-ত্রিশক্তি সংগ্রামের সূচনা হয়। রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব প্রতিহার অধিপতি বৎসরাজ এবং গৌড়ের শাসক ধর্মপালকে পরাজিত করিলেও গৌড়রাজ্যের ক্ষতিসাধন করিতে পারেন নাই। কনৌজ অধিকার না করিয়াই তিনি দক্ষিণ ভারতে ফিরিয়া আসেন। পরে ধর্মপাল সমগ্র আর্যাবর্তই অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন।

ধ্রুব—ত্রিশক্তি সংগ্রাম

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে উত্তর ভারতের তিনটি প্রধান রাষ্ট্রশক্তি ছিল। এই রাষ্ট্রশক্তিগুলি হইল—(১) রাষ্ট্রকূট, (২) পাল এবং (৩) গুর্জর প্রতীহারদের রাজ্য। এই তিনটি রাষ্ট্রই চরম অবক্ষয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল। তখন ইহাদের অধীনস্থ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যগুলির পরাক্রম শক্তি বাড়িয়া

গুর্জর শক্তির উদ্ভব

চলিয়াছিল। ক্রমশঃ তাহারা পূর্বের শাসক রাজ্যসমূহকে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতাশালী দেখিল এবং নির্বিচারে তাহাদের উচ্ছেদ করিয়া চলিয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে গুর্জর প্রতীহারদের অধিকৃত ভূখণ্ডে উক্ত সময় আবির্ভাব ঘটিয়াছিল গুহিল, চৌহান (চাহমান), পারমার এবং চালুক্য (সোলাঙ্কি) রাজবংশ শাসিত রাজ্যসমূহ। অনুরূপভাবে পালবংশ শাসিত রাজ্যটিও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। এই পালবংশ শাসিত রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে পরাক্রমশালী সম্রাট হইয়া ওঠেন সামন্ত সেন-রাজবংশ। চৌহান-রাজবংশ বা বাহ্‌মনগণেরা রাজত্ব করিতেন পূর্ব ও মধ্য অঞ্চলের রাজস্থানের নিকট এবং গুজরাটের কিছু কিছু অংশ বিশেষে। পারমার রাজবংশের মূল ভিত্তি ছিল মালব দেশের উপরে তথাপি তাহারা রাজস্থান, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে কয়েকবার অভিযান চালাইয়াছিলেন। শোনা যায় যে, একাদশ শতকের মাঝামাঝিতে পারমার রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে। এর পর চান্দেল্ল রাজ্যের প্রধান কর্মকেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায় বুন্দেলখণ্ড। তথাপি সেই সময়ও দোয়াবের একটি অংশ বারাণসী এবং বিহারের অল্প কিছু অংশও চন্দেল্লদের অধিকারে ছিল। পূর্বে রাষ্ট্রকূট রাজ্যের অধীনে সামন্ত শাসিত প্রদেশ ছিল মধ্য ভারতে সামন্ত কলচুরি (হৈহয়) রাজ্য। এই সময় এই কলচুরি (হৈহয়) রাজ্য স্বাধীন হইয়া উঠে এবং ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত তাহারা নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিয়াছিল। অন্যদিকে গুজরাটে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল চালুক্য (সোলাঙ্কি) রাজবংশ।

চার □ তৃতীয় গোবিন্দ, তৃতীয় কৃষ্ণ, কল্যাণের চালুক্য এবং ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য

● **তৃতীয় গোবিন্দের সক্রিয়তা ঃ** পরবর্তী শাসক ছিলেন তৃতীয় গোবিন্দ (৭৯৩-৮১৪ খ্রীঃ)। রাজত্বের প্রথম দিকে তাঁহাকে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের কাজে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। অতঃপর তৃতীয় গোবিন্দ রাজ্য জয়ে উদ্যোগী হন। পল্লবরাজ দন্তিবর্মণ, বেঙ্গী রাজ চতুর্থ বিষ্ণুবর্মণ অবশ্য বিনা যুদ্ধেই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া নেন। দক্ষিণভারতে নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্থাপন করিয়া তৃতীয় গোবিন্দ পূর্ববর্তী

প্রতিহার ও পাল বংশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

শাসকের ন্যায় উত্তর ভারত হইয়া অগ্রসর হন। প্রথমেই প্রতিহার-রাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট তাঁহার হস্তে পরাজিত হইয়া রাজপুতনায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। অন্যদিকে ধর্মপালের অনুগৃহীত কনৌজের শাসক চক্রায়ুধ রাষ্ট্রকূট অভিযানের সংবাদ পাইবামাত্র বিনা যুদ্ধে পলায়ন করেন। ইহার পর তৃতীয় গোবিন্দ পাল-রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে ধর্মপাল তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। উত্তর-ভারতের আরও কয়েকটি রাজ্যও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া নেন। আনুগত্যের বিনিময়ে তৃতীয় গোবিন্দ তাঁহাদের রাজ্য ফিরাইয়া দেন। যাহা হউক, তৃতীয় গোবিন্দ উত্তরে নর্মদা হইতে দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে আপন আধিপত্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

অমোঘবর্ষ

তৃতীয় গোবিন্দর পর তাঁহার পুত্র অমোঘবর্ষ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন (৮১৪-৮৭৮) রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রথম দিকে তাঁহাকেও অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। অমোঘবর্ষ বিদ্রোহ দমন করিয়া সাম্রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন করেন। অবশ্য বেঙ্গীর (পূর্ব-চালুক্য) রাজাদের পরাজিত করা এবং গুর্জর প্রতিহাররাজ প্রথম ভোজের দক্ষিণ ভারত অভিমুখে অগ্রগতি রোধ করা ভিন্ন তাঁহার আর কোন উল্লেখযোগ্য সামরিক সাফল্য ঘটিয়াছিল কিনা জানা যায় নাই। কিন্তু ধর্ম ও সাহিত্যে আগ্রহী হিসাবে অমোঘবর্ষ প্রভূত যশের অধিকারী হইয়াছিলেন। হর্ষবর্ধনের ন্যায় তিনিও সাহিত্য রচনা ('রত্নমালিকা' ও 'কবিরাজ মার্গ') করিয়াছিলেন। তিনি একটি নূতন রাজধানী নির্মাণ করিয়াছিলেন। আরব পর্যটক সুলেমান তাঁহাকে বোগদাদের খলিফা, চীনের সম্রাট এবং কনষ্ট্যান্টিনোপল-এর অধিপতির

সমক্ষমতা ও সমমর্যাদাসম্পন্ন শাসক হিসাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন।

● **দ্বিতীয় কৃষ্ণ ঃ** অমোঘবর্ষের পুত্র দ্বিতীয় কৃষ্ণ শাসক হিসাবে বিশেষ সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই। ইহার পর তৃতীয় ইন্দ্র সামরিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকূটদের যশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর যথাক্রমে দ্বিতীয় অমোঘবর্ষ, চতুর্থ গোবিন্দ এবং তৃতীয় অমোঘবর্ষ-রাজত্ব করেন। ইহাদের আমলে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

তৃতীয় ইন্দ্র বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য শাসক

● **তৃতীয় কৃষ্ণ ঃ** অতঃপর সিংহাসনে আরোহণ করেন তৃতীয় কৃষ্ণ (৯৩৯-৯৬৭ খ্রীঃ)। তিনি ছিলেন এই বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা। তৃতীয় কৃষ্ণের রাজত্বকালে রাষ্ট্রকূট বংশ পুনরায় সামরিক সাফল্য অর্জন করে। চোল, পাণ্ড্য, কেরল প্রভৃতি রাজ্যের অধিপতিদের পরাজিত করিয়া তিনি সুদূর রামেশ্বরম্ পর্যন্ত রাষ্ট্রকূট আধিপত্য প্রসারিত করেন। কথিত আছে, সিংহলের রাজাও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। উত্তর ভারতেও তিনি বুন্দেলখণ্ড ও মালব অঞ্চলে সাফল্যের সহিত যুদ্ধ করেন।

তৃতীয় কৃষ্ণের পর রাষ্ট্রকূট বংশের দ্রুত পতন ঘটিতে থাকে। অবশেষে কল্যাণের চালুক্য বংশ রাষ্ট্রকূটদের নিকট হইতে দক্ষিণ ভারতের নেতৃত্ব অধিকার করিয়া নেন।

● **কল্যাণের চালুক্য বংশ ঃ** অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিদুর্গের নিকট পরাজিত হইলে বাতাপির চালুক্য বংশের পতন ঘটে। কিন্তু ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে চালুক্য বংশের দ্বিতীয় তৈল বা তৈলপ শেষ রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কর্ককে পরাজিত করিয়া চালুক্য শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটান। বর্তমান অন্ধ্র (হায়দ্রাবাদ) রাজ্যের কল্যাণ বা কল্যাণী ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। চালুক্যবংশের এই শাখাই 'কল্যাণের চালুক্য' বা পশ্চিমাংশের 'পরবর্তী চালুক্য বংশ' নামে ইতিহাসে পরিচিত।

যে সকল চালুক্যগণ কল্যাণীতে অবস্থান করিয়াছিল চোলগণ তাহাদের বেশ কয়েকবার যুদ্ধে পরাজিত করেন। ইহাছাড়া চোলেরা ওড়িষ্যা ও বঙ্গদেশেও বহুকাল ধরিয়া অভিযান চালাইয়া থাকেন। অনুমান করা হইয়াছে যে তাঁহারা যে সময় এই অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন সেই সময় তাঁহারা সুদূর গঙ্গাবক্ষ ধরিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য সদলবলে আসিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় তৈল বা তৈলপ চব্বিশ বৎসর রাজত্ব করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি উত্তরে নর্মদা ও দক্ষিণে গোদাবরী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হন। পরবর্তী শাসক সত্যাশ্রয়ের আমলে দক্ষিণ ভারতের আধিপত্য লইয়া চোল-চালুক্য বিরোধের সূত্রপাত হয়। সত্যাশ্রয় অবশ্য চোলাধিপতি রাজরাজের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া চালুক্য রাজ্যসীমা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সত্যাশ্রয়ের পুত্র দ্বিতীয় জয়সিংহ ও কলচুরি-রাজ গাঙ্গেয় দেব, পরমার-রাজ ভোজ এবং চোল-রাজ রাজেন্দ্র চোলের সম্মিলিত আক্রমণ হইতে চালুক্য-রাজ্যের অখণ্ডতা বজায় রাখিতে সমর্থ হন। জয়সিংহের পুত্র প্রথম সোমেশ্বরের রাজত্বকালে চোল-চালুক্য সংঘর্ষ তীব্র আকার ধারণ করে। দীর্ঘস্থায়ী এই সংগ্রামে পরাজিত হইলেও সোমেশ্বর রাজ্যের মূল অংশ হস্তচ্যুত হইতে দেন নাই। পরবর্তী শাসক দ্বিতীয় সোমেশ্বরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতা ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য নাম গ্রহণ করিয়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

দ্বিতীয় তৈলপ

দ্বিতীয় জয়সিংহ

● **ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য ঃ** (১০৭৬—১১২৬ খ্রীঃ) ইনি ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। ইনি ছিলেন একজন সার্থক ও দক্ষ সামরিক নায়ক। ইনি চোলদের পরাজিত করিয়া অন্ধ্রপ্রদেশ এবং হোয়েসলদের পরাভূত করিয়া মহীশূরের একাংশ আপন রাজ্যভুক্ত করিয়া নেন। অন্যদিকে, তিনি শিল্প ও সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 'বিক্রমাঙ্কদেব চরিতম্' গ্রন্থের (বিক্রমাদিতার জীবনী) রচয়িতা কবি বিহ্লন এবং 'মিতাক্ষরা'

ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য,বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক

গ্রন্থের লেখক বিজ্ঞানেশ্বর তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যর পর কল্যাণের চালুক্য বংশের পতন শুরু হয়। অবশেষে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হোয়েসল ও যাদবগণ চালুক্যরাজ্য দখল করিয়া লয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ || দক্ষিণ ভারত

এক □ পল্লব বংশ

●**পল্লব বংশ** ঃ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে বর্তমান তামিলনাড়ুর কাঞ্চীপুরমকে কেন্দ্র করিয়া পল্লব বংশের উত্থান হয় এবং খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে নবম শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণভারতে ও দাক্ষিণাত্যে এই বংশের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কেবল সামরিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও পল্লবদের অবদান স্মরণীয়ভাবে উল্লেখযোগ্য।

উৎপত্তি

কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত নামের সাদৃশ্য দেখিয়া 'পল্লব' ও বিদেশী 'পহ্লব' জাতিকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। পল্লবদের উৎস সম্পর্কে ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যেও বহু মতবিরোধ আছে। তাঁহাদের বিভিন্ন মতবাদের উপর ভিত্তি করিয়া বলা যায়, পল্লবদের উৎপত্তি এখনও রহস্যাবৃত রহিয়াছে।

সিংহ বিষ্ণু

সমুদ্রগুপ্তর সভাকবি হরিষেণ-রচিত এলাহাবাদ প্রশস্তিতে বিজিত রাজাদের মধ্যে পল্লবরাজ বিষ্ণুগোপের নাম থাকিলেও, পল্লবদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গৌরবের প্রতিষ্ঠাকারী হইলেন দ্বিতীয় সিংহবর্মণের পুত্র সিংহবিষ্ণু (আঃ ৫৭৫-৬০০ খ্রীঃ)। তিনিই প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে পরাস্ত করিয়া কাবেরী নদী পর্যন্ত রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটান। অন্যদিকে সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসাবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। 'কিরাতার্জুনীয়' গ্রন্থের লেখক ভারবি ছিলেন **সিংহবিষ্ণু** সভাকবি। কথিত আছে, তিনি পল্লব শিল্পের লীলাকেন্দ্র মহাবলীপুরমের স্থাপত্য কার্যের পত্তন করেন।

মহেন্দ্রবর্মণ

সিংহবিষ্ণুর পুত্র মহেন্দ্রবর্মণ (৬০০-৬৩০ খ্রীঃ) ছিলেন পল্লববংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তাঁহার সময় হইতে দাক্ষিণাত্যের প্রভুত্ব লইয়া চালুক্য ও পল্লবদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল লিপি হইতে জানা যায়, এই দ্বন্দ্বে মহেন্দ্রবর্মণ চালুক্যদের নিকট পরাজিত হন। ফলে, রাজ্যের উত্তরাংশের কিছু অংশ তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। সামরিক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইলেও, মহেন্দ্রবর্মণ সাহিত্যিক হিসাবে ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তিনি 'মত্ত-বিলাস-প্রহসন' নামে একটি ব্যঙ্গ-রসাত্মক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

নরসিংহ বর্মণ—পল্লব শক্তির প্রতিষ্ঠা

পরবর্তী শাসক নরসিংহবর্মণ (৬৩০-৬৮৮ খ্রীঃ) ছিলেন পল্লববংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি চালুক্য সম্রাট দ্বিতীয় পুলকেশীকে পর পর তিনবার পরাজিত করিয়া পল্লবশক্তিকে সমগ্র দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করেন। চালুক্য রাজধানী বাতাপি অধিকার করিয়া নরসিংহ বর্মণ 'মহামল্ল' উপাধি গ্রহণ করেন। পিতা ও পিতামহের ন্যায় তিনিও শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার আমলে মহাবলীপুরমের বিখ্যাত রথ মন্দির নির্মিত হয়। নরসিংহ বর্মণের রাজত্বকালের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়েন সাঙের পল্লব রাজ্য পরিদর্শন (৬৪০ খ্রীঃ)। হিউয়েন সাঙ পল্লব রাজ্যের শান্তি ও সমৃদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

নরসিংহবর্মণের পর হইতে পল্লব বংশের গৌরব ম্লান হইতে থাকে। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মণ মাত্র দুই বৎসর রাজত্ব করেন। পরবর্তী শাসক প্রথম পরমেশ্বর বর্মণের আমলে চালুক্যদের সহিত সংঘর্ষ পুনরায় শুরু হয়। চালুক্যরাজ প্রথম বিক্রমাদিত্য পল্লবদের পরাজিত করিয়া কাবেরী নদী পর্যন্ত অগ্রসর

প্রথম পরমেশ্বরবর্মণের পুত্র দ্বিতীয় নরসিংহবর্মণ পল্লব-গৌরব পুনরুজ্জীবিত করেন। তিনি কাঞ্চীর কৈলাসনাথ মন্দির এবং মহাবলীপুরমের বিখ্যাত Shore Temple সমুদ্রতীরের মন্দিরটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, খ্যাতনামা সংস্কৃত-পণ্ডিত দণ্ডি তাঁহার সভাকবি ছিলেন।

২য় নরসিংহবর্মণ

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য পল্লব-রাজ ছিলেন দ্বিতীয় নন্দীবর্মণ (৭৩০-৭৯৬ খ্রীঃ)। তাঁহার সময়ে চালুক্য-পল্লব সংঘর্ষ নূতন করিয়া শুরু হয়। এই দ্বন্দ্বে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য পল্লব-রাজকে পরাজিত করিয়া কাঞ্চী দখল করিয়া লইয়াছিলেন। নন্দীবর্মণ অবশ্য রাজধানী পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন। শাক্য রাজার সহিতও তাঁহার সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল, যদিও এই যুদ্ধের ফলাফল জানা যায় নাই। দ্বিতীয় নন্দীবর্মণের রাজত্বের শেষের দিকে পল্লব বংশের সহিত রাষ্ট্রকূট বংশের বিরোধ বাধে। রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিদুর্গ কাঞ্চী অধিকার করিলেও শেষ পর্যন্ত উভয় শাসকদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মোটামুটিভাবে বলা যায়, দ্বিতীয় নন্দীবর্মণ আপন রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

২য় নন্দীবর্মণ

দ্বিতীয় নন্দীবর্মণের পর দন্তিবর্মণ ৭৯৬ খ্রীঃ হইতে ৮৪০ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকালে পাণ্ড্য ও রাষ্ট্রকূটদের নিকট পল্লবগণ পরাজিত হয়। দন্তিবর্মণের পুত্র তৃতীয় নন্দীবর্মণ এবং তাঁহার পরবর্তী বংশধর পাণ্ড্যদের পরাজিত করিয়া পল্লব শক্তি কিয়ৎ পরিমাণে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইলেও তাহা স্থায়ী হয় নাই। পল্লববংশের শেষ রাজা অপরাজিতবর্মণকে পরাভূত করিয়া চোলরাজ প্রথম আদিত্য পল্লবরাজ্য অধিকার করিয়া নেন। ইহার পর পল্লব রাজ-পরিবারের বিলুপ্তি ঘটে।

দন্তিবর্মণ

দুই □ চোল সাম্রাজ্য

ভারতের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত চোলরাজের কথা মেগাস্থিনীসের বিবরণীতে ও অশোকের শিলালিপিতে এবং গ্রীক, রোমান ও তামিল রচনায় উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে চোল রাজ্যের উত্থান ঘটিলেও পল্লবদের অভ্যুদয়ে তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। পরবর্তীকালে নবম শতাব্দীতে পল্লব গৌরব অস্তমিত হইয়া গেলে চোল রাজ্য প্রবল হইয়া ওঠে এবং প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া দক্ষিণ ভারতের প্রবলতম রাজশক্তি হিসাবে তাহারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয়। বস্তুতপক্ষে চোল শাসন ভারত-ইতিহাসের এক মূল্যবান অধ্যায়।

চোল রাজ্যের নবশক্তির প্রতিষ্ঠাতা বিজয়ালয় (আঃ ৮৫০-৮৭১ খ্রীঃ) পল্লব ও পাণ্ড্যদের পরাজিত করিয়া দক্ষিণ ভারতের এক বিস্তৃত অঞ্চলে আপন আধিপত্য স্থাপন করেন। এই সময় হইতে পাণ্ড্যদের নিকট হইতে বিজিত তাঞ্জোর চোল রাজ্যের রাজধানী হয়। বিজয়ালয়ের পুত্র আদিত্য রাজ্যের স্বাধীন শক্তিকে আরও সুদৃঢ় করেন। তাঁহার পরে আসেন পুত্র প্রথম পরান্তক। তিনি পাণ্ড্য রাজ্য আক্রমণ করিয়া রাজধানী মাদুরা নগরী অধিকার করিতে সক্ষম হইলেও রাষ্ট্রকূট রাজ তৃতীয় কৃষ্ণের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। চোল রাজ্য সাময়িক ভাবে হীনবল হইয়া পড়ে।

বিজয়ালয়, আদিত্য, প্রথম পরান্তক

তিন □ প্রথম রাজরাজ ও প্রথম রাজেন্দ্র চোল

● **প্রথম রাজরাজ ঃ** নূতন করিয়া চোল-গৌরব প্রতিষ্ঠা করিলেন চোল-রাজ প্রথম রাজরাজ (৯৮৫—১০১৪ খ্রীঃ)। শুধু বংশের নয়, রাজরাজ দক্ষিণ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাটরূপে গণ্য হইয়াছেন। ইতিহাসে তাঁহাকে 'মহান' (Rajaraja the Great) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। রাজরাজ চোল সাম্রাজ্যকে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমার বাহিরেও প্রসারিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার বিপুল নৌ-বাহিনী ছিল। ইহার সাহায্যে একদিকে যেমন তিনি চের, পাণ্ড্য ও পূর্ব চালুক্য

রাজবংশের ক্ষমতা খর্ব করেন, অন্যদিকে তেমনি সিংহলের কিয়দংশ ও পশ্চিমসাগরস্থিত লাক্ষাদ্বীপ এবং মালয়দ্বীপও আপন সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এইভাবে তিনি এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধিকারী হন।

রাজ-রাজেশ্বর মন্দির

রাজরাজ শুধু একজন সার্থক যুদ্ধবিজেতাই নয়, শিল্প-সাহিত্য-স্থাপত্য প্রভৃতি বিষয়েও তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। তাঞ্জোরের বিখ্যাত রাজরাজেশ্বর মন্দির তাঁহার মহান কীর্তি। ইহা ব্যতীত আরও কয়েকটি বিষ্ণুমন্দির ও বৌদ্ধবিহারও তাঁহার আমলে নির্মিত হইয়াছিল। ধর্মে শৈব হইলেও তিনি অপর ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাজরাজার সময় হইতে স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া চোল শাসনব্যবস্থা গড়িয়া ওঠে। ইহা ছাড়া তিনি জমি জরিপেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এককথায় বলিতে গেলে, রাজরাজ ভারতের ইতিহাসের একজন খ্যাতকীর্তি শাসক।

● **প্রথম রাজেন্দ্র চোল ঃ** রাজরাজের পুত্র প্রথম রাজেন্দ্র চোল (১০১৮-১০৪৪ খ্রীঃ) দিগ্বিজয়ী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্বের ফলে চোল-সাম্রাজ্য গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে এবং সঙ্গত কারণেই তাঁহাকে চোলবংশের শ্রেষ্ঠতম নরপতির সম্মান দেওয়া হইয়া থাকে।

রাজেন্দ্র চোল

প্রথম রাজেন্দ্রচোল যুবরাজ হিসাবে পিতার সহায়ক ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর তিনি পিতার সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। দক্ষিণে তিনি পাণ্ড্য, ও সিংহল (শ্রীলঙ্কা) জয় করিয়া রাজ্যগুলিকে আপন সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। বেঙ্গি-নিবাসী পুর্বাঞ্চলীয় চালুক্য রাজাদের সহিতও তাঁহার সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই।

বাংলায় আধিপত্য ও রাজধানী স্থাপন

রাজেন্দ্র চোলের রাজ্য বিস্তার শুধু দক্ষিণ ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। রাষ্ট্রকূট প্রতিহারদের ন্যায় তিনিও উত্তরভারতে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী হন। উত্তর-ভারতে তাঁহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অভিযান হইল উড়িষ্যার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া বাংলাদেশ আক্রমণ। সমকালীন পাল রাজ মহীপাল এবং পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গের শাসকদ্বয়ও তাঁহার নিকট পরাজিত হন। গঙ্গানদীর দেশে জয়লাভের স্মারক হিসাবে তিনি 'গঙ্গইকোণ্ড চোলাপুরম্' নামে এক নূতন রাজধানী স্থাপন করেন।

যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও মালয় জয়

পিতার ন্যায় প্রথম রাজেন্দ্র চোলও এক বিপুল নৌ-বাহিনীর অধিকারী ছিলেন। চোল নৌ-বাহিনীর খ্যাতি তখন তুঙ্গে। এই বিশাল নৌ-বাহিনীর সাহায্যে তিনি সমুদ্র অতিক্রম করিয়া প্রথমে ব্রহ্মদেশের কিয়দংশ জয় করেন। অতঃপর ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম রাজেন্দ্রচোল সুমাত্রার শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজা বিজয়োতুঙ্গবর্মণ পরাজিত হইয়া বন্দী হন। ইহার ফলে যবদ্বীপ, সুমাত্রা, মালয় প্রভৃতি অঞ্চল রাজেন্দ্র চোলের কর্তৃত্বে চলিয়া আসে। এইভাবে চোলসাম্রাজ্যের বিজয় পতাকা গাঙ্গেয় উপত্যকা, সিংহলদ্বীপ ও বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়া যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও মালয় পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে উড্ডীন হয়।

বাণিজ্যের বিকাশ

প্রথম রাজেন্দ্র চোলের আমলে রাজনৈতিক ও সামরিক সাফল্যের ফলশ্রুতি হিসাবে বাণিজ্যেরও ব্যাপক প্রসার ঘটে। পশ্চিমে মালদ্বীপ ও সুদূর আফ্রিকা পর্যন্ত চোল রাজ্যের বাণিজ্যক্ষেত্র বিস্তৃত হয়।

পিতা রাজরাজের ন্যায় প্রথম রাজেন্দ্র চোলও শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন করেন। ইহা ব্যতীত, শিক্ষার প্রসারকল্পে তিনি একটি বিশিষ্ট বৈদিক-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন।

রাজাধিরাজ, দ্বিতীয় রাজেন্দ্র

প্রথম রাজেন্দ্র চোলের পর সিংহাসনে বসেন তাঁহার পুত্র রাজাধিরাজ। এই সময় পাণ্ড্য ও সিংহল রাজ চোল আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। রাজাধিরাজ এই বিদ্রোহ দমন করেন, কিন্তু এক চালুক্য রাজের হাতে তাঁহার প্রাণ বিসর্জিত হয়। পরবর্তী শাসক বীর রাজেন্দ্র চালুক্য আক্রমণ প্রতিহত করিয়া তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে একটি বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করেন। ইহার পর আসেন অধিরাজেন্দ্র। এই অত্যাচারী শাসককে শেষ পর্যন্ত আততায়ীর আঘাতে মৃত্যুবরণ করিতে হয়। অতঃপর রাজেন্দ্র চোলের দৌহিত্র তৃতীয় রাজেন্দ্রচোল 'কুলোত্তুঙ্গ' (১০৭০-১১২০ খ্রীঃ) চোল রাজ্যের অধীশ্বর হন। পিতৃকুলের দিক দিয়া তিনি ছিলেন পূর্বচালুক্য বংশীয়। সুতরাং তাঁহাকে চোল-চালুক্য বংশজাত বলা যায়। দীর্ঘ দিন শাসন করিলেও তিনি কোন শাসন কৌশল দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার পর হইতে চোল সাম্রাজ্যের পতন দ্রুততর হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাণ্ড্য শক্তি চোলরাজাদের ক্ষমতা খর্ব করিয়া প্রাধান্য অর্জন করিতে থাকে। অতঃপর চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে (১৩১০ খ্রীঃ) চোল রাজ্যের 'শেষ চিহ্ন' সুলতান আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুরের আক্রমণে বিলুপ্ত হয়।



সপ্তম অধ্যায়

সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি

এক □ বাংলা দেশের সমাজ ও সভ্যতা

সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাফল্য ও অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে পালযুগ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের বিচারে সেনযুগও বিশিষ্টতার দাবি করিতে পারে।

● **সামাজিক অবস্থা ঃ** পাল সম্রাটগণ ধর্মে বৌদ্ধমতাবলম্বী হইলেও বর্ণ ও চতুরাশ্রমের বৈদিক ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া চলিতেন। কিন্তু বিবাহ ও বৃত্তির ক্ষেত্রে এই আদর্শের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল।

বর্ণমিশ্রণ

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন, বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়াই পাল সম্রাটগণ বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার কঠোর প্রয়োগের প্রতি উৎসাহী ছিলেন না। ফলে, পাল আমলে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে মিশ্রণ ঘটিয়াছিল। সেন রাজগণ কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্মের নিষ্ঠাবান সমর্থক ছিলেন। সম্ভবতঃ ইসলাম ধর্মের আক্রমণ ও আকর্ষণ হইতে হিন্দু সমাজকে সুরক্ষিত করিবার জন্য বিধিনিষেধ ও আচার অনুষ্ঠানকে কঠোর নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলিন্য প্রথা সমাজকে আরও সংরক্ষিত রাখিবারই প্রয়াস। ইহার ফলে অবশ্য রক্ষণশীল মনোভাব দৃঢ় হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বাংলাদেশেও এই সময় নারী স্বাধীনতা প্রকৃতপক্ষে ছিল না। পুরুষের বহু বিবাহের বাধা না থাকিলেও বিধবা বিবাহ নিন্দিত ছিল। সহমরণ প্রথাও চালু ছিল। অবশ্য 'দায়ভাগ' গ্রন্থের লেখক জীমূতবাহনের মতে, ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র বাংলা দেশেই স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবার অধিকার স্বীকৃত ছিল। উচ্চবর্ণের মধ্যে নারী শিক্ষারও প্রচলন ছিল।

পাল ও সেন যুগের মানুষের জীবনযাত্রা বেশ স্বচ্ছল ছিল এবং নানারকম পূজাপার্বণ উৎসব ব্রত এবং আমোদ-আহ্লাদ দ্বারা তাহাদের জীবন আনন্দোচ্ছল হইয়া উঠিত। অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি

পোশাক-পরিচ্ছদ

সামাজিক আচার অনুষ্ঠানও সেই যুগে প্রচলিত ছিল। মহিলা ও পুরুষ উভয়ের মধ্যেই অলংকার ও সৌখীন সাজসজ্জা ব্যবহারের প্রচলন ছিল। পুরুষের পোশাক ছিল ধুতি ও উত্তরীয়, নারী পরিধান করিতেন শাড়ী। নারীরা ওড়নাও ব্যবহার করিতেন। বিবাহিত মহিলারা শাঁখা ও সিঁদুর ব্যবহার করিতেন। সেই যুগের বাঙালীদের প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, মাছ-মাংস, শাকসব্জী, ফলমূল, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য। নিন্দনীয় বলিয়া চিহ্নিত হইলেও মাদক পানীয়ের প্রচলন ছিল। দুর্গাপূজা, হোলি ইত্যাদি উপলক্ষে পান-ভোজন ও অশ্লীল নৃত্যগীতও চলিত।

নিম্নশ্রেণীর মানুষের জীবনে কিন্তু কোন স্বাচ্ছল্য ছিল না। চর্যাগীতিগুলিতে দরিদ্র জীবনের দুঃখ-বেদনা, অভাব-অনটনের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

তৎকালীন বাংলার অধিবাসীদের নৈতিক চরিত্র মোটের উপর অশোভন ছিল না। ধনী সমাজের মধ্যে অবশ্য দুর্নীতি ও অশ্লীলতা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সমাজে তাহা তেমন নিন্দার্হ ছিল না।

সমকালীন কাব্যসাহিত্যে ইহার উল্লেখ আছে। কিন্তু বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ সাধারণভাবে তৎকালীন বাঙালীর সাহস, উদ্যম ও বিদ্যোৎসাহিতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

● **সাংস্কৃতিক জীবন ঃ** পালযুগে বাংলাদেশে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়াছিল। ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা ও সোমপুরী বিহার ছিল জ্ঞানচর্চার বিশিষ্ট কেন্দ্র। ওদন্তপুরী বিহারে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন পাল সম্রাট ধর্মপাল। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন ওদন্তপুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হইলেন দেবপাল। যাহা হউক, এই বিশ্ববিদ্যালয়েই অতীশ-দীপংকর শিক্ষালাভ করেন। বৌদ্ধ দর্শন ও শাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য তাঁহাকে 'শ্রীজ্ঞান' উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে বৌদ্ধধর্মে শিক্ষা সংস্কার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং সেইখানেই দেহত্যাগ করেন। ভাগলপুরে গঙ্গার তীরে ধর্মপাল আরও একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইহার নাম বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় তিন হাজার ছাত্র বিনামূল্যে আহার ও বাসস্থান পাইতেন। নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি দূরবর্তী স্থান হইতে বিদ্যার্থীরা এইখানে আসিতেন। নালন্দার পরই বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছিল। সমকালীন ভারতের বহুখ্যাতনামা পণ্ডিত—মহাস্থবির বুদ্ধজ্ঞান পাদ, রাহুল ভদ্র, কল্যাণ রক্ষিত প্রমুখ—এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র, তর্ক ও গণিত শাস্ত্র, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র এবং কাব্য ও ব্যাকরণ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের পঠন-পাঠন এইখানে করা হইত। সোমপুরী বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বর্তমান রাজসাহী জেলায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, সেই সময় বৌদ্ধ ধর্মস্থান বা বিহারগুলিও শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠে।

শিক্ষা

পাল রাজগণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। অশোক এবং কণিষ্কের ন্যায় পাল সম্রাটগণও বৌদ্ধধর্ম বহির্ভারতে প্রসারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের আনুকূল্যে ও প্রচেষ্টায় তিব্বত ও পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃতি লাভ করে। বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটিলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রচার কখনই সংকুচিত হয় নাই। সেন যুগে অবশ্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এইসময় বিশেষ করিয়া, 'গীতগোবিন্দ'কে আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম নূতন গতিবেগ ও জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু রাজধর্ম যাহাই থাকুক না কেন, পাল ও সেন আমলে ধর্মীয় উদারতা বজায় ছিল। শাসকগণ অপর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকিতেন।

পালযুগে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর ঘটে। বুদ্ধের ধর্মমতের আদি শুষ্ক যুক্তিবাদ পরিহার করিয়া সাধারণ মানুষের উপযোগী করিয়া বৌদ্ধধর্মের নবরূপায়ণ ঘটে। 'বজ্রযান', 'কালচক্রযান' ইত্যাদি ছিল এই লোকায়ত বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন রূপ। ইহা ব্যতীত 'সহজিয়া ধর্ম' নামেও একটি ধর্মমত গড়িয়া উঠে। সাধারণতঃ ইহা সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সহজিয়া ধর্মমতের আচার্যগণ 'সিদ্ধাচার্য' নামে পরিচিত ছিলেন। সহজিয়া ধর্মমতে আচার অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইত না।

সাহিত্য ক্ষেত্রে পালযুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বাংলাভাষার উদ্ভব। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত 'চর্যাপদ'-এর মধ্যেই প্রাচীনতম বাংলাভাষার নমুনা পাওয়া গিয়াছে। চর্যাপদ হইল বৌদ্ধ সাধুদের সাধন-ভজনের গান। চর্যাপদের ২৪ জন পদকর্তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন লুইপাদ ও কাহ্নপাদ।

সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে পালযুগের প্রধান গ্রন্থ ছিল সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত'। ইহা একটি দ্ব্যর্থবোধক কাব্য—একদিকে শ্রীরামচন্দ্রের লীলা বর্ণনা, অন্যদিকে পালরাজ রাম পালের জীবনের বিবরণ। ইহা ছাড়া, দর্শনশাস্ত্র রচয়িতা শ্রীধর ভট্ট ও ভবদেব ভট্ট, চরক ও সুশ্রুত লিখিত গ্রন্থদ্বয়ের

বিখ্যাত টীকাকার আয়ুর্বেদাচার্য চক্রপাণি দত্ত এবং 'দায়ভাগ' গ্রন্থের রচয়িতা জীমূতবাহনও এই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতীশ দীপঙ্করও বৌদ্ধ দর্শনের বহু পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। পালযুগের বাংলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চাকে কবি বাণভট্ট 'গৌড়ীরীতি' নামে এক স্বতন্ত্র রীতিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সেন যুগ বাংলাদেশে 'সংস্কৃত কাব্যের সুবর্ণ যুগ'। কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের এক বিখ্যাত কাব্য। জয়দেব ব্যতীত, লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় আরও চারিজন কবি—শরণ, ধোয়ী, গোবর্ধন ও উমাপতি ধর উপস্থিত ছিলেন। অপর এক সাহিত্যিকের নাম হলায়ূধ। রাজা বল্লাল সেন স্বয়ং 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে দুইখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্য

শিল্পকলার ক্ষেত্রেও পাল যুগ স্মরণীয়। বাংলাদেশের প্রাচীন পুঁথিতে বৌদ্ধ বিহার, স্তূপ ও দেবদেবীর মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলার এই প্রাচীন শিল্প নিদর্শনগুলি প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষ হইতে এক উন্নত শিল্পরীতির সন্ধান পাওয়া যায়। অষ্টম শতাব্দীতে ধর্মপাল পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারটি নির্মাণ করেন। ইহা সোমপুরী মহাবিহার নামে ইতিহাসে পরিচিত। বিশালতায় এই বিহারটি ভারতবর্ষে অদ্বিতীয় ছিল। ডঃ সরসীকুমার সরস্বতীর মতে বিহারটি ছিল পাঁচতলা, ইহাতে ১৮০টি কক্ষ ছিল। কক্ষগুলির চারিদিকে ছিল অলিন্দ। তারপরে ছিল প্রশস্ত অঙ্গন। অঙ্গনটি ছিল উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। অঙ্গনটির মধ্যস্থলে একটি মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মন্দিরে বাংলার ভাস্কর্য শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। রামায়ণ-মহাভারত ও কৃষ্ণের লীলা কাহিনী বাদে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কাহিনীও ইহাতে খোদিত আছে। শিল্পীশ্রেষ্ঠ ধীমান ও এবং তাঁহার পুত্র বীতপাল এই ভাস্কর্য শিল্পের গৌরব দাবি করিতে পারেন। বাংলার ভাস্কর্য শিল্পের প্রভাব বহির্ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তিব্বতের সর্বপ্রথম বৌদ্ধ বিহার ওদন্তপুরীর স্থাপত্যশিল্পের অনুকরণে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া শোনা যায়। তেমনই কথিত আছে যে, সোমপুরী বিহারের অনুকরণে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে বহু স্থাপত্য রহিয়াছে। পাল ও সেন আমলের পোড়ামাটির ফলক, কষ্টি পাথরের এবং পিতল কিম্বা অষ্টধাতুর তৈয়ারী মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত মূর্তি দুই-একটি পাওয়া গিয়াছে। সেন যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন শূলপাণি। ই সময় চিত্র শিল্পেরও বিকাশ ঘটিয়াছিল। রামপালের আমলে পুঁথির উপর আঁকা চিত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পালযুগের চিত্রকলায়ও লোকশিল্পের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পরিকল্পনার দিক হইতে ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের মধ্যে গভীর সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়

শিল্প-কলা

পালযুগের ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষতা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করিয়াছেন, "মূর্তিগুলি কোমল অথচ সংযত, ভাবপ্রবণ অথচ ধ্যানস্থ, লীলায়িত অথচ দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত"।

● **অর্থনৈতিক জীবন ঃ** পাল ও সেন যুগের সমাজ ও শাসনব্যবস্থায় সামন্ত প্রথার লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। শাসকগণ নগদ অর্থে বেতন না দিয়া কর্মচারীদের জায়গির বন্দোবস্ত দিতেন। অন্যদিকে, অর্থনীতি ছিল মূলতঃ বৃষ্টিনির্ভর। ধান, পাট, নীল, ইক্ষু ও তুলা বাংলার প্রধান উৎপন্ন শস্য ছিল। আর নারিকেল, কলা, লঙ্কা, পান, সুপারী ইত্যাদির ফলনও ভাল ছিল। বাংলার সুগন্ধী সালী ধানের খ্যাতি বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। আখের রস হইতে প্রস্তুত গুড় ও চিনি বিদেশে রপ্তানি হইত। বাংলায় উচ্চমানের তুলা উৎপাদিত হইত। অর্থশাস্ত্র হইতে মার্কোপোলোর বিবরণীতে বাংলার কার্পাস-বস্ত্রের সপ্রশংস উল্লেখ আছে। বাংলার এই বস্ত্র শিল্পের খ্যাতি ছিল সর্বজনবিদিত। বাংলার সূতীবস্ত্রের, বিশেষ করিয়া মসলিনের চাহিদা ছিল সর্বত্র। ভারতবর্ষের বাহিরেও তাহা রপ্তানি হইত।

কৃষি ও শিল্প

বয়নশিল্প ব্যতীত, বাংলায় তৎকালীন সময়ে জাহাজ নির্মাণ শিল্পও গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহা ছাড়া, পিতল ও কাঁসার বাসনও বিখ্যাত ছিল। কাষ্ঠশিল্পও যথেষ্ট উন্নত ছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও, পাল ও সেনযুগে বাংলার খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক, মেদিনীপুর জেলা) এবং সপ্তগ্রাম (বর্তমান সাঁত গা, হুগলীতে) ছিল বহির্বাণিজ্যের প্রধান বন্দর। এই দুই বন্দর হইতে বাংলার পণ্য রপ্তানি হইত সিংহল, ব্রহ্মদেশ, চম্পা, কাম্বোজ, যবদ্বীপ, মালয়, চীন প্রভৃতি দেশে।

কিন্তু কৃষিজাত পণ্যের প্রাচুর্য এবং বাণিজ্যের প্রসার ঘটিলেও সমানুপাতে বাংলার সমৃদ্ধি ঘটে নাই। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করিয়াছেন, বাংলায় সেই সময় স্বর্ণমুদ্রার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পাল শাসকগণ রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা চালু করিলেও তাহা পর্যাপ্ত ছিল না। সুতরাং আর্থিক দিক হইতে বিশেষ করিয়া সাধারণ মানুষ খুব সমৃদ্ধিবান ছিলেন না।

● দক্ষিণ ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি ●

বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণস্থ অঞ্চলসমূহ দাক্ষিণাত্য নামে পরিচিত। আর্যজাতির আগমনের বহু পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষের এই অংশে এক বিশিষ্ট সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া সম্পূর্ণভাবে আর্যপ্রভাব মুক্ত হইয়া দক্ষিণ ভারতে এই স্বকীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল। কালক্রমে তথায় আর্যজাতির অনুপ্রবেশ ঘটে এবং আর্য-অনার্য সংমিশ্রণের ফলে এক নূতন সমাজ ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে। ডঃ নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর মতে, খ্রীষ্টপূর্ব এক হাজার অব্দ হইতে দক্ষিণ ভারতে ধীর গতিতে আর্য অনুপ্রবেশ ঘটিতে শুরু করে এবং মৌর্য আমলে আর্যীকরণ সমগ্র অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হয়। কালক্রমে দক্ষিণভারতের বিশিষ্ট রাজশক্তিসমূহ—সাতবাহন, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, পল্লব, চোল এই আর্যীকরণ সমগ্র দাক্ষিণাত্যে গভীরভাবে প্রোথিত করে এবং সংস্কৃতিগতভাবে ভারতে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

আর্যীকরণ

দক্ষিণ ভারতের সমাজ জীবনের প্রথম সুস্পষ্ট চিত্র 'সঙ্গম' যুগের (খ্রীষ্টীয় প্রথম হইতে চতুর্থ শতাব্দী) তামিল সাহিত্য হইতে পাওয়া যায়। উক্ত সূত্র হইতে জানা যায়, ঐ সময় হইতে আদিম তামিলসমাজে আর্য প্রভাব ক্রমশঃ দৃঢ় হইতে থাকে। মহাকাব্যদ্বয়ে বর্ণিত ঘটনাবলী এবং আর্যাবর্তের রূপক কাহিনীগুলি ঐ যুগের তামিল সাহিত্যে স্থান পাইয়াছিল। কালের বিচারে মৌর্য যুগে উত্তর ভারতের সংস্কৃতি দক্ষিণ ভারতে অনুপ্রবেশ করিলেও সাতবাহন রাজাদের আমলেই (খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতক হইতে খ্রীষ্টীয় ২য় শতক পর্যন্ত) দক্ষিণ ভারতে আর্য সংস্কৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

সঙ্গম যুগের সমাজে সাধারণভাবে মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ছিল এবং সঙ্গীত, নৃত্য, কাব্যালোচনা প্রভৃতি সুকুমার কলাচর্চায় তাহারা নিয়ত নিরত থাকিত। সমাজে নারী উচ্চ সম্মানের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু বৈধব্য জীবনের কঠোরতা বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হয় নাই। সহমরণ প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। পুনর্জন্ম ও কর্মবাদে মানুষের গভীর বিশ্বাস ছিল।

সঙ্গমযুগের অবসানের (চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দ) পর প্রায় দুই শতাব্দী কালের দক্ষিণভারতের সামাজিক ইতিহাস পাওয়া যায় নাই। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে পুনরায় সমাজজীবনের সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া গিয়াছে। চালুক্য, রাষ্ট্রকূট ও চোলশক্তির শাসনকালে বর্ণভেদ ও চতুরাশ্রম প্রথা দক্ষিণ ভারতের সমাজে পুরোপুরি প্রচলিত ছিল। সামাজিক অনুশাসনও কঠোর হইয়াছিল। তথাপি অনেক সময় জাতিগত জীবিকা গ্রহণ করা হইত না। সমকালীন অনুশাসন হইতে জানা যায়, এই সময় দক্ষিণ ভারতে মিশ্র জাতির উদ্ভব ঘটিয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের সমাজ-বিন্যাসে উত্তর ভারত হইতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গিয়াছে। চোল রাষ্ট্র প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ ও শূদ্র শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য শ্রেণীর মানুষ ছিলেন নিতান্তই স্বল্প। ব্রাহ্মণগণ আবার নাম্মুদ্রি এবং নায়ার নামে দুইটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। শূদ্ররাও কর্মের ভিত্তিতে দ্বিধাবিভক্ত ছিল। অবশ্য চালুক্য, রাষ্ট্রকূট শাসনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ক্ষত্রিয় প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। আর্য সভ্যতার ক্রমপ্রসারণের ফলে আস্তে আস্তে

মিশ্র জাতির উদ্ভব

উত্তরের মত দক্ষিণ ভারতেও জাতিভেদ প্রথা কঠোর হইয়া উঠিতে থাকে।

সমাজে কৃষক জনগণই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। অবশ্য সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক প্রভৃতি শ্রেণীও এইসময় হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল। সমাজ ছিল মূলতঃ গ্রামকেন্দ্রিক। দক্ষিণ ভারতের সমাজ ব্যবস্থার এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রাধান্য। সাতবাহন রাজগণের নামকরণ মাতার নামানুসারে হইত, যথা, গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী, বশিষ্ঠীপুত্রী পুলমায়ী ইত্যাদি। দক্ষিণ ভারতে শাসনকার্যেও নারীগণ অংশগ্রহণ করিতেন। সাতবাহন রাজমহিষী নায়নিকা দেবী এবং বাকাটক রাজমহিষী প্রভাবতী গুপ্তর নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণ ভারতে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছিল। সাধারণতঃ মন্দিরগুলি ছিল প্রধান শিক্ষা-কেন্দ্র। সেখানে ধর্মশাস্ত্রের সহিত দর্শন, অর্থনীতি, দণ্ডনীতি, আয়ুর্বেদ ও জ্যোতির্বিদ্যাও পঠিত ও অধীত হইত। শাস্ত্রালোচনার বাহন ছিল সংস্কৃত ভাষা। কাঞ্চী, বেলগাঁও, দেবগিরি প্রভৃতি অঞ্চলগুলি ছিল বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র।

দক্ষিণ ভারতের সামাজিক ইতিহাসের অপর বৈশিষ্ট্য হইল স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার বিকাশ। বিশেষ করিয়া চোল যুগে, এই বিকাশ ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। "কেন্দ্রীয় শাসনশৃংখলাকে অটুট রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ব্যাপারে সকলের সহযোগিতাকে উৎসাহ দেওয়া, অধিকার স্বীকার করা এবং তৎকালের উপযোগী প্রতিনিধি-প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়া শাসনের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন চোল শাসনের সমুজ্জ্বল কীর্তি।"

অগস্ত্য ঋষি ও শ্রীরামচন্দ্রের দক্ষিণ ভারতে গমনের কাহিনীর মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার মিলনের ইঙ্গিত রহিয়াছে বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে করিলেও, মৌর্য যুগের পূর্বে দক্ষিণ ভারতের ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। মৌর্য যুগে অবশ্য দাক্ষিণাত্যে, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সাতবাহন যুগের সময় হইতেই দক্ষিণ ভারত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উপাসনা এই সময় হইতেই ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়াছিল।

ধর্মবিপ্লব

বিভিন্ন রাজপরিবারভুক্ত সম্রাটগণ অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে বিশেষ ধর্ম বিরোধ ছিল না। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে শৈব ও বৈষ্ণবগণ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই আন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল 'ভক্তি'। যে কয়জন দার্শনিক ও ধর্ম প্রচারকগণের নেতৃত্বে এই 'ধর্মবিপ্লব' ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন শংকরাচার্য, কুমারিল ভট্ট, রামানুজ, মাধবাচার্য ও বাসব। কুমারিল ভট্ট বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের সমর্থক। শংকরাচার্য অদ্বৈতবাদের প্রচার করেন। তাঁহার মতে, "ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় এবং ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা"। তিনি ভারতের চারি প্রান্তে চারিটি মঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন—মহীশূরের শৃঙ্গেরী মঠ, দ্বারকার সারদা মঠ, পুরীর গোবর্ধন মঠ এবং বদরিকাশ্রমে যোশী মঠ। এই আন্দোলনের ফলে বৌদ্ধধর্মের প্রায় বিলুপ্তি ঘটে। রামানুজ ও মাধবাচার্য ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তাঁহাদের মতে জ্ঞানের পরিবর্তে ভক্তি দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়।

দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে সপ্তম শতাব্দীতে অন্ধ্রদেশে বৌদ্ধধর্মের কিঞ্চিৎ প্রভাবের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্রমশঃ স্তিমিত হইতে থাকে এবং বহু বৌদ্ধ মন্দির হিন্দুর পূজার স্থানে পরিণত হয়।

দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের তুলনায় জৈন ধর্ম কিন্তু অধিকভাবে প্রসারিত হইয়াছিল। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত শেষ জীবনে জৈন ধর্মকেন্দ্র শ্রবণবেলগোলায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। হাতীগুম্ফা শিলালিপি, কলিঙ্গরাজ খারভেলকে 'জৈন-ভিক্ষু-রাজরূপে' বর্ণনা করা হইয়াছে। হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে জৈন প্রভাবের কথা উল্লিখিত আছে। রাষ্ট্রকূট রাজ প্রথম অমোঘবর্ষ এবং পূর্ব চালুক্য ও গঙ্গরাজগণের মধ্যে অনেকেই জৈন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইলোরার জৈন গুহামন্দিরগুলি এবং দ্বিতীয় পুলকেশীর আমলে নির্মিত আইহোলের জৈনমন্দির সমাজে জৈন প্রভাবের স্বাক্ষ্য বহন করে।

আর্য অনুপ্রবেশ ঘটিবার পূর্বেই দক্ষিণ ভারত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুনিয়ার সহিত সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়াছিল। Periplus of the Erythrean Sea নামক গ্রন্থে প্রাচীন দক্ষিণ ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। শোনা যায়, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের শেষের দিকে পাণ্ড্য রাজার দূত রোম সম্রাট অগাষ্টাসের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরবর্তিকালে, হিউয়েন সাঙের এবং মার্কোপোলোর বিবরণীতেও দক্ষিণ ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যের কথা বলা হইয়াছে। কাবেরীপত্তন ছিল প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। সিংহল মালয়, সুমাত্রা, জাভা, লাক্ষাদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করা হইত। প্রবাল, মসলিন ও মশলা ছিল প্রধান রপ্তানি পণ্য। সাধারণতঃ স্বর্ণ ও কাঁচ নির্মিত পাত্র আমদানি করা হইত। সামুদ্রিক বাণিজ্য বিস্তারে চোল যুগ বিশেষ কৃতিত্ব দাবি করিতে পারে।

● সংস্কৃতি ঃ প্রাচীনকাল হইতে দক্ষিণ ভারতে সাহিত্য বিকাশ লাভ করিয়াছিল। সংস্কৃত ও স্থানীয় তামিল, তেলেগু, কানাড়া ও মালয়ালাম ভাষাতে এইসব সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় লেখকদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন 'কিরাতার্জুনীয়ম্' রচয়িতা ভারবি এবং 'দশকুমারচরিত' রচয়িতা 'দণ্ডিন্'। কাহারও কাহারও মতে, ন্যায়সূত্রের ব্যাখ্যাতা বাৎসায়ন দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী ছিলেন। নবম শতাব্দীর সাধক কুলশেখরও 'ভক্তিরসাপ্লুত' কাব্য রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। গুরু শংকরাচার্য ও রামানুজও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহাদের দর্শন ও ধর্মমত সম্পর্কিত পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া চালুক্য সভাকবি বিহ্লন রচিত 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত' ও দ্বিতীয় পুলকেশীর সভাসদ রবি কীর্তির 'আইহোল প্রশস্তিগাথা' উন্নত সাহিত্যকীর্তি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মণ স্বয়ং 'মত্ত-বিলাস-প্রহসন' নামে একটি ব্যঙ্গ রসাত্মক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, সংগীতশাস্ত্রের উপরও তাঁহার রচিত একটি পুস্তক ছিল। ডঃ নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর মতে, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতির ব্যাখ্যা সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়।

সাহিত্যের বিকাশ

তামিল সাহিত্য সুপ্রাচীনত্বের গৌরব দাবি করিতে পারে। প্রাচীন তামিল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ তিরুভল্লুভার রচিত 'কুরুল' নামের ভক্তি ও নীতিমূলক কাব্য বর্তমান কালেও দক্ষিণ ভারতের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গ্রন্থ। শৈব ও বৈষ্ণব সাধকগণ রচিত ভক্তিমূলক কাব্যগুলিও উৎকৃষ্ট সাহিত্যকীর্তির মূল্যবান নিদর্শন। জৈন গ্রন্থ 'শিলপ্পাদিকরম্' ও বৌদ্ধগ্রন্থ 'মণি মেকলাই' হইতে উক্ত ধর্মদ্বয় ও সমাজের অনবদ্য চিত্র পাওয়া যায়। রাষ্ট্রকূট রাজগণের আনুকূল্যে কানাড়া ভাষারও উন্নতি ঘটে। রাষ্ট্রকূট রাজ প্রথম অমোঘবর্ষ স্বয়ং কাবতত্ত্ব সম্বন্ধে কানাড়া ভাষায়, 'কবিরাজমার্গ' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। দার্শনিক গ্রন্থ 'রত্নমালিকা' এই সময়েই রচিত হয়।

"স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে দক্ষিণ ভারতের বৈভব বিপুল, বিস্ময়কর, অপরিমিত বলিলে কোন অতিরঞ্জন দোষ ঘটিবে না।" চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, পল্লব, চোল, হোয়েসল প্রভৃতি রাজবংশের অমূল্য অবদানে এই শিল্পকলা সমৃদ্ধ হইয়াছে।

চালুক্য আমলে পাহাড় কাটিয়া মন্দির নির্মাণের রীতি অনুসৃত হইয়াছিল। চালুক্য শাসকগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী হওয়ায় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব প্রমুখ হিন্দু দেবতাদের স্মরণে ও শ্রদ্ধায় তাঁহারা বহু মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। শিল্প-ঐতিহাসিকরা মন্তব্য করিয়াছেন, চালুক্য সাম্রাজ্যের সর্বত্র—প্রত্যন্ত গ্রামেও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে, রাজধানী বাতাপীর (বাদামির) গুহা-মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ দেবমূর্তিগুলি অপূর্ব ভাস্কর্যের অপরূপ নিদর্শন। চালুক্য রাজ মঙ্গলেশ ষষ্ঠ শতাব্দীতে একটি বিষ্ণু মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরটি একটি অখণ্ড পাথর কাটিয়া তৈয়ারি করা হইয়াছে। মেগুটির শিবমন্দিরটিও প্রস্তর দ্বারা নির্মিত। আইহোলের গোলাকৃতি বিষ্ণু মন্দিরটি এই যুগের অপর এক অভিনব শিল্পকীর্তি। এই মন্দিরটি বৌদ্ধ বিহারের স্থাপত্য ধারায় নির্মিত। মন্দির গাত্রের ভাস্কর কার্য অতুলনীয়। চালুক্য অধিপতি দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের

চোলকীর্তি

মহিষীর আনুকূল্যে পট্টদকলে যে বিরূপাক্ষ শিব মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল, শিল্প সমালোচক হ্যাভেল তাহার স্থাপত্যরীতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। চালুক্য শিল্পরীতির একটি বৈশিষ্ট্য হইল বাহুল্যের প্রতি আকর্ষণ।

চালুক্য শাসনকালে বৌদ্ধ স্তূপ ও বিহার এবং জৈন মন্দিরও নির্মিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের আমলে নির্মিত জৈন মন্দিরটি শিল্প রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

চালুক্য রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্রশিল্পেরও বিকাশ ঘটিয়াছিল। বিখ্যাত অজন্তা ও ইলোরা গুহাদ্বার ছিল চালুক্য রাজ্যের অন্তর্গত। অজন্তার বহু গুহাচিত্র এই সময় অঙ্কিত হইয়াছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন "অজন্তার একটি গুহাচিত্রে পুলকেশীর রাজসভায় পারস্য সম্রাটের দূতের আগমন চিত্রিত হইয়াছে।"

রাষ্ট্রকূট রাজ প্রথম কৃষ্ণের আমলে নির্মিত ইলোরার কৈলাসনাথ মন্দির স্থাপত্য শিল্পের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বিষয়গত কাহিনী এই গুহা মন্দিরগুলিতে খোদিত আছে। সঙ্গত কারণেই তাই ইলোরাকে "ভারতীয় সভ্যতার ত্রিবেণী সঙ্গম" আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। "ইলোরায় অসংখ্য শিল্পী যে মৌলিক চিন্তা, কর্মনৈপুণ্য, ধৈর্য ও আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষের ঐতিহ্যে তাহার মূল্য নির্ধারণ সম্ভব নহে।"

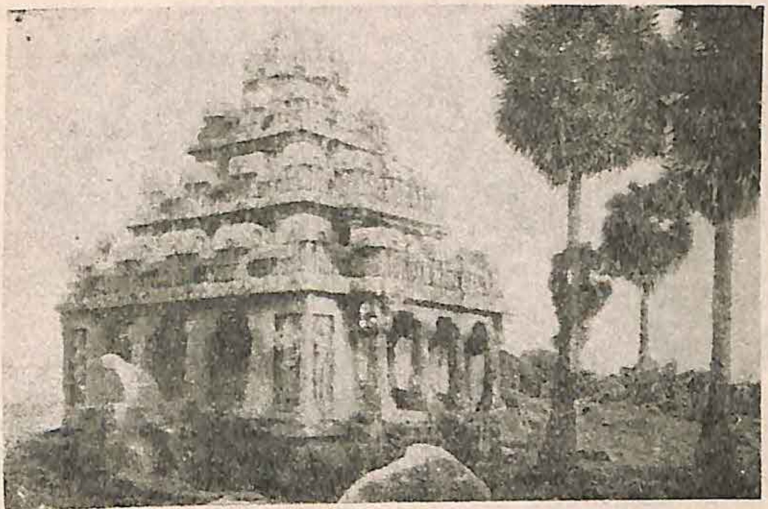
দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য শিল্প পল্লব রাজগণের অবদানে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছিল। পল্লব শিল্পকলায় কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ কাষ্ঠের পরিবর্তে প্রস্তরকে উপাদান হিসাবে গ্রহণ করিবার কৌশল ও রীতি এই সময়েই সর্বপ্রথম অনুসৃত হয়। অখণ্ড পাহাড় কাটিয়া রথ বা মন্দির নির্মাণ করিতে পল্লব যুগের শিল্পীগণ যে অসামান্য দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন, শিল্পের ইতিহাসে তাহা বিরল ও বিস্ময়কর। দ্বিতীয়তঃ, "পল্লব শিল্পে রহিয়াছে স্বল্পায়তন স্থাপত্যের সামঞ্জস্য।" সূক্ষ্ম সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে পল্লব শিল্পধারা যে সাফল্য প্রদর্শন করিয়াছে তাহাতে পাশ্চাত্যের শিল্প সমালোচকগণও বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। পল্লব শিল্পধারায় চারিটি স্তর দেখিতে পাওয়া যায়— মহেন্দ্র রীতি, মহামল্ল রীতি, রাজসিংহ রীতি এবং অপরাজিত রীতি। (১) মহেন্দ্র রীতির প্রবর্তক ছিলেন রাজা মহেন্দ্রবর্মণ। এই ধারার বৈশিষ্ট্য ছিল, একটি অখণ্ড পাহাড় কাটিয়া উহার অভ্যন্তরভাগে গুহা মন্দির নির্মাণ করা। মন্দিরের থামগুলি ছিল চতুষ্কোণাকৃতি (cubical pillars) এবং লিঙ্গ বা বা বিগ্রহ ছিল গোলাকৃতি (circular)। মন্দিরের প্রবেশপথে দ্বারপালের মূর্তি খোদিত থাকিত। কাঞ্চীর একাম্বরনাথ মন্দির ছিল এই শ্রেণীভুক্ত। (২) পরবর্তী শাসক নরসিংহবর্মণ একটি স্বতন্ত্র রীতি অনুসরণ করেন যাহা 'মহামল্ল' রীতি নামে পরিচিত। নরসিংহবর্মণ অবশ্য প্রথম দিকে পূর্বসূরীর শিল্পধারাই অনুসরণ করিয়াছিলেন। পদুকোট্টাইও ত্রিচিনাপল্লীর ত্রিমূর্তি, বরাহ ও দুর্গার গুহামন্দিরগুলি পূর্বোক্ত রীতিতেই নির্মাণ করা হয়। কিন্তু এই মন্দিরগুলির বহির্ভাগ ছিল অত্যন্ত কারুকার্যময় এবং থামগুলি ছিল উপবিষ্ট সিংহমূর্তির আকারে খোদিত। পরবর্তিকালে তিনি পর্বতগাত্র খোদিত করিয়া রথাকারে মন্দির নির্মাণ করেন। তাঁহার নূতন রাজধানী মহাবলীপুরমে তিনি পাহাড় কাটিয়া পঞ্চপাণ্ডবের নামে পাঁচটি রথ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

পল্লব শিল্পের বৈশিষ্ট্য

মহামল্ল রীতিতে পল্লব ভাস্কর্য শিল্প অতুলনীয়ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রস্তর খোদাই করিয়া জীবনের প্রাণময় প্রকাশে পল্লব যুগের শিল্পীগণ অসামান্য দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাবলীপুরমের 'গঙ্গাবতরণে'র (ফলকটি ৩০ গজ লম্বা ও ২৩ ফুট উঁচু) ভাস্কর্যের প্রাণবন্ত রূপ ভারতীয় শিল্পের এক স্মরণীয় ঐশ্বর্য। এই শিল্প নিদর্শনটি 'অর্জুনের তপস্যা' নামেও পরিচিত। মহাবলীপুরমের গুহা মন্দিরস্থ মহিষমর্দিনী দেবী, অনন্ত শয্যায় বিষ্ণু, পদ্মাসনা লক্ষ্মী ইত্যাদি ভাস্কর্য নিদর্শন কলা রসিকদের নিকট অমূল্য সম্পদরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। (৩) 'রাজসিংহ রীতি'তে তৈয়ারী মন্দিরগুলি প্রস্তর ও ইষ্টক নির্মিত এবং শীর্ষদেশ পিরামিডের ন্যায় ধাপে ধাপে উপরে উঠিয়া সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে। কাঞ্চীর কৈলাসনাথ মন্দির এবং মহাবলীপুরমের সমুদ্র সৈকতের

শিল্পরীতি

মন্দির এই রীতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই মন্দিরগুলির স্থাপয়িতা ছিলেন দ্বিতীয় নরসিংহবর্মণ রাজসিংহ। (৪) পল্লব বংশের সর্বশেষ নৃপতি অপরাজিতবর্মণ যে শিল্পধারা অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহা



মহাবলীপুরম

অপরাজিত রীতি' নামে পরিচিত। পণ্ডিচেরীর সন্নিকটে বাহুর নামক স্থানের একটি মন্দির এই ধারাতে নির্মিত। মন্দিরস্থ লিঙ্গ ছিল বেলনাকার (cylindrical) এবং শীর্ষদেশ ছিল অপূর্ব 'কারুকার্যময় এবং দর্শনীয়।

পল্লব যুগে চিত্রকলার বিকাশ দেখা দেয়। পদুকোট্টাই অঞ্চলে পল্লব চিত্রকলার নিদর্শন পাওয়া যায়।

বিশালতার গাম্ভীর্যে এবং শিল্পরীতির লালিত্যে চোলযুগের শিল্পকলা ভারতবর্ষের এক অনন্য ও স্বতন্ত্র যুগ। এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল গগনচুম্বী মন্দির তোরণ বা গোপুরম্। তোরণগাত্র হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে চিত্রিত ও খোদিত। অভ্যন্তরস্থ মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া রহিয়াছে সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ, সুগভীর সরোবর ও প্রশস্ত উদ্যান। প্রধান মন্দিরের শীর্ষস্থানে রহিয়াছে 'বিমান' বা গম্বুজ। তাঞ্জোরের রাজরাজেশ্বরী মন্দির, গঙ্গইকোণ্ড-চোলপুরম, চিদাম্বরম, ত্রিচিনাপল্লী এবং মাদুরায় অসংখ্য মন্দির এবং সেখানকার "সীমাহীন ভাস্কর্য গৌরবে চোল শিল্পের যে স্বাক্ষর রহিয়াছে তাহা ইতিহাসে ভাস্বর হইয়া থাকিবে।" তাঞ্জোরের রাজরাজেশ্বরী মন্দিরকে "ভারতের বৃহত্তম, উচ্চতম এবং সর্বাপেক্ষা উচ্চাকাঙ্ক্ষা-সম্পন্ন ধর্মীয় মন্দির বলিয়া অভিহিত করা হয়।" দশম শতাব্দীর শেষের দিকে প্রথম রাজরাজ এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। এই মন্দিরের স্থাপত্যে একটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য স্থানে গোপুরমের উচ্চতা মূল মন্দিরের উচ্চতার অধিক। এক্ষেত্রে মন্দিরের উচ্চতা গোপুরমের উচ্চতাকে ছাপাইয়া গিয়াছে। মন্দির চূড়ার উচ্চতা ৬৫ মিটার বা ১৯৭ ফুট। মন্দিরের মাথার গম্বুজটি একটি বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ অখণ্ড ২৫ ফুট উচ্চ গ্রাফাইট পাথরের তৈয়ারী। পাথরটির ওজন ৮০ টন। মন্দিরের মধ্যকার লিঙ্গমূর্তির উচ্চতা ১৩ ফুট। তাঞ্জোর, মাদুরা, ত্রিচিনাপল্লী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে মন্দিরগাত্র অপূর্ব চিত্র কাহিনী দ্বারা খোদিত। শিল্পরসিক ফার্গুসন বলিয়াছেন, "চোল শিল্পীগণ দানবসুলভ পরিকল্পনাকে মণিকারের সূক্ষ্মতা সহকারে রূপদান করিয়াছেন। চোল শিল্পের অপর একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন তাম্র বা ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তিগুলি। ইহাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিল চিদাম্বরমের নটরাজ মূর্তি। "নটরাজের নৃত্যের ছন্দে জীবন ও মৃত্যুর ছন্দময় অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। অজন্তার কয়েকটি গুহামন্দিরও এই যুগে নির্মিত হইয়াছিল।

হোয়সল বংশের শিল্পকীর্তির বিশিষ্ট নিদর্শন মহীশূরের হালেবিড় মন্দির। সন্নিকটে রহিয়াছে বেলুড় ও সোমনাথপুরের শিল্প নিদর্শনগুলি। বিস্ময়ের কথা এই যে, যেখানে স্বল্প পরিসরে সহস্রাধিক হস্তিমূর্তি



নটরাজ মূর্তি



রাজরাজেশ্বরের মন্দির

খোদিত আছে সেখানেও "সুসমঞ্জস সুষমার অভাব দেখা যায় না।"

খ্রীষ্টীয় সপ্তম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কে উড়িষ্যার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের সুবর্ণযগ বলা

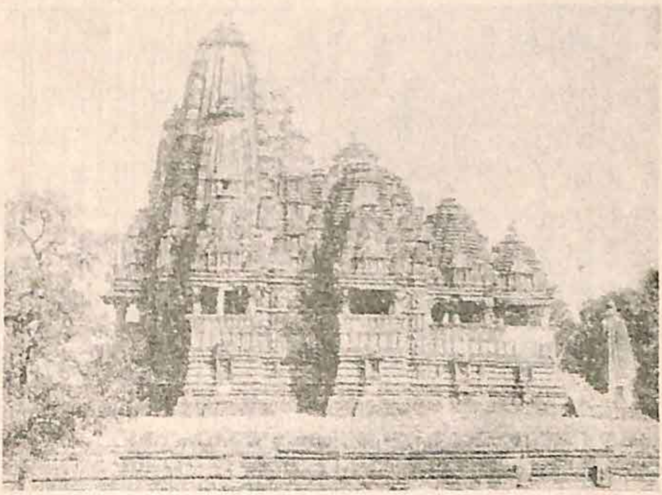


কোনারকের শিল্প নিদর্শন

যায়। উড়িষ্যার কর ও গঙ্গ বংশ এই কলাশিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত লিঙ্গ রাজ মন্দির কর রাজাদের আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভুবনেশ্বরের আরও অজস্র মন্দিরের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল 'রাজরাণী মন্দির'। গঙ্গবংশের বিখ্যাত নৃপতি অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ (১০৭৮-১১৪৭)

পুরীর সুবিখ্যাত জগন্নাথ মন্দিরের নির্মাণকার্য শুরু করেন। চোড়গঙ্গের প্রপৌত্র তৃতীয় অনঙ্গভীম (১২১১-৩৯ খ্রীষ্টাব্দ) জগন্নাথ মন্দিরের নির্মাণকার্য সমাপ্ত করিয়াছিলেন। পরবর্তী শাসক প্রথম নরসিংহর আমলে নির্মিত কোণারকের সূর্যমন্দিরের শিল্প সৌন্দর্য সমগ্র পৃথিবীর শিল্প রসিকদের সবিস্মিত প্রশংসা অর্জন করিয়াছে।

প্রতিহার শক্তির দুর্বলতার সুযোগ লইয়া বর্তমান মধ্যপ্রদেশের বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে চন্দেল্ল শক্তি গড়িয়া উঠে। 'খর্জুর বাহক' বা বর্তমান খজুরাহোতে এই বংশের অন্যতম রাজধানী ছিল। চন্দেল্ল বংশের দুই কৃতি শাসক ছিলেন ধঙ্গ ও কীর্তিবর্মণ। সংস্কৃতি ও কলার ক্ষেত্রে চন্দেল্লগণের অবদান প্রসিদ্ধ। অনুপম ভাস্কর্য সমন্বিত খজুরাহোর মন্দিরগুলি তাঁহাদের রাজত্বকালেই নির্মিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত এই মন্দিরগুলি নির্মিত হইয়াছিল। বহু মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া

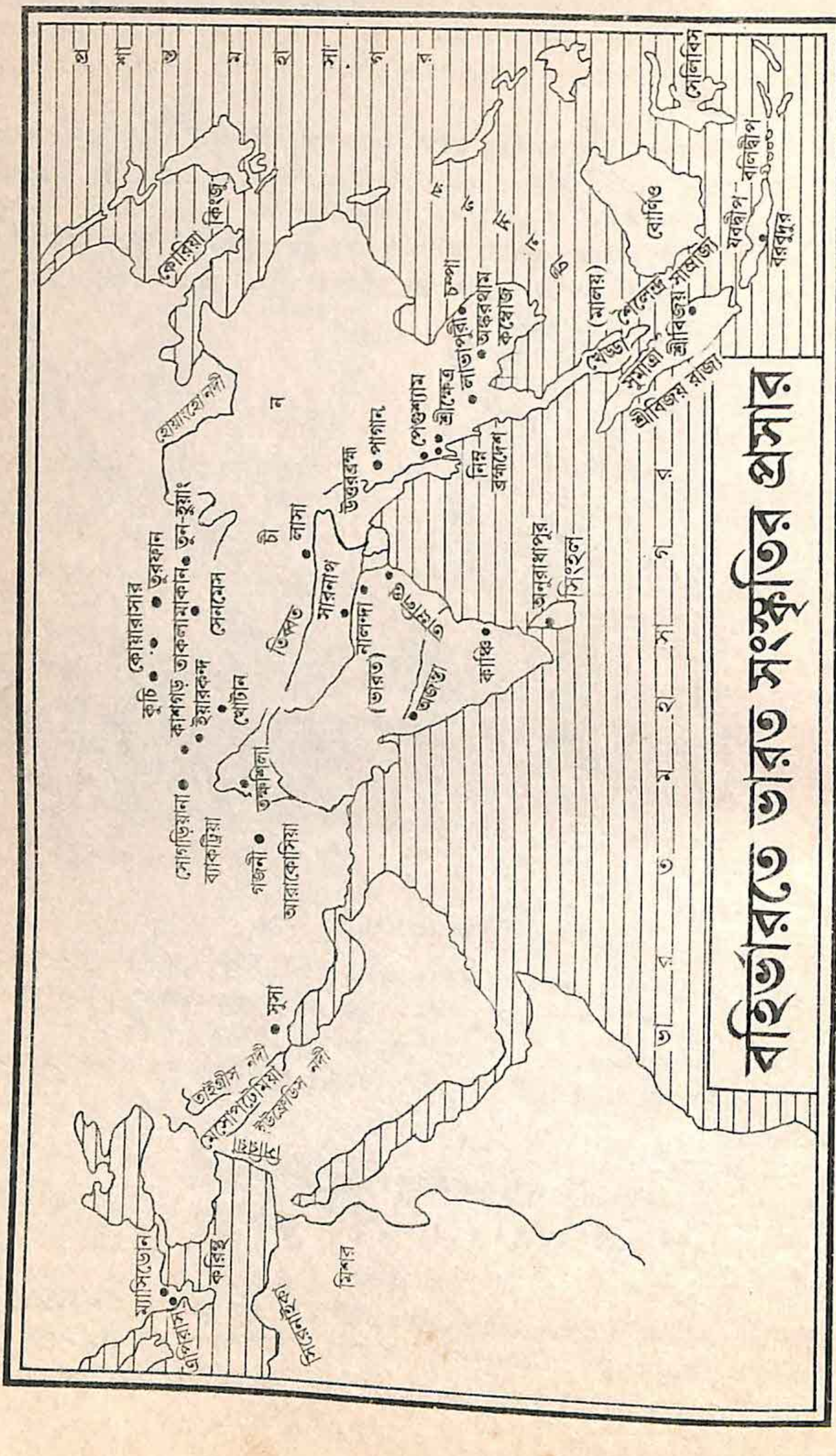


খজুরাহোর মন্দির

বর্তমানে ২৫টি অক্ষত আছে। খজুরাহোর মন্দিরগুলিতে মধ্য ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিটি মন্দির চারিটি অংশে বিভক্ত। মন্দিরের গর্ভগৃহ অলঙ্কারবহুল। খজুরাহোর মন্দিরগুলির ভাস্কর্য এক অনুপম শিল্পসৃষ্টি। "রূপের পূজারী শিল্পী এখানকার মন্দিররাজিতে জীবনরসের প্রবাহ ঢালিয়া স্বর্গমর্ত্য একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন—রাখিয়া গিয়াছেন অকৃপণভাবে তাঁহার শিল্প নৈপুণ্যের অপূর্ব নিদর্শন।"

দুই □ বহির্জগতের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্র

ইতিহাসের প্রথম পর্ব হইতেই ভারতবর্ষের সহিত বহির্জগতের যোগাযোগ চলিয়া আসিতেছিল। সিন্ধু সভ্যতার আমলে ভারতীয় বণিকগণ সুমেরীয় বণিকদের সহিত পণ্যের আদান প্রদান করিতেন। পূর্ব আফ্রিকার উপকূল অঞ্চলের সঙ্গেও ভারতের যোগাযোগ ছিল প্রাগৈতিহাসিক সময় হইতে।


বহির্ভারতে ভারত সংস্কৃতির প্রসার
কোরিয়া
কিউ
হোয়াংহো নদী
কোয়ারাসার
কুচি
তুরফান
তুন-হুয়াং
কাশগড়
তাকলামাকান
ইয়ারকন্দ
খোটান
সেনসেন
সোগডিয়ানা
ব্যাকট্রিয়া
গজনী
তক্ষশিলা
আরাকোসিয়া
তিব্বত
লাসা
সারনাথ
নালন্দা
তাম্রলিপ্ত
(ভারত)
অজন্তা
কাঞ্চি
অনুরাধাপুর
সিংহল
উত্তরব্রহ্ম
পাগান
পেগু
শ্রীক্ষেত্র
নিম্ন ব্রহ্মদেশ
দ্বারাবতী
অঙ্করধাম
কম্বোজ
চম্পা
(মালয়)
শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য
সুমাত্রা
শ্রীবিজয়
শ্রীবিজয় রাজ্য
বোর্নিও
সেলিবিস
যবদ্বীপ
বালিদ্বীপ
বরবুদুর
সুসা
তাইগ্রীস নদী
মেসোপটেমিয়া
ইউফ্রেটিস নদী
ম্যাসিডোন
এফিসাস
করিন্থ
মিশর
নীলনদ
ভা র ত ম হা সা গ র

জাতকের কাহিনীতে উল্লেখ আছে, ভারতীয় বণিকগণ ব্যবিলনে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে জনৈক গ্রীক লিখিত একটি পুস্তকে ভারতের বাণিজ্য পথ ও বাণিজ্যদ্রব্যের বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। এই সময় ইথিওপিয়া, জর্ডন ও পারস্য উপসাগরের দক্ষিণস্থ দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। গজদন্ত ও স্বর্ণের পরিবর্তে ইথিওপিয়ায় প্রেরিত হইত ভারতের মসলিন বস্ত্র। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে ভারত হইতে রপ্তানি করা হইত প্রধানতঃ সূতীবস্ত্র। অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে ছিল তামা, চন্দনকাঠ প্রভৃতি।

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত রোমের সহিত ভারতের ব্যাপক বাণিজ্য চলিত। ভারতের রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মসলিন ও রেশম তন্তু, গজদন্ত নির্মিত শিল্পদ্রব্য, মশলা, মূল্যবান রত্ন, দামী প্রস্তর ইত্যাদি। রোমানরা স্বর্ণমুদ্রায় জিনিস ক্রয় করিতেন। দক্ষিণ ভারতে প্রচুর রোমান স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, "তখন প্রতি বৎসর ৫৫ কোটি রোমান মুদ্রা পরিমাণ মূল্যের জিনিস ভারত রপ্তানি করিত।" সুতরাং প্লিনী যে অভিযোগ করিয়াছেন, ভারতের সহিত বাণিজ্যে রোমের প্রচুর অর্থব্যয় হইয়াছে, তাহা অযৌক্তিক নহে। হূণ আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর রোমের সহিত বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যায়।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে কিছু কিছু চৈনিক দ্রব্য ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইতে শুরু হইয়াছিল। অর্থশাস্ত্রে 'চীনাংশুক' (China silk)-এর উল্লেখ আছে। চীনের সহিত বাণিজ্য চলিত স্থল পথে। এই বাণিজ্য পথ 'রেশমের রাস্তা' (silk-route) নামে ইতিহাসে খ্যাত। চীন হইতে ভারতের উত্তরে ব্যাকট্রিয়া এবং সেখান হইতে রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত এই পথ প্রসারিত ছিল। ক্রমশঃ মধ্য এশিয়ার ভিতর দিয়া চীনের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও প্রসারিত হয়। আবার অন্যদিকে, এই ঘনিষ্ঠতার ফলে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্য-সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান ছিল ভারত ও চীনের যাত্রাপথের মধ্যে। এই অঞ্চলটি ছিল মসলার জন্য বিখ্যাত। রোমান সাম্রাজ্যে মসলার দারুণ চাহিদা থাকিবার ফলে, ভারতীয় ব্যবসায়ীরা মসলা সংগ্রহের জন্য মালয়, সুমাত্রা, জাভা, কাম্বোডিয়া, বোর্নিও প্রভৃতি স্থানে পাড়ি দিতে থাকিলেন।' পল্লব ও চোল আমলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সহিত ভারতের বাণিজ্য বিপুলভাবে বাড়িয়া গিয়াছিল। সিংহল, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশের সহিতও পণ্য আদান-প্রদান করা হইত।

গুপ্ত আমলে ভারতীয় জাহাজগুলি নিয়মিত আরবসাগর, ভারত মহাসাগর এবং চীন সাগরের বন্দর গুলিতে যাতায়াত করিত। এই সময় পশ্চিম ভারতের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল ভারাচ (ব্রোচ) ও ক্যাম্বে এবং পূর্ব ভারতের তাম্রলিপ্তি (তমলুক)। চোল শাসনকালে, বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার জন্য দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল কাবেরী পত্তনম। চোল রাজত্বকালে পশ্চিম এশিয়ার সহিতও ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল। চোল রাজারা আরব দেশ হইতে উৎকৃষ্ট অশ্ব আমদানি করিতেন।

কালক্রমে এই বাণিজ্যের মারফৎ ভারতীয় ধর্ম ও সাহিত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে।

● **সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঃ** পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার সুবিস্তৃত অঞ্চলের সহিত বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় সংস্কৃতির সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। পারস্য সম্রাট দরায়ুস এবং গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের ফলে, পশ্চিম এশিয়ার সহিত ভারতের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইয়াছিল। অশোকের অনুশাসন হইতে জানা যায়, ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি সিরিয়া, ম্যাসিডন, মিশর প্রভৃতি দেশে দূত পাঠাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া, তিনি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে যথা, সিংহল, সুবর্ণভূমি ইত্যাদি স্থানে বৌদ্ধধর্মপ্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। এইভাবে তিনি বৌদ্ধধর্মকে সমগ্র এশিয়াতে পরিব্যাপ্ত

চীন ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক

করিবার এক সফল প্রচেষ্টা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্রাট কণিষ্কের আমলে মধ্য এশিয়াতে বৌদ্ধধর্ম আরও প্রসারিত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্মকে আশ্রয় করিয়া পূর্বোক্ত রাজ্যগুলির সহিত ভারতীয় সভ্যতার গভীর সংযোগ স্থাপিত হয়। চতুর্থ শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এবং সপ্তম শতাব্দীর তীর্থযাত্রী হিউয়েন সাঙ মধ্য এশিয়ার পথ অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশকালে ঐ সব অঞ্চলে বৌদ্ধ ও ভারতীয় সভ্যতার বহু কেন্দ্রের অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। স্যার অরেলস্টাইন প্রমুখ পণ্ডিতগণ মধ্য এশিয়ার মরু অঞ্চল খনন করিয়া কয়েকটি ভারতীয় নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন। খোটান, কাশগড়, ইয়ারখন্দ সমরখন্দ প্রভৃতি অঞ্চলেও ভারতবর্ষের ধর্ম ও সংস্কৃতির বহু চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। বহু স্থানে সংস্কৃত ভাষায় সংকলিত পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম প্রসারের ফলে বহু প্রাচীনকাল হইতে চীন দেশের সহিত ভারতের সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। কথিত আছে, বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক কাশ্যপমাতঙ্গ এবং ধর্মরত্নের সঙ্গে জনৈক চৈনিক সম্রাটের দূতের আনুমানিক ৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এক সাক্ষাৎকার ঘটে। ইহার পর হইতেই চীনের সহিত ভারতের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হইতে থাকে। কুমারজীব, সংঘভূতি, ধর্মমিত্র প্রমুখ বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের মাধ্যমে চীন ও ভারতের মধ্যকার সম্পর্ক নিবিড় হইয়া উঠে। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে চীনে প্রথম বৌদ্ধ মন্দির স্থাপিত হইয়াছিল। কালক্রমে উহা চীন সাম্রাজ্যের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বৌদ্ধশাস্ত্রের মূল গ্রন্থগুলি এবং অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, বসুবন্ধুর দর্শনশাস্ত্রসমূহ চীনা ভাষায় অনূদিত হইল এবং ভারতবর্ষ হইতে শত শত পণ্ডিত আমন্ত্রিত হইয়া চীন দেশে অধ্যাপনায় রত হইলেন। অন্যদিকে, বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার জন্য ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ, ইৎসিং প্রমুখ পরিব্রাজকগণ শাক্যমুনির দেশ—এই ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিশ্ববিশ্রুত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া ও তীর্থস্থানসমূহ দর্শন করিয়া আত্মশুদ্ধ হইয়া তাঁহারা স্বদেশে ফিরিয়াছিলেন। শুধু বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধশাস্ত্র নয়, কালক্রমে ভারতীয় সঙ্গীত, চিকিৎসা শাস্ত্র, গণিত ও বিজ্ঞানও চীনদেশে প্রসারিত হইয়াছিল এবং পণ্ডিতগণের নিকট পরম সমাদর লাভ করিয়াছিল। ভারতের স্থাপত্য, ভাস্কর্য, ও চিত্রাঙ্কন ধারার প্রভাবও চৈনিক শিল্পরীতিকে প্রভাবিত করিয়াছিল। ভারতের গুহামন্দির নির্মাণ-পদ্ধতি ও মূর্তিগঠনের কৌশল চীনদেশের শিল্পীগণ অনুসরণ করিতে থাকেন। পৃথিবীর এই দুই সুপ্রাচীন সভ্য দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক নিবিড়তা প্রাচীন যুগের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি অতঃপর চীনের মধ্য দিয়া মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া এবং জাপানে প্রসারিত হয়। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং-র রচনা হইতে জানা যায়, বৌদ্ধশাস্ত্র ও দর্শন অধ্যয়ন করিবার জন্য কোরিয়া হইতে পাঁচজন পরিব্রাজক ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। কোন কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন, অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে বোধিসেন নামে জনৈক বৌদ্ধ শাস্ত্রবিদ দক্ষিণভারত হইতে জাপানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎকালীন জাপানী সম্রাট তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত বরণ করিয়া জাপানী বৌদ্ধ সংঘের অধ্যক্ষপদে নিয়োগ করেন।

নিকটতম প্রতিবেশী তিব্বতের সহিত ভারতের সংযোগ সুপ্রাচীন। সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচলন ঘটে। ঐ সময় হইতে বহু বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির সেইখানে নির্মিত হয় এবং সংস্কৃত ভাষার চর্চাও শুরু হয়। পরবর্তিকালে তিব্বতীয় বৌদ্ধগণ বিক্রমশীলা ও নালন্দায় বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আসেন এবং বহু পবিত্র গ্রন্থ নিজেদের ভাষায় অনূদিত করেন। প্রাচীন বাংলার পাল রাজাদের সহিত তিব্বতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বিখ্যাত বাঙালী পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতের রাজার অনুরোধে একাদশ শতাব্দীতে তিব্বতে উপস্থিত হন এবং সেইখানে বৌদ্ধধর্মের সংস্কারে ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি শেষ পর্যন্ত ঐ দেশেই দেহ রক্ষা করেন এবং আজও তিব্বতবাসিগণ শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার নাম স্মরণ করেন।

মহামতি অশোকের সময় হইতে ভারত সিংহল যোগাযোগের সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্ম

প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি স্বীয় পুত্র ও কন্যা (মতান্তরে ভ্রাতা ও ভগিনী) মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রাকে সিংহলে পাঠাইয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক সিংহলরাজ মেঘবর্মা সম্রাটের অনুমতিক্রমে সিংহলীয় বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীগণের জন্য বুদ্ধগয়ায় একটি সংঘারাম নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন ভগবান বুদ্ধের স্মারকচিহ্ন হিসাবে তিনি বুদ্ধের পবিত্র দন্ত মগধের অন্তর্গত দন্তপুর হইতে সিংহলে লইয়া গিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে সিংহলের সহিত ভারতের সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির সহিত সিংহলের রাজনৈতিক ও সামরিক রেষারেষি থাকিলেও সেখানে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার ব্যাহত হয় নাই। সিংহলের স্থাপত্য ও চিত্রাঙ্কন প্রভৃতির উপরও ভারতীয় শিল্পধারার গভীর প্রভাব পড়িয়াছিল। অনুরাধাপুরের শিল্পকলার প্রকৃতি একান্ত ভাবেই ভারতীয়।

সিংহল ও ভারতের সম্পর্ক

সিংহলের মত ব্রহ্মদেশেও সম্রাট অশোক ধর্মপ্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। কথিত আছে, শোণ ও উত্তর নামে দুইজন ভিক্ষু ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া, ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন স্থানে যে সব ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাদের মাধ্যমেও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার ঘটে। বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম, এমন কি তান্ত্রিক মতবাদও বিস্তার লাভ করে। ব্রহ্মদেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা এবং শিল্প রীতিও ভারতীয় ঐতিহ্যে পুষ্ট। ত্রিভুবনাদিত্য ধর্মরাজা (১০৮৪-১১২২ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠিত 'আনন্দ মন্দিরের' শিল্পরীতি দেখিয়া মনে হয় উহা ভারতীয় স্থপতিদেরই দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। ভারতের পালি ভাষাতেই সেখানকার ধর্মগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন স্থানের ও নদীর এবং প্রাচীন রাজন্যবর্গের নাম হইতে, যেমন শ্রীক্ষেত্র (রাজ্য), ইরাবতী (নদী), অনিরুদ্ধ (শাসক), তথায় ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারত ও ব্রহ্মদেশ

অতি প্রাচীনকাল হইতেই 'সুবর্ণদ্বীপ' বলিয়া পরিচিত মালয় উপদ্বীপ ও সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় ছিল। কালক্রমে বহু ভারতীয় ক্ষত্রিয় পরিব্রাজক প্রচারক ও শিল্পীর দল ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য তথায় বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। এইভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রবেশ ঘটে। বহু রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিলেও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রভাব এখনও সেখানে লক্ষিত হয়।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক হইতেই সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের সহিত শ্যাম রাজ্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। শোনা যায়, মগধ হইতে শ্যামদেশে (থাইল্যাণ্ড) বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এই রাজ্যটিকে বলা হইত দ্বারবতী। কালক্রমে এই স্থানে বহু ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। ফলে, থাইল্যাণ্ডের (শ্যাম) প্রাচীন সভ্যতার উপর ভারতীয় সংস্কৃতির গভীর প্রভাব পড়িয়াছিল।

বর্তমান কাম্বোডিয়ার প্রাচীন নাম ছিল কম্বোজ বা কাম্বুজ। চীনবাসীরা এই রাজ্যকে বলিত ফু-নান। শোনা যায়, কৌণ্ডিণ্য নামে জনৈক হিন্দু খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে কম্বোজে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। দীর্ঘদিন ধরিয়া তথায় হিন্দু রাজগণ রাজত্ব করেন। কম্বোজের হিন্দু রাজগণের প্রচেষ্টায় ও আনুকূল্যে ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা ঐ অঞ্চলের সর্বত্র প্রসারিত হইয়াছিল। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, ভারতীয় ধর্ম (শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ) ও দর্শন এবং সামাজিক অনুশাসন ও জাতিভেদ প্রথা—এককথায় সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র হিসাবে এই প্রাচীন রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। রাজা যশোবর্মণের রাজধানী যশোধরপুরের (বর্তমান আঙ্কোরধাম) মন্দির ও মঠে, তোরণ ও প্রাকারে ভারতীয় ধর্ম ও শিল্পরীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। মন্দিরের (শহরের মধ্যস্থলে বিখ্যাত 'বেয়ন' শিবমন্দির অবস্থিত ছিল) গাত্রে হিন্দু পুরাণ কাহিনী খোদিত আছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা সূর্যবর্মণ কম্বোজের বিখ্যাত অঙ্কোরভাট বিষ্ণু মন্দির নির্মাণ করেন। কয়েকটি মঞ্চ অতিক্রম করিয়া মূল মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। জলবেষ্টিত এই মন্দিরের পরিবেশ অতি মনোরম। রামায়ণ ও মহাভারতের বহু কাহিনী এই

মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ আছে। গঠনসৌন্দর্যে ও ভাব গভীরতায় আঙ্কোরভাটের এই বিষ্ণু মন্দির বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কীর্তি।



অঙ্কোরভাটের বিষ্ণুমন্দির

কম্বোজের নিকটবর্তী পূর্বদিকে আসাম অঞ্চলে চম্পা রাজ্যে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয় এবং সহস্রার্ধিক বৎসর ধরিয়া ঐ অঞ্চলে হিন্দু রাজগণ রাজত্ব করেন। ইহাদের মধ্যে ঈশ্বরমূর্তি, হরিবর্মণ, জয়সিংহবর্মণ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। চম্পায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ছিল প্রবল। প্রধান উপাস্য দেবতাগণ ছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। কোন কোন অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মও প্রচারিত হইয়াছিল। চম্পার শাসকগণ ধর্মীয় সহনশীলতা অনুসরণ করিতেন। চম্পারাজ্যে ভারতীয় দর্শন এবং সামাজিক ব্যবস্থা ও সমাজরীতিও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। বর্ণভেদ ও সতীদাহ প্রথাও সমাজে চালু ছিল। অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল, চম্পায় রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিল সংস্কৃত।

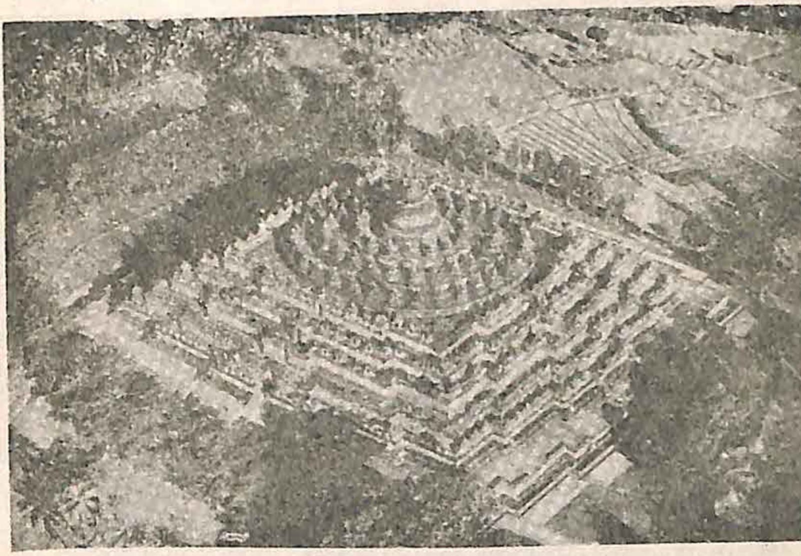
খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় ও পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যকালে মালয় উপদ্বীপে হিন্দু উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ধ্বংসাবশেষ ও শিলালিপি হইতে জানা যায়, এক সময় তথায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম এবং সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সুমাত্রার 'শ্রীবিজয়কে' কেন্দ্র করিয়া একটি শক্তিশালী হিন্দু রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং-এর রচনা হইতে জানা যায় শ্রীবিজয় রাজ্যটি বৌদ্ধ ধর্মের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। জাভা বা যবদ্বীপেও ভারতীয় উপনিবেশের অস্তিত্ব ছিল এবং স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় সভ্যতার প্রসার ঘটিয়াছিল। বোর্ণিওর পুরাকালের ধ্বংসস্তূপ হইতে ধারণা করা যায়, প্রাচীনকালে এই অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ ও তাহার সূত্রে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ঘটিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বলিদ্বীপে একটি সমৃদ্ধশালী হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া এই হিন্দু রাজ্যের অস্তিত্ব বজায় ছিল। বলিদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে বহু হিন্দু দেবতার—ব্রহ্মা, গণেশ মহাকাল ইত্যাদি মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখনও বলিদ্বীপে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব বর্তমান। অধিবাসীদের নামের ভিতরও ভারতীয় ঐতিহ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ—মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও, ও বলিদ্বীপ শৈলেন্দ্র

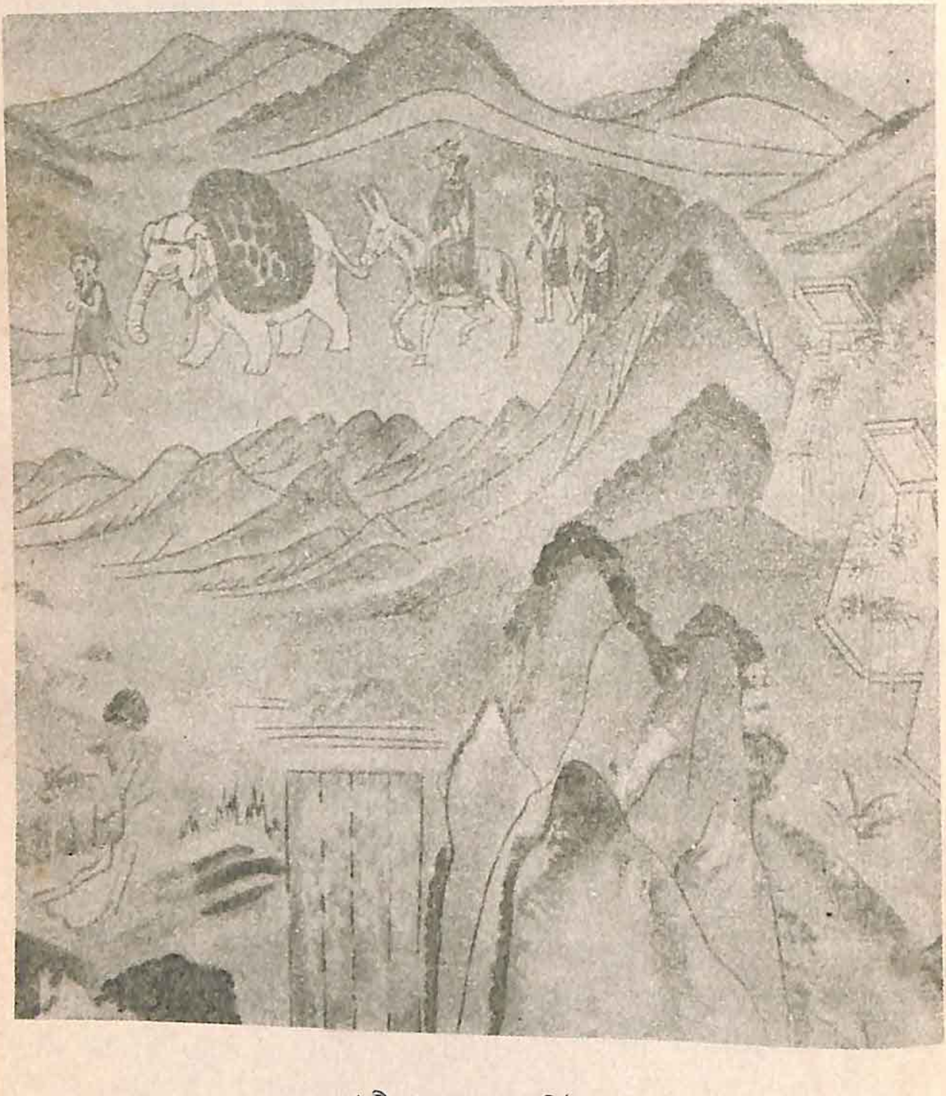
বংশীয় রাজগণের অধীনে একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। শৈলেন্দ্র রাজগণ মহাযানপন্থী বৌদ্ধ ছিলেন। বাংলার বিখ্যাত বৌদ্ধভিক্ষু কুমারঘোষ ছিলেন তাঁহাদের গুরু। তাঁহার আদেশে মালয়ে বিখ্যাত তারা মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। শৈলেন্দ্র বংশের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করে। বাংলার সহিত শৈলেন্দ্র রাজাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। রাজা বালপুত্রদেব দেবপালের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন এবং নালন্দায় একটি বৌদ্ধ মঠ নির্মাণ করেন।

শৈলেন্দ্র রাজাগণ শিল্প সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আমলে বহু সুন্দর ও বিশাল মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে জাভায় (যবদ্বীপ) বরবুদুরে প্রকাণ্ড বৌদ্ধ মঠ পৃথিবীর অষ্টম



বরবুদুরের বৌদ্ধ মঠ

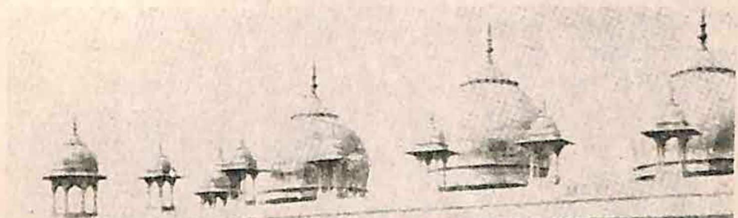
আশ্চর্য বলিয়া অভিহিত হয়। মন্দিরটি নয়টি স্তরে নির্মিত, সর্বনিম্নের স্তরটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩১ গজ। মন্দিরটির শীর্ষদেশে রহিয়াছে ঘন্টার আকারে তৈয়ারী এক বিরাট স্তূপ। মন্দিরের বিগ্রহ হইল বুদ্ধমূর্তি। জাতকের কাহিনী অবলম্বনে বুদ্ধের জীবনগাথা মন্দির গাত্রে খোদিত আছে। এখানে দৈনন্দিন জীবনের অনেক চিত্রও উৎকীর্ণ আছে। পরবর্তিকালে হিন্দুগণ বরবুদুরের মন্দির গাত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মূর্তি এবং রামায়ণের বহু আকর্ষণীয় কাহিনীর দৃশ্যাবলী অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র রাজবংশের পতন ঘটিলেও, হিন্দু ঐতিহ্যের বহু চিহ্ন আজিও স্পষ্ট থাকিয়া অতীতের স্মৃতি বহন করিতেছে।



বাড়ী ফেরার পথে হিউয়েন-স্যাং

ভারত ইতিহাসের মধ্যযুগ

[—১৭০৭ খ্রীঃ পর্যন্ত]



WEST BENGAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

HISTORY SYLLABUS FOR CLASS IX

MEDIEVAL PERIOD (upto 1707 A. D)

MEDIEVAL INDIA 80 pages till 1707

1) Why should we call it 'Medieval India' rather than Muslim India?
2) A brief note on the types of sources; the Sultanate period.
3) Advent of Islam in India : the Arab conquest of Sind—its impact negligible.
4) Beginning of Muslim rule : condition of Northern and Western India on the eve of the Muslim invasion—Sultan Mahmud—Results of his invasions—Al-Biruni on Indian culture and civilisation.
5) From Invasion to Empire-building; Foundation of the Delhi Sultanate by Qutbuddin—Iltutmish and Balban. Nature of the external and internal threats—consolidation of the Sultanate.
6) Khalji Imperialism : growth of the empire under Alauddin (no detailed account of his campaigns) his attempts at consolidating the authority of the Central Government—his economic measures and their results.
7) A short assessment of Muhammad Bin Tughluq's rule—Nature of the changes during Firuz Shah's rule ; some of his beneficient measures.
8) Invasion of Timur—effects—disintegration of the Sultanate : the Sayyids and Lodis (only a brief outline).
9) Rise of some regional powers :
   (a) Bengal under Illias-Sahi rulers : Hussain Shah and Nasarat Shah; cultural developments. (b) The Bahamani Kingdom (no details)—split up into five kingdoms. (c) The nature of the Bahamani—Vijayanagar conflict (details of the wars to be omitted). (d) Vijayanagar empire—Dev Rai and Krishna Rai—special emphasis on the administrative system—and the social, cultural and a economic life.
10) Impact of Islam on India during this period—with particular stress on the impact on the cultural life—the initial orthodox reaction; gradual synthesis of cultures—the Bhakti cult—Sufism—religious reference—their message. Art and architecture—development of vernacular literature and regional art and culture—patronage of literature etc. by the ruling groups—growth of Urdu.

THE MUGHAL AGE : 1526-1707

1) A brief note of the types of sources.
2) Origins of the Mughals : foundation of the Padshahi, by Babar, —Panipath, Khanua and Ghogra—(detail of wars to be omitted) Babar's memories. (a) Mughal—Afgan contest—its nature—a brief narrative of the building up of an empire by Sher Shah—special stress on the administrative and revenue systems. Sher Shah's

contributions—a brief reference to the re-establishment of the Mughal Power. (b) Widening of the empire and its consolidation by Akbar : Stress on the methods by which Akbar achieved it : (detail of the wars to be omitted—foundation of a new administrative system—Jagirdari system—revenue system—cultural life—Din-i-Ilahi—Akbar's Court—His building activities. (c) Jahangir and Shahjahan : assessment as rulers : particular stress on their patronage of art and architecture—Their policy towards European traders. (d) Aurangzeb : a short note on the wars of succession—stress on two developments in the political sphere : further widening of the empire on the one hand, and the emergence on the other of certain conditions which tended to weaken the imperial authority : Roots and nature of his troubles in Northern and North-Western India; the Deccan policy—Shivaji and the first phase of the Mughal-Maratha conflict—organisation of the civil and military administration by Shivaji—assessment of Shivaji as a ruler—the far-reaching consequences of Aurangazeb's Deccan wars—organisation by Aurangazeb of the civil and military administration—His religious policy—his character and personality—a brief estimate as a ruler. (e) Activities of the European Trading companies (a brief outline).

3) India under the Mughals : Political unification of a large part of India—measures in connection with the assertion of the central Authority—the Mughal rulers and Jagirdars—land revenue system—the ruler society of India in the eyes of foreigners—trade, industry and commerce—European traders—special emphasis on the cultural life : art, architecture, paintings, literature—history writing—music—some reference to some distinctive regional cultures.

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রবর্তিত ইতিহাস পাঠ্যক্রম

মধ্য যুগ

সুলতানী যুগ (১৫২৬ খ্রীঃ পর্যন্ত)

১) মুসলিম ভারত না বলিয়া মধ্যযুগীয় ভারত বলা উচিত কেন ?

২) সুলতানী যুগের ইতিহাসের উপাদানের কারণ।

৩) ভারতে ইসলাম আবির্ভাব ঃ আরবগণের সিন্ধু বিজয়

৪) ভারতে মুসলিম শাসন ঃ মুসলিম আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের অবস্থা। সুলতান মামুদ—সুলতান মামুদের ভারত অভিযানের ফলাফল—ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ে অলবেরুনী।

৫) মুসলিম আক্রমণ ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ঃ কুতুবউদ্দিন কর্তৃক দিল্লী সুলতানের প্রতিষ্ঠা—ইলতুৎমিস এবং বলবন—অন্তর্দিক ও বহির্দিক হইতে বিরোধীয় ব্যবস্থা—সুলতানী সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষা।

৬) খলজী সাম্রাজ্যবাদ ঃ আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্যবৃদ্ধি। কেন্দ্রীয় প্রাধান্য সংহত করার চেষ্টা ; আলাউদ্দিনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও ফলাফল।

৭) মহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকালের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন—ফিরুজ শাহের রাজত্বে পরিবর্তন প্রকৃতি—কিছু জনহিতকর কার্যাবলী।

৮) তৈমুরের ভারত আক্রমণ ও তাহার ফলাফল—দিল্লী সুলতানীর পতন—সৈয়দ ও লোদী বংশ।

৯) কয়েকটি আঞ্চলিক রাষ্ট্রের উদ্ভব

(ক) ইলিয়াসশাহী শাসনের অধীনে বঙ্গদেশ—হুসেন শাহ ও নসরৎ শাহ—সংস্কৃতির বিকাশ।

(খ) বাহমনী রাজ্য—এই রাজ্যের ভাঙ্গনে পাঁচটি স্বতন্ত্র রাজ্য।

(গ) বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্যের মধ্যে সংঘাত।

(ঘ) বিজয়নগর সাম্রাজ্য—দেব রায় ও কৃষ্ণদেব রায়। বিজয়নগরের শাসনব্যবস্থা। বিজয়নগরের সভ্যতা-সংস্কৃতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা।

১০) সুলতানী আমলে ভারতের উপর ইসলামের প্রভাব—সাংস্কৃতিক জীবন। রক্ষণশীলদের ন্যায়াধিক প্রতিক্রিয়া—ভক্তি আন্দোলন—সুফীবাদ—ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য—তাঁহাদের বাণী, শিল্প-স্থাপত্য, দেশীয় সাহিত্য, আঞ্চলিক শিল্প ও সংস্কৃতি। আঞ্চলিক শাসকদের সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা। উর্দুর বিকাশ।

মুঘল যুগ (১৫২৬ খ্রীঃ-১৭০৭ খ্রীঃ পর্যন্ত)

১) মুঘল যুগের ইতিহাসের উপাদান।

২) মুঘল যুগের উৎস-পাদসাহী বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠা—পানিপথ, খানুয়া ও গর্গরা উল্লেখ। বাবরের স্মৃতিকথা। মুঘল-আফগান্ সংঘর্ষ—ইহার প্রকৃতি—শেরশাহ কর্তৃক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

(ক) শাসন সংক্রান্ত ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা। মুঘল সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠায় শেরশাহের অবদান।

(খ) আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তার—বিস্তার নীতি—নতুন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন। জায়গিরদারী প্রথা—রাজস্ব প্রথা—সাংস্কৃতিক জীবন—দীন-ই-ইলাহী—আকবরের বিচারালয়—তাঁহার কীর্তিসমূহ।

(গ) জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহান ঃ শাসনকর্তারূপে মূল্যায়ন, স্থাপত্য ও শিল্পকলায় অবদান, ইউরোপীয় বণিকদের সহিত সম্পর্ক।

(ঘ) আওরঙ্গজেব—যুদ্ধ বিজয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : রাজনীতি ক্ষেত্রে দুইটি প্রধান উন্নয়নের উল্লেখ ঃ একদিকে রাজ্যবিস্তার অন্যদিকে কিছু কিছু আবশ্যিক শর্ত প্রয়োগ যাহা শাসন পরিচালনাকে দুর্বল করে, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিরোধের মূল ও প্রকৃতি নিরূপণ ; দাক্ষিণাত্য নীতি। শিবাজী ও মুঘল-মারাঠা সংঘর্ষ ; শিবাজীর সামরিক ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা—শাসক হিসাবে শিবাজীর মূল্যায়ন। আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির সমালোচনা—সামরিক ও প্রাদেশিক দিক হইতে আওরঙ্গজেবের শাসনব্যবস্থা—তাঁহার ধর্মনীতি, তাঁহার চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব—শাসক হিসাবে আওরঙ্গজেবের ভূমিকা।

(ঙ) ইউরোপীয় বণিকদের সক্রিয়তা (সংক্ষিপ্ত রূপরেখা)।

৩) মুঘল আমলে ভারতবর্ষ ঃ ভারতের বৃহত্তর অংশে রাজনৈতিক সমন্বয়সাধন। কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগের মানদণ্ড। মোগল শাসকদের আমলে জায়গিরদার ও ভূমি রাজস্ব প্রথা। বিদেশিদের দৃষ্টিতে শাসক সম্প্রদায়, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও ইউরোপীয় বণিক। বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক জীবন।

অষ্টম অধ্যায়

সুলতানী যুগ (—১৫২৬ খ্রীঃ পর্যন্ত)

এক □ মুসলিম যুগ পরিবর্তে মধ্যযুগ আখ্যা প্রদান

ভারত ইতিহাসে পর্ব ভাগ করিতে যাইয়া প্রাচীনপন্থী ঐতিহাসিকগণ ধর্মকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের বিচারে ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগ হইতেছে যথাক্রমে 'হিন্দু যুগ' ও 'মুসলমান যুগ'। একথা সত্য, প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজশক্তি মূলতঃ হিন্দুদের অধীনে ছিল, অপর দিকে মধ্যযুগে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাই শাসন-কর্তৃত্ব দখল করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের যুগ-বিভাগে শাসকশ্রেণীর ধর্মমত কখনও নিয়ামক নীতি (decesive factor) হইতে পারে না। সমকালীন সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্ক—এককথায় অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করিয়াই পর্ব চিহ্নিত করা হয়। পৃথিবীর সর্বত্র এই নীতি অনুসৃত হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষের রক্ষণশীল ঐতিহাসিকবৃন্দ এই মূলনীতি পরিহার করিয়া মধ্যযুগকে 'মুসলিম যুগ' আখ্যা দিয়াছেন। ইতিহাসের বিচারে কিন্তু এইরূপ নামকরণ অসঙ্গত। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষের দিক হইতে ভারতবর্ষের অর্থনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় নূতন পরিবর্তন সূচিত হইতেছিল। 'বৃহৎ ও কেন্দ্রভিত্তিক' সাম্রাজ্য ভাঙিয়া এই সময় বহু আঞ্চলিক রাজ্য গড়িয়া উঠে। এই সব রাজ্যের শাসকগণ নিজেদের ক্ষমতাকে নিরাপদ করিবার জন্য কয়েকজন অনুগ্রহভাজনের মধ্যে জমি বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন। বেতনের পরিবর্তে জমি দেওয়ার প্রথা এইভাবে শুরু হইয়া যায়। গ্রহীতাদের জীবনকালের জন্য জমির রাজস্ব ভোগ করিবার অধিকার দান করা হইলেও, বাস্তবে জমির মালিকরা পুরুষানুক্রমে শুধু রাজস্ব নয় ; জমিও অধিকার করিয়া চলিলেন। তাহারা আবার আর একদল অধস্তনদের মধ্যে জমি বিলি করিয়া দিতেন। একেবারে শেষে ছিলেন কৃষকগণ। তাহারাও উৎপন্ন ফসলের একাংশের বিনিময়ে কর্ষিত জমি ভোগ করিতে পারিতেন। এইভাবে জমিকে কেন্দ্র করিয়া নূতন শ্রেণীবিন্যাস গড়িয়া উঠিয়াছিল। রাজা ছিলেন সর্বোচ্চে—মধ্যে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের বিভিন্ন স্তর আর সর্বনিম্নে কৃষক। জমির মালিক অর্থাৎ সামন্তরা অবশ্যই রাজার অধীন ছিলেন। রাজার প্রতি আনুগত্যের প্রতীক হিসাবে তাহারা সামন্ততান্ত্রিক কর দিতেন। যুদ্ধের সময় সামরিক দায়িত্ব পালন করিতেন। রাজস্ব ও সৈন্যসরবরাহের জন্য রাজাকে সামন্তশ্রেণীর উপর নির্ভরশীল হইতে হইলেও সামন্তশ্রেণী কিন্তু রাজার নিয়ন্ত্রণে থাকিত। পক্ষান্তরে সামন্ত প্রভুরা বংশপরম্পরায় শূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষক শ্রেণীর উপর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব চালাইতেন। কেন্দ্রীয় শাসনের পরিবর্তে এই যে নূতন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া উঠিল তাহাকে ব্যাপক অর্থে সামন্ততন্ত্র বলা যায়। প্রথমে উত্তর ভারতে ও পরে দাক্ষিণাত্যে এই নূতন পরিবর্তনের সূচনা হইয়াছিল। মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর এই কাঠামো আরও দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হইয়াছিল। ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের সহিত কোন কোন ব্যাপারে পার্থক্য থাকিলেও, মূলতঃ দুইই ছিল অভিন্ন। ইউরোপীয় ইতিহাসে সামন্ত সমাজকে 'মধ্যযুগ' আখ্যা দেওয়া হয়। ভারতবর্ষের সামন্তবাদের সময়কে তাই 'মধ্যযুগ' বলাই যুক্তিসঙ্গত।

এই যুগে ভারতীয় সভ্যতা যে কেবলমাত্র ভারতবাসীকে লইয়াই গঠিত হইয়াছিল তাহা নহে, আবার কেবলমাত্র মুসলিমগণও তাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল তাহাও নহে। মুসলিম আমলে হিন্দু নাগরিকের সংখ্যাও কম ছিল না। বর্তমান কালেও হিন্দুদের প্রভাব প্রতিপত্তি, তাহাদের

সভ্যতা এবং সংস্কৃতি এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সুতরাং একথা স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতে পারে যে, মুসলিমদের শাসনকালে কেবলমাত্র তাহাদেরই প্রতিপত্তি বজায় থাকে না, হিন্দুদেরও সমান অধিকার থাকে। যদি আমরা হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতীয় ক্ষেত্রে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত তুলনা করিয়া থাকি তাহা হইলে বলিতে পারি যে, এই যুগটি হইল দুই জাতির সংমিশ্রণে গঠিত অর্থাৎ ইহা হইল মধ্যযুগ। এই প্রসঙ্গে অনেক ঐতিহাসিকই বলিয়াছেন—'মুসলমান শাসনের অধীনে ভারতে মধ্যযুগ চলিয়াছে।

দুই □ সুলতানী আমলে ভারত-ইতিহাসের উপাদান

মধ্যযুগের (সুলতানী ও মোগল আমল) ইতিহাসের উপাদান সুপ্রচুর। মুসলিম শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজত্বের ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বিবরণ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। ইহা ছাড়া, বিভিন্ন সুলতান ও সম্রাটের জীবনী ও কয়েকজন শাসকের আত্মস্মৃতিও পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত সাহিত্য ও তৎসহ বিদেশী পর্যটকদের ভ্রমণকাহিনী এবং প্রত্নতত্ত্ব (সৌধশ্রেণী, লিপিমালা, মুদ্রা ও চিত্রশিল্প) ইত্যাদির উপর ভিত্তি করিয়া মধ্যযুগের ইতিহাস রচনা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে।

● **ইতিহাস, জীবনী ও অন্যান্য সাহিত্য :** ভারতবর্ষে মুসলিম শক্তির প্রথম সামরিক সাফল্য ঘটে অষ্টম শতকে সিন্ধু অঞ্চলে। মহম্মদ বিন কাশিমের নেতৃত্বে আরবদের এই সিন্ধু বিজয়ের ইতিবৃত্ত লিখিত আছে আরবীয়ভাষায় রচিত 'চাচনামা' নামক গ্রন্থে। বিখ্যাত পর্যটক আলবেরুণী রচিত 'তাহাক্কি-ই-হিন্দ' নামক পুস্তক হইতে সুলতান মামুদের অভিযানের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার এক বাস্তব বিবরণ পাওয়া যায়। হাসান নিজামী রচিত 'তাজ-উল-মাসির'কে কুতুবউদ্দিন আইবক ও ইলতুৎমিসের রাজত্বের প্রথমার্ধের এক প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। মিনহাজ-উদ্দিন-সিরাজের 'তবাকৎ-ই-নাসিরী' নামক গ্রন্থে ১২৬০ সাল পর্যন্ত দিল্লীর তুর্কী সাম্রাজ্যের ধারাবাহিক ইতিহাস সন্নিবিষ্ট আছে। আলাউদ্দিন খলজীর সামরিক অভিযান, শাসনসংস্কার এবং পরবর্তী তুঘলক বংশের রাজত্বকালে মূল্যবান উপাদান হিসাবে সবিশেষ উল্লেখ করা হয় কবি আমীর খসরু রচিত 'খাজাইন-উল-ফুতুহ' নামক গ্রন্থটিকে। তুর্কী-আফগান যুগের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ হইল জিয়াউদ্দিন বারণী রচিত 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'। আলাউদ্দিন খলজী হইতে শুরু করিয়া ফিরোজ শাহ তুঘলক পর্যন্ত দিল্লীর শাসকদের রাজত্বকালের বহু মূল্যবান তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে বারণীর রচনায়।

● **সরকারী দলিলপত্র :** যে কোন দেশের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সরকারী দলিলপত্র এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং সরকারী দলিলপত্র হইল ইতিহাস রচনার একটি অঙ্গ বিশেষ। ফুতুহা-ই-ফিরোজশাহী নামক একটি অর্থচরিতের রচয়িতা ছিলেন সুলতান ফিরুজশাহ তুঘলক। তিনি নগরকোট রাজ্যটি নিজ অধীনে আনিয়াছিলেন। এই রাজ্যটি জয় করিবার সময় তিনি যে সমস্ত সংস্কৃত পুঁথি পাইয়াছিলেন, উক্ত পুঁথিগুলিকে তিনি 'দলাল-ই-ফিরুজশাহী' নামক একটি গ্রন্থে নিবন্ধ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থটি ফার্সীভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষ প্রাচীন আরবগণের নিকট ছিল এক বিশেষ পরিচিত দেশ। ভারতবর্ষের সহিত আরবদের সম্পর্কও ছিল অতি নিগূঢ়। বিশেষতঃ, এই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল খুবই। আরব সাগর এবং ভারত মহাসাগর, মাকরাণ, খাইবার প্রভৃতি জলপথের মাধ্যমে এই দুই দেশ বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখিত। সেই সময় ভারতবর্ষ ছিল প্রভূত অর্থ সম্পদের অধিকারী। ভারতের এই অর্থসম্পদের কাহিনী আরবে বিশেষভাবে প্রসার লাভ করিয়াছিল আরব বণিকগণের মাধ্যমেই।

● **বৈদেশিক বিবরণ :** তুর্কী আফগান যুগে যে সব বিদেশী পর্যটক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদের

অভিজ্ঞতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেইসব রচনা হইতে তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও সামাজিক রীতিনীতির সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। প্রাক্ মোগলযুগের বিদেশী পর্যটকদের মধ্যে মরক্কো হইতে আগত ইবনবতুতা, ইতালীয় নিকোলো কান্তি, আরব আবদুর রজ্জাক, রুশ নিকিতিন এবং ভিনীসিয় মার্কো পোলোর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইবনবতুতা প্রমুখ

● **প্রত্নতত্ত্ব ঃ** স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প ও মুদ্রার নিদর্শন হইতেও সমকালীন শিল্প, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। দিল্লী ও আগ্রাকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র উত্তরভারতে এবং বিক্ষিপ্তভাবে দক্ষিণভারতে ছড়াইয়া-থাকা অসংখ্য সৌধ, মন্দির ও মসজিদ এবং উহাদের গাত্রে উৎকীর্ণ লিপিমালা ও মুদ্রা হইতে মধ্যযুগের ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

তিন □ ভারতবর্ষে ইসলাম আবির্ভাব

খালিফা ওমরের সময়কালে বারো বৎসরের মধ্যে তিনবার নৌ-অভিযান প্রেরণ করা হইয়াছিল। তাহার কিছুকাল পূর্বেই মহম্মদের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। ভারতের নিকট যে তিনবার অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে প্রথম অভিযানের উদ্দেশ্য হইল, বোম্বাই-এর তানাহ্ বন্দর, দ্বিতীয় অভিযানের উদ্দেশ্য হইল বারওয়াস এবং তৃতীয় অর্থাৎ সর্বশেষ অভিযানের উদ্দেশ্য হইল দেবল বন্দর। এই দেবল বন্দরটি অবস্থিত ছিল সিন্ধুনদের নিকটবর্তী স্থানে। এই তিনটি অভিযানই ব্যর্থ করিয়াছিলেন চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী। কাবুলের হিন্দুগণ বহুকাল যাবৎ মুসলিমের অগ্রগতিকে ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। সবশেষে আরব দেশের অন্তর্গত মারকান অঞ্চলের মধ্য দিয়া মুসলিমগণ ভারতের ভিতরে প্রবেশ করিতে সচেষ্ট হয়।

● আরবদের সিন্ধু বিজয় ●

ভারতবর্ষের মাটিতে মুসলিম শক্তির প্রতিষ্ঠা ঘটে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সিন্ধু অঞ্চলে আরব-শাসন স্থাপনের মাধ্যমে। ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে ইরাকের শাসনকর্তার সেনাপতি মহম্মদ বিন কাশিম সিন্ধুদেশের ব্রাহ্মণ অধিপতি দাহিরকে পরাজিত ও নিহত করিয়া এই সাফল্যের সূচনা করেন। দাহিরের পুত্র ও মহিষী প্রতিরোধের চেষ্টা করিয়াও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন। কাশিম অধিকৃত অঞ্চলে আপন অধিকার দৃঢ় করিলেন। আরব ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন, বৌদ্ধ ও সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষ বিদেশী শক্তিকে সাহায্য করিয়াছিলেন। যুদ্ধজয়ের পর কাশিম সিন্ধু অঞ্চলে মুসলিম শাসননীতি প্রবর্তন করেন। কিন্তু হিন্দুদের ধর্মের উপর যেমন হস্তক্ষেপ করা হইল না, তেমন শাসনকার্যের দায়িত্বও ব্রাহ্মণদের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইল না। অতঃপর কাশিম কনৌজ অধিকার করিতে অগ্রসর হইলে খলিফার নির্দেশে বিজয় সম্পন্ন হইবার পূর্বেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। কাশিমের উত্তরাধিকারী ভারতে মুসলিম আধিপত্য আরও বিস্তৃত করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিলেও, তাহাদের সেই প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নাই। গুজরাট, ভারুচ ও মালব ইত্যাদি জয়ের চেষ্টা করিয়াও তাহারা ব্যর্থ হন পরবর্তী শাসক তমীম্ দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হইলে চালুক্যরাজ পুলকেশী কর্তৃক পরাজিত হন। অন্যদিকে, খলিফার বাহিনী উজ্জয়িনী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াও গুর্জররাজ দ্বিতীয় নাগভট্টের নিকট তাহারা পর্যুদস্ত হইল। আরবদের ব্যর্থতার কারণ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকগণ মন্তব্য করিয়াছেন, তৎকালীন ভারতীয় শাসকগণ দেশরক্ষার ব্যাপারে যেমন আগ্রহী ছিলেন, সামরিক শক্তিতেও তেমনি দক্ষ ছিলেন। ভারতের রাজন্যদের সামরিক দৃঢ়তা অতিক্রম করিবার ক্ষমতা আরবগণ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

মহম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয়

মুসলিম আধিপত্য বিস্তারে ব্যর্থ চেষ্টা

রাজনৈতিক দিক দিয়া বিচার করিলে, ভারতে মুসলমান শাসনের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আবরদের সিন্ধু

বিজয়ের কোন বিশেষ ভূমিকা নাই। সিন্ধুদেশে আরব শাসন ছিল সীমিত ও ক্ষণস্থায়ী। ঐতিহাসিক লেসনুল ইহাকে ফলাফলহীন ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই ঘটনার সংস্কৃতিগত তাৎপর্য ছিল বিরাট। সভ্যতায় অগ্রসর দুইটি দেশ—ভারতবর্ষ ও আরবদেশ—পরস্পর পরস্পরের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিল। আরব মনীষিগণ ভারতের গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয় অধ্যয়ন করিয়া আপন সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট করেন এবং এই আরবদের মাধ্যমেই ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাফল্য-কীর্তি পাশ্চাত্য দেশে প্রসারিত হয়। অন্যদিকে, সামুদ্রিক বাণিজ্যে ভারতীয়দের পরাজিত করিয়া বণিকগণ যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য নৌশক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত তাহা অক্ষত রাখেন। এই আরব বণিকদের মাধ্যমেই পণ্যদ্রব্য ইউরোপীয় বাজারে রপ্তানি হইতে থাকে।

চার □ তুর্কী আক্রমণের প্রাক্কালে ভারত

অষ্টম শতাব্দীর শুরুতেই আরবগণ উত্তর দিক হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। ক্রমে তাঁহারা সিন্ধুদেশ নিজ অধিকারে আনিয়া তাঁহাদের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। ক্রমে ক্রমে সিন্ধু অঞ্চল অন্যান্য অঞ্চল হইতে পৃথক হইয়া যায় কিন্তু তাহার জন্য ভারতের কোন প্রকার ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু ইহার পরবর্তিকালে ভারতবর্ষ একের পর এক বিদেশী জাতি দ্বারা আক্রান্ত হইতে থাকে। বিশেষতঃ তুর্কী জাতির আক্রমণই সেই সময় ভারতবর্ষকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। কিন্তু ভারতের প্রতিটি রাষ্ট্র তখন একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকায় শত্রুপক্ষদের দমন করা সম্ভব হইল না। ইহার ফলে ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতের উত্তর দিকে মুসলমানদের অধীনে একটি বিরাট রাজ্য স্থাপিত হইল। পরবর্তিকালে এই রাজ্যই দিল্লীর সুলতানশাহী নামে পরিচিত হইয়াছিল। ক্রমে এই অঞ্চলটি ভারতের দক্ষিণ দিকে প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং ভারতও ক্রমে ক্রমে মুসলিমদের আওতায় আসিয়া পড়িয়াছিল।

রাজনৈতিক ঐক্য ও সংহতি

তুর্কী আক্রমণের প্রাক্কালে (খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষার্ধ) ভারতবর্ষে মৌর্য বা গুপ্ত যুগের ন্যায় কোন রাষ্ট্রীয় ঐক্য ছিল না। হর্ষবর্ধন বা হর্ষোত্তর যুগের পরাক্রমশালী শাসকগণ আঞ্চলিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইলেও সেই অধিকারকে সর্বভারতীয় পর্যায়ে প্রসারিত করিতে সক্ষম হন নাই। দশম শতাব্দী হইতেই সামরিক ও রাজনৈতিক দিক হইতে ভারতীয় রাজন্যবর্গ হীনবল হইয়া পড়িতে থাকেন। অধিকন্তু পারস্পরিক বিবাদ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইয়া তাঁহারা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাও বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। সমগ্র ভারতব্যাপী রাষ্ট্রীয় চেতনার আদর্শ তাঁহাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয় নাই। সিন্ধু অঞ্চলে আরব শাসনের অস্তিত্বে তাঁহারা অস্বস্তিবোধ করেন নাই। বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য সীমান্ত রক্ষার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্যও তাঁহারা সমস্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ ও সংহত করিবার প্রচেষ্টাও গ্রহণ করেন নাই। ফলে, ভারতবর্ষে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠা বিশেষ কষ্টসাধ্য হয় নাই।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এই সময় অবক্ষয় দেখা দেয়। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে উদারতাবাদ এবং সমন্বয়বাদের আদর্শ ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়া যাইতেছিল। বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব প্রকট হইয়া উঠিতেছিল। সমাজে রক্ষণশীলতাও তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। আলবেরুণী হিন্দু সমাজের কুসংস্কার ও কূপমণ্ডুকতার তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। অন্যদিকে ধর্মনেতাদের অসংযম জীবনযাত্রা ধর্মীয় আদর্শবোধ কলুষিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই যুগেই তন্ত্রবাদের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ফলে সাধারণভাবে নৈতিক চরিত্রের অবনতি দেখা দেয়।

তুর্কী আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা কিন্তু যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। নিচের তলার মানুষের উপর শোষণ-পীড়ন থাকিলেও মূলতঃ ভারতের ধনৈশ্বর্যে লুব্ধ হইয়া সুলতান মামুদ বারংবার

ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে মুসলিম আধিপত্যের সমকালের গুরুত্বপূর্ণ রাজপরিবারগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল (১) কনৌজের প্রতিহার বংশ। সুলতান মামুদের আক্রমণে কনৌজ বিধ্বস্ত হইলে গাহড়বালবংশ কনৌজ অধিকার করে। (২) গুজরাটের চালুক্য বা শোলাংকিবংশ, (৩) দিল্লীর চৌহানবংশ, (৪) বুন্দেলখণ্ডে চন্দেল্লবংশ, (৫) মালবের পরমারবংশ, (৬) ডাহলের (জব্বলপুর অঞ্চলে) চেদ বা কলচুরীবংশ, (৭) বাংলার পাল ও সেন রাজবংশ। এই সময়ের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য ছিল কাশ্মীর। ভৌগোলিক অবস্থিতির দিক হইতে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল হিন্দুশাহীরাজ্য। চেনাব নদী হইতে কাবুলসহ হিন্দুকুশ পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত এই রাজ্যটিই সর্বপ্রথম গজনীর আক্রমণের সম্মুখীন হইয়াছিল।

● **সুলতান মামুদের ভারত-আক্রমণ ঃ** ভারতবর্ষে মুসলিম রাজত্ব স্থাপনের কৃতিত্ব দাবি করিতে পারেন তুর্কজাতি। তুর্কী রাজ্য গজনী হইতে প্রথম আঘাত আসে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষের দিকে। গজনী ছিল আফগানিস্থানের অন্তর্গত ছোট্ট একটি রাজ্য। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আলপ্তগীন নামে এক তুর্কী বীর। আলপ্তগীনের জামাই সবুক্তগীনের সময় হইতেই (৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দ) ভারতে তুর্কী আক্রমণ আরম্ভ হয়। সবুক্তগীনের ভারত অভিযানের প্রতিবন্ধক ছিলেন পাঞ্জাবের শাহী রাজবংশের রাজা জয়পাল। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধে জয়পাল পরাজিত হন। পেশোয়ার ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল সবুক্তগীনের অধিকারে আসিল। ৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সবুক্তগীনের মৃত্যু হইলে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান মামুদ পিতার মনোনীত উত্তরাধিকারী আপন ভ্রাতাকে পরাজিত করিয়া গজনীর সিংহাসন দখল করেন। উচ্চাভিলাষী মামুদ গজনীকে মধ্য এশিয়ার বৃহৎ শক্তিতে পরিণত করিবার পরিকল্পনা করেন। পিতার ন্যায় তিনিও ভারতের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং ১০০০ খ্রীঃ হইতে ১০২৭ খ্রীঃ পর্যন্ত মোট সতেরবার (ঐতিহাসিক স্যার হেনরি ইলিয়টের মতে) তিনি ভারত আক্রমণ করেন। সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের পশ্চাতে ভারতব্যাপী সাম্রাজ্যস্থাপন বা অন্য কোন দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা ছিল না। তাঁহার ভারত আক্রমণের লক্ষ্য ছিল এই দেশের বিপুল ঐশ্বর্য এবং উর্বরা ও শস্যশ্যামল পাঞ্জাবের সমভূমি অঞ্চল। অনুর্বর পার্বত্য গজনীর রাজকোষে অর্থস্ফীত কবিবার উদ্দেশ্যেই তিনি বারংবার ভারতবর্ষে অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন।

সুলতান মামুদের সিংহাসন লাভ

মামুদের প্রথম অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে। এই অভিযানে সীমান্তবর্তী কতকগুলি দুর্গ তাঁহার হস্তগত হয়। পর বৎসর মামুদ শাহী রাজ জয়পালকে পরাজিত করেন। জয়পাল পুত্র-পৌত্রাদিসহ বন্দী হইলেন। পরে প্রচুর অর্থ ও রাজ্যের একাংশ প্রদানের বিনিময়ে জয়পাল মুক্ত হইলেন। কিন্তু পরাজয়ের অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি আত্মহত্যা করিলেন। ১০০৪ খ্রীঃ হইতে ১০০৬ খ্রীঃ পর্যন্ত মামুদ মূলতানে আক্রমণ চালাইলে সেখানকার শাসনকর্তা দাউদ বাৎসরিক করদানে স্বীকৃত হইয়া অব্যাহতি লাভ করেন। ১০০৮ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দপালকে পরাজিত করিয়া সিন্ধুনদ হইতে নগরকোট পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড অধিকার করেন। এই অভিযানের সময় নগরকোট বা কাংড়ার দুর্গ লুণ্ঠন করিয়া মামুদ প্রচুর ঐশ্বর্য হস্তগত করেন। ১০১৪ খ্রীষ্টাব্দে থানেশ্বর এবং ১০১৮ খ্রীষ্টাব্দে মথুরা মামুদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়। থানেশ্বর ও মথুরার মন্দির লুণ্ঠন করিয়া মামুদ অভাবনীয় ঐশ্বর্যের অধিকারী হন। ইহার পর কনৌজও বিধ্বস্ত হয়। সুলতান মামুদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অভিযান ঘটে ১০২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই অভিযানে কাথিয়াবাড়ের বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠিত হয়। সোমনাথের মন্দির বিগ্রহসুদ্ধ চূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। শোনা যায়, মন্দিরটি হইতে সুলতান মামুদ প্রচুর অলংকারাদিসহ প্রায় দুই কোটি স্বর্ণমুদ্রা লুণ্ঠন করেন। কলিঙ্গ আক্রমণ করিয়াও তিনি বহুল পরিমাণ ঐশ্বর্য হস্তগত করেন। সুলতান মামুদের সর্বশেষ

ভারত অভিযান

সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন

অভিযান পরিচালিত হয় জাঠদের বিরুদ্ধে। জাঠরা পরাভূত হয়। মামুদ কিন্তু দুইবার চেষ্টা করিয়াও কাশ্মীর দখল করিতে পারে নাই। যাহা হউক, ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মামুদের মৃত্যু হয়।

● **সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের ফলাফল ঃ** ভারতবর্ষের ইতিহাসে সুলতান মামুদের আক্রমণের বিশেষ কোন স্থায়ী ফল দেখা যায় না। এই দেশে স্থায়ী সাম্রাজ্য গঠনের পরিকল্পনা তাঁহার ছিল না এবং সে চেষ্টাও তিনি করেন নাই। ভারতের অগাধ সম্পদের কাহিনী শুনিয়া তিনি প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। তৎকালীন মন্দিরগুলি রাজন ও সাধারণ মানুষের দানে সমৃদ্ধ ছিল। মন্দিরগুলির সঞ্চিত ধনাগার লুণ্ঠন করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি দেবালয়গুলিকেই তাঁহার আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং বিপুল সম্পদ অপহরণ করাই ছিল মামুদের ভারত আক্রমণের প্রধান উল্লেখযোগ্য ফল। অবশ্য মন্দির ধ্বংসের পশ্চাতে ধর্মীয় সংকীর্ণতাবোধও কাজ করিয়াছিল। পৌত্তলিকতা-বিরোধী উগ্র ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা দেবমূর্তি ধ্বংস করা পুণ্যকর্ম বলিয়া মনে করিতেন। সুলতান মামুদের নৃশংস আক্রমণে থানেশ্বর, কনৌজ, মথুরা ও গুজরাটের মন্দিরগুলি ধ্বংস হইয়া যায়। ফলে, প্রাচীন ভারতের কয়েকটি গৌরবময় স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু পরাজিত ভারতীয়দের বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করিবার কোন চেষ্টা মামুদ করেন নাই। সুতরাং ধনসম্পদ লুণ্ঠন করাই ছিল তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। ডঃ স্মিথের ভাষায়—'মামুদ ছিলেন নিছক একজন লুণ্ঠনকারী দস্যু'।

স্থাপত্য নিদর্শন ধ্বংস

ভারতবর্ষে স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস না করিলেও সুলতান মামুদকে ভারতে তুর্কী শক্তির প্রতিষ্ঠাতার আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহার প্রতিটি অভিযানই ঘটিয়াছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল হইতে। অথচ তৎকালীন ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী এই স্থানের নিরাপত্তা সম্পর্কে উদাসীন থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, ভৌগোলিক ও সামরিক কারণে তিনি পাঞ্জাব আপন রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। পাঞ্জাবকে বলা যাইতে পারে, ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার দ্বারপথ। তৃতীয়তঃ, নিরন্তর আক্রমণের মধ্য দিয়া মামুদ ভারতীয় শক্তির রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতাকে চূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সমস্ত কারণের ফলশ্রুতি হিসাবে মহম্মদ ঘুরীর পক্ষে ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছিল। মামুদ ছিলেন মহম্মদ ঘুরীর পথপ্রদর্শক।

ভারতে তুর্কি শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা

● ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলবেরুণীর অভিমত ●

সুলতান মামুদ তাঁহার ভারত অভিযানের একটি পর্যায়ে আলবেরুণী নামে এক পণ্ডিত ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন। আলবেরুণী ছিলেন সমকালীন মধ্য এশিয়ার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। মামুদ তাঁহাকে খিবা হইতে গজনীতে বন্দী করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। ইনি দশ বৎসর ভারতে অবস্থান করেন। আপন অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। আলবেরুণী রচিত গ্রন্থের নাম 'তাহাকিক-ই-হিন্দ'। এই বইটিতে ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে কিছু তীক্ষ্ণ ও গভীর মন্তব্য করা হইয়াছে।

আলবেরুণীর মতে, তৎকালীন ভারতীয়রা ছিলেন সংকীর্ণমনা ও কূপমণ্ডূক। চিরাচরিত ব্যবস্থা বা আচার-ব্যবহার পরিবর্তনে তাহারা বিশ্বাসী ছিলেন না, বিদেশীদের প্রতি অহেতুক বিরূপ ধারণা পোষণ করিতেন। জাতিভেদ-প্রথা ও অস্পৃশ্যতা সমাজে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হইয়াছিল। 'অর্থহীন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উপর ছিল তাহাদের গভীর আস্থা'। আলবেরুণী ভারতীয়দের গুণ সম্পর্কেও কিন্তু উদাসীন ছিলেন না। তিনি বলিয়াছেন, হিন্দুরা দান-ধ্যানে নিরত থাকিতেন। আলাপ ও পরীক্ষার মাধ্যমে বিবাদের নিষ্পত্তি করিতেন। ভূর্জগাছের ছালে এবং তাল পাতায় পুঁথি লেখা হইত। এইসব পুঁথি সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আলোচনায় পূর্ণ।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, আলবেরুণীর সময়কার ভারতবর্ষ (একাদশ শতাব্দী) জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও

অনুশীলন নিম্নমুখী হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতবর্ষে তুর্কী-আফগান শাসন প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে এই সাংস্কৃতিক সংকীর্ণচিত্ততা অনেকাংশেই দায়ী ছিল। আলবেরুণীর দৃষ্টিতে এই ভারতবর্ষই চিত্রিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, জাতীয় জীবন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া যায় নাই।"

পাঁচ □ মুসলিম শাসনের সূচনা

● **মহম্মদ ঘুরীর ভারত-আক্রমণ ঃ** সুলতান মামুদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে পূর্বাপেক্ষা সুপরিকল্পিত অভিযানের সূত্রপাত করেন ঘুর রাজ্যের অধিপতি মহম্মদ ঘুরী। আফগানিস্থানের গজনী ও হিরাটের মাঝামাঝি অঞ্চলে অবস্থিত ছিল ঘুর রাজ্য। মহম্মদের প্রথম ভারত অভিযান ছিল মূলতানের বিরুদ্ধে। ১১৭৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি মূলতান অধিকার করেন। কিন্তু ভারতে আধিপত্য বিস্তার তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য হয় নাই। গুজরাট আক্রমণ করিতে যাইয়া তিনি তৎকালীন চালুক্যরাজ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। তরাইয়ের প্রথম যুদ্ধেও (১১৯১ খ্রীঃ) দিল্লী ও আজমীড়ের অধিপতি চৌহান বংশীয় পৃথ্বিরাজের নিকট তাঁহাকে পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ভারতীয় রাজন্যদের একতাহীনতা (সমকালীন কনৌজের গাহড়পাল বংশের রাজা জয়চন্দ্র পারিবারিক বিরোধের জন্য পৃথ্বিরাজকে সহায়তা করেন নাই) এবং রণনীতির দুর্বলতা (প্রথম তরায়ুনের যুদ্ধের পর পলায়মান পাল সৈন্যকে পশ্চাদধাবন করিয়া ধ্বংস না করিয়া পৃথ্বিরাজ মহা ভুল করিয়াছিলেন) তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিল। ইহারই সুযোগে পেশোয়ার ও লাহোর অধিকার করিবার পর তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২ খ্রীঃ) পৃথ্বিরাজকে পরাজিত করিয়া তিনি দিল্লী অধিকার করেন এবং ঐ দেশে মুসলিম শাসনের পত্তন করেন। ১১৯৪ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ ঘুরী জয়চন্দ্রকে নিহত করিয়া কনৌজ অধিকার করেন। অতঃপর তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর কুতুবউদ্দিন আইবক গোয়ালিয়র, কলিঞ্জর, গুজরাট জয় করিয়া উত্তর ভারতে এবং আইবকের অনুচর ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খলজী বাংলা জয় করিয়া পূর্ব ভারতে মুসলমান-শাসনের বিস্তৃতি সাধন করিলেন। এইভাবে মহম্মদ ঘুরীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষে মুসলিম আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা ঘটিল।

● ভারতবর্ষে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ●

● **কুতুবউদ্দীন আইবক ঃ** পাঞ্জাব হইতে বাংলাদেশ পর্যন্ত মহম্মদ ঘুরীর অধিকারে আসিয়াছিল। তাঁহার এই সাম্রাজ্য শাসনের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর কুতুবউদ্দিন আইবকের উপর। অপুত্রক অবস্থায় ঘুরীর মৃত্যু হইলে কুতুবউদ্দিন স্বাধীন শাসকে পরিণত হইলেন এবং দিল্লীতে রাজধানী স্থাপন করিলেন। সাধারণভাবে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বংশকে 'দাসবংশ' বলা হয়, কারণ কুতুবউদ্দিন হইতে বলবন পর্যন্ত শাসকগণ প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। কিন্তু প্রত্যেকেই সিংহাসনে আরোহণ করিবার সময় ক্রীতদাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং 'দাসবংশ নামকরণ ইতিহাস-সঙ্গত নয়। বরং ইহাকে ইলবারা তুর্কী রাজবংশ বলাই অধিকতর সংগত। যাহা হউক, সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর কুতুবউদ্দিন নূতন কোন রাজ্যজয় করেন নাই। তাঁহার চার বৎসর রাজত্বকালের (১২০৬-১২১০ খ্রীঃ) উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল—দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সিন্ধুর শাসক নাসিরুদ্দিন কুবাচা ও গজনীর শাসক তাজউদ্দিন ইলদিজের বিদ্রোহ দমন করিয়া দিল্লীতে আপন কর্তৃক বজায় রাখা। কুতুবউদ্দিন ন্যায়পরায়ণ ও উদার শাসক ছিলেন। দিল্লী ও আজমীরে তিনি দুইটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার আমলে বিখ্যাত কুতুবমিনারের নির্মাণ কার্য শুরু হইয়াছিল।

কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আরামশাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অকর্মণ্য থাকায় ওমরাহগণ বদাউনের শাসনকর্তা ও সুলতানের জামাতা ইলতুৎমিসকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ জানাইলে ১২১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আরামশাহকে পরাজিত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া লন।

● **ইলতুৎমিস** ঃ রূপবান ইলতুৎমিস অভিজাত ইলবারী তুর্কী পরিবারের সন্তান হইয়াও ভাগ্যদোষে ক্রীতদাস হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার কর্মদক্ষতায় আকৃষ্ট হইয়া কুতুবউদ্দিন আপন কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। ক্রমে ইলতুৎমিসের পদোন্নতি হয় এবং বিভিন্ন প্রদেশে তিনি বিচক্ষণতার সহিত শাসনকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বিদ্রোহ দমন

সিংহাসন লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইলতুৎমিসকে এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। মূলতানের শাসনকর্তা নাসিরউদ্দিন কুবাচা সমগ্র পাঞ্জাবে তাঁহার ক্ষমতা বিস্তারের পরিকল্পনা করেন। বাংলার শাসনকর্তা আলীমর্দান খলজী দিল্লীর বশ্যতা অস্বীকার করিলেন। তাজউদ্দিন ইলদিজ নিজেকে মহম্মদ ঘুরীর উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়া ভারতের উপর কর্তৃত্ব দাবি করিলেন। আজমীর, গোয়ালিয়র, রণথম্ভোর তাঁহার হস্তচ্যুত হইল। এমন কি ওমরাহদের এক অংশ তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু এই সংকটকালেও, অসামান্য সাহস ও স্থৈর্যের পরিচয় দিয়া ইলতুৎমিস প্রতিকূল শক্তিকে পরাভূত করিলেন। ১২১৬ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের সন্নিকটে এক যুদ্ধে তাজউদ্দিন পরাজিত হন, পরে বন্দী অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। লাহোর ইলতুৎমিসের অধিকারে আসে। ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে নাসিরউদ্দিন যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আত্মহত্যা করেন। সিন্ধু ইলতুৎমিসের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। বাংলার বিদ্রোহও দমিত হয়। ১২৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ পুনরায় দিল্লীর কর্তৃত্বে আসে। ইহা ব্যতীত, রণথম্ভোর, গোয়ালিয়র, মালব প্রভৃতি অঞ্চলেও তাঁহার আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। তাঁহার রাজত্বকালের অপর একটি স্মরণীয় ঘটনা দিগ্বিজয়ীবীর চেঙ্গিসখানের নেতৃত্বে দুর্ধর্ষ মোগল আক্রমণ। চেঙ্গিস খাঁ এইসময় মধ্য ও পশ্চিম এশিয়াস্থিত দেশগুলি জয় করিয়া থিবা রাজ্য আক্রমণ করিলে সেখানকার শাসক ইলতুৎমিসের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। অভিজ্ঞ কূটনীতিজ্ঞ সুলতান চেঙ্গিসের বিরাগভাজন হইয়া সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করিতে চাহিলেন না। তিনি জালালউদ্দিনের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন না এবং ভারতবর্ষ চেঙ্গিসের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইল। ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইলতুৎমিসের মৃত্যু হয়।

সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

কৃতিত্ব

কূটনীতি ও সামরিক শক্তির অধিকারী ইলতুৎমিস ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশিষ্টতার দাবী করিতে পারেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের প্রবর্তক। মহম্মদ ঘুরী ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেও, মধ্য এশিয়ার ব্যাপারেই অধিকতর আগ্রহশীল ছিলেন ফলে তিনি ভারতের শাসনভার নিজহস্তে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধি কুতুবউদ্দিন আইবক তাঁহার স্বল্পকালীন রাজত্বকালে কোন সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা চালু করিবার সময় পান নাই। অন্যদিকে তাজউদ্দিন, নাসিরউদ্দিন কুবাচা, আলীমর্দান প্রভৃতির বিদ্রোহে সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সাম্রাজ্য পৃথক পৃথক রাজ্যে বিভক্ত হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। ইলতুৎমিস দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করেন। বিদ্রোহ দমন করিয়া সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখেন। নূতন যুদ্ধনীতির সাহায্যে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সাধন করেন এবং নানারকম প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া (যেমন সেনাবাহিনীকে সুসংগঠিত করা, মুদ্রা চালু করা ইত্যাদি) সাম্রাজ্যের ঐক্য ও সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখেন। শুধু তাই নয়, ভারতের রাজনৈতিক কেন্দ্ররূপে তিনি দিল্লীনগরীকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলেন। অন্যদিকে চেঙ্গিসখাঁর বিরাগভাজন হইয়া সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্ভবপর নয় বিবেচনা করিয়া তিনি যথার্থ কূটনীতির পরিচয় দিয়া জালালউদ্দিনকে সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। তাঁহার এই সর্বাঙ্গীন সাফল্যের স্বীকৃতি হিসাবে বাগদাদের খলিফা তাঁহাকে 'সুলতান-ই-আজম' (প্রধান সুলতান) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণও সঙ্গত

কারণেই তাঁহাকে তথাকথিত 'দাস' সুলতানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

ইলতুৎমিস শুধুমাত্র একজন সার্থক সাম্রাজ্য-স্রষ্টাই ছিলেন না। তিনি শিল্প-সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। তাঁহারই রাজত্বকালে বিখ্যাত কুতুবমিনারের নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়।

● **সুলতানা রাজিয়া (১২৩৬—৪০ খ্রীঃ)** ইলতুৎমিসের পুত্রগণ অকর্মণ্য ও অপদার্থ থাকায় তিনি কন্যা রাজিয়াকে তাঁহার উত্তরাধিকারিণী বলিয়া মনোনীত করিয়া যান। কিন্তু দিল্লীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নারীশাসন মানিয়া লইতে রাজী হইলেন না। পরিবর্তে তাঁহারা ইলতুৎমিসের এক পুত্র রুকনউদ্দিনকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। কিন্তু শীঘ্রই রুকনউদ্দিনের অকর্মণ্যতায় বিরক্ত হইয়া অভিজাতগণ রাজিয়ার হস্তে শাসনদায়িত্ব অর্পণ করিলেন।

পুরুষোচিত গুণাবলীর পরিচয় দিয়া রাজিয়া সাম্রাজ্যের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করিলেন। বঙ্গ হইতে সিন্ধু পর্যন্ত আমীর-উমরাহগণ তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। তথাপি শেষ পর্যন্ত রাজিয়া নিজেকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। গোঁড়া মুসলমানরা এবং দর্পী অভিজাতরা রাজিয়ার শাসন সহ্য করিতে পারিল না। অবশেষে ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দে শত্রু হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয়। ন্যায়পরায়ণ, বিদ্যোৎসাহিনী, প্রজাবৎসল সুশাসক ও সমর কুশলী হিসাবে রাজিয়া ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

রাজিয়া

রাজিয়ার পর যথাক্রমে মুইজউদ্দিন বাহরাম ও আলাউদ্দিন মাসুদ সিংহাসনে উপবেশন করেন। সুলতান হিসাবে ইঁহারা কেহই যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন না। অতঃপর বলবনের নেতৃত্বে অভিজাতবর্গ ইলতুৎমিসের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দিন মামুদকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। নাসিরউদ্দিন অমায়িক ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। কিন্তু শাসনকার্যে তিনি ছিলেন অক্ষম। ফলে তাঁর শ্বশুর উলুঘ খাঁ সুলতানের নামে নিজেকে রাজ্যের প্রকৃত শাসকে পরিণত করেন। অতঃপর ১২৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অপুত্রক অবস্থায় নাসিরউদ্দিনের মৃত্যু হইলে উলুঘ খাঁ গিয়াসউদ্দিন বলবন নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে (১২৬৬ খ্রীষ্টাব্দে) আরোহণ করেন।

নাসিরুদ্দিন মামুদ

● **গিয়াসুদ্দিন বলবন (১২৬৬-৮৭)** : ইঁহার পূর্ব নাম ছিল বাহাউদ্দিন। তিনিও ইলবারী তুর্কী জাতিভুক্ত ছিলেন। কিশোর বয়সে ইনি মোগলদের হাতে বন্দী হইয়া ক্রীতদাসে পরিণত হন। শেষ পর্যন্ত, ইলতুৎমিস তাঁহাকে ক্রয় করেন। সুলতানের নিকট বীরত্ব ও কর্মদক্ষতা প্রদর্শন করিয়া বলবন ক্রমে ইলতুৎমিসের বিখ্যাত 'চল্লিশ চক্রের' অন্যতম সদস্য হইয়া উঠেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ইলতুৎমিসের সময়ে ক্রীতদাসের মধ্যে প্রধান ৪০ জনকে লইয়া এক চক্র বা 'সমিতি' গড়িয়া উঠিয়াছিল। উচ্চাকাঙ্ক্ষী বলবন রাজিয়ার অনুগ্রহ লাভ করিয়া শক্তি ও পদমর্যাদা যেমন বাড়াইয়াছিলেন, তেমনি অধিকতর ক্ষমতা অর্জনের আশায় তাঁহার (রাজিয়ার) বিরুদ্ধবাদী ওমরাহদেরও সমর্থন করিয়াছিলেন। পরে তাঁদেরই প্রচেষ্টায় নাসিরউদ্দিন দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিতে সক্ষম হন। এই সময় হইতেই বলবন কার্যতঃ শাসক-পদ অধিকার করিয়া বসেন। সুলতানের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া তিনি শাসকের প্রধান সহকারীর পদ অধিকার করেন এবং অবশেষে ১২৬৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং দিল্লীর সিংহাসন দখল করিয়া বসেন।

নাসিরউদ্দিনের শাসনকালেই বলবন শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে যোগ্যতার পরিচয় দিয়া অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও মোঙ্গল আক্রমণ হইতে দিল্লী সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর তিনি তাঁহার এই পূর্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে নূতনভাবে রাষ্ট্রশক্তি গড়িয়া তোলেন। দীর্ঘকাল অভিজ্ঞতার ফলে বলবন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অভিজাতদের শক্তি চূর্ণ করিতে না পারিলে সুলতানের রাজকীয় ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। বলবন সুলতানী পদে আসীন হইলে

'চল্লিশ চক্রের' অন্যান্য সদস্যগণ তাঁহাকে অস্বীকার কবিরার চেষ্টা করেন। তাহারা নিজেদের সুলতানের সমকক্ষ মনে করিয়া প্রতিনিয়ত শাসনকার্যে অনর্থক হস্তক্ষেপ করিতে থাকেন।

বিদ্রোহ দমন

ওমরাহদের এই ঔদ্ধত্য চূর্ণ করিবার জন্য বলবন যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার মূল কথা হইল, সুলতান কাহারও সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তি নহেন। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি গুপ্তচরদের সাহায্যে ওমরাহদের প্রভাব ও গুপ্ত ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ দমন করেন। কোন কোন ক্ষমতালিপ্সু আমীরকে তিনি গুপ্তঘাতকদ্বারা হত্যাও করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া, ওমরাহদের সহিত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি নিজেকে পৌরাণিক তুর্কীবীর আফ্রাসিয়াবের বংশধর বলিয়া প্রচার করিয়া সুলতানের অতিমানবীয় সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। রাজদরবারেও তিনি হাস্য-কৌতুক মদ্যপান ও দ্যূতক্রীড়া বন্ধ করিয়া দিয়া নূতন ঐতিহ্য প্রবর্তন করেন।

অতঃপর বলবন সামরিক বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করেন। ইলতুৎমিসের আমলে সেনাবাহিনীকে জায়গির প্রদান করা হইত। এই সব জায়গীরপ্রাপ্ত পরিবারের পরবর্তী বংশধরগণ কিন্তু সামরিক কর্তব্য পালন না করিয়াও উহা ভোগ করিত। সম্পূর্ণরূপে বলবন এই প্রথা

সামরিক বিভাগের সংস্কার

বাতিল করিয়া নিয়ম করিলেন, যাহারা সামরিক কাজে রত থাকিবে তাহারাই কেবল জায়গির ভোগ করিবে। অবশ্য পরবর্তিকালে সুলতান এই আদেশ প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। যাহা হউক, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা প্রয়োগ করিয়া বলবন সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সামরিক বিভাগকে পুনর্গঠিত করিয়া সুলতান দিল্লীর উপকণ্ঠস্থ মেওয়াটি দস্যুদের ও রোহিলাখণ্ডের বিক্ষোভ দমন করেন এবং বিভিন্ন যুদ্ধনিপুণ জাতিগুলিকে আপনার অনুগত শক্তিতে পরিণত করেন। বাংলার বিদ্রোহী শাসনকর্তা তুঘরিল খানকেও তিনি পরাস্ত করিয়া আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন।

বলবনের রাজত্বকালে মোঙ্গল আক্রমণে ভারতবর্ষের নিরাপত্তা বারংবার বিঘ্নিত হইতেছিল। এই আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে বলবন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সীমান্তকে

মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ

সুরক্ষিত করিবার জন্য একাধিক দুর্গ নির্মাণ করিয়া প্রথম পুত্র মহম্মদকে মূলতান-দীপালপুর অঞ্চলে এবং দ্বিতীয় পুত্র বঘরা খাঁকে সামান অঞ্চলে সসৈন্যে মোতায়েন করিলেন। ১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত হইল। কিন্তু ১২৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গলগণ পুনরায় ভারত আক্রমণ করেন। মহম্মদ তাহাদিগকে বাধা দিতে যাইয়া প্রাণ হারাইলেন। পুত্র শোক সহ্য করিতে না পারিয়া বৃদ্ধ সুলতান ১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান।

সুলতানী শাসনের ইতিহাসে বলবনের রাজত্বকাল বিশেষভাবে স্মরণীয়। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার অবসান করিয়া ও অভিজাতদের ক্ষমতা খর্ব করিয়া তিনি কেন্দ্রীয় শাসনের দৃঢ়তা সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জানিতেন, শুধুমাত্র সামরিক শক্তির দ্বারা 'জনচিত্তে' শাসক

সামরিক সংস্কার

শক্তির প্রতি ভীতি উদ্রেক করিলেই সাম্রাজ্যের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা যাইবে না। সামরিক শক্তির সহিত সুশাসনের সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারিলেই প্রজাসাধারণের স্বাভাবিক আনুগত্যলাভ করা সম্ভব। তাই সুষ্ঠু ও পক্ষপাতহীন শাসন ও বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তনে তিনি বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। অন্যদিকে, সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি অপেক্ষা সংহতি সাধন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করিয়া তিনি নূতন রাজ্যবিস্তারে অগ্রসর হন নাই। একই সঙ্গে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতিও তাঁহার অনুরাগ ও উৎসাহ ছিল। ঐতিহাসিক মিনাজউদ্দিন এবং বিখ্যাত কবি আমীর খসরু তাঁহার রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন।

বলবনের মৃত্যুর পর দিল্লীর আমীরগণ মৃত সুলতানের মনোনীত উত্তরাধিকারী কাইখসরুকে বাতিল করিয়া বঘরা খাঁর পুত্র কাইকোবাদকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। নতুন সুলতান ছিলেন বিলাসপরায়ণ ও শাসনকার্যে অনভিজ্ঞ। ফলে শাসনব্যবস্থা শিথিল হইয়া পড়িল এবং ওমরাহদের মধ্যে স্বার্থসংঘাত

শুরু হইল। শেষ পর্যন্ত ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দে জালালউদ্দিন ফিরোজ নামক এক আমীর তাঁহার প্রভু কাইকোবাদকে হত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। খলজী দ্বারা সুলতানী বংশের পতন ও দখল ঘটনাকে খলজী বিপ্লব বলা হয়। এই বিপ্লব শেষে ভারতে খলজী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ছয় □ খলজী সাম্রাজ্যবাদ

জালালউদ্দিন ফিরোজ খলজী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া ছয় বৎসর (১২৯০-৯৬ খ্রীঃ) রাজত্ব করেন। কিন্তু তাঁহার শাসনব্যবস্থা দৃঢ়ভিত্তিক ছিল না। ফলে রাজ্যের সর্বত্র অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছিল। অবশ্য তিনি মোঙ্গলদের পরাভূত করিয়া তাহাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ইহারা 'নব মুসলমান' নামে পরিচিত ছিল।

জালালউদ্দিনের পরম স্নেহাস্পদ ছিলেন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দিন। সুলতান তাঁহাকে কারা প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরবর্তিকালে এই উচ্চাভিলাষী আলাউদ্দিন সুলতানের স্নেহ-দুর্বলতার সুযোগ লইয়া তাঁহাকে হত্যা করেন এবং দিল্লীর সিংহাসন দখল করিয়া লন। স্নেহান্ধ পিতৃব্যকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া সুলতান পদে আসীন হওয়ায় বারুণী প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ আলাউদ্দিনকে তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার, রাজনৈতিক, সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক সমস্ত দিক হইতেই আলাউদ্দিন ছিলেন একর্জন সার্থক ও কৃতীশাসক।

সাম্রাজ্য সংগঠক হিসাবে আলাউদ্দিন মধ্যযুগের ইতিহাসে বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বকালে দিল্লী সুলতানের রাজ্যসীমা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসারিত হইয়াছিল। "আলাউদ্দিনের রাজত্বকাল হইতেই সুলতানী সাম্রাজ্যবাদের যুগ আরম্ভ হয়" (স্যার উইলস্লী হেইগি)। ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম অভিযান ঘটিল গুজরাটের বাঘেলা বংশীয় রাজা কর্ণদেবের বিরুদ্ধে। আলাউদ্দিন তাঁহাকে পরাজিত করেন এবং বিখ্যাত ক্যাম্বে বন্দরটি লুণ্ঠন করেন। গুজরাট হইতে প্রচুর ধনরত্ন ও অন্যান্য দ্রব্যের সহিত তিনি রাজমহিষী কমলাদেবী ও সেনাপতি মালিক কাফুরকে নিজ রাজ্যে লইয়া আসেন। পরে কমলাদেবী তাঁহার প্রিয় মহিষী ও কাফুর প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন। অতঃপর ১৩০১ খ্রীষ্টাব্দে রণথম্ভোর দুর্গ জয় করিবার পর আলাউদ্দিন মেবার দখল করেন (১৩০৩ খ্রীঃ)। মেবার আক্রমণের সহিত জড়িত 'পদ্মিনী উপাখ্যানের' কাহিনী আধুনিক ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন না। যাহা হউক, চিতোর জয়ের পর আলাউদ্দিন উজ্জয়িনী, ধারা, মান্ডু, চান্দেরী প্রভৃতি স্থান অধিকার করিলেন।



আলাউদ্দীন খলজি

উত্তর ভারতে আধিপত্য স্থাপন করিয়া আলাউদ্দিন দক্ষিণ ভারত জয়ে অগ্রসর হইলেন। এই অভিযানের নেতৃত্ব দিয়াছিল মালিক কাফুর। ইতিপূর্বে জালালউদ্দিনের রাজত্বকালে আলাউদ্দিন দেবগিরি আক্রমণ করিয়া প্রচুর ধনরত্ন লইয়া আসিয়াছিলেন, সিংহাসনে উপবেশন করিবার পর তিনি পুনরায় দেবগিরি আক্রমণ করিলেন (১৩০৬ খ্রীঃ)। রাজা রামচন্দ্র পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করেন। অতঃপর একে একে বরঙ্গলের কাকতীয় রাজ্য, দোরসমুদ্রের হোয়েসল রাজ্য ও মাদুরার পাণ্ড্য রাজ্য আলাউদ্দিনের অধিকারে আসিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য দিল্লী হইতে দাক্ষিণাত্যের দূরত্ব বিবেচনা করিয়া আলাউদ্দিন দক্ষিণী রাষ্ট্রগুলিকে সরাসরি সাম্রাজ্যভুক্ত না করিয়া করদ রাজ্য হিসাবে রাখিয়া দিয়াছিলেন।

দক্ষিণ ভারতে রাজ্য বিস্তার

আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে মোট পাঁচবার ভারতবর্ষে আক্রমণ ঘটিয়াছিল। এই আক্রমণধারা সুলতানকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করিলেও শেষ পর্যন্ত তিনি বিপদমুক্ত হইয়াছিলেন। ভবিষ্যত আক্রমণের হাত

হইতে নিরাপত্তা রক্ষার জন্যও আলাউদ্দিন সীমান্তের ও রাজধানীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দৃঢ় করিয়াছিলেন।

● আলাউদ্দিনের শাসননীতি — কেন্দ্রীয় রাজশক্তির দৃঢ়ীকরণ ঃ

মৌলিক ও আধুনিক শাসননীতি

আলাউদ্দিন রাজশক্তির নিরঙ্কুশ অধিকারতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। বলবনের ন্যায় তিনিও সুলতানের স্বাতন্ত্র্য ও স্বেচ্ছাতন্ত্র কায়েম করিবার উদ্দেশ্যে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আলাউদ্দিন যে রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু করিয়াছিলেন, ত্রয়োদশ শতকের ভারতবর্ষে তাহা অনেকাংশে ছিল মৌলিক ও আধুনিক। আলাউদ্দিন বুঝিতে পারিয়াছিলেন সামন্ততান্ত্রিক ধর্মকেন্দ্রিক রাষ্ট্রে রাজকীয় ক্ষমতার উপর আঘাত আসে দুইদিক হইতে—উলেমা বা ধর্মনেতাদের হস্তক্ষেপ এবং ওমরাহ বা অভিজাতদের ঔদ্ধত্য।

ধর্ম নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা

উলেমাদের প্রাধান্য হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য আলাউদ্দিন রাষ্ট্রনীতি হইতে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করিলেন। উলেমাদের বিধানের পরিবর্তে আপন অভিজ্ঞতা ও বিচার-বোধের উপর নির্ভর করিয়া তিনি শাসননীতি পরিচালনা করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। "ঐহিক ব্যাপারে ঐহিক বিবেচনাকেই প্রাধান্য দিতে হইবে"—ইহাই ছিল আলাউদ্দিনের শাসন ব্যবস্থার মূলনীতি। তাঁহার একটি উক্তির মধ্য দিয়া এই নীতিই ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন "ইহা আইনসম্মত অথবা বে-আইনী কিনা, (অর্থাৎ, ইহা ইসলামের বিধিসম্মত কিনা) তাহা আমি জানি না, আমি রাষ্ট্রের পক্ষে যাহা মঙ্গলজনক, অথবা জরুরী অবস্থার পক্ষে যাহা উপযুক্ত মনে করি, সেরূপ নির্দেশই দিয়া থাকি।" মধ্যযুগীয় ধর্ম-ভিত্তিক পরিবেশের মধ্যে থাকিয়াও তিনি উলেমা বা ধর্মনেতাদের হস্তক্ষেপ হইতে শাসনব্যবস্থাকে মুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার শাসননীতিকে অনেকে 'ধর্মনিরপেক্ষ' আখ্যা দিয়াছেন।

রাজত্বের প্রথম দিকে আলাউদ্দিন একাধিক বিদ্রোহের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। নির্মমতার সহিত এইসকল বিদ্রোহ দমন করিবার পর তিনি ভবিষ্যতে উহার পুনরাবৃত্তি রোধে সচেষ্ট হইলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বিদ্রোহের চারিটি কারণ নির্ণয় করিয়া উহা দূর করিবার চেষ্টা করেন। আলাউদ্দিনের মতে কারণগুলি হইল—(১) শাসকের রাজকার্যে অবহেলা এবং গুপ্তচরদের সংবাদ সংগ্রহে ব্যর্থতা, (২) অভিজাতদের সামাজিক মেলামেশা যাহা চক্রান্তকারীদের সংঘবদ্ধ হইতে সাহায্য করে, (৩) জনগণের আর্থিক স্বচ্ছলতা যাহা ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে এবং (৪) মদ্যপানের ব্যাপকতা যাহা বিচারবোধ নষ্ট করিয়া দেয়। অতঃপর কারণগুলি দূর করিবার জন্য আলাউদ্দিন ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। তিনি গুপ্তচর ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিয়া অভিজাতগণের কার্যকলাপের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিলেন এবং সুলতানের অনুমতি ব্যতীত আমীর-ওমরাহদের মধ্যে সামাজিক মেলামেশা ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। শুধু তাই নয়, অর্থপ্রাচুর্য উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্ম দিতে পারে বলিয়া তিনি জায়গির প্রথার অবসান ঘটান এবং যে কোনো ওজুহাতে প্রজা সাধারণের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। অতঃপর রাজ্যের সর্বত্র মদ্যপান ও মাদকদ্রব্যও নিষিদ্ধ করা হইল।

রাজকীয় কৃতিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে আলাউদ্দিন এক শক্তিশালী সেনাবাহিনীও গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এইভাবে তিনি স্বৈরতন্ত্রের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শাসনকে শক্তিশালী করিয়া মধ্যযুগের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী (প্রাক মোগল) রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন।

● আলাউদ্দিনের অর্থ-সংক্রান্ত বিধি-বিধান ঃ রাজকীয় স্বেচ্ছাতন্ত্রে ঘোর বিশ্বাসী আলাউদ্দিন কেন্দ্রীয় শাসনকে শক্তিশালী এবং সাম্রাজ্যের ব্যাপ্তি ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে প্রায় পাঁচ লক্ষ সৈন্য লইয়া একটি স্থায়ী সেনাবাহিনী গড়িয়া তোলেন। এই সেনাদলকে তিনি উন্নত রণকৌশলে সুশিক্ষিত ও সুগঠিত করিয়া তোলেন। জায়গিরের পরিবর্তে নগদ অর্থে বেতন দেওয়ার প্রথা প্রবর্তন করেন। সুতরাং

সামরিক খাতে বিরাট অর্থের প্রয়োজন হইল। অন্যদিকে, মুদ্রাস্ফীতির জন্য জিনিসপত্রের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংকটের সৃষ্টি করিয়াছিল।

অর্থ সংস্কার

অবস্থা মোকাবিলা করিবার জন্য আলাউদ্দিন কয়েকটি আর্থিক বিধি-বিধান প্রবর্তন করেন। অবশ্যই এই অর্থনৈতিক সংস্কারের পশ্চাতে তাঁহার মূল উদ্দেশ্য ছিল, স্বল্প বেতন সম্পন্ন



সেনাবাহিনীকে সন্তুষ্ট রাখা। ব্যাপকতর জনগণের কল্যাণ সাধন তাঁহার বিবেচনায় ছিল না। যাহা হউক, বিভিন্ন ভোগ্য পণ্য-দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রিত করা হইল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, "আটার মণ ছিল প্রায়

দুই আনা, ধানের মণ ছয় পয়সা, দেড় আনায় এক সের চিনি আর তিন সের গুড়।" প্রতিটি ব্যবসায়ীকে মূল্যতালিকা প্রদর্শন করিতে হইত। শাহান-ই-মাণ্ডা নামক রাজকর্মচারীদের নিকট হইতে ব্যবসার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত। দেওয়ান-ই-রিয়াসত নামক কর্মচারিগণ মূল্য নিয়ন্ত্রণ, ওজন-পরিমাপ ইত্যাদির তদারকি করিতেন। প্রতিটি ক্রেতা কতটা খাদ্যদ্রব্য কিনিতে পারিবে তাহাও নির্ধারিত করা হইল। কোনোক্ষেত্রেই অতিরিক্ত ক্রয় করা যাইত না। ব্যবসায়ীরাও সমস্ত পণ্য উন্মুক্ত

বাজার নিয়ন্ত্রণ

বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকিতেন। ব্যবসায়িগণ ধার্য মূল্যের অতিরিক্ত দাবি করিলে বা ওজনে কম দিলে অথবা ভোগ্য-দ্রব্য অতিরিক্ত মজুত করিয়া রাখিলে তাহাদের শাস্তি দেওয়া হইত। সরকারের উদ্যোগে কয়েকটি শস্যভাণ্ডার গড়িয়া তোলা হইয়াছিল। ওই সব ভাণ্ডারে শস্য মজুত রাখা হইত। খাজনার পরিবর্তে যে শস্য আদায় করা হইত তাহাই এখানে জমা হইত। খাদ্য সংকটের সময় এখান হইতে পণ্য বিতরণ করা হইত।

আলাউদ্দিনের বাজার দর নিয়ন্ত্রণনীতি জিনিসের উৎপাদন মূল্যের সহিত সংহতিসূচক ছিল

অর্থনৈতিক সংস্কারের উদ্দেশ্য

না। ইহা ছাড়া, এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কেবলমাত্র রাজধানী দিল্লী ও উহার পার্শ্ববর্তী কিছু অঞ্চলে প্রচলিত হইয়াছিল। সর্বোপরি সামরিক কারণেই ইহা চালু হইয়াছিল। সুতরাং আলাউদ্দিনের মূল্যনীতি স্থায়ী হয় নাই। যাহা হউক, এইভাবে রাজকোষ হইতে অত্যধিক অর্থব্যয় না করিয়াও আলাউদ্দিন এক বিরাট স্থায়ী সৈন্যবাহিনী পোষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

আলাউদ্দিনের নীতি ছিল, জনসাধারণের নিকট হইতে যথাসম্ভব কর আদায় করিয়া রাজকোষ পূর্ণ করা। এইজন্য তিনি দেবত্র, জায়গির ও নিষ্কর হিসাবে দেওয়া সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করেন।

করনীতি

অতঃপর জনগণের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করা হইল। হিন্দু প্রজাদের নিকট হইতে শতকরা ৫০ ভাগ এবং মুসলিম ক্রেতাদের নিকট হইতে শতকরা ২৫ ভাগ ভূমি-রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা হইল। হিন্দুদের জিজিয়া প্রভৃতি কয়েকটি অতিরিক্ত করের বোঝাও বহন করিতে হইত। ঐতিহাসিকগণের অভিমত—ধর্মীয় বিদ্বেষের জন্য নয়, রাজনৈতিক প্রয়োজনেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছিল, কারণ সাধারণভাবে হিন্দুরা ছিলেন রাজদ্রোহী ও প্রজাশোষণকারী (ঐতিহাসিক মোরল্যান্ডের অভিমত)।

● **কৃতিত্ব ঃ** মধ্যযুগের ভারতবর্ষে আলাউদ্দিন একটি স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। মধ্যযুগের ধর্মীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম প্রতিবাদ জানান এবং এক ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই ব্যাপারে তিনি মহম্মদ বিন তুঘলকের পূর্বসূরী। আবার এই ক্ষেত্রে তিনি বলবন অপেক্ষা দৃঢ় চিত্ততার ও মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বলবন প্রশাসনে উলেমাদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করিতে পারেন নাই। আলাউদ্দিন ওমারাহদের ঔদ্ধত্য ও বিদ্রোহ দমন করিয়া শুধু যে রাজ কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা নহে, সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও সংহতিও ইহাতে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল। মোঙ্গল আক্রমণের হাত হইতেও তিনি সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁরই আমলে সুলতানী সাম্রাজ্যবাদের যুগ শুরু হইয়াছিল। আলাউদ্দিন ছিলেন ভারতের প্রথম মুসলিম শাসক যিনি ভারতের বৃহত্তর অংশ (উত্তর এবং দক্ষিণ) লইয়া একটি সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন। বাজারদর নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে তিনি মৌলিকতা ও আধুনিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। পণ্যমূল্য-নিয়ন্ত্রণ, মূল্য তালিকার প্রকাশ, মূল্য ও ওজন এবং পরিমাপের তদারকী, ব্যবসায়ী ধনী ক্রেতাদের অতিরিক্ত পণ্যদ্রব্য মজুত রাখা বে-আইনী ঘোষণা, সংকটের সময় সরকারী ভাণ্ডার হইতে পণ্য বিক্রয়, আইন ভঙ্গকারিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ইত্যাদির মধ্যে আধুনিক অর্থনৈতিক চিন্তাধারার আভাস মেলে।

শিল্প সাহিত্যের প্রতিও আলাউদ্দিনের অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। বিখ্যাত কবি আমীর খসরু এবং সুফী সন্ত নিজামুদ্দিন আউলিয়া তাঁহার আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। কুতুব মসজিদটিকে আরও বড় করিবার এবং কুতুবের দ্বিগুণ আকারের একটি মিনার নির্মাণের কাজও তিনি শুরু করিয়াছিলেন।

তাঁহার আমলে নির্মিত, আলাই দরওয়াজা ও অন্যান্য মসজিদে উন্নত শিল্পরুচির চিহ্ন পাওয়া যায়।

ইবনবতুতা তাঁহাকে একজন শ্রেষ্ঠ সুলতান আখ্যা দিয়াছেন। সর্বাঙ্গীন সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে আলাউদ্দিন খলজীকে যথার্থভাবেই শ্রেষ্ঠ সুলতান বলা যায়।

আলাউদ্দিনের মৃত্যুর (১৩১৬ খ্রীঃ) সঙ্গে সঙ্গে খলজী শাসনব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। পরবর্তী সুলতানদের অকর্মণ্যতার সুযোগে অভিজাতগণ আবার শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত ওমারাহদের পরামর্শে পাঞ্জাবের একাংশের শাসক বৃদ্ধ গাজী মালিক গিয়াসুদ্দিন তুঘলক উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৩২০ খ্রীঃ)।

সাত □ তুঘলক বংশ

● **গিয়াসুদ্দিন তুঘলক** ঃ আলাউদ্দিন খলজীর বিভিন্ন প্রকারের সংস্কার সাধনে যে সকল ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা গিয়াছিল পরবর্তিসময়ে সেই বিভিন্ন ধরনের সংস্কারমূলক কার্যকলাপের ত্রুটি নিবারণে গিয়াসুদ্দিন তুঘলক নূতন নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। বৃদ্ধবয়সে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া গিয়াসুদ্দিন অল্প দিনের মধ্যে রাজস্ব, পুলিস, ডাক ও বিচার বিভাগে নানাবিধ সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ কমাইয়া উৎপন্ন ফসলের $^1/_{১০}$ ভাগ প্রজাদের করপ্রদান হিসাবে ধার্য করা হইল। রাষ্ট্রের নিজ ব্যয়ে বিভিন্ন ফসলোপযোগী জমিতে সেচের জন্য খাল খননের ব্যবস্থা করা হইল।

তুঘলকাবাদ

দিল্লীতে গ্রানাইট পাথরে গিয়াসুদ্দিন তাঁহার নিজের জন্য একটি সুন্দর শহর তৈয়ারি করিলেন এবং প্রবল শক্তিশালী বুরুজযুক্ত একটি প্রাকারে শহরটিকে ঘিরিয়া রাখিলেন। নামকরণ করিলেন তুঘলকাবাদ—যাহা বর্তমানে দুই-একটি সমাধি সৌধ ব্যতীত সম্পূর্ণই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। শহরটির মধ্যে একটি কৃত্রিম হ্রদ তৈয়ারি করাইয়াছিলেন এবং বিভিন্ন লাল, সাদা পাথরে কয়েকটি সুন্দর সমাধি সৌধ ও দালান নির্মাণ করেন যা এখনও অতীতের সাক্ষীরূপে বিরাজ করিতেছে।

সুলতানী নিয়মে গিয়াসুদ্দিন কিছু কিছু সক্রিয় পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করেন। দিল্লীর রাজকোষ এই প্রকার সক্রিয়তায় সাময়িক স্ফীত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল। ইহা ছাড়াও তিনি সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পুত্র জৌনা খাঁর সেনাপতিত্বে দাক্ষিণাত্যে এক বিরাট সেনাবাহিনী পাঠাইয়াছিলেন। জৌনা খাঁ সহজেই কাকতীয়দের রাজধানী ওয়ারাঙ্গল দখল করিয়া স্থানটিকে সুলতানপুর নামে চিহ্নিত করেন।

গিয়াসুদ্দিন বাংলার শাসক সম্প্রদায়কে সুলতান কর্তৃক প্রদত্ত নিয়ম এবং সামন্ত করদ রাজ্য হিসাবে মানিয়া লইবার জন্য বাধ্য করিলেন। বঙ্গদেশ হইতে ফিরিয়া যখন জৌনা খাঁ দিল্লীতে তাঁহার পিতার

মৃত্যু

জন্য সামরিক বিজয়ের অভ্যর্থনা ও সাফল্য জানাইতে আড়ম্বর পূর্ণ আয়োজন করেন তখন কাষ্ঠ নির্মিত মঞ্চ হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িবার ফলে আকস্মিক দুর্ঘটনায় গিয়াসুদ্দিন নির্মমভাবে ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। আরবী পর্যটক ইবনবতুতার ভাষায়,—'এই আকস্মিক দুর্ঘটনাটি যাহাতে সুষ্ঠুভাবে ঘটিতে পারে সেই কারণে গিয়াসুদ্দিনের সমর-কুশলীপুত্র জৌনা খাঁ নিজেই সিংহাসনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই এই প্রকার নির্মম কার্যটি সম্পন্ন করিয়াছিলেন'। এই জৌনা খাঁ বা জুনা খাঁকেই গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যুর জন্য দায়ী করা যাইতে পারে।

● **মহম্মদ বিন তুঘলক** ঃ পিতার অপঘাত মৃত্যুর পর জুনা খাঁ মহম্মদ বিন তুঘলক উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করেন (১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দ)। উলেমা ও অভিজাতদের ক্ষমতা ধ্বংস করিয়া

নরপতিত্বের আদর্শ

আলাউদ্দিন খলজী রাজশক্তির যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, মহম্মদ বিন তুঘলক তাহা আরও গভীর ও আন্তরিকভাবে প্রসারিত করিয়াছিলেন। মতাদর্শের দিক হইতে তিনি আলাউদ্দিন অপেক্ষাও প্রবল উলেমা বিরোধী ছিলেন। তাঁহার

ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি ছিল সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সমতা রক্ষা। বারণী প্রমুখ কট্টর ধর্মান্ধ মানুষ তাঁহার প্রখর সমালোচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি মধ্যযুগে নরপতিত্বের এক উজ্জ্বল আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

বিবিধ অভ্যন্তরীণ সংস্কার কার্যের জন্য মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকাল স্মরণীয়। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রথমেই তিনি গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলের করভার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বারণীর মতে, ধার্য করের পরিমাণ কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ গুণ বৃদ্ধি পায়। ইতিপূর্বেই ওই অঞ্চলে আলাউদ্দিন খলজী অধিক হারে কর ধার্য করিয়াছিলেন। নূতন করিয়া কর বৃদ্ধি ঘটিলে কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। কর আদায়কারীরা কিন্তু বলপূর্বক কর আদায় করিতে থাকেন। সরকারী কর্মচারীদের উৎপীড়নের ফলে একদা সমৃদ্ধ দোয়াব অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। কৃষকরা খাজনা দিতে অস্বীকার করিল। এই অবাধ্যতার জন্য সুলতান তাহাদের কঠোর শাস্তি দিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তিনিই আবার প্রচুর ঋণদান ও জলসেচের ব্যবস্থা করিয়া কৃষকদের সাহায্য করিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, সাম্রাজ্যের মধ্যে এই অঞ্চলটি সর্বাপেক্ষা উর্বর থাকায় অর্থের প্রয়োজনে করবৃদ্ধি একেবারে অযৌক্তিক ছিল না।

করবৃদ্ধি

মহম্মদবিন তুঘলকের বহুনিন্দিত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলির অন্যতম হইল দিল্লী হইতে দক্ষিণ ভারতের দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তকরণ। দেবগিরির নূতন নাম হইল দৌলতাবাদ। সুলতানের আদেশে দিল্লীর অধিবাসীদের সকলকেই নূতন রাজধানীতে যাইতে হইয়াছিল। যাতায়াতের সুবিধার জন্য অবশ্য নূতন পথ ও সরাইখানা নির্মিত হইয়াছিল। বিশ্রামের জন্য ছায়াছন্ন বৃক্ষাদিও রোপণ করা হইয়াছিল। আট বৎসর পরে রাজধানী পুনরায় দিল্লীতে ফিরাইয়া আনা হইল। কিন্তু ৭০০ মাইল দীর্ঘ পথে যাতায়াতের ফলে সাধারণ মানুষের ক্লেশ ও দুর্গতির সীমা থাকিল না।

দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তকরণ

সাধারণের দুর্গতি এবং অর্থের অপচয়—এই দুই দিক হইতে বিচার করিলে রাজধানী স্থানান্তকরণ নিঃসন্দেহে নিন্দার্হ। কিন্তু রাজধানী স্থানান্তকরণের পক্ষে যুক্তিও ছিল। প্রথমতঃ, দেবগিরি ছিল সাম্রাজ্যের মধ্যস্থান। সুতরাং দিল্লীর তুলনায় এই স্থান হইতে দক্ষিণ ভারত তথা সমগ্র অঞ্চলে শাসন পরিচালনা করা সহজসাধ্য ছিল। দ্বিতীয়তঃ, দিল্লী উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিকটে থাকায় মোঙ্গল আক্রমণের সম্ভাবনায় উহার নিরাপত্তা যে কোন সময়ে বিঘ্নিত হইতে পারিত। সুতরাং মোঙ্গল আক্রমণের কেন্দ্রস্থল হইতে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী ও নিরাপদ স্থানে রাজধানী স্থানান্তর করিবার সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত ছিল। তৃতীয়তঃ, আধুনিক গবেষক ডঃ আগা মাহাদি হাসান মন্তব্য করিয়াছেন, হিন্দু সংস্কৃতি প্রধান দক্ষিণ ভারতে মিশ্র সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে মহম্মদ বিন তুঘলক দৌলতাবাদে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ইবনবতুতা অবশ্য বলিয়াছেন, দিল্লীর জনগণের মনোভাবে বিরক্ত হইয়া সুলতান এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই সামান্য কারণকে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করেন না।



মহম্মদ বিন তুঘলক

রাজধানী দিল্লীতে ফিরাইয়া আনাও আযৌক্তিক ছিল না। প্রথমতঃ রাজধানী দক্ষিণ ভারতে স্থানান্তরিত হইলে, মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, দেবগিরি হইতে বাংলা প্রভৃতি অঞ্চল শাসন করা দুরূহ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, সরকারী মুসলিম কর্মচারিগণ দক্ষিণ ভারতের হিন্দু পরিবেশে বসবাস করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। যাহা হউক, পরিকল্পনাটি যুক্তিসঙ্গত হইলেও বাস্তবজ্ঞানের অভাবে উহা ব্যর্থ হইয়া গেল। সমস্ত অধিবাসীদের স্থানত্যাগে বাধ্য না করিয়া কেবলমাত্র দরবার ও সরকারী কার্যালয় স্থানান্তরিত করিলেই তাঁহার কার্য সফল হইত।

মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালের অপর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার। চীন সম্রাট কুবলাই খানের আদর্শ অনুসরণ করিয়া তিনি তাম্র মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন (১৩২৯ খ্রীঃ)। কিন্তু উপযুক্ত সতর্কতা না লইবার ফলে ব্যাপকভাবে মুদ্রা জাল হইতে লাগিল। ক্রমে মুদ্রার মূল্য কমিয়া গেল এবং বিদেশী বণিকগণ তাম্র মুদ্রা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। বাধ্য হইয়া সুলতান তাম্র মুদ্রা বাতিল করিয়া সকলকে ক্ষতিপূরণ দিলেন। তামার মুদ্রা প্রচলনের সিদ্ধান্তটি কিন্তু তত্ত্বের দিক হইতে সঠিক ছিল। এই সময় দেশে স্বর্ণ ও রৌপ্যের ঘাটতি দেখা দিয়াছিল। অথচ সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার, প্রশাসনিক খরচ, সুলতানের দান-ধ্যান ইত্যাদি কারণে রাজকোষ নিঃশেষ হইয়া যাইতেছিল। ধাতু হিসাবে তামার মূল্য কম। যাহার ধাতু-মূল্য কম তাহাকে অধিক মূল্যের প্রতীক রূপে ব্যবহার করা অর্থবিজ্ঞানের একটি মৌলিক সূত্র। কিন্তু সমকালীন ভারতবর্ষে ইহা যুগোপযোগী না হওয়ায় মহম্মদ বিন তুঘলকের মুদ্রা সংস্কার ব্যর্থ হইয়া যায়।

তাম্র মুদ্রার প্রচলন

আলাউদ্দিনের ন্যায় মহম্মদ বিন তুঘলকও দিগ্বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার কারাজল (কুমায়ুন ও গাড়োয়াল অঞ্চল) অভিযান, ঘোরসান ও ইরাক জয়ের পরিকল্পনা সঠিক সামরিক নীতি ও প্রকৃত রণকৌশলের অভাবে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। ফিরিস্তার মতে, তিনি তিব্বত ও চীন জয়েরও চেষ্টা করেন। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই মত সমর্থন করেন নাই। মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে ভারতে নূতন করিয়া মোঙ্গল আক্রমণ ঘটিলে সুলতান প্রচুর অর্থের বিনিময়ে সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন। সীমান্ত সুরক্ষিত করিয়া প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করিবার পরিবর্তে উৎকোচ দানের এই প্রচেষ্টা দুর্বলতার পরিচায়ক।

দিগ্বিজয়ের পরিকল্পনা

মহম্মদের এই অদূরদর্শিতা, অনভিজ্ঞতা ও অত্যাচারের ফলস্বরূপ সাম্রাজ্যে অশান্তি ও বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। সুলতানী সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দক্ষিণ ভারতে বাহমনি ও বিজয়নগর নামে দুইটি স্বাধীন রাজ্যের জন্ম হয়। বাংলা দেশে মুবারক শাহ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সিন্ধু দেশেও বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। শেষে এই বিদ্রোহ দমন করিতে যাইয়া ১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ বিন তুঘলক দেহরক্ষা করেন।

● **মহম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্র ও কৃতিত্ব বিচার ঃ** ভারতবর্ষের ইতিহাসে মহম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন সবচেয়ে বিতর্কিত পুরুষ। তাঁহার চরিত্রে নানা বিরোধী গুণের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। একদিকে তিনি ছিলেন বহুগুণান্বিত এক অসাধারণ পুরুষ। দর্শন, কাব্য, সাহিত্য, চিকিৎসা ও জ্যোতিষ বিদ্যা, গণিত ও বিজ্ঞানে তাঁহার ঔৎসুক্য ও জ্ঞান বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। পারসিক সাহিত্যে তিনি ছিলেন গভীরভাবে পরিচিত এবং পত্রাদিতে তিনি তাহা হইতে প্রচুর উদ্ধৃতি দিতেন। তাঁহার হস্তাক্ষর ছিল যেমন সুন্দর, স্মৃতিশক্তিও ছিল তেমনি অসাধারণ। দয়া-দাক্ষিণ্য, বদান্যতা, চারিত্রিক সরলতা ও নিষ্ঠার জন্য তিনি সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শিল্প সম্বন্ধেও তাঁহার অনুরাগ ছিল। ধর্মান্ধতা, ব্যভিচার, মদ্যাসক্তি প্রভৃতি মধ্যযুগীয় দোষত্রুটি হইতে তিনি ছিলেন একান্তভাবেই মুক্ত। ইবনবতুতা তাঁহার বিনয় ও ন্যায়-পরায়ণতার প্রশংসা করিয়াছেন। আবার একই সঙ্গে তিনি ছিলেন নির্মম ও নিষ্ঠুর। অকাতরে দান করিবার পরমুহূর্তে নির্বিচারে প্রাণদণ্ড দিতে

কৃতিত্ব

তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি ছিলেন চরম অসহিষ্ণু ও অস্থিরমতি। যে পরিকল্পনা তিনি সঠিক বলিয়া মনে করিতেন তাহা রূপায়ণ করিবার সময় তিনি কোন সমালোচনা বা আপত্তি (যাহা অনেক সময়েই সঙ্গত ছিল) সহ্য করিতেন না। তাঁহার বিরুদ্ধাচারণের শাস্তি ছিল কঠোর। নিজে মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিলেও অপরের স্বাধীন মত গ্রাহ্য করিতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁহার চরিত্রে ধৈর্যেরও একান্ত অভাব ছিল। চরিত্রের এই অস্বাভাবিক বৈপরীত্যের জন্য বারণী, ফিরিস্তা, ইবনবতুতা এবং এলফিনস্টোন/, ডঃ স্মিথ প্রমুখ সমসাময়িক এবং ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ মহম্মদ বিন তুঘলককে 'উন্মাদ ও বিকৃতমস্তিষ্ক' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু গার্ডনার ব্রাউন, পণ্ডিত ঈশ্বরীপ্রসাদ প্রমুখ পণ্ডিতগণ এই অভিযোগ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, মোল্লাতন্ত্রের সমর্থক বলিয়াই বারণী সুলতানের বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। মহম্মদ বিন তুঘলকের উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ শাসন আমীর ও মোল্লাতন্ত্রের স্বার্থের বিরোধী ছিল। যাহা হউক, তাঁহার পরিকল্পনাগুলি তত্ত্বের দিক হইতে যতই নিখুঁত থাকুক না কেন, বিচক্ষণতা ও বাস্তববোধের অভাবে তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। অবশ্য যুগের বিচারে অগ্রগামী থাকায় সমকালীন মানুষ মহম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনাগুলির যৌক্তিকতাও অনুধাবন করিতে পারেন। পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ হইবার ফলে জনসাধারণ তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া বিদ্রোহের সৃষ্টি করে এবং সাম্রাজ্যকে দ্রুত পতনের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের জন্য মহম্মদ বিন তুঘলক প্রকৃত দায়ী ছিলেন না। বরং সংগঠিত সেনাবাহিনীর সাহায্যে তিনি শাসনের প্রধান কেন্দ্র উত্তর ভারতে সাম্রাজ্যের সীমা ও আয়তন অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

● **ফিরোজ শাহ তুঘলক ঃ** মহম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁহার পিতৃব্য পুত্র ফিরোজ তুঘলক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার পরই ফিরোজ বিদ্রোহ দমনে যত্নবান হইলেন। কিন্তু বাংলার বিরুদ্ধে দুইবার অভিযান করিয়াও (১৩৫৩-৫৯ খ্রীঃ) তিনি সফল হইলেন না। অবশেষে শামস্উদ্দিন ইলিয়াস শাহর পুত্র সিকন্দরকে বাংলার স্বাধীন শাসক হিসাবে স্বীকৃতিদানে তিনি বাধ্য হইলেন। দাক্ষিণাত্যেও তিনি দিল্লীর আধিপত্য পুনঃস্থাপন করিতে পারেন নাই। অবশ্য পাঞ্জাবের নগরকোট দুর্গ অধিকারে ও সিন্ধুর বিদ্রোহ দমনে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। উড়িষ্যার জাজনগরের অধিপতিও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

● **ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসন সংস্কারের রূপ ও চরিত্র ঃ** সামরিক কৃতিত্বের অধিকারী না হইলেও, নানাবিধ সংস্কার ও জনহিতকর কার্যাবলী প্রবর্তন করিবার জন্য ফিরোজ শাহ তুঘলকের রাজত্বকাল স্মরণীয়। কিন্তু রাষ্ট্রশাসনের ক্ষেত্রে তিনি যে নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা চরিত্রগত দিক হইতে পূর্বতন সুলতানদের অনুসৃত নীতি হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক ছিল। আলাউদ্দিন খলজী এবং মহম্মদ বিন তুঘলক উলেমাদের আধিপত্য এবং অভিজাতদের ঔদ্ধত্য খর্ব করিয়া সুলতানের সর্বাত্মক ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আলাউদ্দিন খলজী ধর্মের ক্ষেত্রে ধর্মনেতাদের নেতৃত্ব মানিয়া লইলেও মহম্মদ বিন তুঘলক তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন নাই। আইনের ক্ষেত্রে তিনি উলেমা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সমতার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফিরোজ শাহ তুঘলক কিন্তু ধর্মের উপর ভিত্তি করিয়াই তাঁহার শাসন ব্যবস্থা বিন্যস্ত করিয়াছিলেন। কর ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি কোরাণ তথা উলেমাদের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। অন্যদিকে, আমীর-ওমরাহদের অনুগ্রহে ক্ষমতা দখল করিয়াছিলেন বলিয়া সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক অভিজাতদের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপও মানিয়া লইয়াছিলেন। ওমরাহদের স্বার্থেই তিনি জায়গির প্রথা পুনঃপ্রবর্তন করিয়াছিলেন। অবশ্য ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসন ব্যবস্থার একটি মৌল নীতি ছিল জনকল্যাণের আদর্শ। সুলতানী শাসনের ইতিহাসে প্রজাহিতৈষণার এই নীতি ছিল একান্তভাবেই বিরল ঘটনা।

ধর্মকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা

অভিজাতদের ক্ষমতাদান ও আদর্শ

রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে ফিরোজ শাহ তুঘলক কয়েকটি সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ইসলামের বিধিবিধানের দ্বারা অনুমোদিত নয় বলিয়া পূর্বতন সুলতানদের আমলের বহু কর তিনি বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন। কোরাণের অনুশাসন মানিয়া তিনি কেবলমাত্র চারিটি কর ধার্য করিয়াছিলেন, যথা (১) খারাজ বা ভূমি রাজস্ব, (২) খামস্ বা লুণ্ঠিত দ্রব্যের বা খনিজ দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ, (৩) জিজিয়া বা অ-মুসলমানদের উপর ধার্য কর। (ফিরোজ শাহ তুঘলকই প্রথম সুলতান যিনি ব্রাহ্মণদের উপরও জিজিয়া কর চাপাইয়া দিয়াছিলেন)। (৪) জাকাৎ বা দান (এই কর কেবলমাত্র মুসলমানদের নিকট হইতে আদায় করিয়া ধর্মীয় ব্যাপারে ব্যয় করা হইত)। ইহা ছাড়া তিনি উলেমাদের সম্মতিক্রমে সেচ করও (উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ) ধার্য করিয়াছিলেন। যাহা হউক বে-আইনী কর বাতিল হওয়ায় জনসাধারণের বিশেষ উপকার হইয়াছিল। ফিরোজ শাহ তুঘলক কৃষির উন্নতির প্রতিও যত্নবান ছিলেন। তাঁহার আদেশে পাঁচটি বৃহৎ সেচ-খাল খনন করা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল ১০০ মাইল লম্বা যমুনা খাল।

রাজস্ব সংস্কার

নির্মাতা হিসাবেও ফিরোজ শাহ তুঘলক খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তিনি বহু প্রাসাদ, নগর ও মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে জৌনপুর, ফতেবাদ, ফিরোজাবাদ প্রভৃতি নগরগুলি উল্লেখযোগ্য। আলাউদ্দিন নির্মিত ত্রিশটি উদ্যানের তিনি সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। অপরদিকে দিল্লীর নিকট নূতন বারশত উদ্যান গড়িয়া তোলেন। প্রাচীন স্থাপত্য কীর্তির প্রতিও তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। মীরাট ও তোপরা হইতে তিনি সম্রাট অশোকের দুইটি শিলালিপি দিল্লীতে আনিয়া রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

নগর ও উদ্যান নির্মাণ

বহু জনহিতকর কার্য পত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া ফিরোজ শাহ তুঘলক ইতিহাসে স্মরণীয়। তিনি বেকার সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কর্মসংস্থান কেন্দ্র এবং দরিদ্র মানুষের চিকিৎসার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। দুস্থ মুসলিম কন্যাদের বিবাহ এবং অনাথ ও বিধবাদের ভরণপোষণের জন্যও তিনি বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তবে তাঁহার কল্যাণ-প্রয়াস মুসলিম জনগণের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি অনেক মাদ্রাসাও নির্মাণ করিয়াছিলেন।

জনহিতকর কার্যাবলী

ফিরোজ শাহ তুঘলক ইসলামী আইন অনুযায়ী বিচার বিভাগের সংস্কার করিয়াছিলেন। পূর্বেকার নিষ্ঠুর শাস্তিদানের প্রথার অবসান করিয়া তিনি বিচার ব্যবস্থাকে বহুল পরিমাণে উদার ও মানবোচিত করেন। কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জায়গির প্রথা পুনঃপ্রবর্তনে তিনি দুর্বলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। সৈনিক ও কর্মচারীদের তিনি বেতনের পরিবর্তে জায়গির দান করিতেন।

শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতা

ফিরোজশাহ তুঘলকের শাসনব্যবস্থার আরও একটি দুর্বলতা ছিল ক্রীতদাসদের সংখ্যাস্ফীতি। সুলতানের নিজস্ব ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ আশি হাজার। পরবর্তিকালে দাসপ্রথা সাম্রাজ্যের সংহতি ও নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ফিরোজশাহ তুঘলকের ধর্মান্ধতা, জায়গির প্রথার পুনঃপ্রবর্তন, ক্রীতদাস প্রথার কুফল ইত্যাদি কারণে সুলতানী শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। রাজত্বের শেষের দিকে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ ঘনীভূত হইতে থাকে। পারিবারিক জীবনেও নানা সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই অবস্থায় ১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বারণী, আফিক প্রমুখ সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ ফিরোজ শাহ তুঘলককে একজন আদর্শ সুলতান হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রজাহিতৈষণা ও সত্যনিষ্ঠার দিক হইতে বিচার করিলে নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন সুলতানী আমলের শ্রেষ্ঠতম সুলতান। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন সৎ ও আদর্শবাদী, অবৈধ কর বাতিল, শিক্ষার প্রসার, কর্মসংস্থান কেন্দ্র ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, দুস্থ মহিলাদের সাহায্যদান, সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি

কৃতিত্ব

জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী ফিরোজশাহ তুঘলকের শাসনকালকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তাঁহার শাসননীতি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ছিল না। তাঁহার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার যথেষ্ট অভাব ছিল। উলেমা এবং ওমরাহদের হস্তক্ষেপ হইতে তিনি রাজশক্তিকে মুক্ত করিতে পারেন নাই, সামরিক অভিযানে তাঁহার উল্লেখযোগ্য সাফল্য নাই। জায়গির প্রথা পুনঃপ্রবর্তিত করিয়া তিনি সামরিক সংগঠনকে দুর্বল করিয়া দিয়াছিলেন। ব্যাপক হারে ক্রীতদাস রাখিয়া তিনি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অবনতির সূচনা করেন। তাঁহার আমলে সাম্রাজ্যের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বাংলা, সিন্ধু, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ব্যক্তিগত জীবনে নিষ্ঠাবান সুন্নী মুসলমান ফিরোজ শাহ তুঘলক হিন্দু ও শিয়াদের প্রতি দমনমূলক আচরণ করিয়াছিলেন। তিনি পুরীর জগন্নাথ মন্দির ও কাংড়ার জ্বালামুখী মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার বলিয়াছেন, হিন্দু মন্দিরগুলি এবং সূফীদের ধর্মস্থানগুলি বিদ্রোহের কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারে এইরূপ আশংকা করিয়াই ফিরোজ তাঁহাদের প্রতি কঠোর ও গোঁড়া আচরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, তাঁহার আদেশে তিনশত সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসী ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছিল। অশোকের শিলাস্তম্ভ দুইটিও তিনি মর্যাদার সহিত দিল্লীতে স্থাপন করিয়াছিলেন।

স্যার হেনরী এলিয়ট, এলফিনস্টোন প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ ফিরোজ শাহ তুঘলককে সুলতানী আমলের আকবর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু ডঃ স্মিথ ও পণ্ডিত ঈশ্বরীপ্রসাদ এই মত গ্রাহ্য করেন না। তাঁহাদের মতে, ফিরোজ শাহ তুঘলক আকবরের মত উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ শাসক ছিলেন না, সামরিক-রাজনৈতিক শাসনতান্ত্রিক কোন দিক হইতেও আকবরের সাফল্য তিনি অর্জন করিতে পারেন নাই। আকবর ছিলেন যথার্থ জাতীয় সম্রাট। তাহা সত্ত্বেও ফিরোজ শাহ তুঘলক ছিলেন একজন দয়াবান, নিষ্ঠাবান, প্রজাবৎসল শাসক।

আট □ তৈমুরলঙের ভারত আক্রমণ

● **তৈমুরলঙ ঃ** ফিরোজের মৃত্যুর পর অক্ষম ও অপদার্থ শাসকদের দুর্বলতার ফলে কেন্দ্রীয় শাসন শিথিল হইয়া আসিল এবং বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিল। এইরূপে সুলতানী সাম্রাজ্যের পতন যখন আসন্নপ্রায় সেই সময় সমরখন্দের দিগ্বিজয়ী বীর তৈমুরলঙ ভারত আক্রমণ করিলেন। তৈমুর ছিলেন তুর্কী। খোঁড়া ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে বলা হইত 'লঙ'। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তৈমুরলঙ এক দুঃস্বপ্নের নায়ক। ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। বিপুলবাহিনী লইয়া সিন্ধু, ঝিলাম ও রাভি নদী অতিক্রম করিয়া তিনি দিল্লীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হন। নিষ্ঠুর লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড তাঁহার এই যাত্রাপথকে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। অতঃপর দিল্লী অধিকৃত হয়। দিল্লীতে তিনি যে 'নরমেধযজ্ঞে'র আয়োজন করিয়াছিলেন ইতিহাসে তাহার নজীর বিরল। দিল্লী আক্রমণ সমাধা হইলে তৈমুর পাঞ্জাব শাসনের জন্য এক প্রতিনিধি রাখিয়া অসংখ্য বন্দী ও অগণিত ধনরাশি লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

● **তৈমুরের ভারত আক্রমণের ফলাফল ঃ** তৈমুরের নৃশংস আক্রমণের ফলে দিল্লী ও উত্তর ভারতের এক বিস্তৃত অঞ্চল শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। নিষ্ঠুরতায় তিনি হিটলারের মতোই পাশবিক ছিলেন। দিল্লী প্রবেশের প্রাক্কালে তিনি এক লক্ষ হিন্দু বন্দীকে হত্যা করিয়াছিলেন যাহাতে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া প্রতিরোধকারীদের সাহায্য করিতে না পারে। অন্যদিকে, তৈমুর যে বিশাল সম্পদ অপহরণ করেন তাহার প্রতিঘাতে ভারতবর্ষে তীব্র আর্থিক সংকট দেখা দিয়াছিল। অত্যাচারী অভিযানকারী চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে আসিল দুর্ভিক্ষ আর মহামারী। বদাউনীর কথায়, 'তৈমুর যাদের মারেন নি, তারাও এবার মরল, শহরের বাতি দেওয়ার কেউ রইল না। পূর্ণ দুই মাস কাল দিল্লীর আকাশে একটা পাখিকে পর্যন্ত উড়তে দেখা যায় নি'।

তৈমুরের আক্রমণ দিল্লীর পতনোন্মুখ সুলতান শাহীর উপর চরম আঘাত হানিয়াছিল। ইহার ফলে যে অরাজকতা ও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছিল তাহার সুযোগ লইয়া প্রদেশগুলি স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল। কালক্রমে তুঘলক বংশের পতন ঘটিল এবং তৈমুরের ভারতস্থ শাসনকর্তা খিজির খান দিল্লীর সিংহাসন দখল করিয়া সৈয়দ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

তুঘলক বংশের পতন

● সৈয়দ বংশ ●

তুঘলক বংশের শেষ সুলতান ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে কোন উত্তরাধিকারী না রাখিয়াই মারা যান। তাহার পর হইতে শুরু হয় সৈয়দ বংশ।

হজরত মহম্মদের বংশধর বলিয়া খিজির খান প্রবর্তিত বংশকে সৈয়দবংশ বলা হয়। এই বংশ ১৪১৪ হইতে ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং ইহার চারিজন সুলতানের মধ্যে মোবারক শাহ বাদে আর সকলেই ছিলেন অপদার্থ ও অকর্মণ্য। ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে আফগান জাতির লোদি উপদল সম্ভূত বহলুল খান দিল্লী আক্রমণ করিলে সৈয়দ রাজবংশের পতন ঘটে।

সৈয়দ রাজবংশের পতন

১৪২১ খ্রীষ্টাব্দে তৈমুরলঙের মৃত্যু পর্যন্ত খিজির খান নামেমাত্র তৈমুর রাজ্যের শাসক ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রতিনিধি মাত্র। দেশ তখন ছিল নিঃস্ব। রাজস্ব আদায় করা খুবই কঠিন ব্যাপার। সৈন্যদল মজুত ছিল অভিযানের জন্য। রাজকোষ পূর্ণ করিতে হইত লুণ্ঠিত অর্থ সম্পদে। নিয়ম করিয়া প্রতিবছর যুদ্ধ অভিযান চালাইতে হইত। ফলে বলা যায়, ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রথম সাত বৎসর বাদ দিয়া সৈয়দ সুলতান বংশের শাসনকালে খিজির খানের দিল্লী, পাঞ্জাব এবং দোয়াব এই তিনটি অঞ্চলে যে বিস্তৃত রাজ্য ছিল তাহার রাজকোষ মূলতঃ নির্ভর করিত প্রতিবেশী রাজ্যসমূহের প্রতি অতর্কিত আক্রমণ, নির্যাতন এবং লুণ্ঠনের সম্বল লইয়া।

সৈয়দ বংশের খিজির খানের সুযোগ্য পুত্র মোবারক শাহ তাঁহার রাজত্ব (১৪২১ হইতে ১৪৩৪ খ্রীঃ) কালের শেষদিকে তৈমুর বংশীয় শাসন অস্বীকার করিয়া নিজ নামে মুদ্রার প্রচলন করেন। সামন্ত ভূস্বামিদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান করেন। ইহা ছাড়াও মালব শাসকের বিরুদ্ধে, গান্ধারদের বিরুদ্ধে, কাবুলে তৈমুরবংশীয় শাসকদের বিরুদ্ধে মুবারক শাহ অভিযান করিয়া কোন কোন স্থানে সাফল্য লাভও করেন। অবশেষে নিজ দরবারের ওমরাহদের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও ষড়যন্ত্রে তিনি নিহত হন।

মোবারক শাহ

অতঃপর ১৪৩৪ খ্রীঃ মুবারক শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র মুহম্মদ শাহ্ সুলতান হিসাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেইসময় লাহোর ও সির-হিন্দের শাসক প্রতিনিধি আফগান লোদী উপজাতির শ্রেষ্ঠ সমর কুশলী নেতা বহলুল খান্ মুহম্মদ শাহ্‌কে মালব অভিযানে সাহায্য করেন এবং বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। মুহম্মদ শাহ ১৪৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু বরণ করিলে সৈয়দ বংশের শেষ সুলতান আলম শাহ্ ঐ বৎসর সিংহাসনে আরোহণ করেন। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় পরিচালিত অভিজাত গোষ্ঠীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রেষারেষি সংঘর্ষ চলিবার ফলে ক্রমশঃ সৈয়দ বংশ দুর্বল হইয়া পড়ে। বহলুল খান অতঃপর ক্ষমতা দখলে সহজেই সফল হইলেন।

মুহম্মদ শাহ

● লোদী বংশ ●

শাহ্ আলমকে দিল্লীর সিংহাসন হইতে সহজেই অপসারিত করিয়া বহলুল খান লোদী উপজাতিকে সর্ববিধ সুবিধা দান করিয়া তাহাদেরই আনুকূল্যে রাজত্ব পরিচালনা করিতে থাকেন এবং ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি তাঁহার সামরিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া একজন শক্তিশালী শাসক হিসাবে পরিগণিত হইয়াছিলেন। প্রায় ৪০ বৎসর কাল রাজত্ব করিবার সুযোগে তিনি সুলতান শাহীর সীমানা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তবে এই ভাবে বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়

বহলুল খান

অসংখ্য যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে একপ্রকার নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল।

বহলুল খান ছিলেন দিল্লীর প্রথম আফগান সুলতান। শাসনকার্যে তিনি দক্ষ ছিলেন বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সিকান্দার লোদী (১৪৮৯-১৫১৭ খ্রীঃ) ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান। ত্রিহুত ও বিহারে তিনি সামরিক সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু বাংলার সুলতান হুসেন শাহের সহিত তিনি সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি সাহিত্যানুরাগী ও সুদক্ষ শাসক ছিলেন। আগ্রা শহরটি তাঁহার আমলেই নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি ছিলেন অনুদার ও সংকীর্ণমনা। সিকান্দারের পুত্র ইব্রাহিম লোদীর ১৫১৭-১৫২৬ খ্রীঃ) রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব ছিল। ইহা ছাড়া তিনি ছিলেন উদ্ধত ও ক্ষমতাপ্রিয়। ফলে তাঁহাদের সহিত আমীরদের বিরোধ চরমে পৌছিয়াছিল। এই সময় পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী এবং সুলতানের আত্মীয় আলম খাঁ সম্মিলিতভাবে কাবুলের আমীর বাবরকে দিল্লী আক্রমণ করিতে আমন্ত্রণ জানাইলেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই ভাবে দিল্লীর সুলতানী শাসনের অবসান হইল এবং ভারতবর্ষে এক নূতন তুর্কী শাসনের (মোগল আমল) সূত্রপাত হইল।

লোদী বংশ

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ

নয় □ আঞ্চলিক শক্তির উত্থান

১২০১ খ্রীষ্টাব্দে ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন বখ্‌তিয়ার খলজী সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করিয়া বাংলায় মুসলিম শাসন কায়েম করেন। অতঃপর তিনি তাঁহার সহচর আমীরদের মধ্যে জায়গির বিতরণ করিয়া সদ্য বিজিত বাংলাদেশে এক নূতন অভিজাত শ্রেণী গড়িয়া তোলেন। এই নূতন সামরিক-রাজনৈতিক শক্তি কালক্রমে দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করিতে শুরু করে। ইলতুৎমিস-বলবনের সময় হইতে শুরু করিয়া আলাউদ্দিন মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকাল পর্যন্ত বারবার বাংলা বিদ্রোহ করে। দিল্লীর সুলতানগণ বাংলায় নিজেদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সর্ববিধ প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইলেও, বাংলায় কোনদিনও সুলতানী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নাই। দিল্লী হইতে বহু দূরে অবস্থিত থাকায় বাংলায় এই স্বাতন্ত্র্য ভাব গড়িয়া ওঠে। অবশেষে, মহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনতান্ত্রিক দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে শামসৃউদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলায় এক স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলার স্বাধীনতা

(ক) বাংলা ইলিয়াস-শাহী রাজবংশ

বাংলার পাণ্ডুয়াতে রাজধানী স্থাপন করিয়া শামসৃউদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলা ও বিহারের এক ব্যাপক অঞ্চল অধিকারভুক্ত করেন। ফিরোজ শাহ তুঘলক বাংলার এই স্বাধীন শাসককে সমুচিত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে এক অভিযানের আয়োজন করেন। কিন্তু তাঁহার সামরিক প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। ইলিয়াস শাহ স্বাধীন শাসক হিসাবেই রাজত্ব করিয়া গিয়াছিলেন। শাসক হিসাবে তিনি ছিলেন কৃতী ও দক্ষ। তাঁহার আমলে বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বজায় ছিল। ইলিয়াস শাহ প্রবর্তিত রাজবংশকে বলা হয় ইলিয়াস শাহী রাজবংশ।

শামসৃউদ্দিন ইলিয়াস শাহ

ইলিয়াশ শাহর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র সিকন্দর শাহ ১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার মসনদে উপবেশন করেন। এই সময় ফিরোজ শাহ তুঘলক নূতন করিয়া বাংলার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া দিল্লী ফিরিয়া যাইতে তিনি বাধ্য হইলেন। সিকান্দর শাহর আমলে বাংলা খুবই সমৃদ্ধিশালী ছিল। এই সময় শিল্পেরও বিকাশ ঘটে। সিকান্দর শাহর রাজত্বকালেই বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল।

সিকন্দর শাহ

১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সিকান্দর শাহর মৃত্যু হইলে বাংলার সিংহাসন অধিকার করিয়া রাখেন তাঁহার পুত্র গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ। শোনা যায়, তিনি পিতাকে হত্যা করিয়া ক্ষমতা দখল করিয়াছিলেন। এই অভিযোগ সত্য হইলেও বলিতে হইবে গিয়াসউদ্দিন ছিলেন একজন দয়ালু ও যোগ্য শাসক। কবি হাফিজের সহিত তাঁহার পত্র বিনিময় হইত। চীনের সহিত সম্পর্ক নিবিড় করিবার মানসে তিনি সেখানে দূত পাঠাইয়াছিলেন।

গিয়াসউদ্দিন

অতঃপর ইলিয়াস শাহ বংশের এক অপদার্থ শাসক আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া উত্তরবঙ্গের এক জমিদার—রাজা গণেশ ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় হিন্দু রাজক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। গোঁড়া মুসলিম ধর্মনেতারা গণেশকে অপসারণ করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের সেই প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নাই। অন্যদিকে গণেশের পুত্র যদু ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়া পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিতে শুরু করেন। সম্ভবতঃ তাঁহারই চক্রান্তে রাজা গণেশের মৃত্যু ঘটে ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং যদু জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহ নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করেন। জালালউদ্দিনের আমলে হিন্দুরা বিশেষভাবে নির্যাতিত হইয়াছিলেন। ১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা গণেশের বংশের শাসনের অবসান হয়। এই বংশের শেষ সুলতানের কু-শাসনে বিরক্ত হইয়া বাংলার আমীরগণ নাসিরউদ্দিন মামুদ নামে ইলিয়াস শাহর এক বংশধরকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। কিন্তু নাসিরউদ্দিন এবং পরবর্তী রুক্নউদ্দিনের আমলে ক্রীতদাসরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে। ইহারা নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ ছিল। ইহাদের দৌরাত্ম্যে বাংলার মানুষের উপর চরম দুর্গতি নামিয়া আসিয়াছিল। অবশেষে হাবসী শাসনের অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা হইতে বাংলাকে মুক্ত করেন হাবসী শাসক সিদি বদরেরই এক মন্ত্রী আলাউদ্দিন হুসেন। তাঁহার নামানুসারে এই নূতন শাসক বংশের নাম হইল হুসেন শাহী রাজবংশ।

হুসেনশাহী রাজবংশের উদ্ভব

● হুসেন শাহী রাজবংশ (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রীঃ) ●

বাংলার ইতিহাসে হুসেন শাহের রাজত্বকাল এক স্মরণীয় অধ্যায়। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উভয় ক্ষেত্রেই এই সময় বাংলার অগ্রগতি সূচিত হইয়াছিল। শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে হুসেন শাহর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য ছিল বাংলায় শান্তি-শৃঙ্খলা ও সংহতি স্থাপন করা। অসাধারণ দৃঢ়তা ও দক্ষতার সহিত তিনি হাবসী আমীরদের বিতাড়ন করিয়া বাংলাদেশে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। সর্বত্র নূতন কর্মচারী নিয়োগ করিয়া হুসেন শাহ বাংলার অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের কাজ সমাধা করেন। অতঃপর তিনি রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হন। উড়িষ্যা ও আসামের বিরুদ্ধে তিনি অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই অভিযানের ফলশ্রুতি হিসাবে 'উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে করদ রাজগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু অংশও তিনি বাংলার সহিত যুক্ত করিয়াছিলেন। হুসেন শাহর রাজত্বকালে দিল্লীর সুলতান সিকান্দর লোদী জৌনপুরের সুলতানকে বিতাড়িত করিয়া জৌনপুর দখল করিয়া লইয়াছিলেন। জৌনপুরের রাজ্যচ্যুত শাসক বাংলার সাহায্য প্রার্থনা করিলে হুসেন শাহ তাঁহাকে আশ্রয় দেন। এই 'অপরাধের' জন্য সিকান্দর লোদী বাংলা আক্রমণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী উত্তর বিহার বাংলার শাসনাধীনে চলিয়া আসে।

রাজ্যবিস্তার

হুসেন শাহ ছিলেন মধ্যযুগের বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। উদার ও ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসাবে তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ অর্জন করিয়াছিলেন। হিন্দুদের প্রতি তিনি সহনশীল মনোভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম-নিরপেক্ষভাবে তিনি রাজকর্মচারী নিয়োগ করিতেন। তাঁহার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে বহু হিন্দু ছিলেন। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত ভ্রাতৃদ্বয়—রূপ

গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী এবং গোপীনাথ বসু ও পুরন্দর খান।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের ইতিহাসে হুসেন শাহর স্মরণীয় অবদান আছে। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বসু শ্রীমদ্‌ভাগবত বাংলায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদের জন্য সুলতান তাঁহাকে 'গুণরাজ খান' উপাধি প্রদান করেন। এই সময় মহাভারতও বাংলায় অনূদিত হইয়াছিল।

ধর্মীয় সহনশীলতা

হুসেন শাহর রাজ্যকালে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ধর্মের ক্ষেত্রে এই সময়ের অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল হিন্দু-মুসলমান সৌহার্দ্য ও সংস্কৃতির সমন্বয়। ঐতিহাসিকরা বলেন, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে হুসেন শাহর আনুকূল্যে বাংলায় সত্যপীরের আরাধনার প্রচলন হয়। হিন্দু দেবতা সত্যনারায়ণের পূজায় ইসলামীয় বিধি অনুযায়ী 'শিরনি'র ব্যবহার এক উদার ও সামাজিক সম্প্রীতির প্রতীক। সর্বগুণান্বিত এই মহান শাসকের মৃত্যু ঘটে ১৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে।

● **নসরৎ শাহ ঃ** পিতা হুসেন শাহর মৃত্যুর পর বাংলার সিংহাসনে উপবেশন করেন পুত্র নসরৎ শাহ। যোগ্য এবং ক্ষমতাবান শাসক হিসাবে নসরৎ শাহও ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তিনি ত্রিহুত জয় করিয়া বাংলাকে বাড়াইয়াছিলেন। এই সময় বাবর পূর্বভারতে মোগল আধিপত্য সম্প্রসারণের

সামরিক কার্যাবলী

উদ্দেশ্যে বাংলা আক্রমণ করেন। নসরৎ শাহ ইতিপূর্বেই প্রথম পানিপথ যুদ্ধ হইতে পলায়নপর আফগান ওমরাহদের আশ্রয় দান করিয়া আক্রমণের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। যুদ্ধে বাবরের হস্তে পরাজিত হইয়া তিনি মোগল আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। বাবর অবশ্য তাঁহাকে সমকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ পাঁচজন শক্তিশালী রাজার অন্যতম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নসরৎ শাহর আমলের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা হইল বাংলায় পর্তুগীজদের প্রথম পদার্পণ। ইহা ব্যতীত, রাজত্বের শেষ দিকে প্রাসাদ রক্ষীরা আবার শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এক প্রাসাদরক্ষী আততায়ীর হস্তেই তিনি প্রাণ হারান। নসরৎ শাহ সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার আমলে গৌড়ের 'বড় সোনা মসজিদ'

পৃষ্ঠপোষকতা

নির্মিত হইয়াছিল। মহাভারত অনুবাদের জন্যও তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নসরৎ শাহের রাজত্বকালের বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শ্রীকর নন্দী, কবিকঙ্কণ প্রমুখ সাহিত্যিকগণ।

নসরৎ শাহর মৃত্যুর পর হুসেন শাহী রাজবংশ তথা বাংলার পতন শুরু হইয়া যায়। এই বংশের শেষ রাজা মামুদকে পরাজিত করিয়া শের শাহ বাংলায় প্রভুত্ব স্থাপন করেন। এই ভাবে হুসেন শাহী বংশের অবসান ঘটে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে ইলিয়াস শাহী ও হুসেন শাহী রাজবংশ দুইটির শাসনকাল বিশেষভাবে স্মরণীয়।

প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসরেরও অধিক সময়কাল ব্যাপিয়া মুসলিম শাসকগণ বঙ্গদেশে শাসন করিয়াছেন। এই সময়ই মুসলমানেরা স্থায়িভাবে বঙ্গদেশে প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়াছিল। ফলস্বরূপ হিন্দু এবং মুসলমানগণ একে অপরের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম সম্পর্কে বিশেষভাবে পরিচিত হইতে থাকে। ক্রমে ধর্ম, সমাজ এবং সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন লক্ষিত হয়। বহুকাল

সাংস্কৃতিক অবদান

হিন্দু ও মুসলমান একজায়গায় বসবাসের জন্য তাহাদের নিজেদের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ, বিরোধ প্রভৃতি হ্রাস পাইতে থাকে এবং ধর্ম ও সমাজ জীবনে বিরাট পরিবর্তন লক্ষিত হয়। এই দুই সম্প্রদায় একে অপরের আত্মীয় সম্বন্ধ গঠন করিতে সচেষ্ট হয়। ক্রমে ক্রমে হিন্দুদের আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, ধর্ম প্রভৃতি সর্ব বিষয়কেই মুসলমানগণ স্বীকার করিয়া

লন। ফলে হিন্দুরা স্বাধীনভাবে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন। এইভাবে কিছুদিন বসবাসের ফলে অনেক হিন্দু-মুসলমান দেব-দেবীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। তাঁহারা হইলেন মুস্কিল আসান, সত্যপীর, ত্রিলোকপীর, ওলাবিবি প্রভৃতি। মুসলমানগণ কেবলমাত্র তাহাদের নিজ উৎসবেই মাতিয়া থাকিতেন না। হিন্দুদের পূজা পার্বণেও যোগ দিতেন। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল বৈশাখী মেলা, দুর্গাপূজা, দোল ইত্যাদি। এই সময় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অভাবনীয় বিকাশ দেখা যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবত ও মহাভারতের বাংলা অনুবাদ, বিজয় গুপ্তর মনসামঙ্গল এবং শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবকে কেন্দ্র করিয়া রচিত কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' এই যুগের সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টি। বাংলা রামায়ণ রচয়িতা কবি কৃত্তিবাসও এই সময়কার মানুষ। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য' ছিল আর একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কীর্তি। সুলতানী আমলে বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা হইত। নবদ্বীপ ছিল হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ও সংস্কৃত চর্চার প্রধানতম কেন্দ্র। এই সময়ের বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃত রচনা হইল রূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধ মাধব' ও 'ললিত মাধব' নামক গ্রন্থ দুইটি।

সাহিত্যের বিকাশ

হিন্দু ও মুসলমান এই দুই শ্রেণীর মিলনের ফলে শুধুমাত্র যে ধর্মের দিক হইতে এক মহামিলন ঘটিয়াছিল তাহা নহে হিন্দু ধর্মের মধ্যে বহু প্রকারের সংস্কারাবলীও দেখা দিয়াছিল। এই সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য হইল মুসলমান ধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি প্রতিহত করা। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হইল ব্রাহ্মণদিগের মাছ, মাংস সহকারে পূজা-অর্চনা করা, বলি প্রথা ইত্যাদি। শূদ্রদের মুসলমানদের কাছ হইতে পৃথক করিবার জন্য ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রদান করিতেন। বৌদ্ধদের তান্ত্রিক মতবাদও হিন্দুদের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছিল। পুরাকালে নীচু শ্রেণীর লোকেরা চণ্ডী, শীতলা, মনসা প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা অর্চনা করিত যাহা উচ্চবর্ণের লোকেরা করিত না কিন্তু পরবর্তিকালে উচ্চশ্রেণীর লোকেরাও উপরোক্ত দেবদেবীর পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। চৈতন্যদেব প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণভিত্তিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ক্রমে ক্রমে বিলুপ্তি ঘটিতে থাকে।

সংস্কারাবলী

নসরৎ শাহী ও হুসেন শাহী রাজবংশ দুইটির আমলে বাংলায় এক বিশিষ্ট ধরনের স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটিয়াছিল। গৌড়ের ছোট ও বড় সোনা মসজিদ, পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ বাংলার স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষতার পরিচয় বহন করে।

(খ) বাহমনী রাজ্য

মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালের শেষের দিকে দাক্ষিণাত্যে এক বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। সুলতান এই বিদ্রোহ দমন করিতে পারেন নাই। অতঃপর ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হাসান নামে উচ্চাকাঙ্ক্ষী সৈনিক দৌলতাবাদ অঞ্চলে এক স্বাধীন রাজ্যের পত্তন করেন। হাসান 'আলাউদ্দিন বাহ্‌মান শাহ' উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐতিহাসিক ফিরিস্তা বলিয়াছেন, হাসান শৈশবকালে গঙ্গু নামে এক ব্রাহ্মণ জ্যোতিষের ভৃত্য হিসাবে কাজ করিতেন। এই ব্রাহ্মণের প্রতি কৃতজ্ঞতা হিসাবেই তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম রাখেন বাহমনী (ব্রাহ্মণ)। ডঃ স্মিথ এবং আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, হাসান নিজেকে পারস্যের প্রসিদ্ধ রাজ পরিবার বহমন্ বংশোদ্ভূত দাবি করিতেন বলিয়াই বংশের নামকরণ করেন বাহমনী। বাহমনী রাজ্যটি নর্মদা ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। ইহার রাজধানী ছিল গুলবর্গা। আলাউদ্দিন বাহ্‌মান শাহ প্রজাহিতৈষী শাসক ছিলেন। ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা যান।

বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

হাসানের উত্তাধিকারী প্রথম মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্যের মধ্যে দক্ষিণভারতের প্রাধান্য লইয়া দীর্ঘ সংগ্রাম শুরু হয়। (এই সংগ্রামের বিস্তৃত বিবরণ অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে)। প্রথম মহম্মদ শাহ দক্ষতার সহিত শাসন করিয়া রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে আসেন যথাক্রমে মুজাহিদ শাহ

মহম্মদ শাহ

এবং দ্বিতীয় মহম্মদ শাহ। দ্বিতীয় মহম্মদ শাহ সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। ১৩৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বাহমনী সিংহাসনে আরোহণ করেন ফিরোজ শাহ। (১৩৯৭-১৪২২ খ্রীঃ)। ফিরোজ শক্তিশালী শাসক ছিলেন। বিদ্বজ্জনের প্রতি তাঁহার সশ্রদ্ধ অনুরাগ ছিল। স্থপত্য শিল্প বিষয়েও তাঁহার আগ্রহ ছিল। কিন্তু ধর্মীয় গোঁড়ামিসহ তিনি ছিলেন ঘোর মদ্যপায়ী এবং তাঁহার বিশাল অন্তঃপুরে বহু নারী ছিল। ঐতিহাসিক ফিরিস্তা অবশ্য তাঁহাকে বাহমনী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান বলিয়া মনে করেন। যাহা হউক, ১৪২২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতা আহম্মদ শাহ বাহমনী সিংহাসন অধিকার করেন। সামরিক দিক হইতে তিনি সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। বিজয়নগরের শক্তি চূর্ণ করিয়া তিনি বরঙ্গল রাজ্য আক্রমণ করেন। রাজ্যটি অধিকৃত হইবার ফলে গোলকুণ্ডার বিখ্যাত হীরক খনি তাঁহার অধিকারে আসে। মালব ও গুজরাটের সহিত যুদ্ধেও তিনি সাফল্য লাভ করেন। তিনি গুলবর্গা হইতে বিদরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ধর্মোন্মাদ ও সংকীর্ণমনা হইলেও বিদ্যাচর্চার প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। পরবর্তী শাসক আলাউদ্দিন কঠোরতার সহিত অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করিয়া রাজ্যকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করিয়াছিলেন। শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁহারও আগ্রহ ছিল। আলাউদ্দিনের পুত্র হুমায়ুন শাহ ইতিহাসে 'জালিম' অর্থাৎ 'অত্যাচারী' শাসক হিসাবে কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র নিজাম শাহর রাজত্বকালে উড়িষ্যা ও তেলেঙ্গনার হিন্দুরাজগণ বাহমনী রাজ্য আক্রমণ করেন। নিজাম শাহর মৃত্যুর পর সিংহাসনে উপবেশন করেন এক অকর্মণ্য ও বিলাসপ্রিয় শাসক তৃতীয় মহম্মদ শাহ। এই সময় রাজ্যের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিতেন প্রধানমন্ত্রী মামুদ গাওয়ান। তিনি নিষ্ঠা ও কৃতিত্বের সহিত বাহমনী রাজ্যের স্বার্থ রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি কোঙ্কণের হিন্দু রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং পরে উড়িষ্যার বিরুদ্ধেও তিনি সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। গোয়া বন্দরটিও তিনি বিজয়নগর রাজ্য হইতে অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও তিনি নানারকম সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সুদক্ষ ও সমরকুশলী প্রধানমন্ত্রীকে অকৃতজ্ঞ সুলতানের আদেশে প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল। মামুদ গাওয়ানের হত্যার পর বাহমনী রাজ্য বেশীদিন টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। চতুর্দশ সুলতান মামুদ শাহর দুর্বলতার সুযোগ লইয়া প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ স্বাধীন ক্ষমতা গ্রহণ করিতে শুরু করেন। অতঃপর ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে এই বংশের শেষ রাজা কলিমউল্লাহ শাহর মৃত্যু ঘটিলে বাহমনী রাজ্যের পতন ঘটে এবং বাহমনী রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর পাঁচটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়।

ফিরোজ শাহ

আহমদ শাহ

তৃতীয় মহম্মদ শাহ

বাহমনী রাজ্যের পতন

● **দাক্ষিণাত্যের পঞ্চরাজ্য ঃ** ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে বাহমনী রাজ্যের অবসান ঘটিলে দাক্ষিণাত্যে পাঁচটি স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠে। এই রাজ্যগুলি হইতেছে—বিজাপুরের আদিলশাহী রাজ্য—প্রতিষ্ঠাতা ইউসুফ আদিল শাহ, আহম্মদনগরে নিজামশাহী রাজ্য—প্রতিষ্ঠাতা আহম্মদ নিজাম শাহ, বেরারের ইমাদশাহী রাজ্য—প্রতিষ্ঠাতা ফতুল্লা ইমাদশাহ, গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী রাজ্য—প্রতিষ্ঠাতা কুলী কুতুব শাহ, এবং বিদরের বারিদশাহী রাজ্য—প্রতিষ্ঠাতা আমীর বারিদ শাহ। এই রাজ্যগুলির মধ্যে কিছুকাল পরে বিজাপুর রাজ্য বিদর এবং আহম্মদ নগর বেরার অধিকার করিয়া লইয়াছিল। ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শাহজাহান আহম্মদনগর এবং ১৬৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অধিকার করেন।

পাঁচটি স্বাধীন রাজ্য

(গ) বাহমনী-বিজয়নগর সংগ্রাম

বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হাসানের উত্তরাধিকারী প্রথম মহম্মদ শাহর রাজত্বকালে বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘ সংঘর্ষের সূচনা হয়। রায়চুর-দোয়াবের অধিকারের প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়া

এই সংগ্রামের সূত্রপাত। মহম্মদ শাহ বিজয়নগর রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বহুলক্ষ মানুষের প্রাণনাশ করেন। বিজয়নগর অধিপতি প্রথম বুক্ক প্রচুর ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরবর্তী সুলতান মুজাহিদ শাহ বুক্কের রাজধানী অবরোধ করিলেও উহা অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই। বাহমনী রাজ্যের চতুর্থ সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ শাহ শান্তিপ্রিয় ও সংস্কৃতি অনুরাগী মানুষ ছিলেন। তাঁহার আমলে বিজয়নগরের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ হয় নাই। দ্বিতীয় মহম্মদ শাহর উত্তরাধিকারী ফিরোজ শাহ পুনরায় আক্রমণের নীতি অনুসরণ করিলেন। বিজয়নগরের সহিত তাঁহার তিনবার যুদ্ধ হয়। দুইবার জয়লাভ করিবার পর তৃতীয়বার তাঁহার পরাজয় ঘটে। ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগর রাজ দ্বিতীয় হরিহর এক বিশাল বাহিনী রায়চুর দোয়াব আক্রমণ করিলে বাহমনী রাজ্যের সহিত যুদ্ধের সৃষ্টি হয়। শিবিরে বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দেওয়ায় হরিহর শেষপর্যন্ত প্রচুর ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। ইতিমধ্যে খান্দেশ, গুজরাট ও মালবের সুলতানগণ তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বাহমনী রাজ্যের শক্তি চূর্ণ করিবার স্বার্থে বিজয়নগরের শাসকগণকে বাহমনী আক্রমণ করিবার জন্য প্ররোচিত করেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে ফিরোজ শাহ পরাজিত হইলেও, তাঁহার এক সেনাপতি তুঙ্গভদ্রা পর্যন্ত এলাকা জয় করেন। বিজয় নগর রাজ দ্বিতীয় হরিহরকে অপমানজনক সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় বাহমনী-বিজয়নগর যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে ফিরোজশাহ পরাজিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যও বিধ্বস্ত হয়। পরবর্তী শাসক আহম্মদ শাহ নবোদ্যমে বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। বিজয়নগর রাজ্যের নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ উপকূলে উপস্থিত হইলে, আহম্মদ শাহ অতর্কিতে শত্রু বাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন। যুদ্ধে বিজয়নগর পরাজিত হয়, রাজা দ্বিতীয় দেবরায় বিপুল পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে এবং বাৎসরিক করদানে স্বীকৃত হইয়া সন্ধি করিলেন। বাহমনী রাজ্যের নিকট বারংবার পরাজিত হইয়া বিজয়নগর অধিপতি নূতন কৌশলে সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠিত করিলেন। ১৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রায়চুর দোয়াব আক্রমণ করিয়া প্রারম্ভিক কিছুটা সাফল্য লাভ করিলেও, দ্বিতীয় দেবরায় বাহমনী সুলতান দ্বিতীয় আলাউদ্দিনের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। তিনিও বাহমনী শাসককে নিয়মিত কর প্রদানে বাধ্য থাকিলেন। পরবর্তিকালে তৃতীয় মহম্মদ শাহর মন্ত্রী মামুদ গাওয়ান বিজয়নগর রাজ্য আক্রমণ করিয়া বিখ্যাত কাঞ্চী নগরীটি লুণ্ঠন করেন। মামুদ গাওয়ানের হত্যার সঙ্গে সঙ্গে বাহমনী রাজ্যের পতন শুরু হইয়া যায়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্যের মধ্যে নূতন করিয়া আর সংঘর্ষ ঘটে নাই।

(ঘ) বিজয়নগর সাম্রাজ্য

মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে শেষের দিকে দক্ষিণভারতে এক বিশাল হিন্দু সাম্রাজ্য গড়িয়া ওঠে। ইতিহাসে ইহাই বিজয়নগর সাম্রাজ্য নামে পরিচিত। এই রাজ্যের উদ্ভব সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু জানা যায় না। কিংবদন্তী আছে, সঙ্গম নামে এক ব্যক্তির পঞ্চপুত্র তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণতীরে বিজয় নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই পাঁচ ভ্রাতার মধ্যে হরিহর ও বুক্কের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্ভবতঃ, ইঁহারা ছিলেন বরঙ্গলের কাকতীয় রাজবংশের কর্মচারী। কিংবদন্তীতে আরও বলা হইয়াছে, হরিহর ও বুক্ক মহাপণ্ডিত মাধব বিদ্যারত্ন এবং তাঁহার ভ্রাতা বেদের বিখ্যাত ভাষ্যকার ধর্মগুরু সায়নাচার্যের নিকট হইতে রাজ্যস্থাপনের অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন।

বিজয়নগর রাজ্যের উত্থান

বিজয়নগর রাজ্যের উত্থান ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মধ্যযুগের মুসলিম আধিপত্যের পরিমণ্ডলের মধ্যে বিজয়নগর রাজ্যের অবস্থিতি দক্ষিণ ভারতে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার প্রাচীরস্বরূপ ছিল। দ্বিতীয়তঃ, বিজয়নগরের শাসকগণের আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় দক্ষিণ ভারতে শিল্পকলার ব্যাপক বিকাশ ঘটিয়াছিল। দক্ষিণ

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

ভারতে বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারের ব্যাপারেও বিজয়নগর রাজগণ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিজয়নগর সাম্রাজ্যে পর পর চারিটি রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন। এইগুলি হইতেছে যথাক্রমে সঙ্গম বংশ, সালুভ বংশ,তুলুভবংশ এবং আরবিড়ু বংশ।

● **সঙ্গম বংশ ঃ** হরিহর ও বুক্ক প্রবর্তিত রাজবংশ সঙ্গম বংশ নামে পরিচিত। ইঁহারা দুইজনই কিন্তু কখনও নিজেদের রাজা বলিয়া পরিচয় দেন নাই। কিন্তু রাজত্বসূচক উপাধি গ্রহণ না করিলেও বুক্ক শক্তিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তিনি চীনদেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলেই মাদুরা বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বাহমনী-বিজয়নগর সংঘর্ষের সূচনা ঘটে। ১৩৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বুক্কের

দ্বিতীয় হরিহর

মৃত্যুর পর রাজপদ লাভ করেন তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় হরহর। ইনি 'মহারাজাধিরাজ', 'রাজপরমেশ্বর' ইত্যাদি সম্রাটসুলভ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় হরিহর বিজয়নগর রাজ্যকে প্রসারিত করিয়াছিলেন। মহীশূর, কানড়া, কাঞ্চী, ত্রিচিনাপল্লী প্রভৃতি এই সময় বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু বাহমনী রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে ফিরোজ শাহর হস্তে তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন। তিনি শিবের উপাসক হইলেও অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে উদার মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় হরিহরের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন প্রথম দেবরায়। তিনি বাহমনী-সুলতান ফিরোজ শাহর নিকট প্রথমবারের যুদ্ধে পরাজিত হইলেও, পরবর্তিকালে তাঁহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হন। অতঃপর সিংহাসন লাভ করেন প্রথম দেবরায়ের পৌত্র দ্বিতীয় দেবরায় (১৪২২-৪৬ খ্রীঃ)। দ্বিতীয় দেবরায় ছিলেন সঙ্গমবংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। পূর্বসূরীদের ন্যায় তিনিও বাহমনী রাজের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাহমনীর তৎকালীন সুলতান আহম্মদ শাহ ভ্রাতা ফিরোজ শাহর পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিজয়নগর রাজ্য আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় দেবরায় পরাস্ত হইলেন। প্রতিকূল শর্তে সন্ধি করিতেও তিনি বাধ্য

দ্বিতীয় দেবরায়

হইয়াছিলেন। কিন্তু বাহমনী রাজ্যের সঙ্গে সংঘর্ষে ব্যর্থ হইলেও দ্বিতীয় দেবরায় দক্ষিণে সিংহলের উপকূল পর্যন্ত বিজয়নগর রাজ্য সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন। বাহমনীর সহিত যুদ্ধে সাফল্য অর্জনের অভিপ্রায়ে তিনি সেনাবাহিনীতে মুসলিম সৈনিক নিয়োগ করিয়া উহা পুনর্গঠিত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত, নানারকম উন্নয়নমূলক কর্মসূচী প্রবর্তন করিয়া তিনি অভ্যন্তরীণ সংস্কারকার্য সমাধা করেন। সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের প্রতিও তাঁহার তীক্ষ্ণ নজর ছিল। এই বিভাগ পরিচালনা করিবার জন্য তিনি এক বিশিষ্ট কর্মচারী

সঙ্গম বংশের অবসান

নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইতালীয় পর্যটক নিকোলো কোন্তি এবং আরবের আবদুর রজ্জাক তাঁহাকে দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজা হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় দেবরায়ের পর তাঁহার পুত্র মল্লিকার্জুন বিজয়নগরের সিংহাসনে উপবেশন করেন। তিনি বাহমনী এবং উড়িষ্যার হিন্দু রাজ্যের সমবেত আক্রমণ হইতে বিজয়নগর রাজ্যের অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার পরই সঙ্গম বংশের শাসনের অবসান ঘটে (১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ)।

● **সালুভ বংশ ঃ** মল্লিকার্জুনের উত্তরাধিকারী বিরূপাক্ষের অকর্মণ্যতার ফলে বিজয়নগর রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া পড়ে। বাহমনী সুলতানের পক্ষে মামুদ গাওয়ান গোয়া ও পাণ্ডরাজা কাঞ্চী দখল করিয়া লইলেন। একই সময়ে উড়িষ্যার অধিপতি বিজয়নগর রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলি আক্রমণ করিলেন। সাম্রাজ্যের এই দুর্যোগময় মুহূর্তে বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত চন্দ্রগিরির শাসক নরসিংহ সালুভ বিরূপাক্ষকে অপসারণ করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। এইভাবে সালুভ বংশের

নরসিংহ সালুভ

প্রতিষ্ঠা ঘটে। নূতন রাজবংশ সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। নরসিংহ সালুভ ছিলেন একজন দক্ষ ও জনপ্রিয় রাজা। একদিকে তিনি অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করিয়া রাজ্যের বিশৃঙ্খল অবস্থার অবসান ঘটান, অন্যদিকে সুদূর দক্ষিণে রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত করেন। বাহমনী সুলতান এবং উড়িষ্যার রাজা বিজয়নগর রাজ্যের যে সমস্ত অঞ্চল অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন তাহার অধিকাংশ তিনি পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অবশ্য রায়চুর দোয়াব ও উদয়গিরি পুনর্দখল করিতে তিনি ব্যর্থ হন। তাঁহার মৃত্যুর পর পুত্র ইম্মদী নরসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাষ্ট্রশাসনের কোন যোগ্যতা তাঁহার ছিল না। ফলে, শক্তিশালী সেনাপতি নরসনায়ক রাজ্যের প্রকৃত শাসনকর্তা হইয়া দাঁড়াইলেন। নরসনায়কের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বীর নরসিংহ অপদার্থ শাসক ইম্মদী নরসিংহকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। এইভাবে সালুভ বংশের অবসানে নূতন শাসক শক্তি তুলুভ বংশের প্রতিষ্ঠা হয় (১৫০৫ খ্রীঃ)।

নরসনায়ক

● **তুলুভ বংশ ঃ** বীর নরসিংহ প্রতিষ্ঠিত তুলুভ রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন কৃষ্ণদেব রায়। কৃষ্ণদেব রায় শুধু তুলুভ বংশ বা বিজয়নগর রাজ্যেরই শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন না, বস্তুতঃ আকবরের পূর্বে ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় ইতিহাসে তাঁহার ন্যায় বহুগুণান্বিত নরপতি খুবই বিরল। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং বৈদেশিক আক্রমণজনিত এক সংকটময় সময়ে তিনি সিংহাসনে আসীন হইয়াছিলেন। সামরিক শক্তি ও দক্ষতার সাহায্যে তিনি প্রতিকূল পরিস্থিতি পরিবর্তন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে বিজয়নগর শক্তি ও সমৃদ্ধির শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। রাজত্বের সূচনায় তিনি মহীশূরের বিদ্রোহ দমন করেন। অতঃপর উড়িষ্যার বিরুদ্ধে সার্থক অভিযান করিয়া উদয়গিরি পুনরুদ্ধার করেন। তাঁহার শাসনকালেও বাহমনী-বিজয়নগরের চিরাচরিত সংঘর্ষ অব্যাহত ছিল। কিন্তু বাহমনী রাজ্য ইতিমধ্যে পাঁচ ভাগে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় কৃষ্ণদেব রায়ের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুরের সুলতানের নিকট হইতে রায়চুর দোয়াব পুনরুদ্ধার করেন। ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুরের সুলতান স্থানটি পুনরধিকারের চেষ্টা করিয়া বিফল হন। অন্যদিকে, কৃষ্ণদেব রায় বিজাপুর আক্রমণ করিয়া গুলবর্গা দুর্গটিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন।


কৃষ্ণদেব রায়

রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের শাসনকালে বিজয়নগর রাজ্যের সর্বাধিক প্রসার ঘটে। তাঁহার সাম্রাজ্য পশ্চিমে কোঙ্কণ, পূর্বে বিশাখাপত্তন এবং দক্ষিণে সমুদ্র উপকূল (কন্যাকুমারিকা) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সম্ভবতঃ ভারত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপেও তিনি কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদেব রায় সুদক্ষ শাসক ছিলেন। পাএস (Paes) নামে এক পর্তুগীজের বিবরণীতে তাঁহার শাসনব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছে। পাএসের মতে, রাজা কৃষ্ণদেব রায় ছিলেন উদারচেতা ও পরধর্মসহিষ্ণু শাসক। তবে তাঁহার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা প্রবল ছিল না। পর্তুগীজদের সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক অভিসন্ধি সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ ছিলেন। সেইজন্য তিনি পর্তুগীজ গভর্নর আলবুকার্ককে তাঁহার রাজ্যের মধ্যে ঘাঁটি ও দুর্গ নির্মাণ করিবার অনুমতি দান করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদেব রায় কেবলমাত্র একজন সার্থক সামরিক নায়ক বা দক্ষ শাসকই ছিলেন না। তিনি ছিলেন একইসঙ্গে একজন বিদ্যানুরাগী পণ্ডিত মানুষ। তিনি বৈষ্ণবধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু অপর ধর্মের প্রতিও সমানভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন তাঁহার ভ্রাতা অচ্যুত রায়। তিনি ছিলেন দুর্বল প্রকৃতির মানুষ। তাঁহার দুর্বলতার ফলে কেন্দ্রীয় শক্তি হ্রাস পাইতে থাকে। পরবর্তী শাসক সদাশিব রায়ও ছিলেন সম্পূর্ণভাবে অযোগ্য ব্যক্তি। তাঁহার আমলে শাসনকর্তৃত্ব মন্ত্রী রাম রায়ের আয়ত্তে চলিয়া আসে। বিজয়নগরের পূর্ব গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় রাম রায় দাক্ষিণাত্যের মুসলিম সুলতানদের অভ্যন্তরীণ বিবাদের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৫৪৩

রামরায়

খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিজাপুরের বিরুদ্ধে আহম্মদ নগর ও গোলকুণ্ডার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিজাপুরের মন্ত্রী আসাদ খানের কূটকৌশলে তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইলে তিনি পরে ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সহিত একত্রিতভাবে আহম্মদনগর আক্রমণ করেন। রাজ্যটি বিধ্বস্ত হইল কিন্তু রাম রায়ের সৈন্যবাহিনীর 'উল্লাস ও ঔদ্ধত্য' তাঁহার পক্ষভুক্ত সুলতানদেরও অপ্রসন্ন করিয়া তুলিল। ফলে, দাক্ষিণাত্যের বেরার ব্যতিরেকে সব কয়টি সুলতানী রাজ্য একযোগে (বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, বিদর ও আহম্মদনগর) ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তালিকোটার রণক্ষেত্রে বিজয়নগরের সৈন্যবাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিল। স্বয়ং রাম রায়, শত্রুহস্তে বন্দী অবস্থায় প্রাণ হারান। বিজয়নগর রাজ্য শত্রুদ্বারা বিধ্বস্ত হইল, পাঁচ মাস ধরিয়া রাজ্যের ঐশ্বর্য লুণ্ঠিত হইল। ঐতিহাসিক সিউয়েলের মতে, "এত আকস্মিকভাবে এত বড় শহরের এমন চরম দুর্গতির দৃষ্টান্ত ইতিহাসে খুব অল্পই পাওয়া যায়।"

তালিকোটার যুদ্ধ

তালিকোটার যুদ্ধে পরাজিত হইবার ফলে বিজয়নগর রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু বিজয়নগরের অস্তিত্ব সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয় নাই। তালিকোটার যুদ্ধকালে গঠিত সুলতানী সংঘ কোন স্থায়ী মৈত্রী বন্ধনে পরিণত হয় নাই। পারস্পরিক স্বার্থসংঘাত মিলনের পথে বাধাস্বরূপ ছিল। আর ইহারই সুযোগে বিজয়নগরের হৃত গৌরব কিঞ্চিৎ পরিমাণ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছিল।

● **আরবিড়ু বংশ ঃ** তালিকোটার যুদ্ধের পর রাম রায়ের ভ্রাতা তিরুমল পেনুগোণ্ডায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ১৫৭০খ্রীষ্টাব্দে সদাশিবকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া তিনি সিংহাসন দখল করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বংশ আরবিড়ু বংশ নামে পরিচিত। তিনি বিজয়নগরের বিনষ্ট গৌরব ও শক্তি কিছু পরিমাণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিরুমলের পর আসেন যথাক্রমে দ্বিতীয় রঙ্গ ও দ্বিতীয় ভেঙ্কট। দ্বিতীয় ভেঙ্কট চন্দ্রগিরিতে রাজধানী স্থাপন করেন। বিজয়নগরের শেষ নরপতি ছিলেন তৃতীয় রঙ্গ। তাঁহার আমলে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী হইয়া কেন্দ্রীয় শাসনকে অগ্রাহ্য করিতে থাকেন। ফলে বিজয়নগরের গৌরব চিরকালের জন্য অস্তমিত হইয়া গেল।

● বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ●

মধ্যযুগের প্রথম পর্বের ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা সুশৃংখল শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল বিজয়নগর সাম্রাজ্যে। সামন্ত সমাজের সহজাত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, বিজয়নগরের রাজারাও ছিলেন স্বৈরাচারী শাসক। রাজক্ষমতা ছিল অখণ্ড ও অবাধ। রাজার ক্ষমতার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকিলেও শাসকগণ ধর্ম ও প্রজাহিতৈষণার আদর্শে রাজকার্য পালন করিতেন। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণদেব রায়ের একটি উক্তি স্মরণীয়—'ধর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করা উচিত।' শাসনকার্য সুপরিচালনার জন্য একটি মন্ত্রিসভা ছিল। মন্ত্রী ব্যতীত, কোষাধ্যক্ষ, বাণিজ্য সচিব, সেনাপতি, পুরোহিত প্রমুখ রাজকর্মচারী লইয়া মন্ত্রি-পরিষদ গঠিত ছিল। রাজসভায় আরও থাকিতেন শিল্পী, সাহিত্যিক, জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ। বিজয়নগর সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে (পর্তুগীজ পায়েজের মতে দুইশতটি) বিভক্ত ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা 'নায়ক' নামে পরিচিত ছিলেন। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ সাধারণতঃ রাজপরিবার বা উচ্চ অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু শক্তিশালী রাজাদের আমলে তাহাদের ক্ষমতা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত। প্রদেশগুলি জেলায় বিভক্ত ছিল। সর্বনিম্ন প্রশাসনিক

প্রজাহিতৈষী স্বৈরতন্ত্র

মন্ত্রী পরিষদ

কেন্দ্র ছিল গ্রাম। গ্রামের শাসনভার অধীনস্থ পঞ্চায়েতের হাতে ন্যস্ত ছিল। গ্রাম শাসন আর কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার ভার ছিল মহানায়কাচার্য নামে রাজকর্মচারিদের উপর। সরকারের আয় প্রধানতঃ আসিত ভূমি রাজস্ব হইতে। নুনিজের মতে, কৃষকদের আয়ের দশভাগের নয়ভাগ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে দিতে হইত। বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চে ছিলেন সম্রাট। অন্যান্য বিচারকগণ শাসক কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। দণ্ডবিধি ছিল কঠোর। বাহমনী রাজ্যের সহিত দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষের জন্য বিজয়নগরের শাসকগণকে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী পোষণ করিতে হইত। এই বিরাট সেনাবাহিনীর জন্য বিপুল অর্থব্যয় হইত। যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিলেও বিজয়নগরের রাজারা শাসনকার্যে উদাসীন থাকিতেন না।

কর ও বিচার ব্যবস্থা

● বিজয়নগর রাজ্যের সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি ●

● **সামাজিক জীবন ঃ** ইতালীয় পর্যটক নিকোলো কোন্তি এবং ইরানী রাজদূত আবদুর রজ্জাকের বিবরণীতে বিজয়নগর রাজ্যের সমাজ জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই রাজ্যে নারী বিশেষ মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন। শিক্ষা-শিল্প-সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে অসিচালনা, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও বিজয়নগরের মেয়েরা দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জন করিয়াছিল। সরকারী হিসাব রক্ষা এবং বিচারের কাজেও তাহাদের নিয়োগ করা হইত। তথাপি বিজয়নগর রাজ্যের সমাজকে আদর্শ বলিয়া গণ্য করা যায় না কারণ বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ সতীদাহ প্রথা, পণপ্রথা প্রভৃতি স্ত্রী-স্বার্থ বিরোধী সমস্ত প্রকার ব্যবস্থাই সেখানে প্রচলিত ছিল। বিজয়নগরের রাজারা অধিকাংশই ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। কিন্তু শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁহারা ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, ইহুদি, খ্রীষ্টান ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ নির্বিরোধ ভাবে সেখানে বসবাস করিতেন। শাসন ব্যাপারে ব্রাহ্মণগণ সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। ইঁহারা নিরামিষাশী হইলেও অপর সকলেই মৎস্য-মাংস প্রভৃতি আমিষ আহার গ্রহণ করিতেন।

নারীর স্থান

ধর্মনিরপেক্ষ নীতি

● **সাংস্কৃতিক জীবন ঃ** বিজয়নগরের শাসকগণ দক্ষিণ ভারতের হিন্দু সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেবভাষা হিসাবে সংস্কৃত রাজাদের সশ্রদ্ধ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিল। বেদের বিখ্যাত টীকাকার সায়নাচার্য এবং তাঁহার ভ্রাতা মাধবাচার্য ছিলেন মধ্যযুগের বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। তেলেগু, তামিল, কানাড়া প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষার উন্নতিসাধনেও বিজয়নগর রাজ্যের শাসকদের প্রচুর অবদান আছে। রাজা কৃষ্ণদেব রায় স্বয়ং তেলেগু ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজসভায় আটজন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক উপস্থিত থাকিতেন। ইঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন তেলেগু ভাষার অন্যতম কবি পেদন। আরবিডু রাজগণও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। বিজয়নগর রাজ্যে সঙ্গীত ও স্থাপত্য শিল্পেরও বিকাশ ঘটিয়াছিল। রাজা কৃষ্ণদেব রায় নির্মিত 'হাজার মন্দির' এবং 'বিঠলস্বামী মন্দির' স্থাপত্য শিল্পের নিখুঁত নিদর্শন হিসাবে শিল্প রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আধুনিক ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার অবশ্য মনে করেন, 'সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বিজয়নগর দক্ষিণ-ভারতে জড়ত্বের যুগ।'

সংস্কৃত চর্চা

দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ

স্থাপত্য শিল্প

● **অর্থনৈতিক জীবন ঃ** বিজয়নগর সাম্রাজ্যের আর্থিক সমৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করিয়া বিদেশী পর্যটকগণ

অভিভূত হইয়া গিয়াছিলেন। আবদুর রজ্জাক বলিয়াছেন, 'বিজয়নগরের মতো সমৃদ্ধ শহর দুনিয়ার মানুষ কখনও শোনে নি, ভবিষ্যতেও শুনবে না'। আর একজন পর্যটক খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্যে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। চাউল, গম, ভুট্টা, যব, ডাল প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনে বিজয়নগর ছিল একটি অগ্রণী রাজ্য। সেচ কার্যে সুবন্দোবস্তের ফলেই কৃষির প্রাচুর্য দেখা দিয়াছিল। কৃষির সঙ্গে শিল্পের বিকাশ ঘটিয়াছিল। বয়ন শিল্প ছিল সবচেয়ে উন্নত। বিজয়নগর সাম্রাজ্যে প্রায় তিনশত বন্দর ছিল। এই সব বন্দর হইতে ইউরোপ ও দূর প্রাচ্যের সহিত বাণিজ্যের মারফৎ ঐশ্বর্য সৃষ্টি হইলেও আর্থিক সমৃদ্ধির কোন চিহ্ন সাধারণ মানুষের জীবনে পরিলক্ষিত হয় নাই।

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য

দশ □ ভারতীয় সভ্যতায় ইসলামের প্রভাব

● **প্রারম্ভিক মুসলিম সংকীর্ণতা ও হিন্দু প্রতিক্রিয়া ঃ** প্রাচীনকাল হইতে বহু বিদেশী জাতি গ্রীক-শক-হূণ কুষাণ প্রভৃতি ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ করিয়াছিলেন। ভারতে তাঁহারা রাজনৈতিক আধিপত্যও কায়েম করিয়াছিলেন। কিন্তু কালক্রমে তাঁহারা বিদেশী চরিত্র হারাইয়া ফেলিয়া বৃহত্তর ভারতীয় জনসমষ্টির সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গিয়াছিলেন। বস্তুতপক্ষে অপরকে আপন সমাজভুক্ত করিয়া লইবার ঔদার্য ভারতীয় সভ্যতার মহান ঐতিহ্য। ভারত-ইতিহাসের মূলগত সত্য হইল এক গভীর সহজাত ঐক্যবোধ। এইভাবেই ভারতে সমন্বয়বাদী সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পূর্বতন শক-কুষাণদের ন্যায় মধ্যযুগের তুর্কী-আফগান ইসলাম ধর্মাবলম্বী জাতিগুলি আপন স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া হিন্দু সমাজে বিলীন হইয়া যায় নাই। ইহার কারণ, ভারতবর্ষে আসিবার সময় তাঁহারা তাঁহাদের নিজস্ব ধর্ম, কর্ম, আচার-ব্যবহার অর্থাৎ এক কথায়, এক সুনির্দিষ্ট সংস্কৃতি লইয়া আসিয়াছিলেন। এই বহিরাগত সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় সংস্কৃতির মূলগত পার্থক্য ছিল। হিন্দুরা বহু ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। কিন্তু অপৌত্তলিক ইসলাম ধর্ম কঠোর একেশ্বরবাদের ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছিল। স্বাভাবিকভাবেই তাই হিন্দুধর্মের প্রতি ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের আকর্ষণ অপেক্ষা বিতৃষ্ণার ভাবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। উপরন্তু বিজেতা হিসাবে মুসলমানগণ আপনাদের জাতিগতভাবে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। অপরদিকে, নানাবিধ ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক কারণে মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনার আতিশয্য প্রকট হইয়া দেখা দিয়াছিল। ফলে ভারতে, মুসলিম শাসনের প্রারম্ভিক পর্বে সুলতানগণ সংকীর্ণ ধর্মকেন্দ্রিক শাসননীতি অনুসরণ করিতে থাকেন। রাজনৈতিক ও ধর্মগত দিক হইতে হিন্দুদের অধীনস্থ করিয়া রাখিতে তাঁহারা বিশেষ তৎপর হন। এই কাজে তাঁহাদের সাহায্য করেন ধর্ম ব্যাখ্যাতা উলেমাগণ। বস্তুতঃ মধ্যযুগের সামন্তবাদী পরিমণ্ডলে রাষ্ট্রশক্তি ও ধর্ম পরিপূরক হিসাবেই কাজ করে। ধর্মনেতাদের নির্দেশে তাই সুলতানগণ ভারতে তাঁহাদের অ-মুসলমান প্রজাবর্গের উপর জিজিয়া কর সমেত বহু অপমানজনক বিধি-ব্যবস্থা চাপাইয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, বিধবা ও নাবালকদের এই কর দিতে হইত না, যদিও ফিরোজশাহ তুঘলক ব্রাহ্মণদেরও কর প্রদানের আওতায় লইয়া আসেন। বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণও চলিয়াছিল। বিজয়গর্বে উল্লসিত শাসকগণ কিন্তু একই সঙ্গে রাজ ও ধর্মীয় কর্তব্য পালন করিতেছেন ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন।

জাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা

বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ

মুসলিম অভিযানকারীদের নৃশংস হত্যালীলা, বিগ্রহাদি সহ দেবালয়গুলির লুণ্ঠন ও ধ্বংস সাধন, অনুদার শাসকদের বিজয় অহংকার, উলেমাদের উৎকট ধর্মোন্মাদনা ইত্যাদি কারণে হিন্দু জনমানসেও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। রাষ্ট্র ক্ষমতা হারানোর বেদনা এবং ধর্মের অবমাননা তাঁহাদের মনে মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে আক্রোশ ও আতংকের মনোভাব গড়িয়া তুলিল। এই বিক্ষোভ ও বিরূপতা মাঝে মাঝেই বিদ্রোহের আকারে আত্মপ্রকাশ করিত। নির্মম অত্যাচারের মাধ্যমে সেই বিদ্রোহ দমন করা

হইত। এইভাবে শাসক ও শাসিতের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রবল হইয়া উঠিতে থাকিল।

● **সমন্বয়ী সংস্কৃতির বিকাশ ঃ** হিন্দু-মুসলমানদের এই মনান্তর বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। দীর্ঘকাল একত্র বসবাসের ফলে এবং বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে দুই সম্প্রদায়ই ক্রমশঃ নিকটতর হইয়া পড়েন এবং উভয় সমাজ সংস্কৃতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। মুসলিম সুলতানগণ উপলব্ধি করেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের প্রতি দীর্ঘকালীন বৈরিতা সাম্রাজ্যস্বার্থের অনুকূল হইবে না। অন্যদিকে হিন্দুরাও বুঝিতে পারেন, শাসকশক্তির সহিত বিচ্ছিন্ন থাকিলে অস্তিত্ব বিপন্ন হইতে পারে। সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাব-বিনিময় ও বৈষয়িক সংযোগ ঘটে এবং পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করিতে থাকে। শিল্পে-কারুকর্মে, সঙ্গীতে-চিত্রাঙ্কনে, পোশাক-পরিচ্ছদে, আদব-কায়দায়, আচার-ব্যবহারে খেলাধূলায়-খানাপিনায় সর্বত্রই এই সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। কালক্রমে ভারতবর্ষে একটি বিশিষ্ট হিন্দুস্থানী ধারা গড়িয়া উঠে যাহাকে বলা যায় সাম্প্রদায়িক সমঝোতার যুক্তির(logical) রূপ। প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক মার্শাল মন্তব্য করিয়াছেন, 'দুইটি একান্তভাবে পৃথক অথচ বিপুল ও সুগঠিত সভ্যতার এইরূপ সংমিশ্রণের উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে কদাচিৎ দেখা গিয়াছে।'

হিন্দুস্থানী ধারা

ইসলাম ধর্মের মধ্যকার ভ্রাতৃভাব এবং মুসলিম সমাজের গণতান্ত্রিক রীতিনীতির আকর্ষণে ভারতবাসীর এক বিরাট অংশ ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের অনুদারতায় বিরক্ত হইয়া তাঁহারা ধর্মান্তরিত হইয়াছিলেন। অন্যদিকে স্বয়ং সুলতানদের মধ্যে কেহ কেহ এবং অভিজাত আমীর ওমরাহদের কয়েকজন হিন্দু রমণী বিবাহ করিয়াছিলেন। ধর্মান্তরিত হিন্দুগণ কিন্তু রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্বতন জীবনযাত্রার কোন পরিবর্তন ঘটান নাই। ফলে হিন্দুদের বহু আচার-অনুষ্ঠান মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইসলাম ধর্ম জাতিভেদ স্বীকার করিত না। কিন্তু কালক্রমে ভারতের মুসলিম সমাজে, বিশেষ করিয়া বিবাহাদি ব্যাপারে হিন্দুদের অনুরূপ সামাজিক ভেদ প্রথা চালু হইয়াছিল। আবার, মুসলমান রমণীদের মধ্যে যে পর্দা প্রথা প্রচলিত ছিল তাহা সম্ভ্রান্ত হিন্দু নারীদের মধ্যে প্রবর্তিত হইয়াছিল। অন্যদিকে, ভারতীয় সভ্যতার ইতিবৃত্ত জানিবার জন্য মুসলিম পণ্ডিতরা যেমন সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিতে শুরু করিয়াছিলেন, তেমনি হিন্দু অভিজাতগণ রাজানুগ্রহ লাভ করিবার জন্য আরবী ও ফারসী শিখিতে আরম্ভ করেন। শাসকদের আদব-কায়দাও অনুসৃত হইতে থাকিল। চোপা-চাপকান হিন্দুদের মধ্যে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

সামাজিক সমন্বয়

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু শাসকবর্গের ক্ষমতা বিনষ্ট করিয়া দিলেও, প্রারম্ভিক সংকীর্ণতার অবসানে মুসলিম শাসকগণ প্রশাসনিক ব্যাপারে হিন্দুদের সাহায্য গ্রহণ করিতে থাকেন। নিম্নস্তরের রাজকার্যে অবশ্য প্রথম হইতেই হিন্দুকর্মচারীদের রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কালক্রমে হিন্দুরা উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হইতে থাকেন। প্রাদেশিক সুলতানদের মধ্যে এই ব্যাপারে বিশেষ অগ্রণী ছিলেন বাংলার হুসেন শাহ ও নসরৎ শাহ এবং কাশ্মীরের জয়নাল আবেদিন।

শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে সমন্বয়

হুসেন শাহ ও তাঁহার পুত্র নসরৎ শাহ হিন্দু-মুসলমানকে সমদৃষ্টিতে দেখিতেন। হুসেন শাহর মন্ত্রীদের মধ্যে ছিলেন পুরন্দর খান, রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী প্রমুখ গুণীজন। হুসেন শাহের আমলে বাংলাদেশে বৈষ্ণব-ধর্মের প্লাবন ঘটে। সুলতান স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেবের গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি ও তাঁহার পুত্র নসরৎ শাহর আনুকূল্যে শ্রীমদ্‌ভাগবত ও মহাভারত বাংলায় অনূদিত হয়। হুসেন শাহী রাজবংশ বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সৌভ্রাতৃত্বের উজ্জ্বল

নসরৎ শাহ

দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিল । মধ্যযুগের অপর একজন উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ শাসক হইলেন কাশ্মীরের 'ঋষিকল্প' সুলতান জয়নাল আবেদিন। হিন্দুদের উপর হইতে তিনি ঘৃণ্য জিজিয়া কর তুলিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারত ও রাজতরঙ্গিণী ফারসী ভাষায় অনুবাদ করা হয়, বহু ফারসী গ্রন্থেরও হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের সুলতানগণের অধীনেও হিন্দু কর্মচারী উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিজাপুর রাজ্যের হিসাব রক্ষণ দেশীয় ভাষা মারাঠীতে রাখিবার ব্যবস্থা হয়। বিজাপুরের সুলতান ইব্রাহিম আদিল শাহর ধর্মনিরপেক্ষ শাসন নীতিতে প্রীত হইয়া হিন্দুগণ তাঁহাকে 'জগৎগুরু' আখ্যা দিয়াছিল। অন্যদিকে, বিজয়নগরের হিন্দু রাজা দ্বিতীয় দেবরায় তাঁহার সেনাবাহিনীতে মুসলিম সৈনিক নিয়োগ করিয়াছিলেন। বিজাপুরের সেনাপতি আসাদ খান বিজয়নগর রাজ্যের মহানবমী উৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এইভাবে শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সহযোগিতার সূত্রপাত হইয়াছিল।

জগদগুরু আখ্যা প্রদান

মুসলিম শাসন শুরু হইলে বহু মুসলমান মনীষী ও পণ্ডিত ভারতে আসিতে শুরু করেন। তাঁহারা ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা, ভেষজ ও উদ্ভিদবিদ্যার সহিত পরিচিত হইবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়া সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিতে থাকেন। অন্যদিকে হিন্দু পণ্ডিতগণও ইসলামীয় জ্যোতিষশাস্ত্র ও চিকিৎসাবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং আরবী ও ফারসী ভাষা শিখিতে শুরু করেন। বিদ্বজ্জনের ভাবের আদানপ্রদান সাংস্কৃতিক যোগসূত্র রচনা করিয়াছিল।

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও উভয় সংস্কৃতির মধ্যে আদানপ্রদান চলিয়াছিল। সুলতানী আমলে সাহিত্য ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব কবি আমীর খসরু। তিনি ফার্সী ভাষায় সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রচনায় ফার্সীর মধ্যে বহু হিন্দী শব্দেরও ব্যবহার করা হইয়াছিল। তাঁহার কাব্যের ভাবভঙ্গীও ভারতীয় চরিত্রের ছিল। আমীর খসরুর প্রত্যক্ষ যত্নে হিন্দী ও ফার্সী ভাষার সংমিশ্রণে উর্দু ভাষার জন্ম হয়। বহু হিন্দুগ্রন্থকারও ফার্সী ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যেমন মুসলমান কবিরাও হিন্দীতে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। হিন্দু জীবনকাহিনী লইয়াও মুসলিম লেখকগণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। যেমন মহম্মদ জায়েসী রচিত 'পদ্মাবৎ' কাব্য।

সুলতানী আমলে একদিকে যেমন ধর্মীয় সংঘাত চলিয়াছিল অন্যদিকে তেমনি পারস্পরিক প্রভাবে একটি সমন্বয় দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রথম দিকের ধর্মাবেগ স্তিমিত হইয়া গেলে, উদারপন্থী মুসলিম মনীষিগণ (আলবেরুণী অবশ্য পূর্ব হইতেই) হিন্দু ধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতার মর্মকথা জানিবার জন্য উৎসাহী হন। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ও দর্শন অধ্যয়ন করিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারেন উপনিষদের এক 'ব্রহ্মের' সাধনার সহিত ইসলামের একেশ্বরবাদের গভীর সাদৃশ্য রহিয়াছে। 'হিন্দু-মুসলমান ধর্মচিন্তায় এই আত্মীয়-সম্পর্ক উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের পথকে সুগম করিতে সহায় হইয়াছিল।'

মুসলিম পীর ও হিন্দু সন্ন্যাসীর প্রতি হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক শ্রদ্ধা প্রীতি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মগত সৌহার্দ্যবোধের সৃষ্টি করিয়াছিল। হুসেন শাহর আমলে বাংলাদেশে সত্যপীরের কল্পনা এই সম্প্রীতির মহত্তম প্রকাশ। শুধু বাংলায় নয়, অন্যত্রও অনুরূপ মনোভাবের প্রকাশ দেখা গিয়াছিল। এমন কি ক্রমে হিন্দু বিদ্বেষী বলিয়া পরিচিত সুলতান আলাউদ্দিন খলজী এবং ফিরোজশাহ তুঘলকও ধর্মীয় সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া যথাক্রমে জৈন সন্ন্যাসী আচার্য মহাসেন এবং হিন্দু কবি রত্নশেখরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সত্যপীর কল্পনা

● মধ্যযুগের ধর্মসংস্কার আন্দোলন ঃ ভক্তিবাদ ●

সুলতানী আমলে ইসলাম ধর্মের সহিত সংঘাতে ও সংস্পর্শে হিন্দুধর্মে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম হইয়াছিল। একদিকে, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সামাজিক অনুশাসন প্রথা ও আচারসমূহকে কঠোর ও

অবশ্য পালনীয় করা হইল এবং ইহারই ফলস্বরূপ রক্ষণশীল মনোভাব আরও দৃঢ় হইল। অন্যদিকে, ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদ ও সামাজিক সাম্যের প্রভাবে এক উদারনৈতিক ধর্মীয় আন্দোলনের উদ্ভব হইল, যাহা 'ভক্তিবাদ' নামে পরিচিত। ভক্তিবাদের মূলনীতি ছিল—ঈশ্বর এক ও অভিন্ন এবং অন্তরের পবিত্রতা ও প্রেমের মাধ্যমে ঈশ্বরের করুণা লাভ করা যায়। শ্রেণী বা জাতিভেদের স্থান ইহাতে ছিল না। ধর্মনির্বিশেষে সকলেই ভগবৎ-সান্নিধ্যে পৌঁছাইতে পারে—এই বিশ্বাসও প্রচারিত হইয়াছিল। "পৌত্তলিকতা ও বহু দেবদেবীর উপাসনা যে মূলতঃ অযৌক্তিক, তাই হল এ কথার তাৎপর্য, কিন্তু ইসলামের মতো তাঁরা পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান প্রয়োজন মনে করেন নি।" ভক্তিবাদ আন্দোলন দক্ষিণ ভারতে উৎপত্তি লাভ করিয়া ক্রমে উত্তর ভারতে প্রসারিত হয়। ইসলাম ধর্মেও এই সময় এক উদারনৈতিক আন্দোলনে—সুফীবাদের জন্ম হইয়াছিল। সুফী সন্তদের মতবাদের সহিত ভক্তি আন্দোলনের ধর্মাচার্যদের বাণীর প্রগাঢ় সাদৃশ্য ছিল। এইভাবে ধর্মক্ষেত্রে এক সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি হইল। ভক্তিবাদের প্রচারকদের মধ্যে রামানন্দ, বল্লভাচার্য, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্যদেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভক্তিবাদ আন্দোলনের প্রসার

● **রামানন্দ ঃ** বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক রামানুজের শিষ্য রামানন্দ এলাহাবাদের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রচারকেন্দ্র ছিল বারাণসী, সুতরাং রামানন্দ ছিলেন দাক্ষিণাত্য ও উত্তরাপথের মধ্যে ভক্তি আন্দোলনের সেতুস্বরূপ। তিনি রামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন এবং সহজ সরল হিন্দী ভাষায় তাঁহার আদর্শ প্রচার করেন। যাগ-যজ্ঞ, আচার অনুষ্ঠানের কোন গোঁড়ামি তিনি সমর্থন করিতেন না। হিন্দু মুসলমান উচ্চ নীচ নির্বিশেষে তিনি সকলকেই ভগবৎপ্রেমের সামিল করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে একজন ছিলেন স্ত্রীলোক ; ইহা ব্যতীত, নাপিত ও মুচি সম্প্রদায়ভুক্ত এবং একজন মুসলিম জোলাও ইহাদের মধ্যে ছিলেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে কবীর ছিলেন প্রধান।

● **বল্লভাচার্য ঃ** ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এক তেলেগু পরিবারে তাঁহার জন্ম। তিনি কৃষ্ণের উপাসক ছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলীন করিয়া দিতে পারিলেই মুক্তি পাওয়া যায়—ইহাই ছিল তাঁহার প্রচারিত নীতির মূলকথা।

● **কবীর ঃ** রামানন্দের প্রধান শিষ্য ছিলেন কবীর। শোনা যায়, তিনি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও মুসলিম তাঁতীর (জোলার) ঘরে মানুষ হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনকাল সম্বন্ধেও মতদ্বৈধতা আছে। সম্ভবতঃ তিনি চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগ হইতে পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। রামানন্দের আদর্শ ও নীতি এবং সুফী ধর্মমতের প্রভাবে তাঁহার মানসিকতার বিকাশ ঘটিয়াছিল। ফলে, হিন্দু বা মুসলমান কোন সম্প্রদায়ের ধর্মসম্বন্ধে তাঁহার আস্থা ছিল না। মূর্তিপূজা, তীর্থযাত্রা ইত্যাদির পরিবর্তে মানব প্রেম এবং ঈশ্বর ভক্তির উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। মধ্যযুগের ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা উদারপন্থী সংস্কারক। তিনিই সর্বপ্রথম জ্ঞাতসারে ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্যসাধনে ব্রতী হন। তিনি বলিতেন, রাম ও আল্লাহ এক এবং অভিন্ন। উভয় ধর্মের মূলগত বাণী আশ্রয় করিয়া তাঁহার ধর্মমত গড়িয়া উঠিয়াছিল। ধর্মভেদে মানুষকে পৃথক করা যায় না ইহাই ছিল তাঁহার শিক্ষা। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান



কবীর

উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন। তাঁহার শিষ্যরা কবীর পন্থী নামে পরিচিত ছিলেন। সরল হিন্দীতে দোঁহার আকারে তিনি তাঁহার ধর্ম ও দর্শন চিন্তা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। দুই পংক্তির এই কবিতাগুচ্ছ সাহিত্যের সম্পদ, ভাবের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ।

● **নানক** ঃ শিখধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের লোহার জেলার তালবন্দী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন একজন সামান্য কেরানী। কিন্তু গভীর ধর্মপ্রবণ নানক অধ্যাত্ম-সাধনার আকর্ষণে কর্ম ও গৃহত্যাগ করেন। উপনিষদের একেশ্বরবাদী দর্শনের মধ্যে তিনি হিন্দু ধর্মের মূল সত্য খুঁজিয়া পাইলেন। অতঃপর ইসলাম ধর্মের স্বরূপ জানিবার জন্য তিনি বাগদাদ, এমন কি মক্কা পরিভ্রমণ করিয়া আসিলেন। বিভিন্ন ধর্মের সহিত পরিচিতি লাভ করিয়া তিনি উপলব্ধি করিলেন, 'হিন্দু বলিয়াও কেহ নাই, মুসলমান বলিয়াও কেহ নাই। অতঃপর তিনি তাঁহার জ্ঞানলব্ধ সত্য সহজ ভাবে ও ভাষায় জনসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিবার উদ্দেশ্যে ধর্ম প্রচার শুরু করেন। তাঁহার ধর্মের মূলকথা ছিল, হিন্দু ও মুসলমানের ঈশ্বর এক ও অভিন্ন। ঈশ্বরের প্রতি প্রেমই মুক্তি লাভের একমাত্র পথ বলিয়া তিনি মনে করিতেন। কবীরের মত তিনিও অর্থহীন অনুষ্ঠান ও কুসংস্কারের বিরোধী ছিলেন। জাতিভেদ প্রথাও তিনি মানিতেন না। সাবা জীবন ধরিয়া তিনি সমন্বয়ের আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার বাণী সংকলিত হইয়া 'গ্রন্থসাহেব' নামে অভিহিত হইয়াছে। তাঁহার শিষ্যগণ 'শিখ' নামে পরিচিত এবং ইহাদের মধ্যে অনেক মুসলমানও ছিলেন।



নানক

● **নামদেব** ঃ মহারাষ্ট্র অঞ্চলের ভক্তি আন্দোলনের নেতা ছিলেন নামদেব (চতুর্দশ শতক) ও তুকারাম (পঞ্চদশ শতক)। ইহারাও মূর্তিপূজা এবং ধর্মের বাহ্যিক আচার অনুশাসনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। মানবপ্রেম ও ভগবদ্বিশ্বাসই মুক্তিলাভের উপায় বলিয়া তাঁহারা প্রচার করিয়াছেন। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতেও তাঁহারা আন্তরিক আগ্রহী ছিলেন।

● **শ্রীচৈতন্যদেব** ঃ শ্রীচৈতন্য ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক। তিনি ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈতৃক নিবাস ছিল শ্রীহট্ট জেলায়। শৈশব হইতেই তিনি ধর্মভাবাপন্ন ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিয়া সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়া জীবনের শেষ কয়েক বছর পুরীতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্মের মূল কথা ছিল শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ ভগবানের প্রতি গভীর প্রেম। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও অন্তরের পবিত্রতার উপর তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য জাতিভেদ মানিতেন না। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই তিনি প্রেমের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। যবন হরিদাস তাঁহার শিষ্য ছিলেন। বাংলার ধর্ম ও সমাজ জীবনের উপর তাঁহার বাণী গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।



চৈতন্যদেব

● **মীরাবাঈ** ঃ ষোড়শ শতাব্দীতে ভক্তিবাদের অন্যতম প্রচারিকা ছিলেন রাজপুত রাজমহিষী মীরাবাঈ।

মীরাবাঈ মেবারের রাণা সঙ্গের সহধর্মিণী এবং কৃষ্ণভক্তিপরায়ণা ছিলেন। ব্রজ ভাষায় তিনি বিভিন্ন দোঁহা রচনা করিয়াছিলেন। তিনি এই সময় দোঁহা রচনার মাধ্যমে ভক্তিবাদের প্রচার করিয়াছিলেন। একমাত্র ভালবাসার মাধ্যমেই যে ঈশ্বরপ্রাপ্তি সম্ভব তা কৃষ্ণ উপাসিকা মীরাবাঈ প্রমাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ভজনগুলি সহজেই ভক্তজনের মন হরণ করিয়া থাকে।

● সুফী মতবাদ ●

ভক্তিবাদ ও মানুষে মানুষে সমতার আদর্শ ইসলাম ধর্মকেও প্রভাবিত করিয়াছিল। ইহারই ফলে জন্ম হইয়াছিল সুফী মতবাদ। ইসলাম ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবেই সুফীবাদের উৎপত্তি। বিভিন্ন ধর্মের সামাজিক ও অধ্যাত্মিক আদর্শের সমন্বয়ে ইহা গঠিত। সুফী মতবাদ হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। প্রেম ও আত্মনিবেদনের মাধ্যমে আল্লার করুণা লাভ করা যায়—ইহাই ছিল সুফী সন্তদের প্রচারিত আদর্শ। তাঁহাদের বাণী হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিল।

সুফী-সন্তদের আদর্শ

সুফী সম্প্রদায়গণ ছিলেন এক ধরনের মরমীয়া সাধক। তাঁহারা সাধারণত নির্জন স্থানে বাস করিতেন লোকালয়ের সহিত তাঁহাদের কোন প্রকার সম্পর্ক ছিল না। ভারতের নির্জনগুহাবাসী সন্ন্যাসীদিগের সহিত সুফীদের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তুর্কী মুসলমানগণ যে সময়ে বিজয়ী হিসাবে ভারতে প্রবেশ করেন সেই সময়েই সুফীগণও ভারতে আসিয়াছিলেন।

ভারতীয় সুফীরা প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। চিস্তি, সুরাবর্দি এবং ফিরদৌসি। ঐতিহাসিক বরণী ও কবি আমীর খসরু চিস্তি সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। দিল্লী ও দো-আব অঞ্চলে ইঁহারা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। সুরাবর্দি সম্প্রদায়ভুক্ত সুফীগণ সিন্ধুতে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হইয়াছিলেন এবং বিহারে ফিরদৌসি সুফী সম্প্রদায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

সুফীগণের শ্রেণী বিভাগ

ভারতে সুফীসম্প্রদায় গোঁড়া মুসলমান জাতি হইতে পৃথক ছিলেন। ইঁহারা কোরাণের ব্যাখ্যা বিশ্বাস করিতেন না। সুফীরা বিশ্বাস করিতেন যে নবযুগ প্রায় আগত, ইসলামের মূল তত্ত্বকে পুনঃ পরিবর্তন করিতে মাহদি বা নতুন মুক্তিদাতার আবির্ভাব শীঘ্রই ঘটিবে। ইসলামের সাম্য নীতিতে সুফী সম্প্রদায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ভারতীয় ভক্তিবাদ সম্প্রদায়ের সঙ্গে সুফীসম্প্রদায়ের অনেক ক্ষেত্রেই সাদৃশ্য আছে। ইঁহারা ঈশ্বর সান্নিধ্যের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রে যে পীরের প্রয়োজন তাহা সুফীগণ উল্লেখ করিয়াছেন। তবে ইঁহারা অন্যান্য ভক্তিবাদ প্রচারকগণের মত জনগণের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিয়া চলিতেন না।

সুফীগণের বিশ্বাস

● **ধর্ম আন্দোলনের ফলাফল ঃ** মধ্যযুগের ধর্মসংস্কার আন্দোলনে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ফল হইল হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য স্থাপন। ধর্মাচার্যগণ প্রেম-মৈত্রী ও ভক্তির আদর্শ প্রচার করিয়া বিভেদ ও বিচ্ছেদের পরিবর্তে ঐক্য ও মিলনের নীতি প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই প্রচেষ্টা কিছু পরিমাণে সফল হইয়াছিল। পরবর্তিকালে সম্রাট আকবর এই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার উদার, সমধর্মসমন্বয়মূলক 'দীন-ইলাহি' মতবাদ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, ধর্মপ্রচারকগণ সর্বসাধারণের নিকট তাঁহাদের আদর্শ ও নীতি উপস্থিত করিবার জন্য লৌকিক অর্থাৎ প্রাদেশিক ভাষাকে বাহন হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলে, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, বাংলা প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক বিকাশ ঘটে। তৃতীয়তঃ, ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে হিন্দু ধর্মের রক্ষণশীলতা ও ইসলাম ধর্মের সংকীর্ণতা প্রশমিত হয়।

দীন-ইলাহি

● শিল্পকলা ও সাহিত্য ●

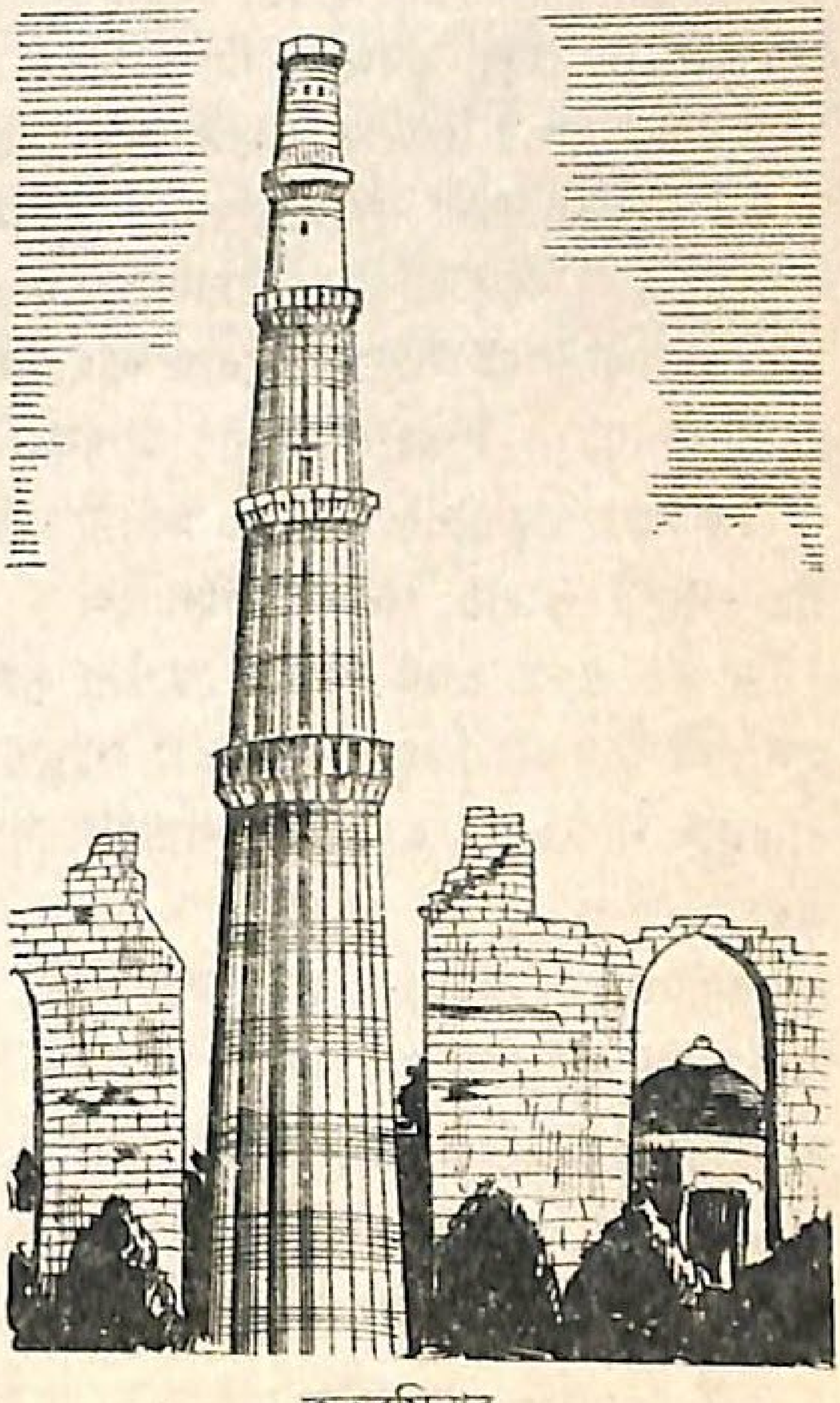
● **সুলতানী আমলের শিল্পকলা ঃ** সুলতানী যুগে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ে এক নূতন শিল্পরীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই সময় ভাস্কর্য শিল্পের কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। অন্যদিকে, গোঁড়া ইসলামীয় অনুশাসনে চিত্রাঙ্কনকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হইত না। সুতরাং তুর্কী-আফগান যুগের চিত্রকলা বলিতে স্থাপত্য শিল্পই বুঝায়। স্যার জন মার্শালের মতে, এই শিল্পরীতিতে ভারতীয় ও পারসিক শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য একই সঙ্গে পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য, এই মিশ্রিত শিল্পধারায় কোন্ সংস্কৃতির প্রভাব কতখানি তাহা সঠিক ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। আবার অঞ্চল বিশেষে, যেমন রাজধানী দিল্লীতে পারসিক ধারার প্রভাব অধিকতর সুস্পষ্ট, কিন্তু দক্ষিণ ভারতের বা জৌনপুরে ভারতীয় বৈশিষ্ট্যই বেশি। শিল্পের ইতিহাসে এই ধারাকে বলা হয় হিন্দু সারাসেনীয় পদ্ধতি। পারসিক স্থাপত্য শিল্পের রীতি অনুযায়ী নির্মিত গম্বুজ, স্তম্ভ বা খিলানে ভারতীয় ধারার নকসার কাজের নিদর্শন দেখিতে পাওয়ার জন্যই এইরূপ নামকরণ করা হইয়াছে।

স্থাপত্য শিল্পের সমন্বয়ী রীতি—হিন্দু আরাসেনীয় পদ্ধতি

ভারতীয় ও পারসিক স্থাপত্যরীতির এই সংমিশ্রণের একাধিক কারণ ছিল। অনেক সময় মুসলিম শাসকগণ হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন মন্দিরের বা শিল্পকীর্তির ভগ্ন অংশের উপর অথবা মন্দির ভাঙিয়া ফেলিয়া শুধু উহার উপরিভাগে পারসিক রীতি অনুযায়ী মসজিদ বা গম্বুজ নির্মাণ করিতেন। দ্বিতীয়তঃ, অধিকাংশ শিল্পীই ছিলেন হিন্দু যদিও প্রধান স্থপতি হইতেন মুসলমান। এইভাবে হিন্দু শিল্পকর্ম মুসলিম পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। আবার, দুই শিল্পধারাই অলঙ্কারবহুল থাকায় উভয়ের সমন্বয় স্বাভাবিকভাবেই ঘটে।

সমন্বয়ের কারণ

দিল্লীতে সুলতানী আমলে বিখ্যাত কুতুবমিনার নির্মিত হইয়াছিল সম্পূর্ণ ইসলামীয় ধারায়। স্তম্ভ নির্মাণের এই ধারা ভারতীয়দের জানা ছিল না কুতুবমিনারের নির্মাণ কাজ শুরু করেন কুতুবউদ্দিন আইবক, সমাপ্ত করেন ইলতুৎমিস। ইসলামী স্থাপত্য শিল্পের আরও দুইটি নিদর্শন হইল, আলাউদ্দিন খলজীর আমলে নির্মিত আলাই দরওয়াজা (কুতুবমিনারের নিকট) এবং জামাইত খাঁ মসজিদ (নিজামউদ্দিন আউলিয়ার সমাধিস্থলে)। তুঘলক আমলের শিল্পে সুলতানদের নৈসর্গিক ধর্মভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। উহা ছিল অলঙ্কার বর্জিত। ফিরোজ শাহ তুঘলকের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আজিও দেখিতে পাওয়া যায় দিল্লীর ফিরোজ শাহ কোটলায়। সৈয়দ এবং লোদী আমলে কোন বড় সৌধ নির্মাণ করা হয় নাই। তবে, এই সময়কার সমাধিভবনগুলিতে হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের বৈশিষ্ট্য, নকসা এবং অলংকারের কাজ ফুটিয়া উঠিয়াছিল।



কুতুবমিনার

দিল্লীতে বাহিরেও হিন্দু সারাসেনীয় স্থাপত্য শিল্পের অনেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাদেশিক শিল্পকীর্তিতে স্থানীয় প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে। জৌনপুরের বিখ্যাত অতাল মসজিদের ঢালু ছাদ এবং চারকোণা থাম হিন্দু শিল্পধারার বৈশিষ্ট্য বহন করে। গুজরাটের স্থাপত্য রীতিতে—আমেদাবাদের আহমদ শাহ নির্মিত জামি মসজিদে মুসলিম প্রভাব বেশ প্রকট। বিজাপুরে মহম্মদ আদিল শাহর সমাধি,

দৌলতাবাদের চাঁদ মিনার, গোলকুণ্ডার জুম্মা মসজিদ ও ফিরোজ শাহ বহমনীর কবর ইত্যাদি ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্য শিল্পের বিশিষ্ট নিদর্শন। মালবের অন্তর্গত মাণ্ডুব বিখ্যাত জুম্মা মসজিদ এবং হিন্দোলা মহল নামে পরিচিত দরবার গৃহের স্থাপত্য সৌন্দর্য শিল্প রসিকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষ ও প্রসার সাধনে বাংলার সুলতানগণ স্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাংলার শিল্প নিদর্শনগুলির দুইটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে 'ইষ্টক এবং রক্তাভ মৃত্তিকা দিয়া' মসজিদ ও অন্যান্য শিল্পকীর্তি নির্মিত হইত, অন্যত্র পাথরের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ, বাংলাদেশের মানুষের বাসস্থানের খড়ের চালার অনুকরণে মসজিদের থামের উপরও চালার আকৃতির খিলান নির্মিত হইত। বাংলার বিশিষ্ট শিল্প নিদর্শনগুলি হইল, পাণ্ডুয়ায় সিকান্দার শাহ নির্মিত আদিনা মসজিদ এবং গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ।

হিন্দু স্থাপত্য

সুলতানী আমলে ভারতবর্ষে যে সব স্বাধীন হিন্দু রাজবংশ ছিল তাহারা কিন্তু চিরাচরিত ভারতীয় শিল্পকলারই পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া গিয়াছেন। সম্পূর্ণভাবে হিন্দু শিল্পকলার নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে বিজয়নগরের হাজার মন্দির ও বিঠলস্বামী মন্দির এবং মেবারের রাণা কুম্ভর জয়স্তম্ভ ও কুম্ভলগড় দুর্গ ইত্যাদি।

● **সুলতানী যুগের সাহিত্য ঃ** দিল্লীর সুলতানগণের এবং প্রাদেশিক শাসকদের প্রত্যক্ষ উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় এই সময় ফারসী, সংস্কৃত এবং প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক বিকাশ ঘটিয়াছিল। ফারসী ছিল রাষ্ট্রভাষা। আলাউদ্দিন খলজী, গিয়াসুদ্দিন বলবন প্রমুখ সুলতানগণ ফারসী ভাষা সম্পর্কে উৎসাহ প্রদান করায় ফারসী সাহিত্যের উন্নতি ঘটে। ফারসী ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক ছিলেন 'সর্ববিদ্যাপারঙ্গম' আমীর খসরু। তিনি 'হিন্দুস্থানের তোতাপাখী' নামে পরিচিত ছিলেন। আমীর খসরু ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক ও সংগীতজ্ঞ। শোনা যায় তিনি নিরানব্বইখানা পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'সৌন্দর্যমণ্ডিত' কাব্য রচনা পারসিক সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। গদ্য রচনার ক্ষেত্রে তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল খাজাইল-উল ফতুহ তুঘলক নামা। তাঁহার রচনায় বহু হিন্দী শব্দ স্থান পাইয়াছিল। আমীর খসরুর সমসাময়িক অপর একজন ফারসী কবি ছিলেন হাসান দেহলভি। অনেক হিন্দুগ্রন্থকারগণও ফারসী ভাষায় সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যসাহিত্য ব্যতীত এই যুগে ইতিহাস রচনাও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। জিয়াউদ্দিন বারণী, মিনহাজউদ্দিন, শামস্-ই সিরাজ প্রমুখ ছিলেন খ্যাতিমান ইতিহাসবেত্তা। এই প্রসঙ্গে ফিরোজ শাহ তুঘলকের আত্মচরিতও উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত আলবেরুণীর রচনা মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপাদান।

ফারসী সাহিত্য—আমীর খসরু

এই সময় অনুবাদের মাধ্যমেও ফারসী সাহিত্য পুষ্ট হয়। ফিরোজ শাহ তুঘলকের আমলে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

সংস্কৃত ভাষা তখন ছিল কাশ্মীর হইতে কেরল পর্যন্ত শিক্ষিত হিন্দুর অবশ্য পঠনীয় ভাষা। সুলতানী আমলের হিন্দু রাজারা তাই সংস্কৃত রচনায় উৎসাহ প্রদর্শন করেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় রামানুজ, সায়ন ও মাধবাচার্য, পার্থসারথি মিশ্র, রূপ গোস্বামী, রঘুনন্দন, বিজ্ঞানেশ্বর, জীমূতবাহন প্রমুখ মহাপণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম দর্শন ব্যবহারবিধি ইত্যাদি সম্পর্কে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। রামানুজ ব্রহ্মসূত্রের টীকা রচনা করেন, বিজ্ঞানেশ্বর হিন্দু আইনের ব্যাখ্যা করিয়া 'মিতাক্ষরা' গ্রন্থ লেখেন। কাব্য ও নাটকের ক্ষেত্রেও এই সময় কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়। সুলতানী আমলের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত কলহণের 'রাজতরঙ্গিণী' বিশিষ্ট ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসাবে পণ্ডিতদের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। অনেক মুসলিম পণ্ডিত সংস্কৃতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আলবেরুণী সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দুদর্শন বিষয়ে গভীর শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

তুর্কী আফগান যুগে আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যেরও অপূর্ব বিকাশ ঘটিয়াছিল। ধর্মপ্রচারকগণের ও

কিছু কিছু সুলতানের প্রচেষ্টায় ও আনুকূল্যে হিন্দী, গুরমুখী, মারাঠী ও বাংলাভাষা বিশেষ প্রসার লাভ করে। ধর্মনেতাগণ সাধারণ মানুষের বোধগম্য করিবার জন্য আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে তাঁহাদের মত প্রচার করিয়াছিলেন। কবীর ও রামানন্দ হিন্দী ভাষার প্রসার ঘটান। কবীরের কাব্য-সৌন্দর্যমণ্ডিত দোঁহা হিন্দী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। হিন্দী 'ঘাড়িবোলী' ভাষায় রচিত কবি চাঁদ রবদাই-এর পৃথ্বিরাজ রাসো হিন্দী কাব্য সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। অপর দিকে মীরাবাঈ-এর ভজন গান হিন্দী ব্রজভাষার বিকাশ সাধন করিয়াছিল। কবি বিদ্যাপতিও 'মৈথিলী' অর্থাৎ ব্রজবুলি ভাষায় তাঁহার পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। নামদেব, জ্ঞানেশ্বর, একনাথ প্রমুখ ধর্মাচার্যদের ভক্তিগীতিতে মারাঠী ভাষার উন্নতি ঘটিয়াছিল। গুরু নানকের ধর্মোপদেশের ফলে গুরুমুখী ভাষার চর্চা ও উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা ও উড়িষ্যাতে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল।

প্রাদেশিক সুলতানদের আনুকূল্যেও ভাষা-সাহিত্যের ব্যাপক বিকাশ ঘটিয়াছিল। কাশ্মীরের সুলতান জয়নাল আবেদিনের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু আরবি ও ফারসী গ্রন্থাদির হিন্দী অনুবাদ এবং হিন্দী ও কাশ্মীরী গ্রন্থাদির আরবি ও ফারসী অনুবাদ করা হইয়াছিল। বাংলাদেশে হুসেন শাহ ও নসরৎ শাহর আমলে বাংলাভাষার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। হুসেন শাহর পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বসু শ্রীমদ্‌ভাগবতের বাংলা অনুবাদ করিয়া গুণরাজ খাঁ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। পরাগল খাঁর উৎসাহে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেন। গৌড়রাজের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি কৃত্তিবাস বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল এই সময়েরই রচনা। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ছিলেন সমকালীন কবিশ্রেষ্ঠ। বীরভূমের নানুড় গ্রামের কবি চণ্ডীদাসের পদাবলী এবং মিথিলার কবি বিদ্যাপতির কাব্য ও ভাব কাব্যসৌন্দর্যে অপরূপ। এই যুগের অপর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা হইল কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ।

প্রাদেশিক ভাষাসমূহের বিকাশ

● **উর্দুভাষার উদ্ভাবন ঃ** "যে সকল প্রয়োজনে মুসলমান ও হিন্দুদের পরস্পরের সাহচর্যে আসিতে হইত তাহারই মধ্যে এক সাধারণ ভাষার অভিব্যক্তি লাভের বীজ অন্তর্নিহিত ছিল। এই সাধারণ ভাষারই নাম হইল উর্দু। ভারতীয় হিন্দী ও ফারসী ভাষার সমন্বয়ে উর্দুভাষার জন্ম হইয়াছিল। এই ভাষার অনেক শব্দ ও লিপি ফারসী (ও আরবী) ভাষা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার ব্যাকরণ ছিল সংস্কৃত ভাষাশ্রয়ী। আমীর খসরু উর্দু ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। দিল্লী ও মীরাট অঞ্চলে উর্দু ভাষা জনপ্রিয় ছিল।

নবম অধ্যায় || মোগল যুগ [১৫২৬-১৭০৭]

এক □ মোগল যুগের ইতিহাস রচনার উপাদান

মোগল যুগের ইতিহাস রচনার উপাদান প্রচুর। সূত্র হিসাবে উল্লেখ করা যায়, সরকারী দলিল পত্র, সমসাময়িক ঐতিহাসিকের রচনা, বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণ, মুদ্রা ও স্থাপত্য নিদর্শন এবং মারাঠী, শিখ ও রাজপুতদের রচনা।

● **সরকারী নথিপত্র** ঃ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সরকারী দলিল পত্রাদি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়। মোগল আমলে সরকারী দপ্তরে কাগজপত্র দলিল-দস্তাবেজ রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। শোনা যায়, আকবরের গ্রন্থাগারে নাকি চব্বিশ হাজার পাণ্ডুলিপি (নথিপত্র) ছিল। অবশ্য প্রাকৃতিক বা অন্য কোন কারণে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আওরঙ্গজেবের শাসনকালে 'আখবরাৎ' নামে এক প্রকারের সরকারী সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত। পেশোয়ার দপ্তরের বহু জিনিস খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। এইসব নথিপত্রাদি মধ্যযুগের ইতিহাসের বহু তথ্যাদির সন্ধান দিয়াছে।

● **সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের রচনা** ঃ বাবর হইতে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত মোগল সম্রাটদের রাজত্বের ইতিহাস বিবৃত আছে মীর্জা হায়দর প্রণীত 'তারিখ-ই রসিজী', আব্বাস শেরওয়ানীর 'তারিখ-ই-শেরশাহী', গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুন নামা', আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবর-নামা, বদাউনীর 'মুনতাখাব-উৎ-তাওয়ারিখ, মুতামিদ খানের 'ইকবালা নামা-ই-জাহাঙ্গীরী', আবদুল হামিদ শাহোরীর 'বাদশাহ নামা' এবং কাফীখানের মুনতাখাব-উল-লুব্বাব' প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে। বাবর ও জাহাঙ্গীরের 'আত্মস্মৃতি' এবং জাহানারার 'আত্মকাহিনী'ও ইতিহাস রচনার নির্ভরযোগ্য সূত্র।

● **বৈদেশিক বিবরণ** ঃ মোগল যুগের ইতিহাস রচনার জন্য বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ বিশেষ মূল্যবান। ইহাদের মধ্যে আছেন ইংরেজ র‍্যালফ্ ফিচ্ ও টমাস রো, ফরাসী বার্ণিয়ের ও তাভার্নিয়ের এবং ইতালীয় মানুচী। ইহাদের বিবরণীর মধ্যে আকবর ও তৎপরবর্তী মোগল সম্রাটদের রাজদরবারের বহু চিত্তাকর্ষক সংবাদ পাওয়া যায়। গোয়ার পর্তুগীজ ধর্মযাজক ও খ্রীষ্টান প্রচারক মনসারেট ও জেরোম জেভিয়ারের রচনাবলীও ইতিহাসের দিক হইতে মূল্যবান।

● **প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন** ঃ স্থাপত্য ভাস্কর্য, চিত্র শিল্প ও মুদ্রার নিদর্শন হইতে মোগল যুগের ভারতবর্ষের শিল্প, সংস্কৃতি সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। শের শাহর সমাধি, আকবরের আমলে নির্মিত হুমায়ুনের সমাধি, সেকেন্দ্রা, ফতেপুর সিক্রী, জাহাঙ্গীরের অজস্র উদ্যান, শাহজাহানের তাজমহল, লালকেল্লা ইত্যাদি অনুপম শিল্পকীর্তি মোগল আমলের শিল্পকলা ও সভ্যতার পরিচয় বহন করে। মোগল দরবার ও রাজস্থানে প্রাপ্ত অজস্র চিত্রশিল্প, স্বর্ণ-রৌপ্য ও তাম্র ফলক, প্রাসাদে মসজিদে, স্মৃতিসৌধে উৎকীর্ণ

লিপিমালা এবং মুদ্রা ইত্যাদি শুধু শিল্পোৎকর্ষ ও ঐশ্বর্যের পরিচয় বহন করে না। অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিত্রের প্রতিফলন রূপেও তাহাদের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

● **প্রাদেশিক রচনা ঃ** আঞ্চলিক রচনা সূত্র হইতে মোগল আমলের মারাঠা, শিখ ও রাজপুতদের ইতিহাস সংগ্রহ করা যায়। মারাঠা ইতিহাসের সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান হইল 'সভাসদ বাখর'। রাজপুত চারণ কবিদের গীত ও গাথার উপর নির্ভর করিয়াই টড রাজপুত ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। শিখ ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেব' শিখ ইতিহাস রচনার মূল্যবান সূত্র।

দুই □ মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

● **মোগল জাতির পরিচয় ঃ** 'মোঙ্গ' শব্দ হইতে মোগল নামের উৎপত্তি হইয়াছে। শব্দটির অর্থ সাহসী। মোঙ্গলরা ছিল নিষ্ঠুর বর্বর জাতি। ইহাদের আদি বাসস্থান ছিল মোঙ্গলিয়া। সেখান হইতে তাহারা মধ্য এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে চলিয়া আসে। এই মোঙ্গলরাই ভারত ইতিহাসে মোগল বা মুঘল নামে পরিচিত। মধ্য এশিয়ায় আসিবার পর মোঙ্গলরা কয়েকটি উপদলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে তেমুচিন বলিয়া এক নেতা উপদলগুলিকে সংঘবদ্ধ করেন। সাহসিকতা ও সংগঠনী প্রতিভার সাহায্যে তিনি মোঙ্গলদের এশিয়ার প্রবলতর রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে পরিণত করেন। এই তেমুচিনই ইতিহাসের বিখ্যাত রণপতি চেঙ্গীস খাঁ।

মোগল শব্দের উৎপত্তি

ইলতুৎমিসের শাসনকালে চেঙ্গীস খাঁ ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সেনাবাহিনী পাঞ্জাবের অসহ্য গ্রীষ্মতাপ সহ্য করিতে না পারায় তিনি ভারতের মধ্যভাগে আসেন নাই। ইলতুৎমিসও চেঙ্গীস খাঁর ক্রোধ উৎপন্ন হইতে পারে এমন কাজ পরিহার করিয়া চলিতেন। গিয়াসউদ্দিন বলবন, আলাউদ্দিন খলজী, মহম্মদ বিন তুঘলক এবং ফিরোজ শাহ তুঘলকের আমলে বহুবার ভারতবর্ষ মোঙ্গল আক্রমণের আশংকায় পীড়িত হইয়াছিল। অতঃপর ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিল তৈমুর লঙের আক্রমণ। তেমুর লঙের আক্রমণের ফলশ্রুতি হিসাবে সুলতানী সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। অতঃপর প্রতিষ্ঠিত হয় এক নূতন সাম্রাজ্যশক্তি—বাবরের নেতৃত্বে মোগল শাসন। বাবর ছিলেন এই তৈমুর-চেঙ্গীসের বংশধর। তাঁহার পিতা ওমর শেখ মির্জা ছিলেন বর্তমান সোভিয়েৎ তুর্কীস্থানের অন্তর্গত ফারগানার রাজা। তিনি ছিলেন তুর্কী বীর তৈমুর লঙের বংশধর। বাবরের মা ছিলেন মোঙ্গল নেতা চেঙ্গীস খাঁর বংশধর ইউনুস খাঁর কন্যা। সুতরাং মধ্য এশিয়ার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং সমর কুশলী জাতি দুইটির রক্ত বাবরের শরীরে বর্তমান ছিল।

তৈমুর লঙ

তৈমুর—চেঙ্গীসের বংশধর

● বাবর (১৫২৬ -১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ) ●

● **বাবর কর্তৃক ভারতে মোগল শাসনের সূচনা ঃ** পাণিপথের প্রথমযুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করিয়া বাবর ভারতবর্ষে মোগল রাজশক্তির সূচনা করিয়াছিলেন। তিনি ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব নাম ছিল জহিরউদ্দিন মহম্মদ। তুর্কী ভাষায় 'বাবর' শব্দটির অর্থ 'ব্যাঘ্র'। তাঁহার সাহসিকতার জন্য তাঁহাকে বাবর আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল।

১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর মাত্র এগার বৎসর বয়সে বাবর ফারগানার শাসক হন। প্রথম হইতেই তিনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুরুষ। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মধ্য এশিয়ার প্রধান নগর সমরখন্দ অধিকার করেন। কিন্তু শীঘ্রই আত্মীয় স্বজনদের চক্রান্তে তাঁহাকে সমরখন্দ ও ফারগানা ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতে হয়, ইহার পর হইতে ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাবর মধ্য এশিয়ায় প্রতিষ্ঠালাভের জন্য বারবার চেষ্টা করিয়াও বিফল হন। ইতিমধ্যে এক

বাবরের পূর্বজীবন

রাজনৈতিক বিশৃংখলার সুযোগ লইয়া তিনি কাবুল ও আফগানিস্থান অধিকার করেন। অতঃপর মধ্য এশিয়া হইতে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হইল ভারতবর্ষে। শৈশব হইতেই তৈমুরের অভিযানের কাহিনী তাঁহাকে রোমাঞ্চিত করিত। তৈমুরের অধিকৃত সমস্ত অঞ্চল পুনরধিকার করাই তাঁহার জীবনের স্বপ্ন। ভারতের বিপুল সম্পদ ও ঐশ্বর্যও তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। এই সময় দিল্লীর সুলতান ছিলেন ইব্রাহিম লোদী। কিন্তু উত্তর ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং লোদী রাজবংশের অন্তর্কলহের কথা বাবরের অজানা ছিল না। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় থাকিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষ হইতে কিছু প্রভাবশালী আমীর ওমরাহ—পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী এবং স্বয়ং সুলতানের আত্মীয় আলমখান প্রমুখ ইব্রাহিম লোদীকে আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিলেন। বাবর এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সসৈন্যে পাঞ্জাবে আসিয়া লাহোর দখল করিয়া লইলেন। অতঃপর তিনি ভারতের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিতে সচেষ্ট হন। এই সময় দৌলত খাঁ লোদী এবং আলম খাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা বিরোধিতা করেন তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন তিনি লুণ্ঠনেই তৃপ্ত থাকিবেন, রাজ্য জয়ের চেষ্টা কবিবেন না। বাবরকে বাধ্য হইয়া কাবুলে ফিরিয়া যাইতে হইল। ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি পুনরায় আক্রমণ করেন। দৌলত খাঁ লোদী পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন। অতঃপর বাবর দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইব্রাহিম লোদী বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। দিল্লীর পানিপথের প্রান্তরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ অনুষ্ঠিত হইল (১৫২৬ খ্রীঃ) সৈন্যসংখ্যার দিক হইতে শক্তিশালী থাকিলেও উন্নত রণকৌশল এবং অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ (ভারতে বাবরই প্রথম কামান ব্যবহার করেন) সেনাবাহিনীর সাহায্যে বাবর জয়লাভ করিলেন। দিল্লী ও আগ্রা তাঁহার হস্তগত হইল। অল্পদিনের মধ্যেই বাবর গোয়ালিয়র এবং পুত্র হুমায়ুন জৌনপুর ও গাজীপুর দখল করিলেন।



বাবর

বাবরের সুযোগলাভ

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (১৫২৬)

এই সময় রাজপুত নেতা রাণা সঙ্গ বা সংগ্রাম সিংহ ভারতবর্ষে হিন্দু সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই বাবরের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ বাঁধিল। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রার নিকটবর্তী খানুয়ার প্রান্তরে মোগলবাহিনীর হস্তে রাণা সঙ্গর পরাজয় ঘটিল। খানুয়ার যুদ্ধ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই যুদ্ধের মারফৎ ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত হয়। ঐতিহাসিক রাশব্রুক উইলিয়ামস্ সঙ্গত কারণেই বলিয়াছেন,—'খানুয়ার যুদ্ধে সাফল্য না ঘটিলে পানিপথের যুদ্ধে বিজয় নিষ্ফল হইত'। পর বৎসর অপর এক রাজপুত নেতাকে পরাজিত করিয়া বিখ্যাত ও দুর্ভেদ্য চান্দেরী দুর্গ বাবর অধিকার করেন।

খানুয়ার যুদ্ধ (১৫২৭)

রাজপুত শক্তি বিনষ্ট করিয়া বাবর পূর্বভারতের আফগান শক্তির বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। বাংলার সুলতান নসরৎ শাহর সহিত বিহারের আফগান সর্দারগণ একত্রিত হইয়া মোগল আক্রমণকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু পাটনার উত্তরে গঙ্গা ও গর্গরা নদীর সঙ্গমস্থলে এক যুদ্ধে (১৫২৯ খ্রীঃ) আফগান শক্তি জোট পরাস্ত হইল। বাংলার স্বাধীনতা অক্ষত থাকিলেও পূর্বভারতে বাবরের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। পানিপথ, খানুয়া এবং গর্গরা—তিনটি যুদ্ধের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের সূচনা ঘটিল। ইহার অল্পদিন পরে ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যু হয়।

গর্গরার যুদ্ধ (১৫২৯)

মধ্য এশিয়ার ফারগানার মত এক ক্ষুদ্র জনপদের বিতাড়িত শাসক উত্তর ভারতের এক বিরাট মোগল সাম্রাজ্যের সূচনা করেন। তাঁহার সাম্রাজ্যের সীমা মধ্য এশিয়ার অক্ষু নদী হইতে পূর্ব ভারতের গর্গরা নদী এবং পাঞ্জাব হইতে গোয়ালিয়র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দিল্লীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া বাবর বাদশাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া সার্বভৌম ক্ষমতা ঘোষণা করেন।

'বাদশাহ' উপাধি গ্রহণ

ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেও বাবর কিন্তু তাহা সংহত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় যুদ্ধ বিগ্রহেই কাটিয়াছিল। শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কোন সুযোগই তিনি পান নাই। তিনি প্রচলিত ব্যবস্থাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় শাসনকে শক্তিশালী না করিয়া যাওয়ায় পুত্র হুমায়ুনের আমলেই সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আকবর সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না করিতে পারিলে বাবরের সাফল্য অকিঞ্চিৎ প্রতিভাত হইত। সেইজন্য কোন কোন ঐতিহাসিক বাবরকে যথার্থ সাম্রাজ্য সংগঠক বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কিন্তু মোগল রাজশক্তির স্থাপয়িতারূপে তাঁহার সাফল্য স্মরণীয় হইয়া থাকিবে

সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে বাধা

ব্যক্তি হিসাবে বাবর অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার সুরুচি, প্রকৃতিপ্রীতি, সৌন্দর্যবোধ ও সাহিত্যানুরাগ প্রশংসনীয়। তাঁহার আত্মবিবরণী সুলিখিত তথ্যপূর্ণ। ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেও ফারগাণা ও সমরখন্দকে তিনি ভুলিতে পারেন নাই। ঐতিহাসিক লেনপুল সঠিকভাবেই বলিয়াছেন, 'বাবর ছিলেন মধ্য এশিয়া ও ভারত, তৈমুর ও আকবরের মধ্যে যোগসূত্র।

● **বাবরের আত্মজীবনী ঃ** তুর্কী ভাষায় রচিত বাবরের আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-বাবরী' বা 'বাবরনামা' ইতিহাস ও জীবনী-সাহিত্যের একটি অমূল্য গ্রন্থ। পুস্তকটি বাবরের কর্মবহুল জীবনের সকল তথ্য আহরণের সর্বপ্রধান উৎস। গ্রন্থটিতে তিনি তাঁহার জীবনের সকল কথা—সাফল্য ও ব্যর্থতা, নিজের এবং অপরের চারিত্রিক দোষ-ত্রুটি এবং গুণাবলী সরল, বলিষ্ঠ এবং সাবলীল ভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। অহেতুক আত্মপ্রশংসার আভাষ ইহাতে নাই। পুস্তকটির মধ্য হইতে বাবরের সৌন্দর্যপ্রীতি ও প্রকৃতি প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। সারাজীবন যুদ্ধের মধ্যে কাটাইলেও তিনি তাঁহার শৈশব জীবন, তাঁহার বাল্যক্রীড়ার সঙ্গী-সাথী বা জন্মভূমির কথা কখনও বিস্মৃত হন নাই। আত্মজীবনীতে তাঁহার চরিত্রের এই কোমল দিকের কথা সকলকেই আবিষ্ট করে। আকবরের আমলে আবদুর রহিম 'খান-ই-খানান' পুস্তকটির ফারসী অনুবাদ করেন। ঐতিহাসিক বিভারীজ গ্রন্থটির ইংরেজী অনুবাদ করেন।

'বাবরনামা' বিবরণী

● হুমায়ুন (১৫৩০—১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ) ●

● **মোগল আফগান সংঘর্ষ ঃ** ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন পিতৃ সিংহাসনে উপবেশন করেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি নানাবিধ বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হন। ভ্রাতা কামরান দিল্লী অধিকার করিবার মানসে বিদ্রোহী হইয়া পাঞ্জাব দখল করিয়া লইলেন। অন্যদিকে বাবরের নিকট পর্যুদস্ত হইয়া আফগানগণ মোগল আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইতে রাজী ছিলেন না। মোগল শাসন তখনও পর্যন্ত ভারতবর্ষে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই সময় বিশেষ করিয়া গুজরাটের শাসনকর্তা বাহাদুর শাহ এবং বিহারের শাসনকর্তা শের খাঁ মোগল অধিকারকে মানিয়া লইলেন না। পশ্চিমে বাহাদুর শাহ মালব, খান্দেশ, বেরার ইত্যাদি জয় করিয়া রাজস্থানের উপর আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। ইহা সফল হইলে দিল্লীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার আশংকা থাকিত। হুমায়ুন প্রথমেই বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার সহজ সাফল্য ঘটিল। গুজরাট ও মালব মোগল অধিকারে আসিল। সন্তুষ্ট চিত্তে হুমায়ুন আগ্রায় ফিরিয়া আসিলে



হুমায়ুন

বাহাদুর শাহ গুজরাট ও মালব পুনর্দখল করিয়া লইলেন।. ইতিমধ্যে শের খাঁ বিহারের শাসনকর্তার ক্ষমতা দখল করিয়া পার্শ্ববর্তী গৌড় রাজ্য আক্রমণ করিলেন। পাঠান নায়কের এই ক্রমবর্ধমান শক্তিতে আতঙ্কিত হইয়া হুমায়ুন শের খাঁর অধিকারভুক্ত চূণার দুর্গ দখল করিলেন। শের খাঁ গৌড়ে পলায়ন করিলে মোগলরাজ গৌড় অবরোধ করিলেন। যুদ্ধ না করিয়া শের খাঁ কূটকৌশলে হুমায়ুনকে দীর্ঘ আট মাস বাংলায় অবস্থান করাইয়া মূল্যবান সময় নষ্ট করিতে বাধ্য করিলেন। এই অবসরে শের খাঁ কৌশলে গৌড় পরিত্যাগ করিয়া বিহারে আবার শক্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। পরে বিহার হইতে কনৌজ এবং জৌনপুরের কতকাংশ অধিকার করিয়া শের খাঁ রাজধানী দিল্লী আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। শংকিত হুমায়ুন রাজধানীতে ফিরিয়া যাইতে গেলে পথিমধ্যে বক্সারের নিকট চৌসার যুদ্ধে (১৫৩৯ খ্রীঃ) তিনি শের খাঁ কর্তৃক পরাজিত হইলেন। মোগল সম্রাট কোন প্রকারে প্রাণ রক্ষা করিয়া আগ্রায় ফিরিয়া গেলেন। বাংলা-বিহার-জৌনপুর কনৌজ শের খাঁর অধিকারভুক্ত হইল। হুমায়ুন বুঝিতে পারিলেন শের খাঁর শক্তি চূর্ণ করিতে না পারিলে মোগল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। ফলে পর বৎসর দ্বিগুণ সৈন্যবাহিনী লইয়া শের খাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজ বা বিল্বগ্রামের যুদ্ধে হুমায়ুন পুনরায় পরাজিত হইলেন। দিল্লী ও আগ্রা তাঁহার হস্তচ্যুত হইল। শের খাঁর নেতৃত্বে পাঠান (আফগান) সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। শের খাঁর নূতন নামকরণ হইল শের শাহ।

গুজরাট-মালব অধিকার

শেরখাঁর সহিত বিরোধ

চৌসার যুদ্ধ

শের শাহ (১৫৪০—১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দ)

শের শাহর বাল্য নাম ছিল ফরিদ। তাহার পিতা হাসান খাঁ ছিলেন সাসারামের জায়গীরদার। শৈশবে তিনি পিতা ও বিমাতার উপর বিরক্ত হইয়া জৌনপুরে উপস্থিত হন এবং আরবী ও ফারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। পব পিতার পৃষ্ঠপোষক জামাল খাঁর অধীনে কর্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার মধ্যস্থতায় সাসারামে ফিরিয়া আসিয়া পিতার জায়গীর পরিচালনা করেন। কিন্তু বিমাতার অত্যাচারে তিনি পলাইয়া যান এবং বিহারের সুলতান বাহার খাঁ লোহানীর অধীনে কর্মগ্রহণ করেন। নিজ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রতিভার সাহায্যে ক্রমে তিনি সুলতানের সহকারী পদে উন্নীত হন। এই সময় কাহারও সাহায্য না লইয়া তিনি নিজহস্তে একটি শের বা বাঘ মারিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নূতন নামকরণ হইল শের খাঁ। অতঃপর তিনি বাহার খাঁর পুত্র জালাল খাঁর ব্যক্তিগত শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। বাহার খাঁর মৃত্যুর পর শের খাঁ জালালের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন এবং কালক্রমে সমস্ত ক্ষমতাই শের খাঁর হস্তে কেন্দ্রীভূত হয়। এই সময় চূণার দুর্গাধিপতির বিধবা পত্নীকে বিবাহ করিয়া মূল্যবান দুর্গটি অধিকার করিয়া লইলেন। ইতিমধ্যে বিহারের লোহানী ওমরাহগণ শের খাঁর উত্তরোত্তর ক্ষমতাবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া তাঁহাকে দমন করিবার জন্য বাংলাদেশের সুলতান মামুদ শাহকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু শের খাঁ অতি সহজেই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সুরজগড়ের যুদ্ধে পরাজিত করেন (১৫৩৪ খ্রীঃ)। অতঃপর তিনি বিহারে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া যান। গৌড় বা বাংলাদেশেও তাঁহার আধিপত্য প্রসারিত হইল।

পূর্ব পরিচয়

বিদ্রোহ

শের খাঁর লক্ষ্য ছিল আফগান সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ইতিমধ্যে শের খাঁর বাংলাদেশ অধিকারের খবর পাইয়া হুমায়ুন কালবিলম্ব না করিয়া চূণার দুর্গ অধিকার করিলেন। অতঃপর তিনি গৌড় আক্রমণ করিলেন। শের খাঁ কৌশলে গৌড় হইতে পলাইয়া আসেন। কূটনীতির আশ্রয়ে ক্রমে ক্রমে বহু সংঘর্ষ ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়া শেরশাহ অবশেষে হুমায়ুনকে পরাজিত করেন। মোগল সম্রাট হুমায়ুন ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া শেষপর্যন্ত পারস্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। শের খাঁর স্বপ্ন সফল হইল। দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত

বিহার ও বাংলার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা

হইবার পর শেরশাহ (ইতিমধ্যে তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতীক হিসাবে 'শাহ' উপাধি গ্রহণ করেন) কামরাণের নিকট হইতে পাঞ্জাব, সিন্ধু ও মূলতান অধিকার করেন। এই সময়ে বাংলাদেশে বিদ্রোহ দেখা দিলে শেরশাহ দ্রুততার সহিত তাহা দমন করিলেন এবং নিজের এক বিশ্বস্ত অনচরকে বাংলার শাসনকর্তার নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর তিনি গোয়ালিয়র মালব প্রভৃতি দুর্গ দখল করিলেন। অবশেষে বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করিতে যাইয়া আকস্মিক বিস্ফোরণে তাঁহার মৃত্যু হয় (১৫৪৫ খ্রীঃ)।

রাজ্যবিস্তার

● **শের শাহর শাসন ব্যবস্থা ঃ শের শাহ মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যে শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসে তাহাকে বিস্ময়কর বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। বস্তুতপক্ষে, সাম্রাজ্য সংগঠক অপেক্ষা দক্ষ শাসক হিসাবেই তিনি ইতিহাসে অধিকতর খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। ঐতিহাসিকদের মতে, আকবর ব্যতীত মধ্যযুগের অপর কোন শাসক শের শাহর মত কৃতিত্ব অর্জন করিতে পারেন নাই। সুষ্ঠু** প্রজাকল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যে সংহতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসক-সংগঠক

শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে শের শাহ মৌলিক উদ্ভাবক না সংস্কারক মাত্র—এই প্রশ্ন লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। ডঃ ত্রিপাঠী ও ডঃ শরণের মতে, তিনি পূর্ববর্তী দিল্লীর সুলতানদ্বয়ের—বলবন ও আলাউদ্দিন খলজীর প্রচলিত বিধি ব্যবস্থাই নূতনভাবে সংস্কার করিয়াছিলেন। আবার ডঃ কানুনগো, ডঃ দত্ত প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে, শের শাহ আকবর অপেক্ষা অধিক মৌলিকতা ও সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। যাহা হউক, ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে শের শাহ অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইংরেজ ঐতিহাসিক (keene) মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'কোন সরকার-এমনকি ব্রিটিশ সরকারও পাঠান সুলতান শের শাহর ন্যায় বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। বহু ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মধ্যযুগের ভারতশ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবরের পথ-প্রদর্শনকারী।

শেরশাহর মৌলিকতা


শেরশাহ

মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শের শাহ নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বৈরাচার ছিল একান্তভাবে প্রজাহিতৈষী। অন্যদিকে প্রশাসনিক ব্যাপারে তিনি হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্যমূলক ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার শাসন ছিল উদার, ধর্মনিরপেক্ষ, প্রজাকল্যাণকামী।

শের শাহ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন স্থাপন করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীভূত শাসন প্রতিষ্ঠা করিলেও প্রাদেশিক, আঞ্চলিক ও গ্রাম্য শাসনের প্রকৃত বিবর্তনের দিকে তিনি বিশেষ নজর দিয়াছিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্য ৪৭টি সরকারে বিভক্ত ছিল। শিকদার-ই-শিকদারণ (প্রধান শিকদার) এবং মুনসিফ-ই-মুনসিফান (প্রধান মুনসিক) যথাক্রমে সরকারের শান্তিরক্ষা এবং রাজস্ব সংক্রান্ত মামলাদির বিচার করিতেন। প্রতি সরকারকে কয়েকটি পরগণায় ভাগ করা হয়। আমিন, শিকদার, মুন্সেফ, কানুনগো প্রভৃতি কর্মচারী পরগণার শাসন পরিচালনা করিতেন। সর্বনিম্নে ছিল গ্রাম। গ্রামের শাসনভার অর্পিত ছিল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর। শের শাহর বিচার ব্যবস্থা ছিল নিরপেক্ষ। সামাজিক, আর্থিক বা ধর্মগত কারণে কোনরকম পক্ষপাতমূলক ব্যবহার করা হইত না। সম্রাট ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারক। রাজধানীর বিচার কার্য পরিচালনা করিতেন প্রধান

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগ

কাজী পরগণায় ছিলেন সাধারণ কাজী ও মীর আদল। দণ্ডবিধি কিন্তু কঠোর ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের উদ্দেশ্যে শের শাহ বাংলাদেশ হইতে সিন্ধু নদ পর্যন্ত গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড সমেত কয়েকটি প্রশস্ত ও সুদীর্ঘ রাজপথও নির্মাণ করিয়াছিলেন। পথে বিশ্রামগৃহ ও সরাইখানাও নির্মিত হইয়াছিল। সংবাদ আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে তিনি ঘোড়া বাহিত ডাক প্রচলন করিয়াছিলেন। তিনি মুদ্রা ব্যবস্থারও সংস্কার

রাজপথ নির্মাণ
ও ডাকের প্রচলন

শের শাহ জায়গির প্রথার অবসান করিয়া সেনাবাহিনীর সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। সৈন্যদলে শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

শের শাহর শাসনব্যবস্থা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। তাঁহার প্রধান সেনাপতি ছিলেন ব্রহ্মজিৎ গৌড়। অশক্ত বৃদ্ধ, অসহায় বিধবা ও অন্ধমানুষদের দান-খয়রাতির জন্য তিনি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অনেক মসজিদ ও মাদ্রাসাও নির্মাণ করিয়াছিলেন।

● **রাজস্ব ব্যবস্থা ঃ** ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে শের শাহ যে নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরবর্তিকালে তাহা অনেক সময়ই অনুসৃত হইয়াছিল। তিনি জমি জরীপ করিয়া উৎপন্ন ফসলের ১/৩ অথবা ১/৪ অংশ সরকারী খাজনা হিসাবে গ্রহণ করিতেন। নগদ অর্থে বা শস্যে রাজস্ব পরিশোধ করা যাইত। আমিন, মুকদ্দম, কানুনগো, পাটোয়ারী প্রমুখ কর্মচারিগণ খাজনা আদায় করিতেন। তিনি নিয়মিত আদায়ের উপর জোর দিতেন, কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটিলে কৃষকদের খাজনা মকুব বা তাহাদের ঋণ দান করিতেন। কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় তিনি সর্বদা সজাগ ছিলেন। জমিতে কৃষকদের স্বত্ব অধিকার এবং দেয় খাজনা উল্লেখ করিয়া সরকারের তরফে একটি দলিল দেওয়া হইত। ইহার নাম পাট্টা, পক্ষান্তরে কৃষকেরাও রাজার প্রাপ্য স্বীকার করিয়া লইয়া একটি অঙ্গীকার দিত, যাহাকে বলা হইত কবুলিয়ত।

করলিখত ও পাট্টা

● **শেরশাহর অবদান ঃ** শেরশাহ এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। মোগল শক্তিকে পরাভূত করিয়া তিনি আফগান সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সর্বাধিক কৃতিত্ব ছিল এক সুবিন্যস্ত ও সুসংহত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন। তাঁহার শাসনব্যবস্থার মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্য ছিল প্রজাহিতৈষণা, উদারতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা। তাঁহার ধর্মনিরপেক্ষ সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও নীতি তাঁহার স্থাপত্য শিল্পেও প্রতিফলিত হইয়াছে। তিনি একটি জাতীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। 'সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম ফারসী ভাষাকে সাম্রাজ্যের সর্বত্র রাষ্ট্রভাষারূপে প্রচলিত করে দেশকে ঐক্যবন্ধনে বাঁধার প্রয়াস পেয়েছিলেন।' তাঁহার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষকদের স্বার্থের অনুকূলে তিনি যে নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহা মধ্যযুগে ইতিপূর্বে করা হয় নাই। ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শ স্থাপন ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি ছিলেন আকবরের পথপ্রদর্শক, অবশ্য আকবর পূর্বসূরীর শাসনব্যবস্থার বহুতর সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন।

কৃতিত্ব

● **হুমায়ুন কর্তৃক মোগল সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার ঃ** সিংহাসনচ্যুত হইয়া হুমায়ুন আশ্রয়ের সন্ধানে স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। এই অবস্থায় ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে অমরকোটে তাঁহার জগদ্বিখ্যাত পুত্র আকবরের জন্ম হয়। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত পারস্যের শাহর সাহায্য লইয়া তিনি হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিলেন। শের শাহর মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের দুর্বলতার সুযোগে ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন দিল্লী ও আগ্রা পুনরধিকার করেন। অনতিকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

হুমায়ুন কর্তৃক সিংহাসন
পুনরধিকার

পিতা বাবর ও পুত্র আকবরের মত ব্যক্তিত্বশালী নরপতিদ্বয়ের শাসনের অন্তবর্তিকালে হুমায়ুন রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুনর্গঠিত আফগান সাম্রাজ্যের কিয়দংশ পুনরধিকার করিয়া মোগল শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত অপর কোন কৃতিত্বের তিনি পরিচয় দিতে পারেন নাই। সামরিক দিক হইতে দুর্বল না হইলেও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা বা শাসনতান্ত্রিক দক্ষতা তাঁহার ছিল না। মোগল রাজত্বের ইতিহাসে তাই তিনি স্বল্পখ্যাত শাসক।

● আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ) ●

১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুনের মৃত্যু হইলে ১৪ বৎসরের কম বয়সে আকবর মোগল সিংহাসনে উপবেশন করেন। প্রথম হইতেই তিনি এক গভীর সংকটের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। বৈরাম খান ব্যতীত মোগল আমীর ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ প্রায় সকলেই ছিলেন আকবরের বিরোধী। অন্যদিকে আফগান নেতা ইব্রাহিম আদিল শাহ শূর তাঁহার হিন্দু সেনাপতি হিমুর সাহায্যে আফগান রাষ্ট্রক্ষমতা পুনর্দখলের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী আকবর হতোদ্যম না হইয়া সংকট ও প্রতিকূলতা অতিক্রম করিয়া আপন আধিপত্য সুদৃঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।



আকবর

প্রথমেই তিনি বৈরাম খানের নির্দেশে ও নেতৃত্বে হিমুর বিরুদ্ধে মোগল সৈন্যকে সংঘবদ্ধ করিলেন। হিমু ইতিমধ্যে দিল্লী ও আগ্রা দখল করিয়া নিজেকে স্বাধীন সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন এবং 'বিক্রমজিৎ' উপাধি গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক পানিপথের প্রান্তরে উভয় পক্ষের মধ্যে তীব্র যুদ্ধ সংঘটিত হইল (১৫৫৬ খ্রীঃ)। পানিপথের এই দ্বিতীয় যুদ্ধ মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই যুদ্ধ বিজয়ের ফলে দিল্লী আগ্রা আকবরের করতলগত হয়। আফগানদের ভারতবর্ষে সার্বভৌম অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চিরতরে ব্যর্থ হইয়া গেল। আকবরের নেতৃত্বে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি পুনঃস্থাপিত হইল। অতঃপর গোয়ালিয়র, আজমীর ও জৌনপুর আকবরের অধীনস্থ হয়।

বৈরামখাঁর পতন

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর আকবর চার বৎসর বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বে থাকেন। কিন্তু বৈরাম খান বেশীদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিলেন না। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পতন হইল। মক্কা যাইবার পথে আততায়ীর হস্তে তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হইল। ইহার পর চার বৎসর ধরিয়া চলিল, ঐতিহাসিক ডঃ স্মিথ যাহাকে বলিয়াছেন 'অন্তঃপুরিকার শাসনকাল'। আকবরের ধাত্রীমাতা মহম আনাগা ছিলেন সকল ক্ষমতার অধিকারিণী। আধুনিক গবেষকগণ অবশ্য এই মত স্বীকার করেন না। যাহা হউক, ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আকবর সমস্ত ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করেন।

সাম্রাজ্য বিস্তার

অতঃপর শুরু হইল মোগল সাম্রাজ্যের ক্রমবিস্তারের ইতিবৃত্ত। আকবর ছিলেন ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী। তিনি মনে করিতেন, রাজা নিরন্তর দিগ্বিজয়ে সচেষ্ট না থাকিলে তাঁহার রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যাহত হইতে পারে। আবার কোন কোন ঐতিহাসিক মন্তব্য করিয়াছেন, নিছক রাজ্যজয়ের নেশায় আকবর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই। দিগ্বিজয়ের মাধ্যমে ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য, শৃংখলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁহার বাসনা। আকবরের রাজ্য বিস্তার নীতির প্রকৃতি যাহাই হউক না কেন, তিনি প্রায় ৪০ বৎসর ধরিয়া ভারতের সর্বত্র তাঁহার সামরিক অভিযান

চালাইয়া গিয়াছিলেন। প্রথমেই তিনি বাজবাহাদুরকে পরাজিত করিয়া মালব অধিকার করেন। ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মধ্য প্রদেশের গণ্ডোয়ানা রাজ্যের বীর রাণী দুর্গাবতী ও তাঁহার সাহসী নাবালক পুত্র বীর নারায়ণকে পরাভূত করিয়া রাজ্যটি আপন অধিকারভুক্ত করেন। মধ্যপ্রদেশের পর আকবরের দৃষ্টি পড়িল রাজপুতনার উপর। রাজপুত রাজ্যগুলির মধ্যে অম্বরের রাজা ভারমল বা বিহারীমল বিনা যুদ্ধে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার অধীনে পাঁচহাজারী মনসবদারের পদ গ্রহণ করেন। বিহারীমলের কন্যার সহিত আকবরের বিবাহ হয় এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্র যথাক্রমে রাজা ভগবানদাস ও মানসিংহ মোগল দরবারে উচ্চপদ লাভ করেন। অতঃপর সামরিক শক্তির সঙ্গে কূটনৈতিক বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়া তিনি একের পর এক চিতোর, রণথম্ভোর, বিকানীর, কালিঞ্জর, মারওয়াড়, জয়শলমীর প্রভৃতি রাজ্যগুলি মোগল সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত করেন। এই সমস্ত সামরিক অভিযানের মধ্যে চিতোর দুর্গ (মেবার) অধিকার করিতে যাইয়া আকবর বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। মেবার রাজপুতনার সবচেয়ে সংগঠিত রাজ্য। মোগল শক্তির বশ্যতা স্বীকার না করায় আকবর রাজ্যটি আক্রমণ করিলে রাণা উদয় সিংহ কাপুরুষের মত পলায়ন করিলেন। কিন্তু রাজপুতগণ জয়মল্ল ও পুত্তর নেতৃত্বে মরণপণ সংগ্রাম করিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হইল না। চিতোরের পতন ঘটিল। কয়েক বৎসর বাদে পিতার মৃত্যুর পর বীর দেশপ্রেমিক রাণা প্রতাপসিংহ নতুন করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হলদিঘাটের যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হইল। পরাজয় সত্ত্বেও রাণা প্রতাপ মোগলদের আনুগত্য স্বীকার করেন নাই। আমৃত্যু এই যোদ্ধা স্বাধীনতার সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছিলেন। ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর আগে তিনি চিতোর ও আজমীর পথে রাজপুতনার বহু দুর্গ ও রাজ্যাংশ পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পুত্র অমর সিংহও মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া গিয়াছিলেন।

মালব ও গণ্ডোয়ানা অধিকার

রাজপুতনায় রাজ্যবিস্তার

রাণা প্রতাপের প্রতিরোধ সংগ্রাম—চিতোর জয়



রাণাপ্রতাপ

এইবার আসিল গুজরাটের পালা। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাট জয় সম্পূর্ণ হইলে মোগল সাম্রাজ্যের সীমা পশ্চিমে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সুরাট সমেত পশ্চিম ভারতের বিখ্যাত বন্দরগুলি মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। পশ্চিমের পর আকবরের দৃষ্টি পতিত হইল পূর্ব ভারতের উপর। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খাঁকে পরাজিত করিয়া বাংলা অধিকার করা হইল। বিখ্যাত সপ্তগ্রাম বন্দর মোগল অধীনে চলিয়া আসিল। বাংলাদেশ অধিকৃত হইলেও বাংলার জমিদারবৃন্দ দীর্ঘদিন মোগল শাসন উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। ইহারা 'বারো ভুঁইয়া' নামে পরিচিত। এই সামন্তরাজদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন ঢাকা ও ময়মনসিংহের ঈশা খাঁ, যশোহরের প্রতাপাদিত্য, বাকলার কন্দর্পনারায়ণ ও বিক্রমপুরের চাঁদ রায়-কেদার রায়। যাহা হউক, বাংলা বিজয়ের পর একে একে উড়িষ্যা, কাবুল কান্দাহার, কাশ্মীর, সিন্ধু, বেলুচিস্তান জয় করিয়া আকবর সমগ্র উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারত আপন সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

গুজরাট অধিকার

বাংলা জয়

বারো ভুঁইয়া

সমগ্র ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপনের অভীপ্সায় আকবর এইবার দক্ষিণ ভারতে অভিযানের সংকল্প গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিকে আনুগত্য স্বীকার করিতে আহ্বান করেন। কিন্তু এই আহ্বানে সাড়া না দেওয়ায় আকবর প্রথমেই আহম্মদনগর আক্রমণ করেন। নাবালক সুলতানের অভিভাবিকা হিসাবে চাঁদবিবি বীরত্বের সহিত লড়াই

আহম্মদনগরের পতন

করিয়াও শেষ পর্যন্ত এক চক্রান্তের বলী হইলেন এবং আহম্মদনগরের একাংশ মোগল অধিকারে চলিয়া আসে। অতঃপর ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে খান্দেশের রাজধানী বুরহানপুর অধিকার করিয়া আকবর আসিরগড় দুর্গ অবরোধ করেন। উৎকোচ ও বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে দুর্গটি অধিকৃত হইলেও ইহাই ছিল আকবরের শেষ সামরিক সাফল্য। এই সময় পুত্র সেলিম বিদ্রোহ করিলে আকবর রাজধানীতে ফিরিয়া গিয়া তাহা দমন করেন এবং কিছুদিন বাদেই ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আকবরের রাজপুত নীতির সহিত তাঁহার সাম্রাজ্যবিস্তার নীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মোগল-রাজপুত ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আকবর যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন 'হিন্দু' ভারতের সবচেয়ে অগ্রণী জাতি ছিলেন রাজপুত জাতি। অন্যদিকে, তখনও পর্যন্ত ভারতীয়গণ মোগলদের বিজাতীয় বলিয়া মনে করিতেন। আফগান কর্তৃত্ব অবসান করিয়া ভারতবর্ষে মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবাসী এবং বিশেষ করিয়া তৎকালীন ভারতের সবচেয়ে যোদ্ধ শ্রেণী রাজপুতদের সহযোগিতা যে একান্তভাবে প্রয়োজনীয় আকবর তাহা বুঝিতেন। এই কারণে তিনি রাজপুতদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন। এই সঙ্গে উল্লেখ্য, ধর্মে মুসলমান হইলেও হিন্দু ভারতবাসীর সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের প্রতি আকবরের ছিল অপরিসীম ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তি। হিন্দু-মুসলিম মিলনের নীতিকে তিনি জীবনের এক পরম কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। সুতরাং, উদারতা ও রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার সম্পর্ক সমন্বয়ের উপর ভিত্তি করিয়া আকবরের রাজপুত নীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই আদর্শবোধ দ্বারা চালিত হইয়া তিনি উদার ও সৌহার্দ্যমূলক নীতি অনুসরণের মাধ্যমে রাজপুতদের হৃদয় জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশ্য রাজপুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেও তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহার ও উপযুক্ত মর্যাদা দান করিয়া তিনি তাঁহার সর্বাধিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রুকে এক অনুগত মিত্র শক্তিতে পরিণত করেন। ফলে, রাজপুতগণ বীরত্ব ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে মোগল সাম্রাজ্যের প্রসার সাধন করেন। বিভিন্ন রাজপুত পরিবারের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন এবং রাজপুতগণকে উচ্চপদে নিয়োগের মাধ্যমে আকবর তাঁহার রাজপুত নীতির সার্থক রূপায়ণ ঘটান। অন্যদিকে সাধারণভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের আনুগত্য লাভ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি তাহাদের পক্ষে গ্লানিকর 'তীর্থকর' ও 'জিজিয়া কর' তুলিয়া দিয়াছিলেন। ধর্মগত কারণে তিনি কোন মন্দির অপবিত্র বা ধ্বংস করেন নাই।

রাজপুত নীতির সার্থক রূপায়ণ

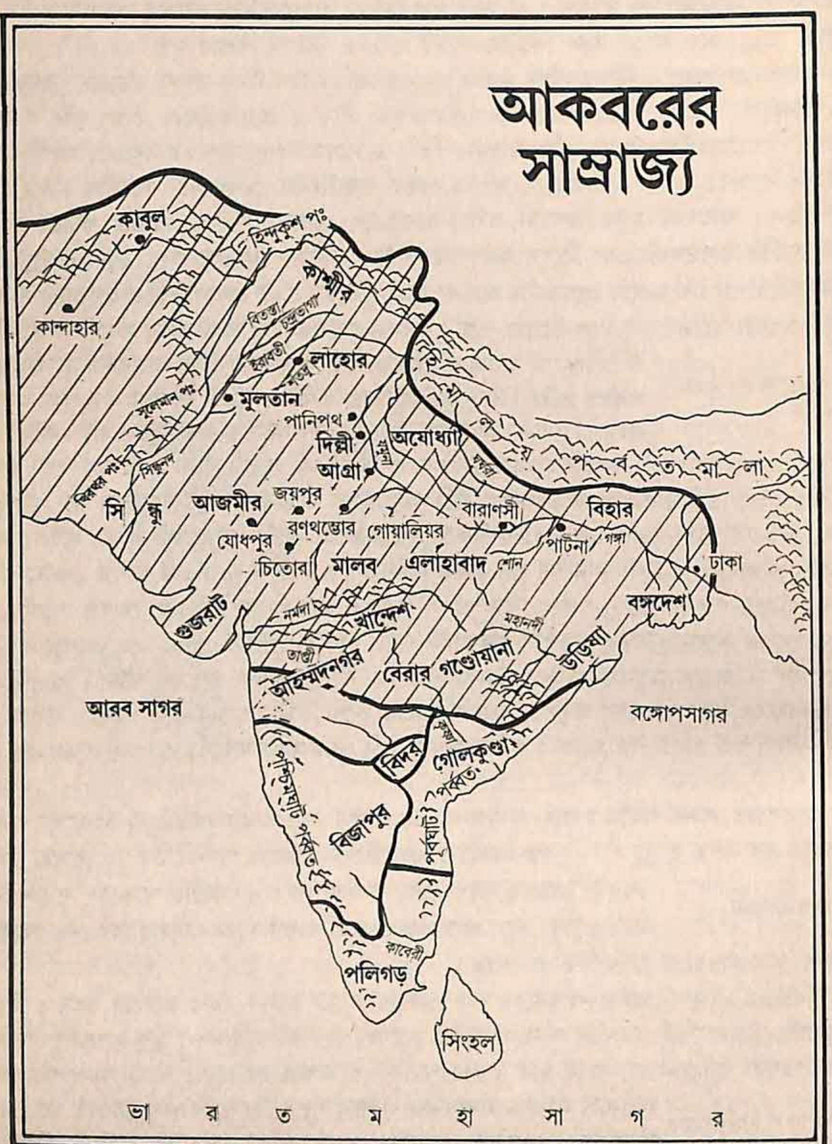
● **আকবরের শাসন পদ্ধতি ঃ** শুধু সাম্রাজ্যের প্রসারসাধন নয়, তাহার সংহতি ও বিকাশের জন্য আকবর এক উন্নত ও সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসননীতির মূল বৈশিষ্ট্য ছিল উদারতা, প্রজাহিতৈষণা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। কেন্দ্রীয় শাসনকে শক্তিশালী করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক ও গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থার বিকাশের প্রচেষ্টা তাঁহার শাসনব্যবস্থাকে মহিমান্বিত করিয়াছে।

কেন্দ্রীয় কর্মচারী

সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত আকবরের শাসনব্যবস্থায় সম্রাট ছিলেন সকল ক্ষমতার উৎস। কিন্তু স্বৈরাচারী হইলেও তিনি উদার ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রাদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমানে তিনি কোন পার্থক্য করিতেন না, ধর্মের দ্বারা তাঁহার শাসননীতি আচ্ছন্ন হয় নাই। সম্রাট সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হইলেও প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য আকবর কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক, আঞ্চলিক ও গ্রাম্য সকল স্তরেই একাধিক কর্মচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় শাসনে সম্রাটের প্রধান কর্মচারী ছিলেন 'ভকিল' বা প্রধানমন্ত্রী। অবশ্য বৈরাম খাঁর পতনের পর ভকিলরা নামে মাত্র ক্ষমতা ভোগ করিতেন। পরবর্তী পর্যায়ে ছিলেন (১) 'দেওয়ান'—ইহার উপর ন্যস্ত ছিল রাজস্ব ও আয়-ব্যয়ের ভার, (২) 'মীর বকসি'—সামরিক বিভাগের অধ্যক্ষ, (৩) 'মীর সামান'—কলকারখানা আর মালগুদামের কর্মসচিব,

প্রাদেশিক ও নিম্নপর্যায়ের রাজকর্মচারিগণ

এবং (৪) 'সদ্‌র-উস-সদ্‌র'—ধর্ম ও বিচার বিভাগের অধিকর্তা। ইহা ব্যতীত, নিম্ন পর্যায়ের আরও কিছু কর্মচারী ছিলেন। আকবরের সাম্রাজ্য ১৫টি সুবায় (প্রদেশে) এবং সুবাগুলি সরকারের (জেলা) এবং সরকারগুলি পরগণায় বিভক্ত ছিল। গ্রাম ছিল সকলের নিম্নে। প্রাদেশিক শাসনবিভাগের শীর্ষে ছিলেন



'সুবাদার' বা 'সিপাহ্‌সলার' বা 'নাজিম' এবং 'দেওয়ান'। সুবার আইন শৃংখলা রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন সুবাদার। তাঁহার অধীনে থাকিতেন 'ফৌজদার', 'কোতোয়াল' প্রমুখ কর্মচারিগণ। দেওয়ান ছিলেন রাজস্ববিভাগের কর্তা। সরকার বা জেলায় ছিলেন 'আমালগুজার', পরগণার কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন, শিকদার, আমিন, জোতেদার, কানুনগো, পাটোয়ার প্রমুখ।

বিচারব্যবস্থায় নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা হইত। সম্রাট ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারক। কাজী, মুফতি, মীর আদল প্রমুখ কর্মচারিগণ সম্রাটের নির্দেশে বিচার বিভাগীয় কর্ম পরিচালনা করিতেন। দণ্ডবিধি কঠোর ছিল। সামরিক বিভাগও সংগঠিত ছিল, যদিও আকবর নৌশক্তির গুরুত্ব যথার্থভাবে অনুধাবন করিতে পারেন নাই।

● **মন্‌সবদারী প্রথা** ঃ আকবরের শাসন ব্যবস্থার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল মন্‌সবদারী প্রথার প্রচলন। 'মন্‌সব' কথাটির অর্থ হইল পদমর্যাদা স্থির করা। সামরিক ও বেসামরিক উভয় বিভাগে মন্‌সবদারগণ নিযুক্ত হইতেন। ইহারা জায়গিরের বদলে বেতন পাইতেন। শের শাহ্‌র মত আকবরও জায়গির প্রথার বিরোধী ছিলেন। মন্‌সবদারগণ তেত্রিশটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। মন্‌সবের অধিকারীরা নির্দিষ্টসংখ্যক সৈন্য ও অশ্ব রাখিতেন। সর্বনিম্নের মন্‌সবদারের অধীনে ১০ জন এবং সর্বোচ্চ মন্‌সবদারের অধীনে ৫০০ সৈন্য থাকিত। সাত-হাজারী, আট-হাজারী ও দশ-হাজারী মন্‌সব রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। তবে মান সিং, টোডরমল, প্রমুখের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম করা হইয়াছিল। মন্‌সবদারদের যুদ্ধের সময় সম্রাটকে সৈন্য সরবরাহ করিতে হইত। ইহাদের বেসামরিক কর্তব্যও পালন করিতে হইত। আকবরের আমলে মন্‌সবদারী প্রথা দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইলেও পরবর্তিকালে তাহা দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

মনসবদারী ব্যবস্থা

● **আকবরের রাজস্ব ব্যবস্থা** ঃ মুজফ্‌ফর খান এবং টোডরমলের ন্যায় বিচক্ষণ দেওয়ানদের সাহায্যে আকবর শেরশাহ-প্রবর্তিত রাজস্ব ব্যবস্থাকে আরও সংহত ও উন্নত করিয়াছিলেন। এই রাজস্ব ব্যবস্থায় প্রথমে সমগ্র জমি নির্ভুলভাবে জরিপ করা হয়। জমির জরিপের জন্য 'ইলাহিগজ' নামে মাপের কাঠি ব্যবহার করা হইত। ইহারই ভিত্তিতে বিঘার নীচের পরিমাণ জমিকে 'কাঠা' বলা হইতে লাগিল। জমি ছিল চার রকমের—(১) পোলজ বা যে জমি সর্বসময় কর্ষণযোগ্য ছিল, (২) পরৌটি—যে জমি বৎসরের কিছু সময় অকর্ষিত থাকিত, (৩) চাচর—যে জমি তিন-চার বৎসর পতিত রাখা হইত এবং (৪) বানজার—যে জমি পাঁচ বা তাহার বেশী সময় অকর্ষিত থাকিত। প্রথম তিন প্রকারের জমির উৎপাদন সরেশ, মাঝারি ও নিরেশ—এই তিনভাগে ভাগ করা হইত। প্রতি শ্রেণীর দশ বৎসরের উৎপাদন একত্রে দশ দিয়া ভাগ করিয়া যে গড় হইত তাহাকেই গড় উৎপাদন বলা হইত। গড় উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ রাজকর হিসাবে ধার্য করা হইত। শস্য অথবা নগদ টাকায় কৃষকরা রাজস্ব দিতেন। শস্যের দাম অনুযায়ী নগদ টাকা কত লাগিবে তাহা স্থির হইত। ধার্য করের অধিক আদায় করা চলিত না। প্রয়োজনে কৃষকদের কৃষিঋণ দেওয়া হইত। এই প্রথাকে জাবতি প্রথা বলা হয়। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে টোডরমল এই প্রথা মালব, গুজরাট, মুলতান, রাজপুতনা ও পাটনাতে প্রবর্তন করেন। ইহা ব্যতীত সিন্ধু, কাশ্মীর ও কাবুলে শস্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হইত। এই ব্যবস্থার নাম গাল্লাবক্স। বাংলাদেশে উৎপাদনের মোটামুটি অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া রাজস্ব নির্ধারিত হইত। এই প্রথাকে বলা হয় নস্‌ক্ প্রথা। সুবায় রাজস্ব বিভাগের প্রধান ছিলেন দেওয়ান। সরকারে থাকিতেন আমিন। আমিনকে সাহায্য করিতেন বিতিকচি, পোদ্দার, কানুনগো, মোকাদ্দম, পাধিয়ার প্রভৃতি কর্মচারীবৃন্দ। আকবরের রাজস্ব ব্যবস্থায় আয় বাড়িয়া গিয়াছিল। কৃষকগণও বে-আইনী দাবি-দাওয়া ও নির্যাতন হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। জমির রাজস্বের হার অধিক হইলেও এই ব্যবস্থার ফলে একদিকে যেমন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পায়, অন্যদিকে তেমনি কৃষকগণের জমি হইতে উচ্ছেদ হইবার আশংকাও কমিয়া যায়। আকবরের এই রাজস্বনীতির সাফল্য বর্ণনা করিয়া ডঃ স্মিথ মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'আকবরের রাজস্বনীতি ছিল বাস্তববাদী ও সুচিন্তিত।'

রাজস্ব নির্ধারণ

● **আকবরের শাসনকালের সাংস্কৃতিক বিকাশ ঃ** আকবর ছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির পরম গুণগ্রাহী। তাঁহার আন্তরিক আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় শিক্ষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি বিকশিত হইয়াছিল। 'বহুবিধ দিক হইতে ভারত ভূখণ্ডে নবযুগ প্রবর্তনে তিনি পুরোধা ছিলেন।' আকবর নিরক্ষর মানুষ ছিলেন কিন্তু জ্ঞানার্জনে তাঁহার প্রগাঢ় আগ্রহ সমকালীন ও পরবর্তিকালের ঐতিহাসিকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। রাজধানী ফতেপুর সিক্রীতে বিভিন্ন বিষয় লইয়া জ্ঞানীগুণীদের আলোচনা ও বিতর্কে তিনি নিয়মিত অংশগ্রহণ করিতেন। তাঁহার বিরাট গ্রন্থাগারের তুলনা জগতে বিরল ছিল।

আকবরের জ্ঞানস্পৃহা

আকবরের আমলে সাহিত্যের ব্যাপক বিকাশ ঘটে। তাঁহার সময়ের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিক ছিলেন 'রামচরিত মানসে'র কবি তুলসী দাস। শুধু হিন্দী সাহিত্যে নয়, তুলসীদাস ছিলেন সর্বযুগের এবং সমগ্র সাহিত্যের উজ্জ্বলতম মহাকবিদের অন্যতম। হিন্দী ব্রজভাষার অন্যতম স্মরণীয় কবি সুরদাস আকবরের সমকালেই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ফারসী সাহিত্যের বিকাশের ইতিহাসেও আকবরের শাসনকাল উল্লেখযোগ্য। বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এই সময় রচিত ও অনূদিত হইয়াছিল। তাঁহার সভাকবি ফৈজী ছিলেন ফারসী ভাষার বিশিষ্ট কবি। আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসী ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছিল। ফৈজী অনুবাদ করেন লীলাবতী নামে গণিত-শাস্ত্র বিষয়ক একটি গ্রন্থ। অথর্ববেদ অনুবাদ করেন হাজী ইব্রাহিম। আকবরের আদেশে বদাউনী রামায়ণ ও মহাভারত ফারসী ভাষায় রূপান্তরিত করেন। ফারসী ভাষাতে বাবরের আত্মজীবনী অনুবাদ করেন খান-ই-খানান। আকবরের আমলে ফারসী ভাষায় কয়েকটি মৌলিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, আবুল ফজল লিখিত 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবর নামা' এবং বদাউনীর রচনা 'মন্তাখাবাৎ-ই-আকবরী'। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষারও বিকাশ এই সময়ে ঘটিয়াছিল। আবুল ফজলের বিবরণ হইতে জানা যায়, সম্রাট আকবর ছিলেন সংগীতের অনুরাগী। তাঁহার দরবারে উপস্থিত থাকিতেন ভারতের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ প্রতিভা-বিখ্যাত তানসেন। সমকালীন অন্যান্য সংগীতজ্ঞদের মধ্যে ছিলেন বৈজুবাওরা, তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামী পুরদাস প্রভৃতি। আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুস্থানী সংগীতে উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার অন্যতম সভাসদ খান-ই-খানান একই সঙ্গে গীতিকার ও সুরকার ছিলেন। আকবরের অপর একজন সুরসিক সভাসদ ছিলেন বীরবল। তাঁহার আমলে হিন্দী ও পারসিক রীতির সমন্বয়ে এক নূতন চিত্র-শৈলী গড়িয়া উঠিয়াছিল। শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আবদুস সামাদ, জগন্নাথ প্রমূখ গুণীজন।

তুলসীদাস ও সুরদাস

অনুবাদ সাহিত্য

সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা, তানসেন

বীরবল

● **আকবরের ধর্মমত—দীন-ইলাহি ঃ** ভারতবর্ষের মুসলমান নৃপতিবর্গের মধ্যে আকবর সর্বাপেক্ষা উদার ধর্মনীতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন। বিভিন্ন পরিবেশে ও প্রভাবে তাঁহার এই উদারতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার পিতৃকুল ও মাতৃকুল ধর্মের দিক হইতে গোঁড়া বা পরধর্মবিদ্বেষী ছিলেন না। উত্তরাধিকারী সূত্রে আকবরও এই গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত, পারস্য হইতে আগত সুফী পণ্ডিতগণের, গৃহশিক্ষক আবদুল লতিফ এবং বিখ্যাত জ্ঞানী শেখ মুবারক ও তাঁহার পুত্রদ্বয় ফৈজী ও আবুল ফজলের সংস্পর্শে ও প্রভাবে ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার উদার মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল। আকবরের ধর্মসহিষ্ণুতার পশ্চাতে রাজনৈতিক বিবেচনাবোধ ও রাজপুত মহিষীদেরও গভীর প্রভাব রহিয়াছে। সমকালীন হিন্দু ধর্মাচার্যদের ধর্মসংস্কার আন্দোলন তাঁহার ধর্ম মতবাদ গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল। মানসিক দিক হইতেও তিনি গভীর ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। ধর্মের স্বরূপ জানিবার জন্য গভীর অনুসন্ধিৎসু আকবর তাই রাজধানী ফতেপুর সিক্রীর 'ইবাদৎ খানায়' হিন্দু, মুসলমান, জৈন, পার্সী, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের আলোচনা শুনিতেন। এই আলোচনার মাধ্যমে তিনি উপলব্ধি

ধর্মীয় উদারতার পশ্চাতে বিভিন্ন প্রভাব

করিলেন সকল ধর্মের সারবস্তু এক এবং অভিন্ন। নূতন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আকবর 'দীন-ইলাহি' নামে এক নূতন ধর্মমতের প্রবর্তন করেন। সকল ধর্মের মূল আদর্শের সমন্বয়ে উহা গঠিত ছিল। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ইহাকে ভারতের জাতীয় ধর্মে পরিণত করা। কিন্তু গভীর দার্শনিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ 'দীন-ইলাহি' জনপ্রিয় হইয়া উঠে নাই। যাহা হউক, আকবরের ধর্মমতে কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাব প্রকাশ পায় নাই। তাঁহার ধর্মনীতির মূল কথা ছিল 'সুল্‌হে কুল' বা পরধর্মসহিষ্ণুতা।

দীন ইলাহি

গোঁড়া মোল্লাতন্ত্রের সমর্থক বদাউনী, উগ্র ক্যাথলিক খ্রীষ্টান জেসুইট পাদ্রীগণের অভিযোগের উপর ভিত্তি করিয়া ডঃ স্মিথ আকবরের ধর্মমতকে ইসলাম বিরোধী আখ্যা দিয়াছেন। তিনি এই ধর্মচেতনার নির্মম সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, আকবরের ধর্মমত 'মূর্খতার উচ্চস্তম্ভ ও অহংকারের হাস্যকর দৃষ্টান্ত।' কিন্তু গবেষণালব্ধ তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া বলা যায়, আকবর কখনও স্বধর্মচ্যুত হন নাই। তবে ইসলামীয় গোঁড়া অনুশাসনগুলি যাহা যুগোচিত বা বাস্তব প্রয়োজনীয় নয় বলিয়া তিনি মনে করিতেন তাহা তিনি বর্জন করিতেন। এই ব্যাপারে ধর্মান্ধ উলেমাদের প্রভাব খর্ব করিবার জন্য তিনি সম্রাটের 'অভ্রান্তি ঘোষণা' করেন ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। ইহাতে বলা হয়, কোরাণ বা শরিফের ব্যাখ্যা লইয়া মতবিরোধ সৃষ্টি হইলে সম্রাটের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে। পরিস্থিতির প্রয়োজনেই এইরূপ আইন প্রণয়ন করা হইয়াছিল। যাহা হউক, দীন-ইলাহি প্রচারের আসল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলমানদের ধর্মগত সমন্বয় সাধন। মধ্যযুগের সংকীর্ণতা ও ধর্মান্ধতার পরিমণ্ডলে এই মহৎ আদর্শের যথার্থ তাৎপর্য অনুধাবন করা গোঁড়া ও রক্ষণশীল-মানুষদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। ফলে আকবরের এই মহৎ প্রচেষ্টা বিশেষ সফল হইতে পারিল না।

● **আকবরের দরবার ঃ** শৈশবে পিতৃহীন হইয়া আকবর প্রথম জীবনে বৈরাম খানের অভিভাবকত্বে ছিলেন। বৈরাম খান ছিলেন তাঁহার অভিভাবক, ভকিল ও খান-ই- খানান। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে আকবর তাঁহাকে ক্ষমতা হইতে সরাইয়া দেন। ইহার পরবর্তী চার বৎসর তাঁহার তথাকথিত অন্তঃপুরিকার শাসনে ধাত্রীমাতা মহম আনাঘার পুত্র আদম খাঁ বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার ক্ষমতাবৃদ্ধি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা দমন করিয়া আকবর তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। অতঃপর আকবর ভকিল পদটি রাখিয়া দিলেও নিজেই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। স্বৈরাচারী হইলেও আকবর দরবারের বিশিষ্ট সভাসদ ও রাজকর্মচারীদের মূল্যবান উপদেশ গ্রহণ করিতেন। ভকিলের পরেই ছিলেন উজীর বা দেওয়ান। আকবরের দেওয়ানদের মধ্যে ছিলেন মজাফ্‌ফর খাঁ, টোডর মল, শাহমনসুর প্রমুখ প্রশাসকগণ। তাঁহার দরবারে যে সমস্ত বিশিষ্ট মনসঁবদার ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, ভগবান দাস, মানসিংহ প্রভৃতি নায়কগণ।

আকবর সংস্কৃতির পরম অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার রাজসভায় উপস্থিত থাকিতেন, সঙ্গীতজ্ঞ তানসেন, ঐতিহাসিক আবুল ফজল, বদাউনি, কবি ফৈজী, সুরসিক বীরবল প্রভৃতি সমকালীন মনীষিগণ। ইহা ছাড়া ছিল, বিভিন্ন পর্যায়ের রাজকর্মচারিগণ। অভিজাত কর্মচারীরা তিন ভাগে বিভক্ত ছিল—ইরানী, তুরানী ও হিন্দুস্থানী। অসাধারণ দক্ষতার সহিত দরবারকে সংযত কিন্তু কার্যকরী করিয়া আকবর রাজকার্য পরিচালনা করিতেন।

● **আকবর আমলের স্থাপত্য ঃ** স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে আকবর সমন্বয়বাদী নীতি গ্রহণ করেন। দিল্লীর হুমায়ুনের সমাধি তাঁহার সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য সৌধ। এই ক্ষেত্রে অবশ্য পারসিক শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য অধিকভাবে পরিলক্ষিত হয়। আকবরের রাজধানী ফতেপুর সিক্রীর সৌধ নির্মাণে ইন্দো-পারসিক রীতি অনুসৃত হইয়াছিল। বীরবলের গৃহ, অম্বরের রাজা মানসিংহের গৃহ, যোধাবাঈ-এর মহল, ইত্যাদি ফতেপুর সিক্রীর সৌধাবলীতে হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের সমন্বয় ঘটিয়াছে। আগ্রার দুর্গের জাহাঙ্গীর মহলেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। আকবরের স্থাপত্য শিল্পের একটি বিস্ময়কর কীর্তি বুলান্দ দরওয়াজা। ১৭৬ ফুট উচ্চ এই দরওয়াজা ভারতের সর্বোচ্চ দরওয়াজা। ফতেপুর সিক্রীতে

আকবর তাঁহার শ্রদ্ধেয় সন্ত সেলিম চিস্তির সমাধি মার্বেল পাথরে বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। ডঃ স্মিথ ফতেপুর সিক্রীর শিল্প সৌন্দর্য বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, ইহা ছিল 'প্রস্তরে তৈয়ারী কল্পনা ও স্বপ্ন'। আকবর মৃত্যুর পূর্বে সেকেন্দ্রাতে তাঁহার সমাধি নির্মাণ শুরু করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইহার নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয়।

● জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দ) ●

১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র যুবরাজ সেলিম 'জাহাঙ্গীর' নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল পুত্র খসরুর বিদ্রোহ। কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া জাহাঙ্গীর বিদ্রোহ দমন করেন।

পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জাহাঙ্গীর মোগল সাম্রাজ্যের আরও বিস্তৃতি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের প্রথম উল্লেখযোগ্য সামরিক সাফল্য ঘটিয়াছিল মেবারের বিরুদ্ধে। রাণা অমর সিংহ মোগল আক্রমণ প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিয়াও সফল হইলেন না। শাহী ফৌজের অধিনায়ক শাহজাহানের নিকট তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন। অতঃপর জাহাঙ্গীর বাংলাদেশের আফগানদের দমন করেন এবং কাংড়া বা নগরকোটের দুর্গও আপন অধিকারে লইয়া আসেন। কিন্তু দক্ষিণভারতে তিনি সামরিক অভিযান প্রেরণ করিয়াও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই। একমাত্র আহম্মদনগরের মন্ত্রী মালিক অম্বরের মোগল-বিরোধী কার্যকলাপ ও পরিকল্পনা ব্যাহত করিয়া ঐ অঞ্চলে দিল্লীর প্রাধান্য অটুট রাখিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে পারস্যের সম্রাট শাহ্ আব্বাস অতর্কিত আক্রমণের মাধ্যমে কান্দাহার দখল করিয়া ফেলিয়াছিলেন (১৬২২ খ্রীঃ)। জাহাঙ্গীর পুত্র শাহজাহানকে কান্দাহার পুনরুদ্ধার করিবার আদেশ দিলে, তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য, জাহাঙ্গীরের দরবারে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিলেন তাঁহার পত্নী নূরজাহান। অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই নারী রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন। তাঁহার পূর্ব নাম ছিল মেহেরউন্নিসা এবং তাঁহার স্বামী শের আফগান ছিলেন বাংলাদেশের এক জায়গিরদার। বিদ্রোহের অপরাধে সম্রাট তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং তাঁহার বিধবা পত্নীকে বিবাহ করেন। পরবর্তিকালে তাঁহার নূতন নামকরণ হয় নূরজাহান এবং জাহাঙ্গীরের আড়ালে তিনিই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারিণী হইয়া পড়িয়াছিলেন।



জাহাঙ্গীর

জাহাঙ্গীরের শেষ জীবনে সিংহাসন লইয়া অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা হইয়াছিল। পুত্র শাহজাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন। ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু ঘটিলে শাহজাহান ও শাহারিয়ারের মধ্যে সিংহাসন লইয়া দ্বন্দ্ব আরও তীব্র হইয়া উঠে।

পিতার মত জাহাঙ্গীরও ছিলেন সংস্কৃতির অনুরাগী। ফার্সী সাহিত্যে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। তুর্কী ভাষায় তিনি অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। তাঁহার আত্মচরিত শুধু ইতিহাসেই নয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও মূল্যবান সংযোজন। জাহাঙ্গীর ছিলেন খাঁটি চিত্র-রসিক। তিনি সমরখন্দ হইতে বিখ্যাত চিত্রকর মনসুরকে ভারতে লইয়া আসিয়াছিলেন। হিন্দু চিত্রকরদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বিষণ

দাস, গোবর্ধন প্রভৃতি। জাহাঙ্গীরের চিত্রশৈলীর বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাকৃতিক ও নৈসর্গ দৃশ্যাবলীর চিত্র। এই সময়কার চিত্রশিল্পে পারসিক প্রভাব লোপ পায়। চিত্রকলায় খাঁটি ভারতীয় চরিত্র বিকাশ লাভ করে। জাহাঙ্গীর সংগীত ও নৃত্যকলারও সমজদার ছিলেন।

ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্প

উদ্যানের প্রতিও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ও আকর্ষণ ছিল। বিভিন্ন স্থানে তিনি বহু উদ্যান নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল লাহোর এবং শ্রীনগরের শালিমার বাগ। স্থাপত্যের দিকে কিন্তু জাহাঙ্গীরের তেমন আগ্রহ ছিল না। এমন কি, পিতার আরম্ভ করা সেকেন্দ্রার স্মৃতিসৌধ নির্মাণের সমাপ্তির জন্য তিনি কোন উৎসাহ বোধ করেন নাই। নূরজাহানের নির্দেশেই তাহা শেষ হইয়াছিল। সম্রাজ্ঞী নূরজাহানও কলা-রসিক মহিলা ছিলেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিল্প-কীর্তি হইল পিতা ইতিমদ্‌উদ্‌দৌলার শ্বেত প্রস্তরের তৈয়ারী সমাধি-সৌধ।

● **ইউরোপীয় বণিকদের সহিত জাহাঙ্গীরের সম্পর্ক ঃ** ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো ডা গামার কালিকট বন্দরে আসিবার পর হইতে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ প্রভৃতি জাতি ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিতে থাকেন। ভারতবর্ষের শাসকগণ বিদেশী বণিকদের প্রতি সাধারণভাবে বন্ধুজনোচিত ব্যবহার করিতেন। জাহাঙ্গীরও পর্তুগীজদের সহিত সৌহার্দ্যের সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলিতেন। তিনি তাঁহাদের শুধু যে গীর্জা নির্মাণ করিবার অধিকারই প্রদান করিয়াছিলেন তাহা নয়, তিনি উপাসনা-গৃহ নির্মাণের জন্য তাহাদের অর্থসাহায্যও করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ জলদস্যুরা বহু লক্ষ টাকার পণ্যবাহী জাহাজগুলি লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলে জাহাঙ্গীর তাহাদের প্রদত্ত সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার করিয়া লইলেন এবং আগ্রা ও লাহোরের পর্তুগীজ গীর্জার উপাসনা বন্ধ করিয়া দিলেন। পর্তুগীজগণ ক্ষমা প্রার্থনা করিলে পূর্বেকার সম্পর্ক ফিরিয়া আসে।

পর্তুগীজদের সহিত সম্পর্ক

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেই ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে আসে। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সম্রাট প্রথম জেমসের সুপারিশ পত্র লইয়া ক্যাপ্টেন হকিন্স নামে এক ব্যক্তি মোগল সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হন। জাহাঙ্গীর তাঁহার বাণিজ্যের আবেদন মঞ্জুর করিয়া দেন। কিন্তু পর্তুগীজদের বিরোধিতায় ইংরেজ বণিকগণ তাহাদের প্রদত্ত সুযোগ হইতে বঞ্চিত হন। অতঃপর ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট প্রথম জেমসের রাষ্ট্রদূত হিসাবে স্যার টমাস রো নামে এক বিদ্বান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি জাহাঙ্গীরের রাজসভায় উপস্থিত হন। তিনি তাঁহার সহজাত বুদ্ধি, মার্জিত রুচি ও কূটনীতির সাহায্যে সম্রাটের নিকট হইতে ইংরেজ বণিকদের জন্য বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা আদায় করিয়া লইতে সমর্থ হন। পর্তুগীজদের বিরোধিতা সত্ত্বেও সুরাটে ইংরাজ বাণিজ্য কুঠি প্রতিষ্ঠিত হইল। ভারতবর্ষে পরবর্তী যুগের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে স্যার টমাস রোর এই দৌত্য-সাফল্য এক যুগান্তকারী ঘটনা।

মোগল ইতিহাসে জাহাঙ্গীর এক নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তিনি দানে-ধ্যানে উদার ও বিচার ব্যবস্থায় নিরপেক্ষ ছিলেন। তিনি সাহিত্যানুরাগী ও সৌন্দর্য প্রেমিকও ছিলেন। তবে অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় পরায়ণতার জন্য তাঁহার যাবতীয় সদ্‌গুণ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

● শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ) ●

সিংহাসনলাভ ও বিদ্রোহ দমন

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তাঁহার তৃতীয় পুত্র খুররম্ 'শাহজাহান' উপাধি ধারণ করিয়া শ্বশুর আসফ খাঁর (নূরজাহানের ভ্রাতা) সাহায্যে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। রাজত্বের প্রথম দিকে শাহজাহানকে বুন্দেলখণ্ড ও দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। উভয়ক্ষেত্রেই মোগল বাহিনী বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অল্পদিন বাদে

পর্তুগীজগণ দস্যুবৃত্তি ও বাণিজ্যাধিকারের অপপ্রয়োগ করিতে থাকিলে সম্রাট শাহজাহানের নির্দেশে বাংলার শাসনকর্তা হুগলী অধিকার করিয়া লন।

সম্রাট শাহজাহানও চিরাচরিত রীতি অনুসারে দাক্ষিণাত্যে সামরিক অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। অবশ্য সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সিয়া সম্প্রদায়ের ধ্বংসসাধন করাও ছিল তাঁহার দাক্ষিণাত্য নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। দক্ষিণ ভারতে তাঁহার প্রথম সাফল্য ঘটে আহম্মদনগরের বিরুদ্ধে। বিশ্বাসঘাতক ফতে খাঁর (মালিক অম্বর-পুত্র) সাহায্যে ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শাহজাহান আহম্মদনগর দখল করেন। অতঃপর তিনি গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। রাজ্য দুইটির সুলতান প্রথমে অসম্মত হইলেও শেষ পর্যন্ত মোগল সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। সম্রাটের তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব দক্ষিণ ভারতের সুবাদার পদে নিযুক্ত হইলেন।

দাক্ষিণাত্য নীতি

শাহজাহান পারস্য সম্রাটের হাত হইতে কান্দাহার পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সাফল্য ক্ষণস্থায়ী ছিল। পরবর্তিকালে তিনি কান্দাহার জয়ের আবার চেষ্টা করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কান্দাহার মোগল হস্তচ্যুত হইয়া গেলে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত উন্মুক্ত হইয়া গেল এবং ইহার ফলে মোগল স্যাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইল। শাহজাহান মধ্য এশিয়ায় তাঁহার পিতৃপুরুষের রাজ্য বলখ ও বাদকশান অঞ্চল দুইটিও অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানকার উজবেগী উপজাতিদের প্রতিরোধে উহা বেশী দিন দখলে রাখা সম্ভব হইল না। এই অসাফল্যের দরুন শাহজাহানের অর্থ (প্রায় ৪ কোটি টাকা), মর্যাদা ও সেনাবাহিনী নষ্ট হইয়া যায়।

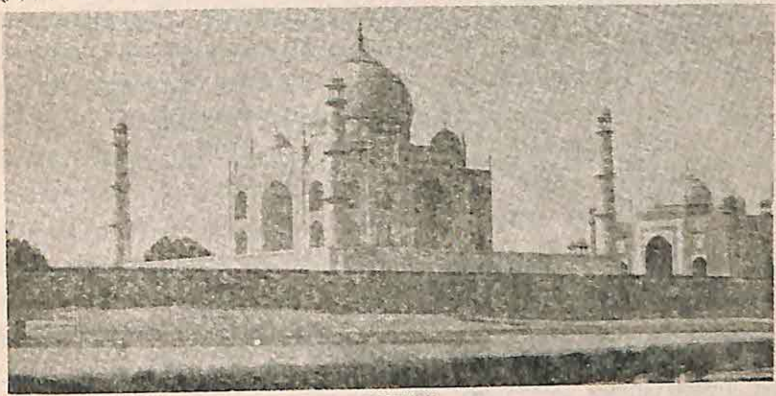

শাহজাহান

১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর সম্রাট শাহজাহান অসুস্থ হইয়া পড়িলে, যুবরাজ দারা পিতার উত্তরাধিকারী মনোনীত হইলেন। কিন্তু শাহজাহানের পুত্রগণ সকলেই ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও সিংহাসন প্রত্যাশী। ফলে সিংহাসন লইয়া ভ্রাতৃবিরোধের সৃষ্টি হইল। সম্রাটের পুত্রগণের মধ্যে বাস্তব জ্ঞান, ব্যবহারিক বুদ্ধি ও কূটনৈতিক জ্ঞানের দিক হইতে আওরঙ্গজেব ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি কৌশলে মুরাদকে স্বীয় পক্ষে আনিয়া দারাকে পরাজিত করিয়া আগ্রায় আসিলেন এবং সিংহাসন দখল করিলেন। পিতা শাহজাহানকেও আমৃত্যু আগ্রা দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিলেন। মুরাদকেও প্রথমে বন্দী ও পরে হত্যা করা হইল। দারা ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। পারস্য যাইবার পথে দারা আওরঙ্গজেবের হস্তে বন্দী হইলেন এবং কিছুকাল পরে ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল। সুজা আরাকানে পলাইয়া গেলেন। অন্যদিকে, ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বৃদ্ধ সম্রাটের মৃত্যু হইলে আওরঙ্গজেব নিষ্কণ্টক হইলেন।

● **শাহজাহানের শাসনকালের শিল্পকলা ঃ** শাহজাহান ছিলেন শিল্পকলার পরম পৃষ্ঠপোষক। তাঁহার স্থাপত্য শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হইল আগ্রার তাজমহল। পত্নী মমতাজ বেগমের স্মরণে নির্মিত এই সমাধি-সৌধ পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম বলিয়া স্বীকৃত। আগ্রায় তাঁহার আরো একটি স্থাপত্য সৌন্দর্যের নিদর্শন হইল আগ্রা দুর্গের মধ্যকার মোতি মসজিদ। রাজধানী দিল্লী নানা সৌধ দ্বারা নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। দিল্লীর নূতন নাম হইল শাহজাহানাবাদ। দিল্লীর বিখ্যাত জুমা মসজিদ, লালকেল্লা,

তাজমহল, লালকেল্লা, ময়ূরসিংহাসন কাহিনূর মণি

দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস ইত্যাদি স্থাপত্য শিল্পের অনুপম নিদর্শন। লাহোর, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানেও তিনি অগণিত সুরম্য প্রাসাদ ও উদ্যান নির্মাণ করিয়াছিলেন। শাহজাহান দরবারের আড়ম্বর ছিল পৃথিবী বিখ্যাত। শাহজাহানের শিল্প ও আড়ম্বরপ্রিয়তার অপর একটি নিদর্শন হইল বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন। নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করিয়া সিংহাসনটি লইয়া গিয়াছিলেন।



তাজমহল

শাহজাহান চিত্রশিল্পেরও সমাদর করিতেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু ও ইউরোপীয় চিত্র-শিল্পরীতির সমন্বয়ে এক নূতন চিত্রশিল্পধারা প্রবর্তিত হয়। এই সময়ের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী ছিলেন নাসির সমরখান্দ।

আড়ম্বর প্রিয় শাহজাহানের উষ্ণীষে শোভা পাইত জগদ্বিখ্যাত কোহিনূর মণি। নাদির শাহ রত্নটিকে লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান। পরে ইহা মহারাজ রণজিৎ সিংহের হাতে আসে। পাঞ্জাব বিজয়ের পর কোহিনূর মণি ইংরেজদের হাতে চলিয়া যায়।

● **শাহজাহানের রাজত্বকালে মোগল-পর্তুগীজ বিরোধ ঃ** জাহাঙ্গীরের শাসনকালেই পর্তুগীজরা বাংলার সপ্তগ্রাম অঞ্চলে বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। অতঃপর তাহারা হুগলীতে কুঠি নির্মাণ করেন। পর্তুগীজরা কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে বাণিজ্য করিত না। তাহারা নানাভাবে স্থানীয় মানুষদের উৎপীড়ন করিত। তাহাদের ব্যবসার সহিত যুক্ত ছিল জলদস্যুতা। ভারতীয়দের অতর্কিত আক্রমণের মাধ্যমে বন্দী করিয়া ক্রীতদাস হিসাবে চালান দেওয়া হইত। অন্যদিকে তাহারা বে-আইনীভাবে বলপূর্বক ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে শুল্ক আদায় করিত। ইহার সঙ্গে যুক্ত হইল গুজরাট অঞ্চলে জেসুইস্ট পাদ্রীদের নেতৃত্বে বলপূর্বক খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণ। এইসব নানাবিধ কারণে শাহজাহান পর্তুগীজদের উপর দারুণভাবে বিরক্ত হইয়াছিলেন। অবস্থা চরমে উঠিল যখন পর্তুগীজরা বেগম মমতাজের দুইজন ক্রীতদাসীকে আটক করে। শাহজাহানের আদেশে বাংলার শাসনকর্তা কাশিম খাঁ ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজদের নিকট হইতে হুগলী অধিকার করেন। যুদ্ধে বহু পর্তুগীজ নিহত হন। অনেককে বন্দী করিয়া আগ্রায় পাঠান হইল। অবশেষে পর্তুগীজগণ ক্ষমা প্রার্থনা করিলে এবং অশোভনতা বন্ধ করিবার প্রতিশ্রুতি দিলে সম্রাট তাহাদের হুগলীতে বসবাসের অনুমতি দেন।

পর্তুগীজদের প্রতি শাহজাহানের বিরূপতা

● **কৃতিত্ব ঃ** কোন কোন ঐতিহাসিক শাহজাহানের রাজত্বকালকে মোগল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ না হইলেও তাঁহার রাজত্বকালে একদিকে যেমন সাম্রাজ্যসীমা বিস্তৃত হইয়াছিল, অন্যদিকে ইউরোপের সহিত বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় সাম্রাজ্যের

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও ঘটিয়াছিল। কোন অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বা বৈদেশিক আক্রমণ সাম্রাজ্যের সংহতি বা নিরাপত্তাকে বিপজ্জনক ভাবে বিঘ্নিত করিতে পারে নাই। আবার শিল্প-সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে শাহজাহানের রাজত্বকাল বিশ্ব ইতিহাসের স্মরণীয় অধ্যায়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সাফল্যের সামগ্রিকতার বিচারে শাহজাহানের রাজত্বকাল নিঃসন্দেহে মোগল ইতিহাসের সুবর্ণ যুগ। কিন্তু ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের আড়ালে ধ্বংসের বীজও নিহিত ছিল। শাহজাহান বারবার চেষ্টা করিয়াও কান্দাহার পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই। কান্দাহার মোগলদের হস্তচ্যুত হইবার ফলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। ফলে, অতীতের মত পরবর্তিকালেও এই পথ ধরিয়াই ভারতে বিদেশী আক্রমণ ঘটে। নাদির শাহ ও আহম্মদ শাহ আবদালীর আক্রমণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক হইতে শক্তি হ্রাস করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের পতন তরান্বিত করে। নিছক ধর্মবিদ্বেষের তাড়নায় তিনি দাক্ষিণাত্যে শিয়া রাজ্য—গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর আক্রমণ করিয়া রাজনৈতিক অবিবেচনার পরিচয় দিয়াছিলেন। এই রাজ্য দুইটি শক্তিহীন হইয়া পড়ায় দক্ষিণ ভারতে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাদের উত্থান সহজতর হইয়া পড়িয়াছিল। তৃতীয়তঃ, আকবরের অনুসৃত ধর্মসহিষ্ণুতার নীতি বিসর্জন দিয়া শাহজাহান মোগল সাম্রাজ্যের গণভিত্তির উপর আঘাত করিয়াছিলেন। চতুর্থতঃ, তাঁহার আড়ম্বরপ্রিয়তা রাজকোষকে প্রায় নিঃস্ব করিয়া দিয়াছিল। সর্বশেষে বলা যায়, তাঁহারই দুর্বলতার ফলে সিংহাসন লইয়া ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের অবতারণা হয় যাহা শেষ পর্যন্ত মোগল শাসনের প্রাণশক্তি বিনষ্ট করিয়া দেয়। সুতরাং মোগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্যও শাহজাহান পরোক্ষভাবে দায়ী।

মোগল ইতিহাসের সুবর্ণযুগ

পতনের জন্য পরোক্ষ দায়িত্ব

● আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ) ●

শাহজাহান যখন কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা আগ্রায় পিতার নিকটে ছিলেন। অপর তিন পুত্র—সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ যথাক্রমে বাংলা, দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটের শাসনদায়িত্বে থাকায় রাজধানী হইতে দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। সম্রাট প্রিয় পুত্র দারাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলে সিংহাসন লইয়া দ্বন্দ্ব শুরু হইল। গুজরাটে মুরাদ ও বাংলাদেশে সুজা নিজেদের স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কূটকৌশলী আওরঙ্গজেব প্রথমে নীরব থাকিলেন। "শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে দারা ছিলেন 'বৈষয়িক বুদ্ধিতে অপরিপক্ব', সুজা অতিরিক্ত বিলাসী ও অলস এবং মুরাদ অসংযমী। সাম্রাজ্য পরিচালনার মত যোগ্যতা ইহাদের কাহারও ছিল না। আর ভ্রাতাদের মধ্যে যিনি তৃতীয় সেই আওরঙ্গজেবই ছিলেন সবচেয়ে নিপুণ, সবচেয়ে দূরদর্শী, উদ্দেশ্য সাধনে সবচেয়ে একাগ্র, কূটনীতিতে সবচেয়ে কৌশলী, যুদ্ধবিদ্যায় সবচেয়ে পারদর্শী"। আওরঙ্গজেব কৌশলে নিজেকে প্রস্তুত করিলেন। তিনি জানিতেন রাজপুত ও উদারপন্থী মুসলিম অভিজাতগণ দারার পক্ষ অবলম্বন করিবেন। তাই তিনি ধর্মকে ব্যবহার করিয়া গোঁড়া সুন্নীদের আপনার সমর্থক করিলেন। অতঃপর মুরাদের সহিত চুক্তি করিয়া অপর দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। পরপর দুইটি যুদ্ধে দারাকে পরাজিত করিয়া আওরঙ্গজেব আগ্রায় প্রবেশ করিলেন। অতঃপর অসুস্থ, বৃদ্ধ পিতাকে আগ্রা দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিলেন। মুরাদ আওরঙ্গজেবের অভিসন্ধি ধরিয়া ফেলিয়া আপন মৃত্যু ত্বরান্বিত করিলেন। আওরঙ্গজেব তাঁহাকে হত্যা করিয়া দিল্লীতে নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন (১৬৫৮ খ্রীঃ)। আওরঙ্গজেব এইবার সুজার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। সুজা পরাজিত হইয়া শেষ পর্যন্ত আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আপন পুত্র মহম্মদ সুজার পক্ষ অবলম্বন করায় তাঁহাকেও কারারুদ্ধ করা হয়। বন্দী অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে। দারার পুত্র

সিংহাসন লইয়া দ্বন্দ্ব

আওরঙ্গজেবের ক্ষমতা লোলুপতা

সুলেমানকেও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইল। সর্বশেষে, পরাজিত দারাকে দিল্লীতে আনিয়া ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইল। এইভাবে আওরঙ্গজেব আপনার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিলেন।

নিষ্ঠুরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে দিল্লীর সিংহাসন দখল করিলেও, স্বীকার করিতে হইবে যে, আওরঙ্গজেব সম্রাটোচিত বাস্তব রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক গুণের যথার্থ অধিকারী ছিলেন। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁহার রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হইবার পর তিনি 'আলমগীর' উপাধি গ্রহণ করিয়া অর্থ পুরস্কার ও কর মকুবের মাধ্যমে অভিজাতগণের ও সাধারণ মানুষের সমর্থন সংগ্রহ করেন।

তাঁহার রাজত্বকাল প্রায় সমান সমান ভাবে দুইভাগে বিভক্ত—প্রথম ভাগ (১৬৫৮-১৬৮১ খ্রীঃ) অতিবাহিত হয় উত্তরভারতে, দ্বিতীয়ভাগ (১৬৮১-১৭০৭ খ্রীঃ) দাক্ষিণাত্যে। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে একদিকে যেমন সাম্রাজ্যের চরমতম বিস্তৃতি সাধিত হইয়াছিল, অপরদিকে তেমনি তাঁহার অনুসৃত নীতিসমূহের ফলে সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। এই সময় হইতেই মোগল সাম্রাজ্যের পতনের আভাস পাওয়া গিয়াছিল।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত নীতি

উত্তর ভারতে আওরঙ্গজেবের প্রথম অভিযান চালিত হয় উত্তর-পূর্ব সীমান্তস্থিত কোচবিহার ও আসামের হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধে। তাঁহার আদেশে বাংলার শাসনকর্তা মীরজুমলা কোচবিহার দখল করেন। অন্যদিকে, আহোম রাজাও মোগল সম্রাটকে বাৎসরিক করদানে বাধ্য করিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই মীরজুমলার মৃত্যু হইলে উপরিউক্ত অঞ্চলগুলি মোগলদের হস্তচ্যুত হইয়া গেল। অতঃপর আওরঙ্গজেবের মাতুল শায়েস্তা খাঁ বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং আরাকান রাজের নিকট হইতে চট্টগ্রাম ও পর্তুগীজদের কাছ হইতে সন্দীপ অধিকার করেন।

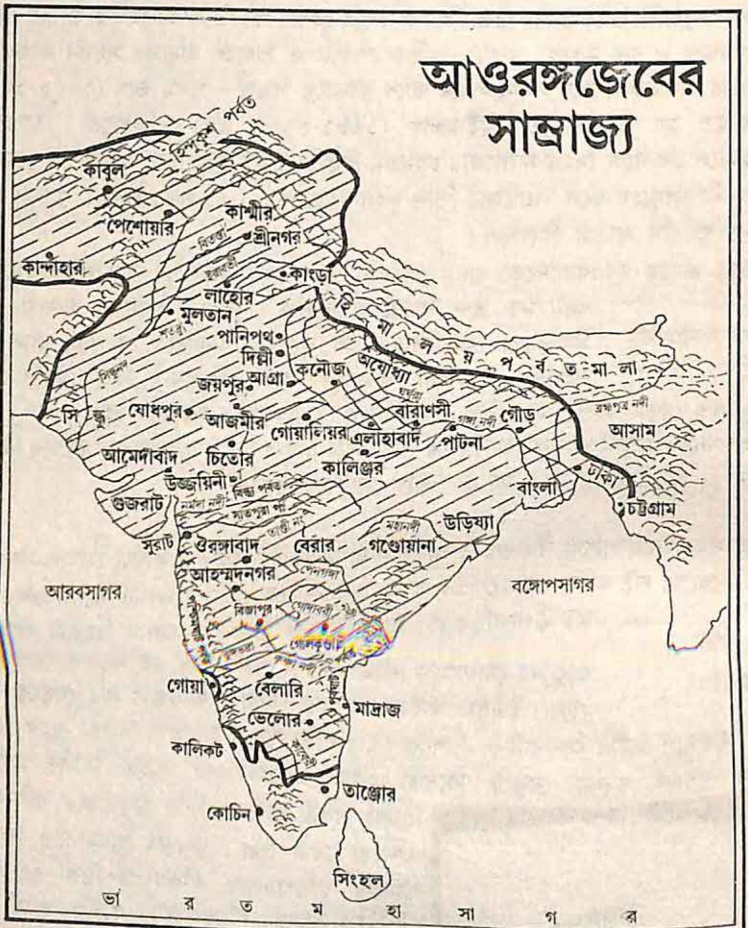
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত নীতি

এই সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী আফগান উপজাতিগুলি বিদ্রোহ করিয়া মোগল সম্রাটের পক্ষে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করিল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে অঞ্চলটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই উপজাতিগুলির মধ্যে 'ইউসুফ জাইরা' সর্বপ্রথম বিদ্রোহী হইয়া দিল্লী ও কাবুলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। কিন্তু এই বিদ্রোহ শীঘ্রই দমন করা হইল। ইউসুফ জাইরা পরাজিত হইলেও, আফজল খাঁর নেতৃত্বে 'আফ্রিদি' গণের আক্রমণে দিল্লীর সৈন্যবাহিনী বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইতিমধ্যে 'খতক' নামক উপজাতীয় দলটিও ঘুশহল খানের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হইয়া আফ্রিদিগণের সহিত মিলিত হইল এবং বিদ্রোহ একটি স্বাধীন জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইবার আশংকা দেখা দিল। অবস্থার অবনতিতে সম্রাট স্বয়ং সসৈন্যে পেশোয়ারের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কূটনীতির সাহায্যে বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু এই বিদ্রোহের ফলে আওরঙ্গজেবের গভীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষতি হইয়াছিল। প্রথমতঃ, যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, সীমান্ত বিদ্রোহমুক্ত করিয়া রাখিবার জন্য সেখানে মোগল সৈন্যবাহিনীর এক বিরাট অংশকে মোতায়েন করা হয়। ফলে, দক্ষিণ ভারতে সৈন্য ঘাটতি দেখা দেয় এবং শিবাজী ইহার সুযোগ গ্রহণ করেন। তৃতীয়তঃ, দুর্ধর্ষ আফগান উপজাতিদের তাঁহার মোগল সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা সম্ভব হওয়ায়, মারাঠা ও রাজপুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের সামরিক শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল।



আওরঙ্গজেব

আওরঙ্গজেবের অনুদার ধর্মনীতির ফলে রাজপুতগণও মোগলদের বিরোধী শক্তিতে পরিণত হইয়াছিলেন। তাঁহারই চক্রান্তে অম্বরের রাজা জয়সিংহ ও মাড়বার রাজা যশোবন্ত সিংহ নিহত হন। অতঃপর তিনি যশোবন্তের শিশুপুত্র অজিত সিংহকে মাতাসহ দিল্লীর প্রাসাদে বন্দী করিয়া রাখিয়া



মাড়বার দখল করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে রাঠোর নায়ক দুর্গাদাস অসামান্য রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়া অজিত সিংহ ও তাঁহার মাতাকে মুক্ত করিয়া যোধপুরে লইয়া গেলেন। মেবারের রাণা রাজসিংহও জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তনের জন্য মোগল সম্রাটের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ফলে, বিভিন্ন রাজপুত নেতাগণ সম্মিলিত হইয়া প্রবল মোগল-বিরোধী জাতীয় সংগ্রামের সূচনা করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজসিংহ পরাজিত হইলেন এবং চিতোর ও উদয়পুর মোগল রাজ্যভুক্ত হইল। তাহা সত্ত্বেও

রাজপুত নীতি ও রাজপুত দ্বন্দ্ব

রাজপুতগণ সংগ্রাম চালাইয়া গেলেন। শেষপর্যন্ত, ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে মেবারের রাজসিংহ-পুত্র জয় সিংহের সহিত এবং আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে মাড়বারের সহিত মোগলদের সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আওরঙ্গজেবের রাজপুত নীতি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইয়াছিল। রাজপুতদের সহিত যুদ্ধে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়, সেনাবাহিনীর

এক বিপুল অংশও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন। এই অর্থক্ষয় ও লোকক্ষয় সাম্রাজ্যের ভিত্তি ও শক্তিকে দুর্বল করিয়া দিয়াছিল। যে রাজপুতদের বিশ্বস্ততা, ত্যাগ ও শ্রমে মোগল সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে ও দাক্ষিণাত্যে সেই মোগল শক্তির চরমতম বিপদের দিনে, মোগলগণ রাজপুতদের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইলেন। ইহার পরিপূর্ণ সুযোগ মারাঠা নায়ক শিবাজী গ্রহণ করিলেন।

● **আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি ঃ** বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার শিয়া সুলতানদের ধ্বংসসাধন ও উদীয়মান মারাঠী শক্তিকে দমন করাই ছিল আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির মূল উদ্দেশ্য। ইতিপূর্বে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা থাকিবার সময় তিনি সুলতানী রাজ্য দুইটি জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু পিতা শাহজাহানের হস্তক্ষেপে তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই। সম্রাট হইবার পর, রাজত্বের প্রথম পঁচিশ বৎসর আওরঙ্গজেব উত্তর ভারতের ঘটনাবলী লইয়া বিব্রত থাকায় রাজ্য দুইটি মোগল আক্রমণের আশংকা হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। কিন্তু শিবাজীর ক্রমবর্ধমান শক্তি বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হইয়া আওরঙ্গজেব দক্ষিণ ভারতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে বাধ্য হন। ১৬৮১ খ্রীঃ হইতে ১৭০৭ খ্রীঃ জীবনের শেষ ছাব্বিশ বৎসর তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যে অতিবাহিত করিতে হয়। ঐতিহাসিকদের কথায়, দক্ষিণ ভারত শুধু তাঁহার নিজের নয়, মোগল সাম্রাজ্যেরও সমাধিস্থল।

দাক্ষিণাত্য নীতির মূল উদ্দেশ্য

দক্ষিণভারতে আওরঙ্গজেব প্রথমেই বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করেন। দেড় বৎসর প্রতিরোধ করিবার পর বিজাপুর আত্মসমর্পণ করে (১৬৮৬ খ্রীঃ) এবং মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিজাপুরের পর গোলকুণ্ডার পালা আসিল। সম্রাট স্বয়ং অভিযানের নেতৃত্ব করেন, কিন্তু সেখানকার সুলতান আবুল হাসান হার মানিলেন না। শেষ পর্যন্ত আবদুল্লা পানি নামে এক আফগানের বিশ্বাসঘাতকতায় গোলকুণ্ডা মোগলদের অধিকৃত হয়।

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয়

ইতিমধ্যে মারাঠী নায়ক শিবাজী দক্ষিণ ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে স্বীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আওরঙ্গজেব মারাঠী শক্তি ধ্বংসের উদ্দেশ্যে মাতুল শায়েস্তা খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। কিন্তু শায়েস্তা খাঁ কোনমতে নিজপ্রাণ বাঁচাইয়া দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করেন। ইতিপূর্বে বিজাপুরের সুলতানের সেনাপতি আফজল খাঁও শিবাজীর হাতে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত মোগল সেনাপতি জয়সিংহ সাময়িকভাবে শিবাজীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। পুরন্দরের সন্ধির (১৬৬৫ খ্রীঃ) শর্তানুযায়ী শিবাজীকে মোগল দরবারে আসিতে হইল। সম্রাট কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শিবাজীকে নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। কিন্তু মারাঠা নায়ককে বেশীদিন আটক করিয়া রাখা গেল না। কৌশলে তিনি আগ্রা হইতে পলায়ন করিলেন। অতঃপর ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মারাঠা-মোগল সংঘর্ষ পুনরায় শুরু হইয়া গেল। আমৃত্যু শিবাজী লড়াই করিয়া কোঙ্কণ, মাদুরা, পুরন্দরের অধিকাংশ দুর্গ পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।* শিবাজীর পর তাঁহার পুত্র শম্ভুজীর আমলেও মোগল বিরোধী সংগ্রাম অব্যাহত থাকিল। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাট শম্ভুজীকে বন্দী ও হত্যা করেন এবং তাঁহার পুত্র শাহুকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। এতদ্‌সত্ত্বেও আওরঙ্গজেব মারাঠাদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই।

মারাঠা-মোগল সংঘর্ষ

● **আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির সমালোচনা ঃ** আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। ডঃ স্মিথ, এলফিনস্টোনের ন্যায় কোন কোন ঐতিহাসিক মনে

* [শিবাজীর উত্থান ও রাজ্য শাসনব্যবস্থা পরে দেওয়া হইল]

করেন, দক্ষিণ ভারতের সিয়া রাজ্যদ্বয় অধিকার করিয়া মোগল সম্রাট রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার স্বাধীন অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবার ফলে দাক্ষিণাত্যে মারাঠা শক্তি অপ্রতিহত হইয়া উঠিয়াছিল। অন্যদিকে সুলতানী রাজ্য দুইটির কর্মচ্যুত বহু সৈনিক মারাঠা সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়া শিবাজীর শক্তি পুষ্ট করিয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ মন্তব্য করিয়াছেন, আওরঙ্গজেবের যথার্থ কাজ হইত মারাঠা ও সিয়াশাসিত রাজ্যগুলির মধ্যকার আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ গ্রহণ করা। তাঁহার উচিত ছিল বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সহিত একত্রিতভাবে মারাঠা রাজ্য আক্রমণ করা। অন্যথায় দক্ষিণী রাজ্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব তীব্র করিয়া উভয়ের শক্তি খর্ব করা।

ডঃ স্মিথ ও এলফিনস্টোনের মত

ডঃ যদুনাথ সরকার প্রমুখ ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ উপরিউক্ত মত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বলেন, ক্ষয়িষ্ণু ও পতনোন্মুখ সুলতানী রাজ্য দুইটির পক্ষে মারাঠীদের 'জাতীয় জাগরণ' রোধ করা সম্ভব হইত না। সংহতি ও প্রগতির ভিত্তিতে মারাঠাগণ যে সংগঠন শক্তি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহার অগ্রগমন ব্যাহত করিবার ক্ষমতা এমন কি, মোগল-সুলতানী শক্তি জোটের সাধ্যাতীত ছিল। তাহাছাড়া, দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সুলতানী রাজ্য দুইটির সহিত মোগল সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইত না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আকবর যেদিন প্রথম বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে মোগল-শক্তির সম্প্রসারণ সাধনের কর্মনীতি গ্রহণ করেন সেদিন হইতে আওরঙ্গজেবের গোলকুণ্ডা প্রবেশ পর্যন্ত মোগল-শক্তির চরম লক্ষ্য ছিল দাক্ষিণাত্যের সম্পূর্ণ বশ্যতা সাধন।'

ডঃ যদুনাথ সরকারের অভিমত

যাহা হউক, আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য অভিযানের ফল মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে শুভ হয় নাই। প্রথমতঃ, দীর্ঘকাল ধরিয়া দাক্ষিণাত্যে ক্রমাগত যুদ্ধ ঘটায় মোগল রাজকোষ প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। এমন কি, সেনাবাহিনীর বেতনও বাকি পড়িয়াছিল। ফলে, মোগল শাসনের মর্যাদা হ্রাস পাইল। দ্বিতীয়তঃ, উত্তর ভারতে সম্রাটের দীর্ঘ অনুপস্থিতির ফলে যে শাসনতান্ত্রিক শৈথিল্য দেখা দিয়াছিল তাহার প্রতিঘাতে মোগল সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে থাকিল। একদিকে যেমন শিখ, জাঠ প্রভৃতি শক্তি স্বাধীন হইয়া গেল, অন্যদিকে তেমনি প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ কেন্দ্রীয় শাসন অগ্রাহ্য করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বসিল। এইভাবে, আওরঙ্গজেবের দক্ষিণ-ভারতীয় নীতি মোগল সাম্রাজ্যের বিপর্যয়ের সূচনা করে। ঐতিহাসিকগণ যথার্থ বলিয়াছেন, 'দাক্ষিণাত্যের দুষ্টক্ষতই তাঁহার চরম সর্বনাশ সাধন করিয়াছিল।'

● **আওরঙ্গজেবের শাসনপদ্ধতি ঃ** আওরঙ্গজেবের ধর্মনীতি তাঁহার শাসননীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। ভারতবর্ষকে ইসলামীয় রাষ্ট্রে পরিণত করিবার জন্য তিনি তাঁহার নীতি ও কার্যক্রম স্থির করিয়াছিলেন। প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুরাতন কাঠামো বজায় থাকিলেও, আকবরের অনুসৃত কর্মপন্থা অনুসরণ করা হইল না। যোগ্যতা ভিত্তিতে রাজপদে নিয়োগের প্রথা বাতিল হইল। শিয়া ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের রাজকার্য হইতে সরাইয়া দেওয়া হইল। কেবলমাত্র গোঁড়া সুন্নী ও ধর্মত্যাগী হিন্দুদের রাজকর্মচারী হিসাবে গ্রহণ করা হইত। ফলে, প্রশাসনে উপযুক্ত ও যোগ্য ব্যক্তির ঘাটতি দেখা যায় যাহা মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে শুভ হয় নাই।

ব্যক্তিগতভাবে আওরঙ্গজেব অক্লান্ত কর্মী ছিলেন। শাসনের প্রতিটি বিভাগে তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। প্রতিটি কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়ের সহিত তাঁহার নিবিড় পরিচয় ছিল। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার কর্মোদ্যোগ হ্রাস পায় নাই। কিন্তু তিনি প্রশাসন ব্যবস্থার কোন সাংগঠনিক রূপ দিতে পারেন নাই। তাঁহার চরিত্রের একটি মারাত্মক ত্রুটি হইল সন্দিগ্ধচিত্ততা। কোন রাজকর্মচারীকেই তিনি বিশ্বাস করিতেন না। ফলে তাঁহাদের মধ্যে তিনি কাজের উৎসাহ সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। আওরঙ্গজেবকে তাই যথার্থ

রাজনীতিজ্ঞ আখ্যা দেওয়া যায় না। যাহা হউক, তাঁহার আমলে পূর্বের মত সাম্রাজ্য সুবায় বিভক্ত ছিল। এই সময় সুবার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ২১টি। সুবার প্রশাসনিক ব্যবস্থা পূর্বের ন্যায়ই ছিল। রাজস্ব ব্যবস্থারও কোন মৌলিক পরিবর্তন হয় নাই, যদিও ভূমি-রাজস্বের ১/৩ হইতে বৃদ্ধি করিয়া শস্যের ১/২ অংশে ধার্য হইয়াছিল। গোঁড়া সুন্নী মুসলমান আওরঙ্গজেব কোরাণ-বহির্ভূত নানারকম কর যেমন বাতিল করিয়াছিলেন, তেমন ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর ধার্য করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের আমলে সকল মনসবদারকে জায়গির দেওয়া সম্ভব হইত না। আবার অনেক সময় জায়গির হইতে মনসবদারগণ আকাঙ্ক্ষিত অর্থ আদায় করিতে পারিতেন না। ফলে তাহারা জায়গির ইজারাদারদের নিকট বিক্রয় করিয়া দিতেন। এই সকল ইজারাদারগণ কৃষকদের উপর নানারকম নির্যাতন করিতেন। ইহার ফলে যে ব্যাপক কৃষক বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল তাহা মোগল সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল করিয়া দেয়।

সামরিক বিভাগে নানারকম বিধি নির্দেশ প্রয়োগ করিলেও, আওরঙ্গজেবের সামরিক বাহিনীতে শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতার একান্ত অভাব দেখা দিয়াছিল।

● **আওরঙ্গজেবের ধর্মনীতি ঃ** আওরঙ্গজেব ছিলেন গোঁড়া সুন্নী মুসলমান। কোরাণ ও অন্যান্য মুসলিম ধর্ম ও নীতি শাস্ত্রগুলি ছিল তাঁহার মুখস্থ। ইসলামীয় অনুশাসন অনুযায়ী তিনি সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। শোনা যায়, তিনি স্বহস্তে কোরাণ নকল করিতেন এবং আপন জীবিকা অর্জনের জন্য টুপি তৈয়ারি করিয়া বিক্রয় করিতেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেও পাঁচ বার নমাজ পড়িতেন এবং নিয়মিত রমজান পালন করিতেন। লোকে তাঁহাকে 'জিন্দা পীর' বা 'জীবন্ত পীর' এবং 'বাদশাহের ছদ্মবেশে দরবেশ' বলিয়া বর্ণনা করিতেন।

ব্যক্তিগত ধর্মচর্চা

আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস তাঁহার রাষ্ট্রনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। তিনি মনে করিতেন, বিভিন্ন ধর্মের সংস্পর্শে ইসলামের পবিত্রতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। খাঁটি সুন্নী মুসলমান হিসাবে তাঁহার পরম দায়িত্ব হইবে ইসলামকে পূর্ব গৌরবে আসীন করা। শাসিত রাষ্ট্রকে আদর্শ মুসলিম রাষ্ট্র (দার-উল-ইসলাম) হিসাবে গড়িয়া তোলা ছিল তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে, প্রথমেই তিনি দরবারে আকবরের আমলে প্রবর্তিত বিবিধ ইসলাম-বহির্ভূত প্রথা ও উৎসব রদ করিয়াছিলেন। এইগুলি ছিল সম্রাটের জন্মদিন, নওরোজ, দেওয়ালি উৎসব, ঝরোখা দর্শন ইত্যাদি। এমন কি, রাজদরবারের নৃত্যগীতও নিষিদ্ধ করা হইল। পীর বা সন্ন্যাসীদের সমাধিস্থলে বাতি দেওয়ার প্রথাও বাতিল করা হইল।

রাষ্ট্রনীতি নির্দ্ধারণ

ইসলামে যাহারা বিশ্বাসী ছিলেন না তাহাদের সম্পর্কে আওরঙ্গজেবের ছিল প্রচণ্ড অবজ্ঞা। স্বাভাবিকভাবেই তাই, হিন্দুদের প্রতি তিনি এক কঠোর, ধর্মান্ধ ও অনুদার নীতি গ্রহণ করেন। হিন্দুদের হোলী, দেওয়ালী ও বসন্ত উৎসব নিষিদ্ধ হয়। হিন্দুদের ধর্মীয় মেলা ও মিছিল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এক বাদশাহী ফরমান জারী করিয়া গুজরাটের সোমনাথ, কাশীর বিশ্বনাথ ও মথুরার কেশব মন্দির ধ্বংস করিবার নির্দেশ দেওয়া হইল। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে আকবর যে জিজিয়া কর নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা পুনঃপ্রবর্তিত হইল। রাজপুত ব্যতীত অন্যান্য হিন্দুদের পাল্কী, ঘোড়া বা হাতিতে চড়িবার অধিকার কাড়িয়া নেওয়া হইল। সরকারী উচ্চপদে হিন্দু নিয়োগ বন্ধ হইল। হিন্দুবণিকদের নিকট হইতে শতকরা পাঁচ ভাগ শুল্ক আদায় করা হইত কিন্তু মুসলিম ব্যবসায়ীরা শুল্ক দিতেন শতকরা আড়াইভাগ হারে। এইভাবে হিন্দুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের পর্যায়ে নামাইয়া আনা হইল এবং তাহাদের ধর্মান্তরকরণে উৎসাহ দেওয়া হইল।

হিন্দুদের প্রতি ব্যবহার

শুধু হিন্দুদের উপরই নয়, দাক্ষিণাত্যের শিয়া রাজ্যগুলি এবং গুজরাটের ইসমাইলি বোহরাদের প্রতিও আওরঙ্গজেব অনুদার, ধর্ম-বিদ্বেষী নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন.।

আওরঙ্গজেবের ধর্মবিদ্বেষী নীতির ফলে সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। জাঠ সৎনামী, বুন্দেলা, শিখ, মারাঠী, রাজপুত প্রভৃতি জাতি মোগলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। মথুরার জাঠগণ প্রথমে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আওরঙ্গজেব ইহা দমন করিতে ব্যর্থ হওয়ায় জাঠগণ স্বাধীন হইয়া যান। পাঞ্জাবের পাতিয়ালা সৎনামী বিদ্রোহ অত্যন্ত নৃশংসতার সহিত দমন করা হইয়াছিল। বুন্দেলরাজ ছত্রশাল মোগল শাসন অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। শিখগুরু তেগবাহাদুরকে হত্যা করিয়াও শিখ বিদ্রোহ দমন করা গেল না। প্রায় সমগ্র পাঞ্জাব মোগলদের হস্তচ্যুত হয়।

হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া

আধুনিক ঐতিহাসিকগণ অবশ্য জাঠ-শিখ-বুন্দেলা-সৎনামী বিদ্রোহকে কৃষক বিদ্রোহ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, রাজস্ব হারের অত্যধিক বৃদ্ধি, নানারকম অতিরিক্ত কর ধার্য, রাজকর্মচারীদের অত্যাচার ইত্যাদি কারণে কৃষকদের অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। এই অসন্তোষই বিদ্রোহের আকারে আত্মপ্রকাশ করে।

কৃষক বিদ্রোহ

আধুনিককালে, আওরঙ্গজেবের ধর্মনীতির নূতন মূল্যায়নের চেষ্টা করা হইয়াছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, রাজনৈতিক প্রয়োজনে আওরঙ্গজেব গোঁড়া সুন্নী মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিংহাসনকে কেন্দ্র করিয়া যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে সাফল্য অর্জন করিতে হইলে সুন্নীদের সমর্থন একান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ হিন্দুগণ এবং উদারপন্থী মুসলিম অভিজাতরা ছিলেন দারার সমর্থক। তাঁহারা আরও বলেন, বারাণসীর বিশ্বনাথ মন্দিরের মত দুই-একটি প্রক্ষিপ্ত ঘটনা ব্যতীত মন্দির ভাঙিয়া মসজিদ নির্মাণের উদাহরণ পাওয়া যায় নাই। বস্তুতঃপক্ষে পুরাতন হিন্দু মন্দির ধ্বংসের কোন আদেশ তিনি দেন নাই। বাদশাহী ফারমানেও বলা হইয়াছিল, নতুন মন্দির নির্মাণ করিতে দেওয়া হইবে না। সম্রাটের অনুমতি অগ্রাহ্য করিয়া মন্দির নির্মিত হইলে তাহা ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে। অত্যুৎসাহী রাজকর্মচারীরা সম্রাটের আদেশ সম্প্রসারিত করিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে পুরাতন মন্দিরও ভাঙিয়া ফেলিয়াছিলেন। দুই একটি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কারণ ঘটায় তিনি বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণের নীতি গ্রহণ করেন। অন্যথায় তিনি ধর্মত্যাগ করিতে জোর দিতেন না। মোগলদরবারে তখনও পর্যন্ত বহু হিন্দু কাজ করিতেন। ব্রাহ্মণদের নিষ্কর জমি দিবার জন্য তিনি আদেশ জারী করিয়াছিলেন। কৃষকদের নিকট হইতে অতিরিক্ত কর আদায় না করিবার জন্য সরকারী সংগ্রাহকদের নির্দেশ দিয়াছিলেন। দারার পক্ষ লইলেও তিনি যশোবন্ত সিংহকে পদচ্যুত করেন নাই। জিজিয়া করকেও তাঁহারা বৈষম্যমূলক কর বলিয়া মনে করেন না।

আওরঙ্গজেবের ধর্মনীতির মূল্যায়ণ

আওরঙ্গজেবের ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতির নব-মূল্যায়ন প্রসঙ্গে যাহাই বলা হউক না কেন, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে তিনি আকবরের উদার ও সমদর্শী নীতি হইতে দূরে সরিয়া আসিয়াছিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ভারতবাসীর সহযোগিতায় আকবর যে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেব তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া ভারতবর্ষকে একটি ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রে—ইসলামী রাষ্ট্রে-পরিণত করার প্রচেষ্টা চালান। ইহার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে হিন্দুজনমানস মোগল শাসনের বিরুদ্ধে চলিয়া যায়। মারাঠা ও শিখশক্তির উত্থানের পশ্চাতে ধর্মও একটি প্রেরণার কাজ করিয়াছিল। অন্যান্য কারণের সহিত এই 'হিন্দু' জাতীয়তাবাদের উত্থান মোগল সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করিয়াছিল।

ধর্মনীতির ফলাফল

● **আওরঙ্গজেবের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব ঃ** মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসে আওরঙ্গজেব এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। ইউরোপীয় পর্যটকগণ তাঁহাকে সুদক্ষ ও ধর্মভীরু সম্রাট, নিরপেক্ষ বিচারক এবং প্রতিভাবান কূটনীতিজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এমন কতকগুলি গুণের অধিকারী ছিলেন যাহা সেইযুগে সচরাচর দেখা যায় না। কোরাণের অনুশাসন অনুযায়ী তিনি সর্বপ্রকার বিলাস-ব্যসন ও বাহুল্য হইতে

ব্যক্তিগত অনাড়ম্বর জীবন

মুক্ত ছিলেন। পোশাক-পরিচ্ছদ ও আহার্যে তিনি ছিলেন মিতাচারী। তিনি সুরা স্পর্শ করিতেন না। নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসাবে তিনি নিজের জীবিকা অর্জনের জন্য কোরাণ নকল ও টুপি তৈয়ারি করিয়া বিক্রয় করিতেন, এবং এই উপার্জিত অর্থের মাধ্যমে তাঁহার শেষ কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য উইলে নির্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন।

নিষ্ঠাবান মুসলিম

আওরঙ্গজেব ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন। তিনি নিয়মিত রমজান পালন করিতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ঝুঁকি লইয়াও তিনি নমাজ পাঠ করিতেন। কোরাণ ও অন্যান্য ইসলামীয় ধর্মশাস্ত্র তাঁহার মুখস্থ ছিল। ইসলাম ধর্মের শিক্ষার জন্য তাঁহার উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। দিল্লী, জৌনপুর, শিয়ালকোট প্রভৃতি অঞ্চল ইসলামীয় দর্শন ও শাস্ত্রচর্চার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি পায়।

আওরঙ্গজেব ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী শাসক। শাসনকার্য পরিচালনায় তিনি যে একাগ্রতা ও পরম-নিষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন তাহা একান্তই বিরল। যুদ্ধ পরিচালনায়ও তিনি দক্ষতা ও সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে যেমন রাজকার্যে তাঁহার ক্লান্তি ছিল না, তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া সৈন্য পরিচালনা করিতেও বিরত থাকিতেন না। কূটনীতিতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। কূটনীতি ও সামরিক দক্ষতার সাহায্যেই তিনি সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। ভ্রাতাদের মধ্যেই নয়, আওরঙ্গজেব ছিলেন সেই সময়ের সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণ, সাহসী ও কর্মঠ পুরুষ।

সামরিক ও কূটনৈতিক সাফল্য

আওরঙ্গজেবের আমলেই মোগল সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তৃত হইয়াছিল। বহুগুণাঙ্কিত হইলেও, সঙ্কীর্ণতা পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা, সন্দিগ্ধচিত্ততা ইত্যাদি চারিত্রিক দোষত্রুটির জন্য আওরঙ্গজেব সর্বাঙ্গীন সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই। সিংহাসন লইয়া দ্বন্দ্বে তিনি পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিতেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। তাঁহার ধর্মীয় গোঁড়ামি, অনুদারতা এবং বিধর্মীদের প্রতি নিপীড়ন-নীতি হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ইহার ফলে সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা দেয় যাহা পরিশেষে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ডাকিয়া আনে। আওরঙ্গজেবের চরিত্রের অপর প্রধান ত্রুটি ছিল সন্দিগ্ধচিত্ততা। তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মভীরু হইলেও রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থায় তিনি প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। অপরদিকে সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করিয়া তিনি রাজকর্মচারীদের অলস ও অকর্মণ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার শাসন-সংগঠন কখনও প্রতিষ্ঠানিক রূপ পায় নাই।

চারিত্রিক দোষত্রুটি

● **শাসক হিসাবে আওরঙ্গজেবের ভূমিকা ঃ** শাসক হিসাবে আওরঙ্গজেব চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রথমতঃ, তাঁহার শাসননীতি ধর্মান্ধ থাকায় ভারতবর্ষের বৃহত্তম জনসমষ্টি মোগল শাসনের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। জনসাধারণের স্বাভাবিক আনুগত্য লাভ না করিতে পারিলে সাম্রাজ্য শাসন টিকিয়া থাঁকিতে পারে না। আওরঙ্গজেবের শাসনের প্রতি জনসমর্থন-হ্রাস তাঁহার নিজের ও মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণ থাকায় আওরঙ্গজেব কাহারও নিকট হইতে উপদেশ নিতেন না, কাহাকেও আপন বলিয়া ভাবিতেন না। সকল ক্ষমতা স্বয়ং করায়ত্ত করিয়া রাখিতেন। ফলে রাজকর্মচারিগণ ক্ষমতা-প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা হইতে বঞ্চিত হইয়া নিছক কেরানীতে পরিণত হইয়াছিলেন। অন্যদিকে, বৃদ্ধ বয়সেও ক্ষমতার লোভে আচ্ছন্ন হইয়া তিনি কর্মচারিগণের মধ্যে ভেদনীতির প্রয়োগ করেন। তাৎক্ষণিক লাভ হইলেও, শেষ বয়সে সম্রাট কর্মচারীদের আর নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিতেন না। আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য ও রাজপুত নীতিও ভ্রান্ত ছিল। সুদক্ষ রাষ্ট্রনেতার ভূমিকা তিনি কোনোদিনই পালন করিতে পারেন নাই।

• শিবাজী ও মারাঠা শক্তির উত্থান •

মারাঠা জাতির জনক শিবাজী ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে) জুনাগড়ের নিকটবর্তী শিবনার নামক স্থানে এক দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন শাহজী ভোঁসলে এবং মাতা ছিলেন দেবগিরির যাদব বংশীয় কন্যা জীজাবাঈ। পিতা শাহজী নিজ কর্মস্থল বিজাপুরে দ্বিতীয় পত্নীসহ থাকিতেন। আর জীজাবাঈ শিশুপুত্র সহ দাদাজী কোণ্ডদেব নামে জনৈক ব্রাহ্মণের তত্ত্বাবধানে পুণায় বাস করিতেন। মাতার অনুপ্রেরণা ও শিক্ষায় বাল্যকাল হইতেই শিবাজীর মনে সাহস, দেশপ্রেম আর গভীর ধর্মানুরাগ সঞ্চারিত হইয়াছিল। অন্যদিকে, রাজপুত বংশজাত দাদাজীর সাহায্যে পুণার মাওয়ালী জাতির সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। পরবর্তিকালে এই মাওয়ালী জাতি লইয়া শিবাজী তাঁহার দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী গঠন করেন।

শিবাজীর বাল্যজীবন

প্রচণ্ড উচ্চাভিলাষী শিবাজী আপন নেতৃত্বে হিন্দু সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইয়া প্রথমেই দক্ষিণ ভারতের সুলতানী রাজ্য বিজাপুর আক্রমণ করিলেন। ১৬৪৬-৪৭ সালে তিনি একে একে বিজাপুরের অন্তর্গত তোরণা, রায়গড়, বড়মতি প্রভৃতি দুর্গগুলি জয় করিয়া লইলেন। এই সময় বিজাপুরের সুলতান পিতাকে কারারুদ্ধ করিলে সাময়িক কালের জন্য শিবাজী আক্রমণ বন্ধ করেন। কিন্তু শাহজীর মুক্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পুরন্দরের দুর্ভেদ্য দুর্গটি এবং জাওয়লী নামক রাজ্যটি দখল করিয়া লন। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মোগল আক্রমণের আশংকা হইতে মুক্ত হইয়া বিজাপুরের সুলতান তাঁহার সেনাপতি আফজল খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। আফজল খাঁর উদ্দেশ্য ছিল শান্তিস্থাপনের ভান করিয়া শিবাজীকে বন্দী অথবা হত্যা করা। কিন্তু এই দুরভিসন্ধি পূর্বেই জানিতে পারিয়া শিবাজীই সাক্ষাৎকারের সময় বাঘনখের সাহায্যে তাহাকে হত্যা করেন এবং কোলাপুর ও দক্ষিণ কোঙ্কণ অধিকার করিয়া নেন।

ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা

দাক্ষিণাত্যের সুবাদারের পদে থাকাকালে আওরঙ্গজেব শিবাজীর ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পরে যখন মোগল সিংহাসন লইয়া ভ্রাতৃবিরোধ চলিতেছিল তখন শিবাজী ধীরে ধীরে আপন শক্তি সংহত করিতেছিলেন। সিংহাসন-প্রাপ্তির পর আওরঙ্গজেব শিবাজীর ক্রমবর্ধমান শক্তি নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য মাতুল শায়েস্তা খাঁকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মোগল সেনাপতি পুণা অধিকার করিয়া কল্যাণ অঞ্চল হইতে মারাঠাদের বিতাড়িত করিলেন। কিন্তু শীঘ্রই পুণা মারাঠাগণ কর্তৃক পুনরধিকৃত হইল। এক নৈশ আক্রমণে শায়েস্তা খাঁর পুত্র নিহত হইলেন। শায়েস্তা খাঁ একটি অঙ্গুলি হারাইয়া কোনক্রমে প্রাণ লইয়া পলাইয়া যাইতে সক্ষম হন। ইহার পর শিবাজী সুরাট বন্দর দখল ও লুণ্ঠন করিলেন। মোগল সম্রাট অতঃপর অম্বররাজ জয়সিংহ ও সেনাপতি দিলির খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পুরন্দরের সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হন। অধিকৃত দুর্গের এক বিরাট অংশ ছাড়িয়া দিয়া তিনি মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং জয়সিংহের পরামর্শক্রমে আগ্রায় সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হন। প্রতিশ্রুতিমত সৌজন্যমূলক ব্যবহার না পাওয়ায় শিবাজী প্রতিবাদ করিলে পুত্র শম্ভুজীসহ তাঁহাকে নজর বন্দী করা হইল। কৌশলী শিবাজী ফলের ঝুড়িতে আত্মগোপন করিয়া আগ্রা হইতে পলায়ন করিলেন। স্বদেশে ফিরিয়া তিনি মারাঠা সেনাবাহিনী সুগঠিত করেন এবং মোগল অধিকৃত দুর্গসমূহ পুনরধিকার করেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের আফগান বিদ্রোহ দমন করিতে মোগল বাহিনী ব্যস্ত থাকায় দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর প্রাধান্য অপ্রতিহত থাকিল।

মারাঠা মোগল সংঘর্ষ

পুরন্দরের সন্ধি

১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রায়গড় দুর্গে শিবাজীর অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তিনি 'ছত্রপতি' উপাধি গ্রহণ করিলেন। এইবার শিবাজী রাজ্য জয়ে মনোনিবেশ করিলেন। মোগল বাহিনীর কর্মব্যস্ততার সুযোগে তিনি জিঞ্জি, ভেলোর ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলগুলি অধিকার করিয়া লইলেন। অতঃপর শিবাজী তাঞ্জোরের কিয়দংশ তাঁহার রাজ্যভুক্ত করিলেন। মহীশূরের একটি অংশও তাঁহার অধিকারে আসিল। কিন্তু অকস্মাৎ ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজীর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটিল। মৃত্যুর সময় তাঁহার রাজ্য উত্তরে সুরাটের নিকটবর্তী ধরমপুর জেলা হইতে দক্ষিণে কানাড়া জেলা, পূর্বে বাগলানা, নাসিক, পুণা ও সাতারা সহ কোলাপুর পর্যন্ত এবং পশ্চিমে সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

রাজ্যাভিষেক ও রাজ্যবিস্তার



শিবাজী

শিবাজীর সাফল্যের মূল কারণ ছিল দুইটি। প্রথমতঃ, দক্ষিণ ভারতের উপর মোগল আধিপত্য ও প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। নানাকারণে মোগল সম্রাটগণ দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হইতেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, উন্নত ধরনের রাজস্বব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার ফলে শিবাজীর প্রচুর অর্থাগম ঘটিয়াছিল। এই আর্থিক সমৃদ্ধি ও সংগঠনী শক্তির মাধ্যমে শিবাজী মারাঠা সৈন্যবাহিনীকে সুগঠিত ও সুশিক্ষিত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

● **শিবাজীর শাসনব্যবস্থা ঃ** শিবাজী শুধুমাত্র সমরকুশলী সেনাপতি হিসাবে ইতিহাসে পরিচিত নহেন। সুদক্ষ শাসকরূপেও তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী হইলেও তাঁহার শাসনব্যবস্থার মূলনীতি ছিল প্রজাসাধারণের কল্যাণ সাধন করা।

শিবাজীর শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ ছিলেন রাজা স্বয়ং, কিন্তু শাসনকার্যে তাঁহাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য অষ্টপ্রধান বা আটজন মন্ত্রী লইয়া একটি সভা বা পরিষদ ছিল। ইঁহারা ছিলেন যথাক্রমে, পেশোয়া বা প্রধানমন্ত্রী, অমাত্য বা রাজস্বমন্ত্রী, সামন্ত, সচিব, ওয়াকিয়ানবীশ, পণ্ডিত ও ন্যায়াধীশ। ইঁহারা ব্যতীত অপর সকলকেই সামরিক কর্তব্য পালন করিতে হইত। শিবাজী শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তাঁহার রাজ্যকে চারিটি প্রান্ত বা প্রদেশে বিভক্ত করেন, এবং প্রদেশগুলি কয়েকটি তরফ বা জেলায় ভাগ করেন। কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি তরফ গঠিত ছিল। গ্রামের শাসনভার ছিল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর। 'দেশমুখ' বা 'দেশপাণ্ডে' নামক কর্মচারিগণ কতকগুলি গ্রামের পরিদর্শকের কর্তব্য পালন করিত। তরফের শাসনকর্তার নাম ছিল হাবিলদার বা কায়কুন। প্রান্তের শাসনকর্তাকে বলা হইত মামলতদার। শিবাজী রাজ্যের সমস্ত জমি জরিপ করাইয়া রাজস্ব নির্ধারণ করিয়াছিলেন। উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ এবং পরে দুই-পঞ্চমাংশ রাজকর রূপে ধার্য হইয়াছিল। কৃষকগণ শস্যে অথবা নগদে রাজস্ব পরিশোধ করিতে পারিত। ইহা ছাড়া, শিবাজী স্বীয় রাজ্যের বহির্ভূত অঞ্চল হইতে চৌথ (রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ) এবং সরদেশমুখী (রাজস্বের এক-দশমাংশ) আদায় করিতেন। শিবাজীর বিচারব্যবস্থাও উন্নত ছিল।

শাসনব্যবস্থা, অষ্টপ্রধান

রাজস্ব ব্যবস্থা

সামরিক বিভাগের সংগঠনেও শিবাজী কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার সেনাবাহিনীতে ৪০,০০০ অশ্বারোহী, ১০,০০০ পদাতিক, কামান, হস্তী ও উট ছিল। অশ্বারোহী সৈন্যদল আবার 'বর্গীর' বা নিয়মিত ও 'শিলাদার' বা অনিয়মিত—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। শিবাজী সৈন্যদের নগদ বেতন দিতেন। সেনাবাহিনীতে কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা প্রবর্তিত হইয়াছিল। তাঁহার সমরকৌশলের প্রধান নীতি ছিল সম্মুখ যুদ্ধ এড়াইয়া সেনাবাহিনীর উপর অতর্কিত আক্রমণ করা বা পাহাড়ের আড়ালে থাকিয়া লড়াই

সামরিক সংগঠন

করা ; সামরিক পরিভাষায় যাহাকে বলা হয় গেরিলাযুদ্ধ। আপন রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চলে শিবাজী অনেকগুলি দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুর্গের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৫০। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন



রাজনৈতিক পুরুষ শিবাজী নৌবহরের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। পর্তুগীজদের সহিত সংঘর্ষে নৌশক্তি অপরিহার্য বিবেচনা করিয়া তিনি ২০০টি বিভিন্ন আকারের রণতরী নির্মাণ করিয়াছিলেন।

● **শাসক হিসাবে শিবাজীর মূল্যায়ন ঃ** শিবাজীর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করিতে যাইয়া প্রখ্যাত

ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার মন্তব্য করিয়াছেন, "শিবাজী শুধু যে মারাঠাজাতির স্রষ্টা ছিলেন এমন নহে, তিনি ছিলেন মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাসম্পন্ন জাতীয় স্রষ্টা"। শিবাজীর সমসাময়িক জনৈক ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, '৯৬টি গোষ্ঠীর সমবায়ে গঠিত মারাঠা জাতিকে উন্নত করিয়া যান এক অশ্রুতপূর্ব মর্যাদায়। এক চমৎকার শাসন-ব্যবস্থা সমন্বিত একটি সুসংহত সামরিক রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়া যান তিনি'। উপরে উদ্ধৃত উক্তি দুইটি তাঁহার সামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিভার পরিচয় বহন করে। ঐতিহাসিক ডাফ্ এবং পণ্ডিত ঈশ্বরীপ্রসাদ স্রষ্টা ও শাসক হিসাবে শিবাজীর প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সাম্রাজ্য বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই।

শাসক হিসাবে সাফল্য

সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অবশ্য শিবাজীর শাসনব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতি সমধিক দায়ী ছিল। প্রথমতঃ, এই শাসনব্যবস্থায় ছত্রপতির একক ভূমিকা ক্রিয়াশীল থাকায় কোন পরিপূরক নেতৃত্ব গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। দক্ষ পরিচালকের অভাবেই তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিশৃংখলা দেখা দিতে থাকে। অবশেষে তাহার পতন ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটাইবার জন্য তিনি কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-কোন ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেন নাই। রাষ্ট্রের আয়ের কোন স্বাভাবিক উৎস না থাকায় চৌথ ও সরদেশমুখী করের উপর নির্ভরতা বাড়িয়া চলিয়াছিল। পরবর্তিকালে উহা আদায় করিতে যাইয়া যে জুলুম-জবরদস্তি ও নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হইত তাহা মারাঠাদের মর্যাদা ও সুনাম নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। প্রতিবেশী রাজ্যের মানুষের কাছে মারাঠারা ছিলেন লুঠেরা ও পীড়নকারী। তৃতীয়তঃ, জাতিভেদের বিষও তিনি দূর করিতে পারেন নাই। নিষ্ঠাবান হিন্দু কায়স্থ শিবাজী চিৎপাবন ব্রাহ্মণদের গোঁড়ামি ভাঙ্গিতে পারেন নাই। চতুর্থতঃ, শিবাজী জায়গির প্রথা লোপ করিবার চেষ্টা গ্রহণ করিলেও উহা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করিতে পারেন নাই। তাঁহার ব্যবস্থার মধ্যেই সিন্ধিয়া-ভোঁসলে হোলকার-গায়কোয়াড়ের নেতৃত্বে সামন্তশক্তির উত্থানের উপাদান নিহিত ছিল। সুতরাং মারাঠা শক্তির পতনের মূল কারণগুলি শিবাজীর নীতি হইতে সঞ্জাত। শাসক হিসাবে শিবাজী তাই যথার্থ সুবিবেচনার পরিচয় দিতে পারেন নাই।

শাসক হিসাবে অসাফল্য

● ইউরোপীয় বণিকসংস্থা সমূহের সক্রিয়তা ●

ভারতের পর্তুগীজ জাতিঃ বহু প্রাচীনকাল হইতেই জলপথে ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে আরব সাগর ও লোহিত সাগরের উপর আরব বণিকদের একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপিত হওয়ায় পাশ্চাত্য দেশগুলির সহিত ভারতের সরাসরি বাণিজ্য সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয়। অথচ ভারতের বিপুল ঐশ্বর্যের খ্যাতি ইউরোপীয় বণিকদের গভীরভাবে প্রলুব্ধ করিতেছিল। পঞ্চদশ শতক হইতে প্রত্যক্ষভাবে ভারতের সহিত বাণিজ্য করিবার অভিপ্রায়ে নূতন জলপথ আবিষ্কারের চেষ্টা শুরু হয়। অবশেষে ১৪৯৮ সালে পর্তুগীজ নৌ অভিযাত্রী ভাস্কো-ডা-গামা ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থ বন্দর কালিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। ভাস্কো-ডা-গামার আগমনকে কেন্দ্র করিয়া ধীরে ধীরে অধিক সংখ্যক পর্তুগীজ ভারতে প্রবেশ করেন এবং প্রথমে কোচিন ও পরে অন্যত্র তাঁহারা অনেকগুলি বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করেন। বাণিজ্যকে নিরাপদ করিয়া রাখিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা রাজনৈতিক তৎপরতাও শুরু করিয়াছিলেন। আলবুকার্কের আমলেই ভারতের পর্তুগীজ শক্তির প্রতিষ্ঠা ঘটে। ১৫১০ সালে তিনি বিজাপুরের সুলতানের নিকট হইতে গোয়া দখল করিয়া সেখানে দুর্গ নির্মাণ করেন। কালক্রমে গোয়াই ভারতবর্ষের পর্তুগীজ কর্তৃত্বের প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত হয়। আলবুকার্কের পরবর্তিকালে দিউ, দমন, সলসেট, ব্যাসিন, বোম্বাই, হুগলী প্রভৃতি স্থানে পর্তুগীজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত

ভাস্কো ডা গামার কালিকট বন্দরে আগমন

হয়। শাহজাহানের আমলে হুগলী হইতে পর্তুগীজ বিতাড়িত করা হয়। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডরাজ ২য় চার্লস যৌতুক হিসাবে (পর্তুগীজ রাজকন্যাকে বিবাহ করায়) বোম্বাই লাভ করেন। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠারা সলসেট ও ব্যাসিন দখল করিয়া নেন। এইভাবে পর্তুগীজ আধিপত্য সংকুচিত হইতে থাকে। গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি কয়েকটি স্থান মাত্র তাহাদের অধিকারে থাকিয়া যায়। পর্তুগীজ বণিকদের জলদস্যুতা ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা, শাসনকার্য উপেক্ষা করিয়া ধর্মপ্রচার করিবার জন্য অধিকতর মনোযোগ দেওয়া, ব্রাজিল আবিষ্কারের ফলে পূর্ব হইতে পশ্চিম গোলার্ধের প্রতি দৃষ্টি দান করা এবং সর্বোপরি ইংরেজ বিরোধিতা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে ভারতের পর্তুগীজ সাম্রাজ্য নষ্ট হইয়া যায়।

ভারতে পর্তুগীজ সাম্রাজ্য স্থাপন

● **ওলন্দাজ বণিকদের আগমন ঃ** ১৬০২ সালে ওলন্দাজগণ প্রাচ্য দুনিয়ায় ব্যবসা করিবার জন্য একটি বণিক-সংস্থা গড়িয়া তোলেন। এশিয়াতে তাহারা প্রথম 'মশলা দ্বীপপুঞ্জ' অর্থাৎ বর্তমান ইন্দোনেশিয়ায় বাণিজ্য শাসনকেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৬০৫ সালে তাহারা ভারতে প্রবেশ করেন। ভারতবর্ষের সুরাট, কোচিন, বরাহনগর, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানেও ওলন্দাজরা কয়েকটি বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করেন। ইহারা একান্তভাবেই বণিক ধর্মাবলম্বী ছিলেন। মাত্র একবার ব্যতীত (মীরজাফরের শাসনকালে) তাঁহারা ভারতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন নাই। প্রধানতঃ ইংরেজ বণিকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাভূত হইয়া তাঁহারা ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন।

● **ফরাসী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ঃ** সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিখ্যাত ফরাসী পর্যটক টেভার্নিয়ে মোগল দরবার এবং ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য ও সম্পদ সম্পর্কে একটি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এই পুস্তক পাঠে ফরাসী বণিকগণ ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে উৎসাহী হইলেন। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্দশ লুই-এর দূরদর্শী মন্ত্রী কলবেয়ারের প্রচেষ্টায় ফরাসী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম সুরাটে ফরাসী বাণিজ্যকুঠি প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার পর মসুলীপত্তনে এবং ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঁসোয়া মার্তিনের চেষ্টায় মাদ্রাজের নিকট পণ্ডিচেরীতে ফরাসী বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠিল। কালক্রমে পণ্ডিচেরী ভারতবর্ষের ফরাসী বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির মধ্যে সর্বাধিক সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। তথায় ফরাসীদের উপনিবেশও স্থাপিত হইয়াছিল। ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার শাসনকর্তা শায়েস্তা খানের অনুমতি লইয়া ফরাসীগণ চন্দননগরে কুঠি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ক্রমে কারিকল, মাহে প্রভৃতি অঞ্চলে ফরাসী উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত ফরাসী নায়ক দুপ্লে পণ্ডিচেরীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলে দক্ষিণ ভারতে বাণিজ্যিক কর্তৃত্বের প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়া ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব শুরু হইয়া গেল।

ফরাসী উপনিবেশ স্থাপন

● **ইংরেজ বণিকদের আগমন ঃ** ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ (১ম) ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামক এক বণিক প্রতিষ্ঠানকে প্রাচ্য দেশে ১৫ বৎসরের জন্য একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকারের সনদ প্রদান করেন। এই বণিক কোম্পানীর তরফ হইতে ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন হকিন্স তৎকালীন ইংরেজ সম্রাট প্রথম জেমসের সুপারিশ পত্র লইয়া মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন। সম্রাট তাহাদের ভারতে বাণিজ্য করিবার অনুমতি দান করিলেও পর্তুগীজ বিরোধিতার জন্য ইংরেজরা প্রাপ্ত সুযোগ কাজে লাগাইতে পারিল না। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে ১ম জেমসের রাষ্ট্রদূত হিসাবে এক বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি স্যার টমাস রো মোগল দরবারে উপস্থিত হন। মার্জিত ব্যবহার ও কূটবুদ্ধির সাহায্যে তিনি ইংরেজ কোম্পানীর জন্য জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে গুজরাট, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে কুঠি নির্মাণের অধিকার লাভ করেন। অবশ্য ইংরেজ কোম্পানীর প্রথম কুঠি নির্মিত হয় সুরাটে, পরে একে

একে আগ্রা, আমেদাবাদ, প্রভৃতি অঞ্চলে ইংরেজ বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া ফ্রান্সিস ডে মাদ্রাজে একটি সুরক্ষিত বাণিজ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মাদ্রাজ নিকটবর্তী অঞ্চল ইংরেজের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইল। ক্রমে ক্রমে পাটনা, হুগলী ও কাশিমবাজারে ইংরেজ কুঠি প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ রাজকন্যা ক্যাথেরিন অফ ব্রাগাঞ্জার সহিত ইংরেজ সম্রাট ১ম চার্লসের বিবাহ হয়। এই বিবাহের পর্তুগীজ শাসক ইংল্যান্ডেশ্বরকে বোম্বাই বন্দর যৌতুক হিসাবে দান করেন। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট বন্দরটিকে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট বিক্রয় করিয়া দেন। বোম্বাই পশ্চিম ভারতে ইংরেজ বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠিল।

মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা

হুগলীর বাণিজ্য কুঠি দুর্গে পরিণত করিতে যাইয়া ইংরেজ ও মোগলদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হইল। ইংরেজগণ পরাজিত হইয়া বাংলা পরিত্যাগ করিল। কিন্তু ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে জব চার্নক, মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের অনুমতি লইয়া বাংলা দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কালক্রমে তিনি সুতানুটি গ্রামে (বর্তমান শোভাবাজার এলাকা) কলকাতা মহানগরীর গোড়াপত্তন করিলেন। ১৭০০ সালে তদানীন্তন ইংল্যান্ডের সম্রাট উইলিয়ম আওরঙ্গজেবের নামানুসারে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম নামে একটি সুরক্ষিত দুর্গ স্থাপিত হইল।

কলিকাতা ও ফোর্ট-উইলিয়ম প্রতিষ্ঠা

১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজগণ জন সারম্যান নামে জনৈক দূতকে বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা আদায় করিবার উদ্দেশ্যে দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন। সম্রাট ফররুখশিয়রের অনুমতিতে (বাদশাহী ফারমান দ্বারা) বাংলা, মাদ্রাজ, ও বোম্বাইতে ইংরেজ বণিকগণ বিনাশুল্কে অবাধ বাণিজ্য পরিচালনার অধিকার লাভ করিল, (১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে) এমন কি কোম্পানী নিজস্ব মুদ্রা প্রবর্তনেরও অধিকার পাইল।

বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ

মোগল সাম্রাজ্যের আসন্ন পতনের ও কেন্দ্রীয় রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যের প্রসারের সাথে সাথে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করিবার চেষ্টা করিল। ফলে একদিকে ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসীদের ও অন্যদিকে দেশীয় রাজশক্তির বিরুদ্ধে কোম্পানীকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইল।

তিন □ মোগল আমলে ভারতবর্ষ

● **রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন ঃ** ১৫২৬ হইতে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া মোগল রাজবংশের প্রথম ছয়জন সম্রাট/বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহাজাহান ও আওরঙ্গজেব—সামরিক দক্ষতা ও কূটনৈতিক প্রতিভার সাহায্যে আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপী এক অখণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। বস্তুতপক্ষে, আওরঙ্গজেবের শাসনকালের মোগল-ভারতবর্ষ ছিল প্রাক-ইংরেজ আমলের সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত সাম্রাজ্য। সম্রাট আশোক অথবা সমুদ্রগুপ্তর সাম্রাজ্য সীমা হইতে মোগল সাম্রাজ্যের আয়তন অনেক বেশী ব্যাপ্ত ছিল। এই বিশাল দেশের সর্বত্র একই শাসন ও বিচার ব্যবস্থা, একই মুদ্রা, ওজন ও সরকারী ভাষা প্রবর্তনের মাধ্যমে মোগল সম্রাটগণ ভারতব্যাপী যে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা ইতিপূর্বে কোনও যুগে ভারতবর্ষে পরিলক্ষিত হয় নাই। সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন সুবায় বিভক্ত করিয়া এবং সুবাদার ও অন্যান্য রাজকর্মচারীদের নিরন্তর বদলির ব্যবস্থা করিয়া মোগল শাসকগণ স্থানীয় ও আঞ্চলিক বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ বহুলাংশে পরিহার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিভিন্ন ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীভূক্ত মানুষকে শাসনকার্যে নিযুক্ত করিয়া (আওরঙ্গজেবের শাসনকাল ব্যতিক্রম) তাঁহারা

ইংরেজ যুগে বিস্তৃত রাজনৈতিক ঐক্য

জাতিগত ও ধর্মগত দূরত্বের পরিবর্তে সংস্কৃতিগত নৈকট্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অবশ্য আধুনিক চিন্তার মানদণ্ডে মোগল আমলেও ভারতবর্ষে কোনও জাতীয়তাবাদ গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। মধ্যযুগের এই সহজাত ত্রুটির কথা স্মরণে রাখিয়াও বলা যায়, মোগল শাসনাধীনেই ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ঐক্য ও সংহতি স্থাপিত হইয়াছিল। এমন কি, মোগল সাম্রাজ্যের বাহিরে যে সমস্ত স্বাধীনরাজ্য ছিল, তাহাদের শাসনকার্যেও মোগল শাসননীতির পরোক্ষ প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল। বলা নিষ্প্রয়োজন, আকবরের সময় হইতেই মোগল রাজগণ বিদেশী স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া ভারতের মূলধারার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছিলেন।

● **রাজকীয় স্বৈরাচারী ক্ষমতার দৃঢ়ীকরণ ঃ** মোগল রাষ্ট্রে সম্রাট ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার উৎস। তিনি ছিলেন শাসন বিভাগের শীর্ষে, আইন প্রণয়নে মুখ্যব্যক্তি, বিচার বিভাগের প্রধান এবং সামরিক বিভাগের সর্বাধিনায়ক। আকবর আরও একধাপ অগ্রসর হইয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, ধর্মের ব্যাখ্যাতেও তাঁহার অভিমতই 'অভ্রান্ত'। এক কথায়, মোগল সম্রাট ছিলেন 'রাষ্ট্রের প্রতীক' স্বরূপ।

সুসংহত কেন্দ্রীভূত শাসন প্রবর্তন ব্যতিরেকে সম্রাটের এই সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইত না। মোগল সম্রাটগণ তাই কেন্দ্রীয় শাসনকে শক্তিশালী ও দৃঢ়বদ্ধ করেন। কেন্দ্রের প্রশাসনিক কার্যাবলীর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ রাজকর্মচারী ছিলেন। কিন্তু প্রধান রাজপুরুষদের নিয়োগ ও কর্মধারা কেন্দ্রীয় ভিত্তিতে নির্ধারিত হইত। কর্মচারীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানীয় ও ক্ষমতাবান ছিলেন ভকিল বা প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু বৈরাম খাঁ সম্রাটের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিলে আকবর তাঁহাকে অপসারিত করেন। ইহার পর সম্রাট আর কাহাকেও ভকিলের পদে নিযুক্ত করেন নাই। তিনি স্বয়ং ভকিলের কার্য পরিচালনা করিতেন। অন্যান্য রাজকর্মচারিগণ যেমন—দেওয়ান বা রাজস্বমন্ত্রী, মীর বক্‌সি বা যুদ্ধ সচিব, মীর সামান বা রাজ-কারখানার পরিচালক, সদর-উল-সুকুর বা ধর্ম ও বিচার বিভাগের অধিকর্তা—সকলেই সম্রাটের পরামর্শ বা নির্দেশ ব্যতীত স্বাধীন কার্যক্রম অনুসরণ করিতে পারিতেন না। সুবার প্রশাসনের উপর কেন্দ্রীয় রাজশক্তির কর্তৃত্বকে অটুট রাখিবার জন্য সমমর্যাদাসম্পন্ন দুইজন প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত হইতেন। বস্তুতঃ সুবাদার ও দেওয়ান ছিলেন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং উহাদের মতবিরোধের মীমাংসা করিতেন সম্রাট স্বয়ং। রাজদরবারে অভিজাতদেরও নিয়ন্ত্রণে রাখা হইত। উচ্চপর্যায়ের মন্‌সবদারের পদগুলি রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট থাকিত। বিচার ব্যবস্থার একমাত্র ধারক ও বাহক ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। সম্রাটের রায় ছিল একমাত্র গ্রাহ্য। মোগল সম্রাটগণ এই ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য—আকবর হইতে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত—নিয়মিতভাবে প্রতি শুক্রবার দরবারে আপিলের মামলায় বিচার করিতেন। সম্রাটের 'দৈবাধিকার তত্ত্বে'র (divine right) ব্যবহারিক প্রয়োগ হিসাবে মসজিদে সুলতানের নামে 'খুতবা' পড়া হইত, সম্রাটের সম্মানে 'দিল্লীশ্বরো বা, জগদীশ্বরো বা' ধ্বনি দেওয়া হইত। 'ঝরোখা' দর্শনের ব্যবস্থাও ছিল একই নীতি-অনুসারী। এইভাবে রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ ও কার্যক্রম অনুসরণ করিয়া মোগল সম্রাটগণ রাজকীয় স্বৈরতন্ত্র অটুট ও অক্ষুণ্ণ রাখিতেন।

কঠোর কেন্দ্রীভূত শাসন

রাজ দরবারে অভিজাতদের নিয়ন্ত্রণ

● **মোগল আমলে জায়গিরদারি ব্যবস্থা ঃ** মোগল শাসন-নীতির মুখ্য উদ্ভাবক আকবর পাঠান সম্রাট শের শাহর ন্যায় জায়গির প্রথার বিরোধী ছিলেন। এই ব্যবস্থা যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ ছিল। তত্ত্বগতভাবে বলা হইত, জায়গির হইতেছে বেতনের একটা বিশেষ রূপ। নগদ অর্থে দেবার পরিবর্তে অনেক সময় কর্মচারীদের বেতন জায়গিরের মাধ্যমে প্রদান করা হইত। নিয়ম ছিল, 'খাজনা যদি বেতনের পরিমাণ হইতে বেশী হয়, তবে সেই উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারে জমা দিতে হইবে। কিন্তু এই অর্থ অনেক সময়েই জায়গিরদারগণ আত্মসাৎ করিয়া ফেলিতেন। সেইজন্য সময়ে সময়ে জায়গির এক মন্‌সবদারের হাত হইতে অন্য মন্‌সবদারের হাতে দেওয়া হইত। তাহা সত্ত্বেও অপচয় বন্ধ হইত না। এই অসুবিধা দূর

করিবার জন্য আকবর কর্মচারীদের নগদ অর্থে বেতন দিয়া জায়গিরগুলিকে সরকারের খাসজমিতে রূপান্তরিত করিতে চেষ্টা করিতেন। মন্‌সবদারদের বেতনের পরিবর্তে জায়গির দিবার সময় পরিষ্কার ভাবে বলা হইত, জায়গির মানে জমির মালিকানা নয়, বেতনের সমপরিমাণ খাজনার অংশ ভোগ করা মাত্র। আকবরের সময়ে এই ব্যবস্থার কোন বিচ্যুতি ঘটে নাই। কিন্তু আওরঙ্গজেবের আমলে মন্‌সবদারদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়। তদনুযায়ী জায়গিরের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নাই। উপরন্তু জায়গির বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া থাকিত। ফলে মন্‌সবদারগণ জায়গির নিলামে ইজারাদারদের বিক্রয় করিতেন। ইহার ফলে যে জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা মোগল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

● **মোগল আমলের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা ঃ** মোগল যুগে সরকারের আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি-রাজস্ব। মুজাফ্‌ফর খান ও রাজা টোডরমলের মত বিচক্ষণ দেওয়ানদের উদ্যোগে আকবরের রাজত্বকালে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা সুসংহত ব্যবস্থা হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। মোগল ভূমি-ব্যবস্থা ছিল শের শাহর অনুসৃত ব্যবস্থার এক উন্নত সংস্করণ। ভূমি-রাজস্বের ক্ষেত্রে তিন রকমের ব্যবস্থা দেখা যায় যাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

রাজস্বের এই ব্যবস্থা সরকার ও রায়ত উভয়েরই স্বার্থের অনুকূল ছিল। সরাসরি রায়তদের সহিত বন্দোবস্ত হইবার ফলে একদিকে যেমন সরকার রাজস্বের পরিমাণ সম্পর্কে সচেতন থাকিত (কম অর্থ প্রদান করিয়া সরকারকে প্রতারিত করা যাইত না), অন্যদিকে তেমনি স্বত্ব লাভ করিয়া কৃষক জমি হইতে উচ্ছেদের আশংকা হইতে এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের নির্যাতন হইতে মুক্ত হইয়াছিল। ফলে ভূমি-রাজস্ববাবদ আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ফসলের $^{১}/_{৩}$ অংশ রাজকর হিসাবে দেওয়া কৃষকদের পক্ষে কষ্টকর ছিল। শাহজাহান এবং আওরঙ্গজেবের আমলে রাজস্বের পরিমাণ আরও বাড়াইয়া $^{১}/_{২}$ অংশ করা হইয়াছিল। ইহার ফলে ব্যাপক কৃষক বিক্ষোভ ঘটে যাহা মোগল শাসনের ভিত্তিকে দুর্বল করিয়া দিয়াছিল।

রাজস্ব আয় বৃদ্ধি

রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন দেওয়ান, আমিলসুজার, বিতিকচি, পাটোয়ারী, কানুনগো, আমীন ইত্যাদি।

● **সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী ঃ** মোগলযুগে ভারতবর্ষে বহু ইউরোপীয় পর্যটক আসিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন র‍্যালফ্‌ফিচ, উইলিয়ম হকিন্স, স্যার টমাস রো, পেলসার্ট, ট্যাভার্নিয়ে, বোর্নিও এবং মানুচি। বিদেশী ভ্রমণকারীদের লিখিত বিবরণী হইতে সমকালীন ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। আবুল ফজল প্রমুখ লেখকদের রচনা হইতেও সমসাময়িক জনসমাজ সম্পর্কে বহু ঐতিহাসিক সংবাদের কথা জানা যায়। সামন্ততান্ত্রিক মোগল সমাজে সম্রাট ছিলেন ক্ষমতা ও মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতম। সম্রাটের নিম্নে ছিলেন অভিজাতবর্গ এবং প্রধান প্রধান রাজকর্মচারিগণ। সাধারণভাবে তাঁহারা উচ্ছৃংখল ও বিলাসময় জীবন যাপন করিতেন। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রধান উপজীবিকা ছিল ব্যবসায়-বাণিজ্য। সমাজের অধস্তন শ্রেণী ছিল কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ বৃত্তিজীবিগণ। করভার পীড়িত মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান কিন্তু উন্নত ছিল না।

বহু ঐতিহাসিক সংবাদ

মোগলযুগে হিন্দুদের মধ্যে সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা ও কৌলিন্য প্রথা চালু ছিল। সম্রাট আকবর বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ নিবারণ করিতে যাইয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন। মারাঠা ও জাঠদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল। মুসলিম মহিলাদের অনুকরণে হিন্দুসমাজে অবগুণ্ঠন ও অবরোধ প্রথা দৃঢ় করা হইয়াছিল। অন্যদিকে, অনেক বাদশাহ হিন্দু রমণী বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে হিন্দুদের বহু সামাজিক আচার অনুষ্ঠান প্রবেশ করিয়াছিল। জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর দুই সম্প্রদায়ের অগাধ বিশ্বাস

হিন্দু মুসলমানে পারস্পরিক প্রভাব

ছিল। মোগল আমলে, বিশেষ করিয়া আকবরের পরধর্মসহিষ্ণুতার ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর সম্প্রীতি এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাব অক্ষুণ্ণ ছিল।

ইউরোপীয় বণিক ও পর্যটকদের এবং পারসিক গ্রন্থসমূহ হইতে মোগল আমলের আর্থিক জীবনের চিত্র পাওয়া যায়। এই যুগেও জনগণের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ছিল ধান্য ও অন্যান্য খাদ্য-শস্য, ইক্ষু, নীল, তামাক, তুলা, রেশম ইত্যাদি। কৃষিদ্রব্যের ব্যাপক উৎপাদন ঘটিলেও

কৃষিজাত দ্রব্য

কৃষকদের অবস্থা বিশেষ উন্নত ছিল না। মোগল সম্রাটগণ ভারতের সুপ্রাচীন কুটির শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। বয়ন শিল্প ছিল সবচেয়ে উন্নত শিল্প। তুলা, রেশম ও পশম হইতে বস্ত্র বয়ন করা হইত। ঢাকার মসলিন বস্ত্রের খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া। বাংলার সাতগাঁ এবং গুজরাটের সুরাট ছিল তাঁত বস্ত্রের আবার দুই প্রধান কেন্দ্র। বারাণসী, আগ্রা ও মালবে রেশম এবং মিহি কাপড় বয়ন করা হইত। কাশ্মীরে পশমের শাল এবং লাহোরে কম্বল প্রস্তুত করা হইত। চামড়া শিল্পও ছিল যথেষ্ট উন্নত। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি ধাতব শিল্পও ছিল এই সময়কার বর্ধিষ্ণু শিল্প। মৃৎশিল্পও যথেষ্ট উন্নত ছিল। সমকালীন ভারতবর্ষে শিল্পজাত সামগ্রীর বেশ প্রাচুর্য ছিল। দেশের চাহিদা মিটাইয়া এইসব সামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করা হইত। বিদেশে ভারতীয় দ্রব্যের কদর ছিল। ইহা ছাড়া, বাংলা ও বিহারে প্রচুর পরিমাণে সোরা উৎপন্ন হইত। বারুদ তৈয়ারি করিবার জন্য উহা বিদেশে রপ্তানি করা হইত।

মোগল যুগে স্থলপথে কান্দাহার, তিব্বত ও নেপালের সহিত এবং জলপথে ইউরোপ ও এশিয়ার

বাণিজ্য

বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তবে ভারতীয় বণিকগণ সমুদ্র পথে বাণিজ্য করিতে খুব পারদর্শী ছিলেন না। কালক্রমে সমুদ্রে বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে করায়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন বিদেশী বণিকের দল। সুরাট, ভারুচ, ক্যাম্বে, ব্যাসিন, গোয়া, সপ্তগ্রাম, কালিকট ইত্যাদি বন্দরগুলি ছিল মোগল আমলের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র।

মোগল যুগে ভারতবর্ষে ইউরোপীয় বণিকগণ লাভজনক ব্যবসা করিতেন। পর্তুগীজগণ অবশ্য মোগল শাসন শুরু হইবার আগেই ভারতে বাণিজ্য করিতেন। ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী বণিকরা আসেন জাহাঙ্গীরের শাসনকালে। ওলন্দাজগণ ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার 'মশলা দ্বীপপুঞ্জে'

ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়

ব্যবসা করিতে অধিকতর আগ্রহী ছিলেন। অন্যদিকে এইসময় হইতে পর্তুগীজদের বাণিজ্য আধিপত্য ক্রমেই সংকুচিত হইতেছিল। ফলে ইংরেজ এবং ফরাসী—এই দুই বিদেশী বণিক সংস্থার মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। মোগল সম্রাটগণ সাধারণভাবে বিদেশী বণিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় অনেক সময় রাজকীয় আইন-নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া বেআইনী কার্যকলাপ চালাইতেন। ফলে জাহাঙ্গীর, শাহজাহান এবং আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে কোন কোন ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে বিদেশী বণিকদের ব্যবসা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

বিদেশী বণিক ও পর্যটকগণ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা বিশেষ জোর দিয়া বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই বিপুল বৈভব মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের হাতে সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ মানুষের অবস্থা ছিল শোচনীয়। জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার ক্ষমতাও অনেক সময় তাহাদের থাকিত না।

● **মোগল আমলের শিল্পকলা ও সাহিত্য ঃ** মোগল সম্রাটগণ (আওরঙ্গজেব ব্যতিরেকে) সকলেই

শিল্প ও কীর্তি

ছিলেন সৌন্দর্যপ্রিয় শিল্পরসিক। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপত্য ও চিত্র শিল্পের অভাবনীয় বিকাশ ঘটিয়াছিল। সুলতানী আমলের স্থাপত্য-রীতিতে হিন্দুমুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ের যে সূচনা দেখা গিয়াছিল মোগল যুগে তাহা সম্পূর্ণতা লাভ করে। প্রথম দুই মোগল সম্রাটের আমলে কোন উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কীর্তি নাই। কিন্তু আফগান সম্রাট শের শাহ শিল্পানুরাগী ছিলেন। তাঁহার শিল্প সৃষ্টির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল দিল্লীর 'পুরানা কেল্লা' এবং

সাসারামের স্বনির্মিত সমাধি-সৌধ। সাসারামের সমাধি-সৌধে হিন্দু ও মুসলিম রীতির সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে মোগল স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটিয়াছিল। শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রেও তিনি উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু-মুসলিম শিল্পাদর্শ ও শিল্পরীতির পূর্ণ মিলন হইয়াছে। দিল্লী, আগ্রা ও ফতেপুর-সিক্রীতে তাঁহার আমলে নির্মিত প্রাসাদ, দুর্গ ও সৌধগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বুলন্দ দরওয়াজা, পাঁচমহল, ইবাদাৎ খানা, যোধপুরী মহল, সেলিম চিস্তীর সমাধি, হুমায়ুনের সমাধি ইত্যাদি। সেকেন্দ্রায় আপন সমাধি-সৌধের পরিকল্পনা তাঁহার জীবদ্দশায় প্রস্তুত হইয়াছিল।

জাহাঙ্গীরের আমলে স্থাপত্য শিল্পের তেমন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। শাহজাহান ছিলেন মোগল রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পরসিক। শিল্পসাধনা তাঁহার জীবনের স্বপ্ন ছিল। তাঁহার আমলের স্থাপত্য শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল আলঙ্কারিক কারুকার্য। আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, কাশ্মীর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে তাঁহার স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শন ছড়াইয়া আছে। ইহাদের মধ্যে দিল্লীর দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, মোতি মসজিদ, জুম্মা মসজিদ, লালকেল্লা এবং তাজমহল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। শিল্পসৃষ্টির দিক দিয়া তাজমহল এক অনন্যকীর্তি—'মর্মরের বেদনা-স্বপ্ন'। এই মসৃণ শ্বেত প্রস্তর নির্মিত মর্মর সৌধ নির্মাণ করিতে বাইশ হাজার শ্রমিকের বাইশ বছর সময় লাগিয়াছিল। ঈশা ছিলেন প্রধান স্থপতি। শাহজাহানের ময়ূর সিংহাসন ছিল শিল্পসৃষ্টির অপর একটি অপূর্ব নিদর্শন। ৮৬ লক্ষ টাকার মণি-মুক্তা ও এক লক্ষ তোলা সোনা দ্বারা ইহা নির্মিত হইয়াছিল।

আওরঙ্গজেবের আমল হইতে মোগল স্থাপত্য শিল্পের অবনতি ঘটে। গোঁড়া ও ধর্মান্ধ আওরঙ্গজেব কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য দিল্লীতে একটি মর্মর প্রস্তরের মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী মোগল শাসকগণও নূতন কোন কৃতিত্বের নজীর রাখিতে পারেন নাই।

হিন্দু স্থাপত্য

মোগল রাজত্বকালে কিছু কিছু হিন্দু মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, মানসিংহ নির্মিত বৃন্দাবনের একটি মন্দির এবং বীরসিংহ বুন্দেলা নির্মিত মথুরার কেশব দেও-এর মন্দির। শাহজাহানের রাজত্বকাল হইতে হিন্দুদের নূতন মন্দির নির্মাণ নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। আওরঙ্গজেবের আমলে কয়েকটি হিন্দু মন্দির ভাঙিয়াও ফেলা হইয়াছিল।

মোগল চিত্রকলা

মোগল সম্রাটগণ চিত্রশিল্পেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। স্থাপত্যের ন্যায় চিত্রশিল্পেও ভারতীয় ও বহির্ভারতীয় শিল্পনীতির এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। আকবর ও জাহাঙ্গীরের দরবারে বহু হিন্দু চিত্রশিল্পী উপস্থিত থাকিতেন। মোগল চিত্রকলার মধ্যে দরবার ও শিকারের চিত্রগুলি খুব বিখ্যাত ছিল। সম্রাটগণের মধ্যে জাহাঙ্গীর ছিলেন প্রধানতম চিত্রশিল্পরসিক। অপরপক্ষে, আওরঙ্গজেবের শাসনকালে চিত্রাঙ্কন ইসলাম বিরোধী বলিয়া গণ্য করা হইয়াছিল।

রাজপুত চিত্রকলা

কাংড়া অঞ্চলে রাজপুত চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই শিল্পরীতির প্রধান বিষয়বস্তু ছিল মহাকাব্য ও পুরাণের ঘটনাবলী। সঙ্গীতের প্রতিও মোগল সম্রাটগণের পরম অনুরাগ ছিল। আবুল ফজল সম্রাট আকবরের গভীর সঙ্গীত প্রীতির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার আমলে হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিশেষ প্রসার ঘটে।

সংগীত

শোনা যায় সম্রাট স্বয়ং কয়েকটি সুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তানসেন ছিলেন সমকালীন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম সঙ্গীতজ্ঞ। আওরঙ্গজেব ছিলেন সঙ্গীতের ঘোরতর বিরোধী। তাঁহার আদেশে সঙ্গীত নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

শিক্ষা

মোগল যুগে শিক্ষারও ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছিল। আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা চলিত। স্ত্রী শিক্ষাও সেই সময় প্রচলিত ছিল। মোগল সম্রাটগণের অনেকেই সাহিত্য রসিক ও সাহিত্য স্রষ্টা ছিলেন। রাজদরবারে কবি ও কাব্যের বিশেষ সমাদর ছিল। ইহা ছাড়া ইতিহাস ও দর্শন সাহিত্যও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সম্রাটগণের মধ্যে

বাবর ও জাহাঙ্গীর আত্মজীবনী লিখিয়াছিলেন এবং যুবরাজ দারা উপনিষদ অনুবাদ করিয়াছিলেন। রাজ পরিবারের মহিলাদের মধ্যে গুলবদন বেগম 'হুমায়ুন নামা' এবং শাহজাহান কন্যা আত্মজীবনী রচনা করিয়াছিলেন। জাহানারা এবং আওরঙ্গজেব দুহিতা জেব-উন্নিসা ফারসী কবিতা রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। এই যুগে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি হিন্দুধর্মগ্রন্থ ফারসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। মোগল আমলে হিন্দী সাহিত্যেরও উন্নতি হইয়াছিল। তুলসী দাস রচিত 'রামচরিত মানস' শুধু এই যুগের নয়, সমগ্র হিন্দী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। সুরদাসের দোঁহাগুলিও হিন্দী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। আকবরের সভাসদ সুবিখ্যাত হাস্যরসিক বীরবল হিন্দী ভাষায় সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। মোগল যুগে আবুল ফজল, বদাউনী, কাফী খাঁ প্রমুখ ঐতিহাসিকদের (আকবর নামা, আইন-ই-আকবরী, মন্তাখাবাৎ-ই-তারিখ ইত্যাদি) গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, শাহজাহান সম্বন্ধে আব্দুল হামিদ লোহারীর 'বাদশাহনামা' এবং আওরঙ্গজেব সম্পর্কে মির্জা মহম্মদ কাজিমের 'আলমগীর নামা'ও উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

সাহিত্য, কাব্য, ইতিহাস ইত্যাদি

মোগল যুগে বাংলাদেশে সাহিত্যের বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের ব্যাপক বিকাশ দেখা গিয়াছিল। বৈষ্ণব লেখকদের মধ্যে 'চৈতন্য-চরিতামৃত' রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ, 'চৈতন্য ভাগবত' রচয়িতা বৃন্দাবন দাস, 'চৈতন্য মঙ্গল' রচয়িতা জয়ানন্দ এবং 'ভক্তি রত্নাকর' গ্রন্থের লেখক নরহরি চক্রবর্তী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া, বাংলায় মহাভারত রচয়িতা কাশীরাম দাস, চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম এবং অন্নদামঙ্গল কাব্যের লেখক ভারতচন্দ্র মোগলযুগেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বাউল সঙ্গীতে হিন্দু-মুসলমান মিলনের সুর ধ্বনিত হইয়াছে।

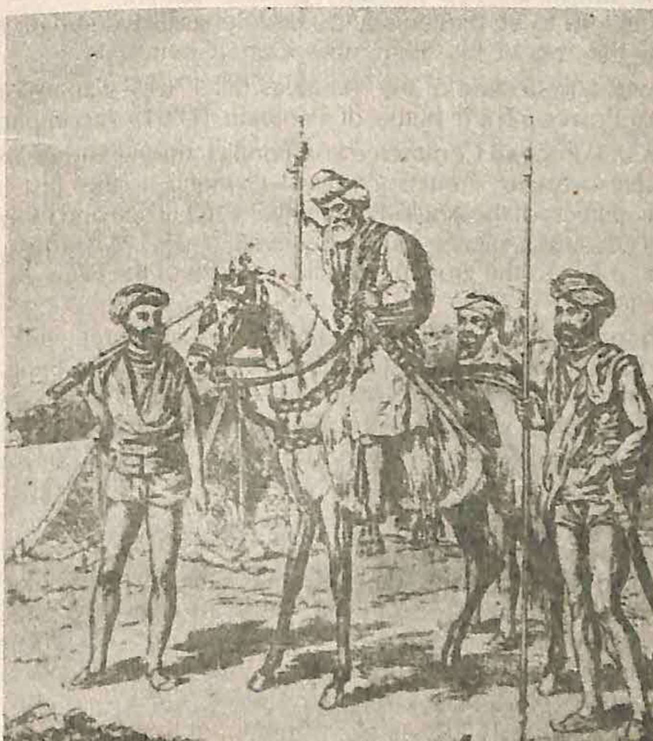
বাংলা সাহিত্যের বিকাশ

"মোগল যুগে দক্ষিণ ভারতে স্থাপত্য শিল্পের মূল্যবান সৃষ্টি ঘটিয়াছিল। বিজাপুরের বিখ্যাত 'গোলগম্বুজের' (গম্বুজটির পরিধি রোমের 'পন্থিয়ান'-এর চেয়ে বড়) তাজ সুলতানার সমাধি যেন তাজমহলের সঙ্গে উপমা করা চলে। বিজাপুরের মসজিদের দেওয়ালে ইতালীয়ান চিত্রকরের আঁকা ছবি আছে। গোলকুণ্ডাও বড় কম যায় নি শিল্পকর্মের প্রতিযোগিতায়।"

দক্ষিণ ভারতের শিল্পকলা

ভারত ইতিহাসের আধুনিক যুগ

[১৭০৭—১৮৫৭ খ্রীঃ পর্যন্ত]



WEST BENGAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

HISTORY SYLLABUS FOR CLASS IX

MODERN PERIOD (1707 A. D—1857 A. D)

HISTORY OF INDIA : 1707-1857

1) Decline and disintegration of the Mughal Empire—beginning of the process during Aurangzeb's time—threaits to the Mughal Empire from different quarters—drain on the mperial finances due to wars–implications of the fast increasing jaigirs, increased factionalism in the Mughul Court—different parties and factions—Weakness of the successors of Aurangzeb—power struggle—the nobles etc. further consolidated their powers;Central control over the different Subas and regions gradually disappeared,—effects of the invasion of Nadir Shah.

2) Growth of regional powers (emphasis on those, whose encounters with the British affected the later political scene.)

i) The regions to be particularly studied Bengal, Hyderabad, Mysore, Awadh, the rise of the Sikhs upto Guru Govind.

ii) Growth and decline of the Marathas (till 1761)—Expansion of the Maratha Power—Third battle of Panipath (1761)—its impact.

3) Growth of European Commerce and conflict among European trading Companies—Anglo - French conflict—Carnatic : the first area of conflict—Effects of the Anglo-French rivalry in Europe and elsewhere—War of Austrian succession and Seven Years' War—Reaction of Carnatic rulers to the growing conflict—Result of the Wars—causes of French failure.

4) Growth of English East India Company's Commerce and political power in Bengali till 1765—Growth of English trade in Bengal in the first half of 18th Century--Farman of 1717—frictions with the Nawabs—conflict between the English and Siraj from 1756 to Plassey—its results—conflict with Mir Qasim : Buxar (1764)—Dewani (1765).

5) 1767 – 1857

British Imperial Expansion :

(The War operations to be described as briefly as possible. The main stress should be given on (a) The British Motives, (b) The decisive factors in the British victory) —

(a) Marathas (one long narrative)

(b) Mysore (-do-)

Subsidiary Alliance (1798) as an instrument of British political control.

(c) Other conquests, (excluding relationship with the Sikhs—Anglo-Sikh relations till the death of Ranjit Singh.

(d) Annexation of the Punjab.

(e) Dalhousie and British imperial expansion—Novel features.

6) Administrative Foundations

i) Nature of the growth of British political power till 1765 (two short paragraphs)—Implications of Diwani of 1765—and of Diarchy in 1772.

ii) Growth of centralisation : (Hastings to Cornwallis)

iii) Organisation of a new and judicial and police system.

iv) Need for an increased income from land-revenue—Types of arrangements in this connection—their broad effects.

7) Industry and Trade

Expansion of India's foreign trade and decline of some Indian industries—(To stress, cotton-goods during the period, 1765-1857)

8) The Cultural Scene

i) Brief note on the old educational system : The Changes : English Education—Decline of Vernacular Education. Contact with western culture.

ii) A history of social and cultural Movements with special reference to Bengal and Maharashtra.

9) Peasant unrest and uprisings

a) Peasant Rebellions—Ferazi—Wahabi Movement;

b) Tribal Movements—Kols—Santhals.

10) The Revolt of 1857—causes—

Extent of popular participation—leadership—Nature of the Revolt.

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদ কর্তৃক প্রবর্তিত ইতিহাস পাঠ্যক্রম

আধুনিক যুগ

(১৭০৭ খ্রীঃ—১৮৫৭ খ্রীঃ পর্যন্ত)

১) **মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঃ** জায়গীরের মূল্যবৃদ্ধি ও রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস। মোগল দরবারে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। আওরঙ্গজেবের দুর্বল উত্তরাধিকারী। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। আমীর ও অভিজাত ব্যক্তিদের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা। নাদির শাহের ভারত আক্রমণ।

২) **আঞ্চলিক শক্তির উত্থান ঃ** (ক) বাংলা, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, অযোধ্যা অঞ্চলের উত্থান কাহিনী। গুরু গোবিন্দ পর্যন্ত শিখ শক্তির অভ্যুদয়। (খ) মারাঠা শক্তির অভ্যুদয় ঃ মারাঠা ক্ষমতা সম্প্রসারণ—পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১)—ইহার ফলাফল।

৩) **ইউরোপীয় বাণিজ্য নীতি ও পারস্পরিক সংঘর্ষ**—ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষ—কর্ণাটক ঃ সংঘর্ষের প্রথম অঞ্চল—ইউরোপে এবং অন্যত্র ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের ফল—অষ্ট্রিয় যুদ্ধের সাফল্য এবং সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ—ক্রমবর্দ্ধমান সংঘর্ষে কর্ণাটক শাসকবর্গের প্রতিক্রিয়া—যুদ্ধের ফলাফল—ফরাসী পতনের কারণ।

৪) **ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তার ঃ** (১৭৬৫ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্ধকাল

পর্যন্ত ইংরেজ বাণিজ্য বৃদ্ধি। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দের ফারমান। ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের দ্বন্দ্ব। ইংরেজ ও সিরাজের মধ্যে দ্বন্দ্ব। ১৭৫৬ পলাশীর যুদ্ধ। যুদ্ধের ফলাফল—মীরকাশিমের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও বক্সারের যুদ্ধ।

৫) ১৭৬৭-১৮৫৭—বৃটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ঃ [যুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা সহ (ক) ব্রিটিশ অগ্রগতি এবং (খ) যুদ্ধ-সাফল্যের নিয়ামক সূত্র আলোচনা।]

(ক) মারাঠা (একটি বিশদ বিবরণী)

(খ) মহীশূর "

দ্বৈত শাসন—ব্রিটিশ রাজনীতি

(গ) অন্যান্য বিজয় (শিখ—ইঙ্গ-শিখ সম্পর্ক বাদে : রঞ্জিৎ সিংহর মৃত্যু পর্যন্ত)

(ঘ) পাঞ্জাব সম্প্রসারণ

(ঙ) ডালহৌসি ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার—মূল ঘটনাবলী।

৬) ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনের ভিত্তিস্থাপন ঃ (ক) দুইটি অনুচ্ছেদে ব্রিটিশ রাজনীতির (১৭৬৫ পর্যন্ত) প্রকৃতি বিশ্লেষণ—১৭৬৫-এর দেওয়ানী ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

(খ) কেন্দ্রীকরণ পর্যালোচনা (হেস্টিংস থেকে কর্ণওয়ালিস)

(গ) নতুন শাসন ও বিচার নীতির পর্যালোচনা

(ঘ) ভূমিরাজস্ব হইতে বর্দ্ধিত আয় ও তাহার বিস্তৃতি পর্যালোচনা

৭) শিল্প ও বাণিজ্য

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি—ভারতীয় শিল্পের (মূলত বস্ত্রশিল্প ১৭৬৫-১৮৫৭) আলোচনা।

৮) সংস্কৃতির বিকাশ

(ক) পুরানো শিক্ষা পদ্ধতি—পরিবর্তন। ইংরেজী শিক্ষা—মাতৃভাষা শিক্ষার রূপরেখা, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব।

(খ) বাংলা ও মহারাষ্ট্রে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ইতিহাস।

৯) কৃষি-বিদ্রোহ ও তাহাদের উত্থান

(ক) কৃষক বিদ্রোহ—ফরাজী-ওয়াহাবি আন্দোলন

(খ) কোল-সাঁওতাল বিদ্রোহ।

১০) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ

মহাবিদ্রোহের কারণ, বিস্তার—নেতৃত্ব—প্রকৃতি আলোচনা।

দশম অধ্যায় ‖ মোগল রাজশক্তির অবক্ষয়

● মোগল সাম্রাজ্যের পতন ●

আওরঙ্গজেবের সুদীর্ঘ রাজত্বকালেই মোগল রাজশক্তির অবক্ষয়ের সূচনা ঘটিলেও, সম্রাটের ব্যক্তিত্ব তাহাকে অনেকখানি আড়াল করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে আহমদনগরে তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যের সংকট তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিল। সিংহাসন লইয়া দ্বন্দ্ব ছিল মোগল রাজবংশের ঐতিহ্যগত অভিশাপ। আওরঙ্গজেবের পুত্রদের মধ্যেও তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটিল। শাহাজাহাদের মধ্যে শুরু হইল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। যুদ্ধে আজম ও কামবক্স প্রাণ হারান। অতঃপর আওরঙ্গজেবের একমাত্র জীবিত পুত্র মুয়াজ্জম 'বাহাদুর শাহ' উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করেন ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি প্রথম শাহ আলম (১৭০৮-১৭১২ খ্রীঃ) নামেও ইতিহাসে পরিচিত। ব্যক্তিগত জীবনে কিছু কিছু গুণের অধিকারী হইলেও, মোগল সাম্রাজ্যের দ্রুতগামী অধঃপতনকে প্রতিহত করিবার মত সামরিক শক্তি বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তাঁহার ছিল না। ১৭১২ সালে তাঁহার মৃত্যুর পর আবার গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। তাঁহার তিন পুত্রকে হত্যা করিয়া অবশিষ্ট সন্তান জহান্দর শাহ ওয়াজীর বা প্রধানমন্ত্রী জুলফিকর খানের সাহায্যে সিংহাসন দখল করিয়া বসেন। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই জহান্দর শাহর ভ্রাতুষ্পুত্র ফাররুক-শিয়র (১৭১৩-১৭১৯ খ্রীঃ) সম্রাট এবং ওয়াজীরকে লালকেল্লায় বন্দী ও হত্যা করিয়া মোগল সিংহাসন অধিকার করেন। ফাররুক-শিয়রকে এই কার্যে সাহায্য করিয়াছিলেন 'সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়' নামে পরিচিত সৈয়দ হুসেন আলি খাঁ (পাটনার সহকারী সুবাদার) এবং সৈয়দ আবদুল্লা আলি খাঁ (এলাহাবাদের সহকারী শাসনকর্তা)। কিন্তু এই নতুন শাসকের চরিত্রে রাজোচিত গুণের অভাবে প্রকৃত ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকেন সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়। পরে সম্রাটের সহিত তাঁহাদের বিরোধ দেখা দেওয়ায় উহারা ফাররুক-সিয়ারকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া হত্যা করেন। অতঃপর মোগল সিংহাসনে উপবেশন করেন জহান শাহর (১ম বাহাদুর শাহর অন্যতম পুত্র) পুত্র মহম্মদ শাহ (১৭১৯-১৭৪৮ খ্রীঃ)। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সাহায্যে ক্ষমতা দখল করিলেও মহম্মদ শাহর সহিত তাঁহাদের বিরোধ ঘটে। সম্রাট চক্রান্ত করিয়া আবদল্লা আলি খাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন, অপর ভ্রাতা হুসেন আলি খাঁও নিজাম-উল-মুলকের সহিত লড়াই করিতে করিতে প্রাণ হারান। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পর মোগল দরবারে



বাহাদুর শাহ

সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তিতে পরিণত হন নিজাম-উল-মূলক আসফ জা। মহম্মদ শাহর রাজত্বকালেই মোগল সাম্রাজ্যের "অন্তিম লগ্ন" ঘনাইয়া আসিল। হায়দ্রাবাদ, অযোধ্যা ও বাংলা সুবা সম্রাটের হস্তচ্যুত হইয়া গেল এবং জাঠ, রোহিলা প্রভৃতি জাতিরাও দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করিল। অপরদিকে মারাঠা আধিপত্য বাড়িয়াই চলিল। এই সময় ১৭৩৯ সালে পারস্য সম্রাট নাদির শাহ ভারতবর্ষে এক বিধ্বংসী অভিযান চালান। নাদির শাহর আক্রমণ শুধু রাজধানী দিল্লী নয়। ভারতের মোগল শাসনকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিল।

পরবর্তী সম্রাট ছিলেন আহমদ শাহ (১৭৪৮-১৭৫৪ খ্রীঃ)। সাম্রাজ্যের অবনতি তখন এমন পর্যায়ে নামিয়া আসিয়াছিল যে তাহা রোধ করিবার মত ক্ষমতা আহমদ শাহর ছিল না। এই সময় শিখগণও স্বাধীন ক্ষমতা অর্জন করিয়া লইয়াছিলেন। সম্রাটের দরবারে তখন প্রধান পরিচালক ছিলেন নিজাম-উল-মূলকের পৌত্র ইমাদ-উল-মূলক। ১৭৫৪ সালে ইনি আহমদশাহকে অপসারিত করিয়া জহন্দার শাহর এক পুত্র দ্বিতীয় আলমগীরকে (১৭৫৪-৫৯ খ্রীঃ) সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। সম্রাট ওয়াজীরের প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে তাঁহাকে হত্যা করা হয় এবং নূতন শাসক হন দ্বিতীয় শাহ আলম (১৭৫৯-১৮০৬ খ্রীঃ)। শাহ আলমের আমলে সাম্রাজ্যের আয়তন হ্রাস পাইয়া দিল্লী ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকিল। কথিত আছে, "দ্বিতীয় শাহ আলমের রাজ্য ছিল দিল্লী (লালকেল্লা) হইতে পালম' (বর্তমানে দিল্লীর বিমান বন্দর)। ওয়াজীর ইমাদ-উল-মূলকের প্রভাব হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতে যাইয়া তিনি ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ইংরেজ কোম্পানীর বৃত্তিভোগী হিসাবেই জীবন ধারণ করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪ খ্রীঃ) মীরকাশিমের অন্যতম সহযোগী ছিলেন দ্বিতীয় শাহ আলম এবং এই মোগল সম্রাটের 'ফারমান' অনুযায়ী ১৭৬৫ সালে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের অধিকার অর্থাৎ দেওয়ানীর অধিকার অর্জন করেন। দ্বিতীয় শাহ আলমের পুত্র দ্বিতীয় আকবর (১৮০৬-১৮৩৭ খ্রীঃ) কোনক্রমে রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ অধিকার করিলেন। অবশেষে সিংহাসনে উপবেশন করেন মোগল রাজবংশের সর্বশেষ সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭-৫৮ খ্রীঃ)। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে তিনি বিদ্রোহীদের সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন, বিদ্রোহী বাহিনী তাঁহাকে হিন্দুস্থানের সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন

খুনী দরওয়াজা

স্বাভাবিকভাবেই বিদ্রোহের অবসানের পর বিজয়ী ইংরেজ কোম্পানী তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত ও বন্দী করেন। সম্রাটকে ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়, সেই খানেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। অন্যদিকে, বাহাদুর শাহর পুত্র-পৌত্রদের দিল্লী শহরে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়। রাজধানী দিল্লীর "খুনী দরওয়াজা" এই নৃশংস ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে। ১৮৬২ সালে ব্রহ্মদেশে বাহাদুর শাহর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মোগল রাজবংশের অবসান ঘটে। মোগল রাজবংশের প্রথম ছয়জন সম্রাট দক্ষতা ও যোগ্যতার সহিত দীর্ঘ ১৮১ বৎসর (১৫২৬ হইতে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) শাসন করিয়া মধ্যযুগের পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য শক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন আর পরবর্তী ১৫০ বৎসরে (১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ) এগার জন অপদার্থ শাসক সেই সাম্রাজ্যের পতন সংঘটিত করেন, "গৌরবে যার সূত্রপাত, অগৌরবে তার অবসান"।

● মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ●

১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে মোগল রাজশক্তির সূচনা করেন বাবর। পাঠান সম্রাট শের শাহর হাতে সাময়িক বিপর্যয়ের পর পানিপথের সেই ঐতিহাসিক প্রান্তরেই বাবর-পৌত্র আকবর নূতন করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। অতঃপর শুরু হয়

আকবরের নেতৃত্বে মোগল শাসনের ক্রম প্রসারণ। পূর্বে আসাম হইতে পশ্চিমে গুজরাট, উত্তরে কাশ্মীর এবং উত্তর-পশ্চিমে কাবুল হইতে দক্ষিণ ভারতের আহম্মদনগর ও খান্দেশ পর্যন্ত বহুধা-বিস্তৃত মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা মধ্যযুগের ইতিহাসের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ঘটনা। জাহাঙ্গীরের শাসনকালে সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক সীমা অক্ষুণ্ণ থাকে। শাহজাহানের আমলে উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ মোগল শাসন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অঞ্চলটি পুনরধিকৃত না হইলেও আওরঙ্গজেবের সুদীর্ঘ শাসনকালে মোগল সাম্রাজ্যের চরমতম বিস্তৃতি ঘটে। আয়তনে ও বিশালতায় ভারতের মোঘল সাম্রাজ্যের সমকক্ষ সাম্রাজ্য সমকালীন পৃথিবীতে বিরল ছিল। আবার এই আওরঙ্গজেবের আমলেই মোগল সাম্রাজ্যের ক্ষয়ের সূচনা দেখা দেয়। তাঁহার অনুদার ও অদূরদর্শী নীতির ফলে সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি দুর্বল হইয়া পড়ে এবং তাঁহার মৃত্যুর অর্ধশতাব্দীর মধ্যে একদা-বিশাল মোগল সাম্রাজ্য সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

আওরঙ্গজেবের শাসনকাল হইতেই মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত ঘটে। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও তিনি সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করিয়া দক্ষিণ ভারতের অভ্যন্তরে মোগল সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের এই বিস্তৃতি ঘটাইতে যাইয়া তাঁহাকে অর্থ ও জনসম্পদের বিপুল ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বস্তুতঃপক্ষে তৎকালীন যোগাযোগ ও যানবাহন ব্যবস্থা এবং সমকালীন আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একটি কেন্দ্র হইতে এইরূপ বিরাট সাম্রাজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। ইহারই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে আলমগীরের শাসনকাল হইতে প্রশাসনিক সতর্কতার অভাবে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নতা-বোধ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

আকবর যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের আন্তরিক সমর্থন এবং স্বাভাবিক আনুগত্য লাভ করিতে না পারিলে 'বহিরাগত' মোগলদের পক্ষে ভারতবর্ষে দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপন করা সম্ভব হইবে না। বাস্তব রাজনীতিবোধ দ্বারা চালিত হইয়া আকবর সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সমদর্শী নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান মোটামুটি একই নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কোন মানুষের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই। মোগল শাসকদের এই ধর্মসহিষ্ণু নীতি সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও সংহতি দৃঢ় করিয়াছিল। আওরঙ্গজেব কিন্তু পূর্বসূরীদের উদারতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা বর্জন করিয়া ইসলামীয় বিধি অনুযায়ী রাষ্ট্রশাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ধর্মীয় সংকীর্ণতাবোধে আচ্ছন্ন হইয়া তিনি হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর পুনঃস্থাপন করেন এবং রাজকর্মচারী পদ হইতে হিন্দুদের বিতাড়িত করেন। তাহাদের ধর্মীয় মেলা, সমাবেশ, আয়োজনও নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সম্রাটের আদেশে নূতন হিন্দু মন্দির নির্মাণ নিষিদ্ধ এবং পুরাতন মন্দিরগুলির (যেমন কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির বা মথুরার কেশব রায়ের মন্দির) ধ্বংস করা হয়। আওরঙ্গজেবের এই ধর্মনীতির প্রতিঘাতে হিন্দুদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রাজপুত, জাঠ, শিখ, সৎনামী প্রভৃতি বিদ্রোহের মধ্য দিয়া হিন্দুদের মধ্যে এই মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে। গুরু তেগবাহাদুরের হত্যা শিখগণ কোনোদিন ভুলিতে পারেন নাই। সম্প্রতি কোন কোন লেখক আওরঙ্গজেবের ধর্মবিষয়ক নীতির সপক্ষে নূতন যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, সম্রাট প্রবল হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন না। তাঁহার অধীনে বহু হিন্দু কর্মচারী ছিলেন। রাজনৈতিক কারণে দুই একটি ক্ষেত্র ব্যতীত সম্রাট বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু আওরঙ্গজেবের নীতির সমর্থনে যাহাই বলা হউক না কেন, একথা নিশ্চিত বলা যায় যে, তিনি আকবর অনুসৃত উদারনীতি পরিত্যাগ করিয়া অ-মুসলমানদের ক্ষেত্রে সংকীর্ণ নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ধর্মীয় সংকীর্ণতা বোধ

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, অষ্টাদশ শতকের মারাঠা, রাজপুত, জাঠ বা শিখ নেতারা হিন্দু সম্প্রদায়ের রক্ষক বা

অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেন নাই। ধর্মের প্রশ্নটিকে তাঁহারা নিতান্ত ব্যক্তিগত বা স্বীয় সম্প্রদায়গত স্বার্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন। ধর্মনির্বিশেষে, জমিদার এবং উচ্চ বর্ণের শাসকগোষ্ঠীভুক্ত মানুষ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের উপর চরম নির্যাতন চালাইয়া গিয়াছিলেন। আগ্রা, অযোধ্যা বা বাংলায় হিন্দু অথবা মুসলমান কৃষককে যে উচ্চ হারে রাজস্ব দিতে হইত, মহারাষ্ট্র অথবা রাজপুতনায় তথাকার হিন্দু শাসকগণও প্রজাসাধারণের নিকট হইতে তদনুরূপ উচ্চ হারে রাজস্ব আদায় করিতেন। বস্তুতঃ সমাজে দুইটি শ্রেণীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়—একদিকে উচ্চ শ্রেণীভুক্ত মানুষ (যাহাদের মধ্যে আছেন হিন্দু ও মুসলমান জমিদার সম্প্রদায়), অন্যদিকে সমাজের নিম্ন স্তরের সাধারণ মানুষ ও কৃষক সম্প্রদায়। জনৈক ঐতিহাসিক মন্তব্য করিয়াছেন, মধ্যযুগে ভারতীয় সমাজে তিন শ্রেণীভুক্ত মানুয বিদ্যমান ছিল—মুসলিম শাসক সম্প্রদায়, হিন্দু জমিদার ও আঞ্চলিক শাসক গোষ্ঠী এবং কৃষক (হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে)। সুতরাং ধর্মীয় বিচার বোধ নয়; ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত সুযোগ-সুবিধা, অধিকার ও ক্ষমতা দখলের প্রয়োজনেই আওরঙ্গজেব এবং তাঁহার বিরোধী গোষ্ঠী ধর্মকে ব্যবহার করিয়াছেন।

নির্বিশেষ নির্যাতন

আকবরের সময় হইতেই মোগল-রাজপুত মৈত্রী সাম্রাজ্যের এক প্রধান স্তম্ভরূপে বিবেচিত হইত। প্রকৃতপক্ষে রাজপুত শৌর্য ও আত্মত্যাগে মোগল সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। রাজপুতদের সামরিক নিপুণতা ও প্রশাসনিক দক্ষতা মোগল শাসনের ভিত্তিকে প্রসারিত ও গভীরভাবে প্রোথিত করিয়া দিয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ আওরঙ্গজেব রাজপুত-মৈত্রীর গুরুত্ব অনুধাবন করিতে পারেন নাই। বিদ্বেষমূলক নীতি গ্রহণ করিয়া তিনি হিন্দু সমাজের সবচেয়ে অগ্রণী শ্রেণী রাজপুতদের মোগল শাসনের প্রতি বিদ্বিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। শোনা যায় তাঁহারই চক্রান্তে রাজা যশোবন্ত সিংহ প্রাণ হারান। যশোবন্তের বিধবা পত্নী ও নাবালক পুত্রের প্রতি আওরঙ্গজেবের আচরণও রাজপুতদের রুষ্ট করিয়াছিল। ফলে তাঁহারা মোগল শাসনের বিরুদ্ধে চলিয়া যান।

আওরঙ্গজেব জীবনের দীর্ঘসময় ব্যয় করিয়াছিলেন শিবাজী ও মারাঠাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু মারাঠা শক্তিকে তিনি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করিতে পারেন নাই। মারাঠা শক্তি উত্থানের অনিবার্যতা উপলব্ধি করিয়া যদি তিনি তাঁহাদের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি স্বীকার করিয়া লইতেন, তবে সম্ভবতঃ তিনি আপনাকে ও সাম্রাজ্যকে বাঁচাইতে পারিতেন। আওরঙ্গজেব কিন্তু মারাঠা-মৈত্রী নীতি পরিত্যাগ করিয়া সংঘর্ষের পথ গ্রহণ করেন। মারাঠাদের বিরুদ্ধে তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী শত্রুতা ও সংঘর্ষ সেনাবাহিনীর দক্ষতা বিনষ্ট এবং রাজকোষ নিঃশেষ করিয়া দিয়াছিল। অন্যদিকে, দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘসময়ব্যাপী অবস্থান করিবার ফলে উত্তরভারতে শাসনতান্ত্রিক সংকট দেখা দেয় এবং ইহার সুযোগ লইয়া প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও আঞ্চলিক রাজশক্তিগণ মোগল শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীনতা ও আধিপত্য অর্জন করিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং আওরঙ্গজেবের ভ্রান্ত মারাঠা নীতিকে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, দক্ষিণভারতের শিখ রাজ্য দুইটি-বিজাপুর ও গোলকুন্ডা অধিকার করিয়া আওরঙ্গজেব অভ্যন্তরীণ শক্তি সাম্যনীতি বিঘ্নিত করেন। ইহার প্রতিক্রিয়া মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে শুভ হয় নাই। এই সুলতানী রাজ্য দুইটি মারাঠা শক্তির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। সুতরাং গ্রাস না করিয়া এই রাজ্য দুইটির সহিত সদ্ভাব রাখিতে পারিলে, আওরঙ্গজেবের পক্ষে শিবাজীকে দমন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইত।

আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতি ও ব্যবস্থাপনার ফলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।একদিকে রাজপুত অন্যদিকে মারাঠা—দুই সংগঠিত শক্তি মোগল সাম্রাজ্যের প্রাণশক্তি বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল জাঠ, সৎনামী, বুন্দেলা ও শিখ বিদ্রোহ। দিল্লী ও মথুরা অঞ্চলের জাঠেরা রাজারাম ও চূড়ামণির নেতৃত্বে মোগলদের বিরুদ্ধে দৃঢ়বদ্ধ সংগ্রাম চালাইয়া শেষ

পর্যন্ত স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। সৎনামীরা ছিলেন নিরীহ ভক্তিবাদী হিন্দু সম্প্রদায়। আওরঙ্গজেবের কর্মচারীদের জুলুমের প্রতিবাদে ইহারা প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করেন। নৃশংস অত্যাচারের মাধ্যমে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। কিন্তু "সৎনামী বিদ্রোহে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংহতি ও চেতনা কৃষকদের মধ্যে এক লড়াকু মনোভাব এনে দেয়।" আওরঙ্গজেবের সংকীর্ণ ধর্মনীতির প্রতিক্রিয়ায় চম্পত রায় নামে এক নেতার নেতৃত্বে বুন্দেলা বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। পরবর্তিকালে ছত্রসালের পরিচালনায় বুন্দেলাগণ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। আওরঙ্গজেবের নির্দেশে শিখগুরু তেগবাহাদুরের শিরচ্ছেদ ঘটিলে শিখ জাতীয়তাবাদ উত্তাল হইয়া উঠে। তেগবাহাদুরের পুত্র গুরু গোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বে শিখগণ একটি শক্তিশালী শ্রেণীতে পরিণত হন এবং আওরঙ্গজেব তাঁহার পরবর্তী মোগল শাসকদের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম চালাইয়া যান। এই বিদ্রোহগুলির সম্মিলিত প্রভাবে মোগল সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়।

সংকীর্ণ ধর্মনীতি

আওরঙ্গজেবের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধনীতি মোগল রাজকোষকে নিঃশেষ করিয়া দিয়াছিল। অবশ্য এই অর্থনৈতিক সংকটের সূচনা হইয়াছিল শাহজাহানের রাজত্বকালের আড়ম্বরপ্রিয়তার জন্য। কিন্তু শিল্পকর্মে বিপুল অর্থব্যয় করিলেও শাহজাহান বেশ হিসাবী ছিলেন। অপরদিকে উন্মত্ত নেশার মত আওরঙ্গজেব বৎসরের পর বৎসর অবিরাম যুদ্ধ চালাইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার এই ব্যয়বহুল যুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যের নানাস্থানের বিদ্রোহ দমনের জন্য অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের উদ্ভব হয়। উন্নত শিল্প ব্যবস্থা, বৈদেশিক বাণিজ্য ও কৃষির বিকাশ অর্থনীতিকে বলীয়ান করিতে পারিত। কিন্তু আকবর-পরবর্তী মোগল শাসকগণ কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের বিকাশের জন্য কোন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। মোরল্যান্ড মন্তব্য করিয়াছেন, "আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেশ যে দেউলিয়া তা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এই আর্থিক সংকট মোগল সাম্রাজ্যকে দ্রুত পতনের দিকে ধাবিত করিয়াছিল।"

আওরঙ্গজেবের শাসনকালে যে সংকটের সৃষ্টি হইয়াছিল, পরবর্তী সময়ে সেই অধঃপতন দ্রুততর হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার অন্যতম কারণ ছিল সিংহাসনের উত্তরাধিকারের প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়া শাহজাহাদের মধ্যে লড়াই। মোগল রাজবংশের একটি মারাত্মক অভিশাপ ছিল সিংহাসন লইয়া রক্তপাত ও ভ্রাতৃহন্তা। প্রত্যেক রাজত্ব শুরু ও শেষ হইত বিদ্রোহের মধ্য দিয়া। হুমায়ুনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন তাঁহার ভ্রাতৃত্রয়—কামরান, আসকারি, হিন্দাল। আকবরকে প্রথম জীবনে ভ্রাতা মীর্জা মহম্মদ হাকিম এবং শেষ জীবনে পুত্র যুবরাজ সেলিমের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইয়াছিল। আবার জাহাঙ্গীরের পুত্র খুরম (শাহজাহান) পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের হাত তো ভ্রাতৃহত্যার রক্তে রঞ্জিত। আওরঙ্গজেবের পরবর্তী শাসকদের ক্ষেত্রেও একই চিত্র দেখা যায়। প্রথম বাহাদুর শাহ এবং তাঁহার পরবর্তী জহান্দর শাহ ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে জয়ী হইয়া সিংহাসন দখল করেন। জহান্দর শাহকে হত্যা করেন ফারুক-শিয়র আবার তাঁহাকেও কারাগারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছিল। মোগল রাজপুত্রদের মধ্যে একটি কথা প্রচলিত ছিল—"তখ্‌ত য়া তখতা"—সিংহাসন অথবা কফিন—রাজপুত্রদের ইহাই ছিল অবধারিত ভাগ্য

উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব নানা দিক হইতে, বিশেষ করিয়া অষ্টাদশ শতকে, মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে শিথিল করিয়া দিয়াছিল। প্রথমতঃ, ইহার ফলে, বহু দক্ষ সেনাপতি, অভিজ্ঞ রাজকর্মচারী এবং সুপটু সৈনিক নিহত হইয়াছিলেন। প্রচুর অর্থহানিও ঘটিয়াছিল। ইহার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে সামরিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উপযুক্ত জনশক্তি এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পদের অপ্রতুলতা দেখা দেয়। অন্যদিকে, শাহজাদাদের পারস্পরিক বিরোধের সুযোগে স্বার্থান্বেষী ওমরাহের দল প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের পরবর্তিকালে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে অভিজাতদের ভূমিকার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। পূর্বের বিদ্রোহে ওমরাহগণ প্রতিদ্বন্দ্বী শাহজাহানের অধীনস্থ থাকিয়া চক্রান্তে অংশগ্রহণ করিতেন। পরবর্তিযুগে যুদ্ধরত

ওমরাহদের চক্রান্ত

যুবরাজগণ অভিজাতদের ক্রীড়নকে পরিণত হইয়াছিলেন। শাহজাদাদের সম্মুখে রাখিয়া আসল লড়াই শুরু হইয়াছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষী ওমরাহদের মধ্যে। জুলফিকার খাঁ, সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়—হুসেন আলি খাঁ ও আবদুল্লা আলি খাঁ নিজাম-উল-মূলক ইত্যাদি অভিজাতগণ উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব এবং শাসকদের অকর্মণ্যতার সুযোগ লইয়া প্রশাসনে ও দরবারে আপন আপন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী হইলেন। অভিজাতদের এই স্বার্থদুষ্ট কার্যকলাপ সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল।

মোগল রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা স্থাপনের এক পর্যায়ে কিন্তু অভিজাতগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈরাম খান হইতে মীরজুমলা পর্যন্ত অভিজাতগণের অবদান উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু আওরঙ্গজেবের পরবর্তিকালে মোগল অভিজাতদের মধ্যে সর্বপ্রকার নৈতিক অবনতি দেখা দেয়। পুরাতন ওমরাহদের ন্যায় ইহাদের কর্মনিষ্ঠা, সততা বা আনুগত্য বোধ ছিল না। অন্যদিকে, প্রচণ্ড দলাদলিতে ইহাদের মধ্যে সংহতি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই সময় মোগল অভিজাতগণ ইরানী-তুরানী-হিন্দুস্থানী—তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। বেশীর ভাগ ওমরাহের দল ছিলেন বিদেশী। আপন স্বার্থসিদ্ধির প্রতিযোগিতায় ইঁহারা রাষ্ট্রের স্বার্থকে উপেক্ষা করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। বস্তুতঃ অভিজাতদের স্বার্থ-দ্বন্দ্ব ও ষড়যন্ত্র সাম্রাজ্যের সংহতি বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল।

অভিজাতদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও স্বার্থপরতার প্রধান কারণ ছিল একদিকে জায়গিরের স্বল্পতা অন্যদিকে, বিশেষ করিয়া আওরঙ্গজেবের সময়কাল হইতে, অভিজাতদের ক্রম-বর্ধমান সংখ্যা। দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক ও সামরিক সাফল্য অর্জনের উদ্দেশ্যে আওরঙ্গজেব দক্ষিণী অভিজাতদের জায়গিরের প্রলোভন দেখাইয়া আপনার অনুকূলে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অথচ সকলকে সন্তুষ্ট করিবার মত পর্যাপ্ত জায়গিরের অভাব ছিল। আবার যে সমস্ত ভাগ্যবানদের জায়গির মিলিত অধিকাংশ সময়ে তাহা নিম্নমানের হইত। ফলে সকলেই অধিক আয়ের সম্ভাবনা-পুষ্ট উত্তর ভারতের জায়গির দাবি করিতেন এবং তাহার জন্য তদ্বিরও করিতেন। আবার অনেকে, অপেক্ষাকৃত দূরত্বে জায়গির পাওয়ায় তথায় যাইতে ইচ্ছুক থাকিতেন না। তাহারা তখন ইজারাদারদের নগদ মূল্যে জায়গির বিক্রয় করিয়া দিতেন। এই ক্রয়-বিক্রয়কে কেন্দ্র করিয়া নানাবিধ দুর্নীতি দেখা দিয়াছিল। অনেক সময় আবার সরকারের খাস জমি-খালসা-জায়গির হিসাবে দখল করিবার চেষ্টা চলিত। এইভাবে জায়গির স্বল্পতার দরুন নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল। বস্তুতঃপক্ষে, আওরঙ্গজেবের সময়কালে জায়গিরের সংকট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের মাত্রা তীব্র করিয়া তুলিয়াছিল।

জায়গির দাবি

এই জায়গির সংকটের সহিত যুক্ত ছিল জায়গিরদার ও ইজারাদারের অর্থলোলুপতা। তাঁহাদের ব্যয়ের মাত্রা অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়ায় কৃষকদের নিকট হইতে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের চেষ্টা শুরু হয়। ইতিপূর্বেই ভূমি-রাজস্বের হার শস্যের ১/৩ অংশ হইতে ১/২ অংশ করা হইয়াছিল। ইহার উপর জায়গিরদারগণ সরকারী আইন উপেক্ষা করিয়া কৃষকদের উপর বাড়তি করের বোঝা চাপাইয়া দিয়াছিলেন। অন্যদিকে, জায়গির হস্তান্তর নীতিও কৃষক শোষণের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। নানাবিধ কারণে জায়গির নূতন করিয়া বন্দোবস্ত হইত। ফলে, জায়গির ভোগ করিবার কালেই জায়গিরদারগণ যথাসম্ভব অর্থস্ফীত হইবার উদ্দেশ্যে কৃষকদের উপর অত্যাচার করিয়া অর্থ আদায় করিতেন। কৃষকশ্রেণীর উপর এই মাত্রাতিরিক্ত শোষণ ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি করে। বর্ধিত হারে খাজনা প্রদানে অসমর্থ হইয়া কৃষকগণ কৃষিকর্ম পরিত্যাগ করিয়া পালাইয়া যান এবং সশস্ত্র বিদ্রোহীতে পরিণত হন। বস্তুতঃপক্ষে, আওরঙ্গজেবের শাসনকালে জাঠ, সৎনামী, শিখ বিদ্রোহগুলি শুধু ধর্মীয় অসন্তোষের জন্য সংঘটিত হয় নাই। এইগুলি ছিল মূলতঃ কৃষক বিদ্রোহ। এই কৃষক অসন্তোষ ও বিদ্রোহের জন্য কৃষিকাজ অবহেলিত হয়। অন্যদিকে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় সাধারণভাবে আর্থিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

কৃষক শোষণ

ব্যক্তিত্বপরায়ণ সম্রাটের শাসনকালে অবশ্য অভিজাতগণ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া যোগ্যতা ও

বিশ্বস্ততার সহিত কর্তব্য-কর্ম পালন করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আওরঙ্গজেবের বংশধরগণের সম্রাটোচিত কোন গুণাবলীই ছিল না। মোগল রাজবংশের প্রথম ছয়জন সম্রাটের তুলনায় পরবর্তী এগার জন শাসক এতই অপদার্থ, অকর্মণ্য এবং অযোগ্য ছিলেন যে, একজন ঐতিহাসিক দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "আওরঙ্গজেবের মৃত্যু থেকে মুঘলরাজকাহিনী এমন একঘেয়ে আর অকিঞ্চিৎকর মনে হয় যে তার বিবরণ লেখা বা পড়া বিরক্তিকর হয়ে উঠে।" বাহাদুর শাহ, জহান্দর শাহ, ফাররুখ-সিয়র বা মহম্মদশাহ কাহারও পক্ষেই মোগল সাম্রাজ্যের দ্রুতধাবমান পতনের পথ রোধ করা সম্ভব ছিল না। রাজকার্য পরিচালনায় যে মানসিক দৃঢ়তা সাংগঠনিক প্রতিভা ও সামরিক নৈপুণ্যের প্রয়োজন—ইহারা কেহই তাহার অধিকারী ছিলেন না। আওরঙ্গজেবের এই ব্যক্তিত্বহীন উত্তরাধিকারিগণের চারিত্রিক দুর্বলতা মোগল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

মোগল সাম্রাজ্য গঠনে সেনাবাহিনী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। বাবর হইতে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত সম্রাটগণ সকলেই যেমন ব্যক্তিগতভাবে রণনিপুণ ছিলেন, অপরদিকে তেমনি সেনাবাহিনীকে সঠিকভাবে পরিচালিত করিতে পারিতেন। কিন্তু পরবর্তিকালে সামরিক বাহিনীর ত্রুটি-বিচ্যুতি নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী সম্বলিত মোগল সামরিক বাহিনী জাতীয় বাহিনী হিসাবে বিকশিত হইতে পারে নাই। ইহা ব্যতীত, রণনীতি বা রণকৌশলের দিক হইতেও সুনির্দিষ্ট কোন ধারা অনুসরণ করা সম্ভব হইল না। মোগল সম্রাটগণ জায়গিরদারদের উপর সামরিক দিক হইতে নির্ভরশীল থাকিতেন। সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় আবদ্ধ এই সেনাবাহিনী সম্রাটের প্রতি মানসিকভাবে অনুগত থাকিতেন না। মোগল সেনাশিবিরগুলিতেও নিয়ম, শৃংখলা এবং গতির অভাব ছিল। নর্তকী, হারেম, রসুইখানা ইত্যাদি সহ মোগল সেনাবাহিনীকে মনে হইত একটি চলমান শহর। এই সমস্ত নানা কারণে "মোগল সৈন্যদলে দেখা দেয় বিশৃংখলা, বিলাসিতা, অকর্মণ্যতা, সাজসজ্জার অকারণ আতিশয্য, সংগঠনের গণ্ডগোল, সংহতির অভাব।"

মোগল সাম্রাজ্য পতনের অন্যতম কারণ হইল জাতীয় চেতনার অনস্তিত্ব।। কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ জাতীয় স্বার্থের প্রতি অনুগত ছিলেন না। সকলেই ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতি বা ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিতেন। কৃষকগণের দৃষ্টি গ্রামের সংকীর্ণ চৌহদ্দির বাহিরে প্রসারিত হইত না। দীর্ঘকাল ধরিয়া নিপীড়িত থাকিতে থাকিতে তাহারা রাষ্ট্রীয় ঘটনা বা পরিবর্তন সম্পর্কে কোন আগ্রহ বোধ করিতেন না। তাহারা জানিতেন কোন অবস্থাতেই তাহাদের ভাগ্য পরিবর্তন ঘটিবে না। আঞ্চলিক শাসনকর্তাগণ কেন্দ্রীয় সরকারের সামান্যতম দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিদ্রোহী হইবার চেষ্টা করিতেন। বস্তুতঃ আপনাদের স্বার্থে তাঁহারা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন না। অভিজাতদের মধ্যেও জাতিবোধের আদর্শের অভাব ছিল। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহারা অনেকেই দক্ষ এবং নিপুণ থাকিলেও তাঁহাদের প্রতিভা স্ফুরণের দৃষ্টান্ত দেখা যায় স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপনে, সাম্রাজ্যের সংহতি ও সংগঠন বজায় রাখার প্রযত্নে নয়।

চরিত্রের দিক হইতে মোগল শাসন ছিল স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র। এই এক-কেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সাম্রাজ্যের সাফল্য, এমন কি অস্তিত্বও নির্ভর করে শাসকের ব্যক্তিগত দক্ষতা, উদ্যম ও সমরনিপুণতার উপর। প্রথম পর্বের মোগল সম্রাটগণের সকলেই উপযুক্ত ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী থাকায় সাম্রাজ্য শাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইয়াছিল। কিন্তু আওরঙ্গজেবের শাসনকালের দ্বিতীয় পর্ব হইতেই মোগল শাসনব্যবস্থায়, বিশেষ করিয়া উত্তর ভারতে, চরম শৈথিল্য দেখা দেয়। প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং স্থানীয় ভূস্বামীরা কেন্দ্রীয় শাসনকে অগ্রাহ্য করিয়া আঞ্চলিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হন।

সর্বস্তরে বিদ্রোহ ও অরাজকতা

উত্তর ও মধ্য ভারতের এক ব্যাপক অঞ্চলে বিদ্রোহ ও অরাজকতা দেখা দেয়। সুবাদার, দেওয়ান, ফৌজদারের দল, এমন কি নিয়ন্ত্রিত কর প্রেরণ করাও বন্ধ করিয়া দিলেন। এইভাবে শাসনব্যবস্থার দুর্নীতি, শৃঙ্খলাহীনতা, অবাধ্যতা এবং আনুগত্য-হীনতা নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে। শুধু বেসামরিক বিভাগেই নয়, সামরিক সংগঠনেও একই

চিত্র দেখা দিল। সেনাবাহিনীর বেতন দীর্ঘদিন বকেয়া থাকায় শৃঙ্খলা বিনষ্ট হইল। সর্বস্তরে মোগল শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভাঙিয়া পড়িল। ফলে বিদ্রোহী ও স্বেচ্ছাচারী রাজকর্মচারীদের বিরুদ্ধে কোন সক্রিয় বা কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার মত ক্ষমতা কোন শাসকের, এমন কি সম্রাট আওরঙ্গজেবেরও থাকিল না। এই সর্বব্যাপী প্রশাসনিক সংকটের সুযোগ লইয়া সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। জাঠ ও শিখগণ স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া তুলিলেন। মারাঠারা পেশোয়ার নেতৃত্বে শুধু দক্ষিণে নয়, উত্তর ভারতেরও রাজনৈতিক আধিপত্যের সম্প্রসারণ ঘটাইলেন। দাক্ষিণাত্যে নিজাম-উল-মূলক, বাংলা সুবায় মুর্শিদকুলি খাঁ স্বাধীন শাসন প্রবর্তন করেন। অযোধ্যা ও রোহিলাখণ্ডও স্বাধীনতা ঘোষণা করিল।

এইভাবে নানাবিধ অভ্যন্তরীণ কারণে যখন মোগল সাম্রাজ্যের 'নাভিশ্বাস' উঠিয়াছে, তখন নূতন করিয়া ভারতবর্ষে ঘটিল বিদেশী আক্রমণের ধারা। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল সুরক্ষিত রাখিবার গুরুত্ব অনুধাবন করিবার অক্ষমতা মর্মান্তিক বেদনার সঙ্গে উপলব্ধি করা গেল। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যের সম্রাট নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন। মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহ আক্রমণকারীর সহিত সন্ধি করিয়া তাঁহাকে দিল্লীতে লইয়া আসেন। একটি মিথ্যা গুজবকে কেন্দ্র করিয়া দিল্লীতে থাকাকালীন নাদিরের ফৌজের কয়েকজনকে হত্যা করিলে পারস্য সম্রাট যে ভয়াবহতা ও নিষ্ঠুরতার সহিত দিল্লীবাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইলেন, তাঁহার স্মরণে ভারতবাসী আজিও আতঙ্কে শিহরিত হন। শুধু ময়ূর সিংহাসন, কোহিনূর মণি সমেত কোটি কোটি টাকার মণি-মাণিক্য ও অলঙ্কারাদি নয়, দিল্লীর চাঁদনী চক আর জুম্মা মসজিদের সংলগ্ন এলাকার বসবাসকারী নাগরিকদের বর্বরতার সহিত নির্বিচারে হত্যা করা হইয়াছিল। সম্রাট ও অভিজাতদের "ক্লীবত্ব ও কাপুরুষতা" নাদির শাহর উন্মত্ত লুণ্ঠন ও নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড অপেক্ষা অধিকতরভাবে মোগল সাম্রাজ্যকে আঘাত করিয়াছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই আহমদ শাহ আবদালী পরপর নয়বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া মোগল সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল। ইতিমধ্যে ইউরোপীয় বণিকের দল, বিশেষতঃ ইংরেজ ও ফরাসীগণ বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর সমুদ্র উপকূলে বাণিজ্যিক ও সামরিক শক্তিকেন্দ্র গড়িয়া তোলেন। মোগল সম্রাটগণ—এমন কি আকবরও নৌবাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এই দুর্বলতার সুযোগে ইংরেজ ও ফরাসী কোম্পানী দুইটি রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপনে অগ্রসর হইলে তাহাদের বাধা প্রদান করা মোগল সম্রাটদের পক্ষে সম্ভব হইল না। আনুষ্ঠানিক ভাবে মোগল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিল ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে।

নাদির শাহের ভারত আক্রমণ

একাদশ অধ্যায় ॥ আঞ্চলিক শক্তির অভ্যুত্থান

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ কয়েকটি রাজ্যের উদ্ভব

এক ☐ বাংলা, হায়দ্রাবাদ ও অযোধ্যা

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙনের সুযোগ লইয়া কয়েকটি স্বাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। এই রাজ্যগুলি হইতেছে বাংলা, হায়দ্রাবাদ ও অযোধ্যা এবং মহীশূর, শিখ ও মারাঠা রাজ্য। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত রাজ্যগুলির প্রতিষ্ঠাতারা ছিলেন অভিজাত মোগল রাজকর্মচারী। মহীশূর[১] রাজ্যের স্রষ্টা হায়দর আলী ছিলেন একজন ভাগ্যান্বেষী কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী সৈনিক। শিখ ও মারাঠাগণ দীর্ঘকাল ব্যাপী সংগ্রাম করিয়া স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লক্ষণীয় বিষয়, বাংলা, হায়দ্রাবাদ ও অযোধ্যা স্বাধীনভাবে শাসিত হইলেও মোগল সম্রাটের প্রতি আনুষ্ঠানিক আনুগত্য প্রকাশ করিয়া চলিত। ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হইবার সূচনা পর্বে এই রাজ্যগুলি ভারতবর্ষের ইতিহাস ও রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিল।

বাংলা ঃ ১৭০০ সালে মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলা সুবার দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। এইসময় বাংলার সুবাদার ছিলেন আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-উস-খান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, মোগল সুবার প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকিতেন সুবাদার, দেওয়ান ছিলেন রাজস্ব-বিভাগের অধিকর্তা। মুর্শিদকুলি খাঁ দায়িত্বগ্রহণের সময় বাংলার রাজস্ব বিভাগ চরম বিশৃংখল অবস্থায় ছিল। সুবাদার ও তাঁহার অনুগ্রহভাজনদের দুর্নীতির জন্যই এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল। মুর্শিদকুলি খাঁ এই অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা করিলে সুবাদারের সহিত তাঁহার বিরোধ সৃষ্টি হয়। এই সময় দক্ষিণভারতে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আওরঙ্গজেবের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় এবং মুর্শিদকুলি খাঁকে মূলতঃ তিনি সেই উদ্দেশ্যেই বাংলার দেওয়ান পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ফলে দেওয়ান-সুবাদার দ্বন্দ্বে মুর্শিদকুলি সম্রাটের সমর্থন লাভ করেন এবং তাঁহার প্রশ্রয়ে স্বাধীনভাবে রাজস্ব বিভাগ পরিচালনা করিতে থাকেন। ১৭০২ সাল হইতে মুর্শিদকুলি প্রতি বৎসর নিয়মিতভাবে সম্রাটকে এক কোটি টাকা রাজস্ব প্রদান করিয়া বাংলায় আপনার অবস্থানকে দৃঢ় করেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর অবশ্য তাঁহাকে দক্ষিণ ভারতে স্থানান্তরিত করা হয়। দুই বৎসর পর ১৭১৩ সালে তিনি পুনরায় বাংলার দেওয়ান ও নায়েব-সুবাদার (সহকারী শাসনকর্তা) পদে নিযুক্ত হন। ১৭১৭ সালে সম্রাট ফররুখ-শিয়র তাঁহাকে সুবাদার পদে উন্নীত করেন।

দেওয়ান-সুবাদার দ্বন্দ্ব

মুর্শিদকুলি খাঁর সময় হইতেই বাংলার স্বাধীনতার সূত্রপাত হয়। আওরঙ্গজেবের অপদার্থ

---

(১) মহীশূর রাজ্যের উদ্ভব লইয়া পরে আলোচনা করা হইয়াছে।

উত্তরাধিকারিদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া তিনি বাংলার স্বাধীন শাসন শুরু করেন। মৌখিকভাবে অবশ্য দিল্লীর বাদশাহর প্রতি আনুগত্য অক্ষুণ্ণ থাকিল। শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি ভাগীরথীর তীরে মুকসুদাবাদে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন (আওরঙ্গজেবের অনুমতিক্রমে তিনি পূর্বেই ঢাকা হইতে তথায় দেওয়ানির কেন্দ্র স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন)। তাঁহার নামানুসারে স্থানটির নামকরণ হয় মুর্শিদাবাদ। অতঃপর তিনি রাজস্ব বিভাগকে দুর্নীতি ও বিশৃংখলা হইতে মুক্ত করিলেন। জায়গিরদারদের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া তিনি সমস্ত জমি সরকারের খাস জমিতে পরিণত করেন এবং রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব জমিদারগণের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া ইজারাদারদের হাতে ন্যস্ত করেন। এই নূতন ইজারাদারগণের বেশীর ভাগই ছিলেন বাঙ্গালী হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। সরকারী অন্যান্য উচ্চপদেও তিনি হিন্দু প্রদেশবাসীদের নিয়োগ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ প্রশাসনিক স্বার্থে তিনি ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা চালিত হইতেন না। এইভাবে তিনি বাংলায় এক নূতন অভিজাত শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কৃষকদের উপর হইতে তিনি অনেক অবৈধ কর তুলিয়া দিয়াছিলেন এবং সরকারের তরফ হইতে তাহাদের কৃষি ঋণ দেওয়ারও বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি কঠোরতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক অবশ্য অভিযোগ করেন তাঁহার প্রবর্তিত ভূমি-রাজস্বের হার যথেষ্ট চড়া ছিল। মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে ১৭১৭ সালে মোগল সম্রাট ফররুখ-শিয়রের 'ফারমান' অনুসারে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলায় বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু বাংলার অর্থনীতির স্বার্থে নির্ভীক মুর্শিদকুলি খাঁ বাদশাহী ফারমান অগ্রাহ্য করিয়া অন্যান্য বণিকের ন্যায় ইংরেজ কোম্পানীর নিকট হইতেও শুল্ক আদায় করিয়া ছাড়িয়াছিলেন। এক কথায়, মুর্শিদকুলি খাঁ ছিলেন এক জবরদস্ত শাসক। ১৭২৭ সালে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দিন বাংলার মসনদে আসীন হন। সুজাউদ্দিন বিহার অধিকার করিয়া বাংলার সুবার সহিত যুক্ত করেন (১৭৩৩ খ্রীঃ)। বিহারের শাসনদায়িত্ব অর্পিত হয় আলীবর্দি খাঁ নামে এক কর্মচারীর উপর। সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর বাংলার সিংহাসনে উপবেশন করেন তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ (১৭৩৯ খ্রীঃ)। অল্পদিনের মধ্যেই বিহারের 'নায়েব নাজিব' আলীবর্দি খাঁ নবাবের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া রাজমহলের নিকট এক যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন। অতঃপর বাংলার মসনদে আসীন হইলেন আলীবর্দি খাঁ (১৭৪০ খ্রীঃ)। বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে সিংহাসন প্রাপ্তি ঘটিলেও আলিবর্দি খাঁ ছিলেন সুদক্ষ ও প্রজাবৎসল শাসক। তাঁহার সামরিক দক্ষতা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতাবোধও ছিল। বৃদ্ধ বয়সে তিনি শাসনক্ষমতা হস্তগত করেন এবং তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয় বর্গীর হাঙ্গামার (মারাঠা দলছুট সৈনিকদের) হাত হইতে বাংলাকে রক্ষা করিতে। আলীবর্দি খাঁ ইংরেজ বণিকদের অভিসন্ধি সম্বন্ধেও সন্দিহান ছিলেন, যদিও প্রত্যক্ষভাবে তিনি তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হন নাই। তিনি সর্বদাই তাঁহাদের সহিত সতর্কতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলিয়াছিলেন। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আলীবর্দি খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার মনোনীত প্রার্থী সিরাজউদ্দৌলা বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিরাজের রাজত্বকালে বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসের যুগান্তকারী পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় (১৭৫৭ খ্রীঃ)।

অভিজাত শ্রেণী সৃষ্টি

আলিবর্দি খাঁর শাসন

হায়দ্রাবাদ ঃ ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম-উল-মূলক আসফ জা হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রথম জীবনে সেনাবাহিনীতে যুক্ত ছিলেন। আপন কর্মদক্ষতার জোরে তিনি মোগল দরবারে প্রবেশ করেন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে পরাভূত করিয়া তিনি ফররুখ-শিয়রকে সিংহাসন দখল করিতে সাহায্য করিলে সম্রাট কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁহাকে 'নিজাম-উল-মূলক' উপাধি প্রদান করেন (তাঁহার পূর্বনাম ছিল মীর কামারউদ্দিন)। এই সময় তিনি দাক্ষিণাত্যের সুবাদার পদে নিযুক্ত হন। দাক্ষিণাত্য বাদে তিনি অযোধ্যা এবং মালব অঞ্চলেও শাসন দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। মহম্মদ শাহর আমলে তিনি

সাম্রাজ্যের ওয়াজীর বা প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু রাজধানীর রাজনৈতিক আবহাওয়া অনুকূল মনে না করিয়া তিনি আবার দাক্ষিণাত্যে চলিয়া আসেন এবং স্বাধীনভাবে শাসন শুরু করিয়া দেন। মহম্মদ শাহ্ তাঁহাকে দমন করিতে ব্যর্থ হন। অতঃপর সম্রাট নিজাম-উল-মুলুককে 'আসফজা' উপাধিতে ভূষিত করিয়া এবং তাঁহার স্বাধীন শাসন স্বীকার করিয়া লইয়া ফিরিয়া আসেন। শাসনের ক্ষেত্রে আসফ জা নিজাম-উল-মূলক অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছিলেন। পূরণচাঁদ নামে এক দক্ষ হিন্দু রাজপুরুষকে তিনি তাঁহার দেওয়ান হিসাবে নিযুক্ত করেন। তিনি নিজেও একজন দক্ষ রাজনীতিবিদ এবং নিপুণ সেনাপতি ছিলেন। মারাঠারা তাঁহার রাজ্যে বিশেষ অনুপ্রবেশ করিতে পারেন নাই। অবশ্য কর্ণাটক নামে পরিচিত তাঁহার রাজ্যভুক্ত করমণ্ডল উপকূল মারাঠা আক্রমণ দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াছিল। ১৭৪৮ সালে তাঁহার মৃত্যুর পর দক্ষিণ ভারতে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়া ইংরেজ ও ফরাসী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়।

'আসফ্‌জা' উপাধি প্রদান

অযোধ্যা ঃ অযোধ্যা, বারাণসী, এলাহাবাদ, এবং কানপুরের কতকাংশ লইয়া অযোধ্যা সুবা গঠিত ছিল। ১৭২২ সালে সাদাৎ খাঁ নামে এক ব্যক্তি অযোধ্যায় সুবাদার পদে নিযুক্ত হন। সেই সময় অযোধ্যা সুবায় চরম বিশৃংখল অবস্থা বিদ্যমান ছিল। সাদাৎ খাঁ সুবার বিদ্রোহী জমিদারদের দমন করিয়া এবং নূতন রাজস্ব নীতি প্রবর্তন করিয়া শান্তি-শৃংখলা এবং সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত করেন। ক্রমে তাঁহার নেতৃত্বে সুবাটি স্বশাসিত রাজ্যে পরিণত হয়। প্রশাসনের ক্ষেত্রে তিনিও ধর্মগত বৈষম্য-নীতি অনুসরণ করিতেন না। সামরিক এবং বেসামরিক উভয় বিভাগেই তিনি বহু হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন। ১৭২৪ সালে তাঁহার মৃত্যু হইলে ভ্রাতুস্পুত্র ও জামাতা সফদরজং অযোধ্যার শাসনকর্তার পদ লাভ করেন। তিনি কিছুকাল দিল্লীতে ওয়াজীর বা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করিয়াছিলেন। ১৭৫৪ সালে অযোধ্যায় নূতন শাসক হইলেন সুজা-উজ-দৌল্লা। তিনি নামে মাত্র মোগল আনুগত্য স্বীকার করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। এই সুজা-উদ-দৌল্লা ১৭৬৪ সালে বাংলার নবাব মীরকাশিমের সহিত একযোগে ইংরেজ কোম্পানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ইতিহাস বিখ্যাত এই বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হইবার পর অবশ্য অযোধ্যা ইংরেজদের মিত্ররাষ্ট্রে পরিণত হয়।

রাজস্ব নীতি প্রবর্তন

দুই □ মহীশূর রাজ্যের উত্থান

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতনের পর যাদব বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ শ্রীরঙ্গপত্তমে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া মহীশূর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যাদব বংশের পতনের পরও মহীশূরে হিন্দু শাসন অব্যাহত থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তথায় কৃষ্ণ রায় নামে জনৈক নরপতি শাসন করিতেন। তিনি ছিলেন এক ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ। তাঁহার অকর্মণ্যতার সুযোগ লইয়া প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতি নঞ্জরাজ রাজ্যের যাবতীয় কর্তৃত্বের অধিকারী হন। এই নঞ্জরাজের অধীনেই সামান্য 'নায়েক' হিসাবে হায়দর আলী জীবন শুরু করেন। এই সময় মহীশূর রাজ্য প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সহিত যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িলে হায়দর আলী তাঁহার রণনিপুণতা প্রদর্শন করিবার সুযোগ পান। তাঁহার রণনৈপুণ্য, সাহসিকতা, কর্মদক্ষতা ও মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় পাইয়া নঞ্জরাজ তাহাকে দিন্দিগুল নামক স্থানের ফৌজদার পদে নিযুক্ত করেন (১৭৫৫ খ্রীঃ)। ইতিমধ্যে দাক্ষিণাত্যের ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বে অংশগ্রহণ করিয়া হায়দর ইউরোপীয় রণকৌশলের সহিত পরিচিত হন। উত্তরকালে এই অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া তিনি তাঁহার সামরিক বাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ১৭৬১ সালে

নঞ্জরাজের কর্তৃত্ব

মহীশূরের রাজনৈতিক অব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া হায়দর আলী স্বয়ং নঞ্জরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া মহীশূর রাজ্যের শাসনক্ষমতা হস্তগত করেন। শাসনক্ষমতা অধিকার করিয়া তিনি প্রতিবেশী রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া মহীশূর রাজ্যের সীমানা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। অতঃপর মহীশূরের হিন্দুরাজার মৃত্যু হইলে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে মহীশূরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। হায়দর আলীর ক্রমবর্ধমান শক্তিতে আতঙ্কিত হইয়া মারাঠা, নিজাম ও ইংরেজ কোম্পানী সম্মিলিতভাবে বা আলাদা-আলাদাভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। সামরিক ও কূটনীতির সাহায্যে হায়দর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যান। তিনি ছিলেন স্বাধীনতার চরম পূজারী। তিনি ও তাঁহার পুত্র টিপু সুলতান আমৃত্যু ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছিলেন।

(হায়দর ও টিপু সুলতানের সহিত ইংরেজ কোম্পানীর সম্পর্ক বিস্তৃতভাবে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে)

তিন □ শিখজাতির অভ্যুত্থান

শিখ ধর্মের প্রবর্তক নানকের সময় হইতেই ভারতের ইতিহাসে শিখজাতির আবির্ভাব হয়। নানক ছিলেন শিখদের প্রথম গুরু। নানকের পর হইতে যথাক্রমে অঙ্গদ (১৫৩৯-১৫৫২ খ্রীঃ), অমর দাস (১৫৫২-৭৪ খ্রীঃ) এবং রামদাস (১৫৭৪-৮০ খ্রীঃ) শিখদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ইঁহাদের প্রচেষ্টায় শিখধর্ম পাঞ্জাব অঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। চতুর্থ গুরু রামদাসকে সম্রাট আকবর ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি উপাসনার জন্য অমৃতসরে একটি প্রকাণ্ড সরোবরসহ একখণ্ড ভূমি শিখগুরুকে দান করিয়াছিলেন। পরে এখানেই বিখ্যাত শিখ তীর্থস্থান গড়িয়া উঠে। পঞ্চম শিখগুরু অর্জুনের সময় (১৫৮১-১৬০৬ খ্রীঃ) হইতে শিখগণ ভারতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিতে শুরু করেন। অসাধারণ সংগঠনী প্রতিভার অধিকারী অর্জুন একদিকে যেমন 'গ্রন্থ সাহেব' (শিখ ধর্মগ্রন্থ) সংকলিত করিয়া এবং অমৃতসর শহরটিকে তীর্থস্থান হিসাবে গড়িয়া তুলিয়া শিখধর্মকে নূতন রূপ দান করেন, অন্যদিকে তেমনি আপন ধর্মাবলম্বীদের ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে উৎসাহ দান করিয়া তাহাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সূচনা করেন। পূর্ব হইতেই শিখগণ 'ধর্মসংঘে' স্বেচ্ছাকৃত দান করিতেন। গুরু অর্জুন এই স্বেচ্ছাদান নিয়মিত ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করেন। যাহাদের উপর এই দক্ষিণা আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল তাহারা 'মসন্দ' নামে পরিচিত হইলেন। এইভাবে শিখগণ কিছু পরিমাণে রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে গড়িয়া উঠে।

গ্রন্থ সাহেব

গুরু অর্জুন সমকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। জাহাঙ্গীরের পুত্র খসরু পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে তিনি তাঁহাকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। ফলে তিনি মোগল সম্রাটের বিরাগভাজন হন। শোনা যায়, তাঁহাকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে আনা হয় এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তিনি এই দণ্ড গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে জাহাঙ্গীর তাঁহাকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেন। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্পে শিখগণ অতঃপর মোগলদের চিরশত্রুতে পরিণত হইয়াছিল।

গুরু অর্জুনকে হত্যা

● **গুরু হরগোবিন্দ (১৬০৬-১৬৪৫ খ্রীঃ) ঃ** গুরু অর্জুনের পুত্র হরগোবিন্দ শিখজাতিকে এক বিশিষ্ট সামরিক শ্রেণীরূপে গড়িয়া তোলেন। মোগলদের বিরুদ্ধে অভিযানে তিনি আফগানদের সহযোগিতা লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হইয়া জাহাঙ্গীর তাঁহাকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি মুক্ত হইলেন। সম্রাটের সহিত তাঁহার সদ্ভাবও প্রতিষ্ঠিত হইল।

কিন্তু শাহজাহানের রাজত্বকালে নূতন করিয়া মোগল-শিখ দ্বন্দ্ব শুরু হইল দুর্ভাগ্যবশতঃ হরগোবিন্দ পর পর দুইটি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কোন ক্রমে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, রামদাসের পর হইতে শিখ গুরুর পদ বংশানুক্রমিক হয়।

হরগোবিন্দ তাঁহার পৌত্র হররায়কে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয়।

হররায় (১৬৪৫-৬১ খ্রী ঃ)

কিন্তু শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন সংক্রান্ত যুদ্ধে তিনি দারার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন—এই অপরাধের জন্য আওরঙ্গজেবের নির্দেশে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামরায়কে প্রতিভূ স্বরূপ মোগল দরবারে লইয়া আসা হয়। শোনা যায়, শেষ পর্যন্ত আওরঙ্গজেব তাঁহার প্রাণদণ্ডের বিধান করেন।

হরকিষণ (১৬৬১-৬৪ খ্রী ঃ)

হররায়ের উত্তরাধিকার লাভ করেন তাঁহার মধ্যম পুত্র হরকিষণ। তাঁহাকেও দিল্লীতে আসিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং সেখানেই অবস্থানকালে তিনি বসন্তরোগে মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি হরগোবিন্দর মধ্যমপুত্র তেগবাহাদুরকে গুরুপদে মনোনীত করিয়া যান।

● **গুরু তেগবাহাদুর (১৬৬৪-১৬৭৩ খ্রীঃ) ঃ** ইনি ছিলেন শিখদের নবম গুরু। আওরঙ্গজেবের ধর্মান্ধ নীতির তীব্র সমালোচনা করায় ইনি মোগল সম্রাটের বিরাগভাজন হইলেন। ইঁহাকেও দিল্লীতে তলব করা হইয়াছিল। যাহা হউক, দিল্লী হইতে ইনি পাটনায় চলিয়া আসেন। পাটনায় এবং আসামে ইনি শিখধর্মের প্রসারের চেষ্টা করেন। কয়েক বৎসর পর পাঞ্জাবে ফিরিয়া আসেন। এই সময় ইঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া দিল্লীতে লইয়া যাওয়া হয়। শোনা যায় মৃত্যু ভয় দেখাইয়া আওরঙ্গজেব তেগ বাহাদুরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বলিলে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করেন। ক্রুদ্ধ এবং ধর্মান্ধ সম্রাটের আদেশে ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তেগবাহাদুরের মস্তক ছেদন করা হয়। তেগবাহাদুরের হত্যা শিখ সমাজে মোগলদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও প্রতিশোধ স্পৃহার উদ্রেক করে।

পঞ্চদশ বৎসর বয়স্ক পরবর্তী গুরু গোবিন্দ সিংহ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া শিখজাতিকে দুর্ধর্ষ ও রণনিপুণ সামরিক জাতিতে পরিণত করিবার মানসে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তিনি গুরুপদের অবসান করিয়া 'খালসা' নামে এক নূতন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর খালসা সংস্থাই শিখদের গুরুপদে অধিষ্ঠিত হইল।

গুরুগোবিন্দ সিংহ

দ্বিতীয়তঃ, তিনি শিখধর্মের বাহিরের আচার-অনুষ্ঠানের রূপান্তর ঘটান। তাঁহার নির্দেশে তাঁহার অনুচরবর্গকে কেশ, কৃপাণ, কাঙ্গা (চিরুনি), কঙ্কণ (লোহার বালা) এবং কঞ্চুক (পায়জামা) ধারণ করিতে হইল। তিনি মূর্তিপূজা ও জাতিভেদ প্রথাও রদ করেন। প্রতি শিখকে তিনি 'সিংহ' উপাধি লইতে নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন করিয়া শিখগণকে সতত যুদ্ধবিগ্রহে ও শত্রু নিপাতে রত থাকিবার নির্দেশ দিলেন।

গুরুগোবিন্দর সামরিক কার্যকলাপে আতঙ্কিত হইয়া মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব সরহিন্দের মোগল ফৌজদারকে শিখদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ১৭০৩-০৪ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দপুরের দ্বিতীয় যুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াও শিখগণ পরাজিত হইলেন। গুরু গোবিন্দর দুই শিশু পুত্রকে জীবন্ত সমাধিস্থ করা হইয়াছিল। যাহা হউক, গোবিন্দ সিংহ আত্মসমর্পণ না করিয়া মোগলদের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে আবার পরাজিত হইয়া তিনি পাতিয়ালা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথাপি নিরুৎসাহিত না হইয়া তিনি খালসাবাহিনীকে পুনর্গঠিত করিলেন। ইতিমধ্যে আওরঙ্গজেব তাঁহাকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করিলে গুরু গোবিন্দ তাহা গ্রহণ করেন। কিন্তু দিল্লীতে উপস্থিত হইবার পূর্বেই আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হইল। অতঃপর সিংহাসনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধে তিনি বাহাদুর শাহর পক্ষ অবলম্বন করেন। বাহাদুর শাহ মোগল সিংহাসনে বসিবার পর তিনি তাঁহার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে যান। সেইখানে ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক আফগান আততায়ী কর্তৃক তিনি নিহত হন।

গুরুগোবিন্দর হত্যার পর বান্দা শিখ সম্প্রদায়ের নেতা হন। তিনি প্রথমেই সরহিন্দ এবং পরে শতদ্রু ও যমুনা মধ্যবর্তী অঞ্চল দখল করিয়া লৌহগড় নামে একটি দুর্গ স্থাপন করিলেন। কিন্তু বাহাদুর শাহ ও মুনিম খাঁর দ্বারা তিনি লৌহগড় দুর্গ হইতে বিতাড়িত হন। সম্রাট ফাররুখ-সিয়ারের আমলে তিনি আবার নূতন করিয়া মোগলদের সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু শেষে পরাজিত হইয়া গুরুদাসপুরের দুর্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন এবং সেইখানে উপবাসক্লিষ্ট হইয়া তিনি আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে অনুচরবর্গের সহিত তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়।

বান্দা শিখ সম্প্রদায়

বান্দার মৃত্যুতেও শিখশক্তি ভগ্নোৎসাহ হয় নাই। মোগল সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও বিশৃংখলা এবং আহম্মদ শাহ আবদালীর ক্রমাগত আক্রমণের সুযোগে শিখগণ পাঞ্জাবের বিভিন্ন অংশে ক্রমশঃ অধিকার বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। আহম্মদ শাহ আবদালী অবশ্যই শিখশক্তিকে পরাভূত করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে শিখদের হাতে পাঞ্জাব ছাড়িয়া দিয়া আবদালী ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন।

আহম্মদ শাহ আবদালী

স্বাধীন শিখরাজ্য প্রতিষ্ঠার গৌরব কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রাপ্য নয়। সমগ্র জাতিরই প্রাপ্য। যাহা হউক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর শিখগণ একটি শিখরাষ্ট্রমণ্ডল গঠন করিয়া গুরু নানক এবং গুরু গোবিন্দর নিকট হইতে "দেগ, তেগ ওফতে (দয়া, শক্তি ও জয়) কামনা করে। এই সময় শিখদের কোন কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না, কিন্তু তাহাদের অধিকার পূর্বে শাহারণপুর হইতে পশ্চিমে আটক, উত্তরে জম্মু হইতে দক্ষিণে মলতান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। শিখগণ বারটি দল বা 'মিশলে' বিভক্ত হইয়া এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে শাসন করিত। এই মিশলগুলিকে ধর্মীয় সামন্ত সংঘ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। এইভাবে শিখগণের নেতৃত্বে মোগল শাসন হইতে মুক্ত হইয়া সমগ্র পাঞ্জাব স্বাধীন হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ পেশোয়াতন্ত্রের উত্থান

শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শম্ভুজী মারাঠা সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মোগল-বিরোধী সংগ্রাম চালাইয়া যান। শেষপর্যন্ত তিনি আওরঙ্গজেবের হাতে বন্দী এবং নিহত হন। তাঁহার পুত্র শাহুকে মোগলদরবারে বন্দী করিয়া রাখা হইল। ইতিমধ্যে শম্ভুজীর ভ্রাতা রাজারাম জিঞ্জি দুর্গে রাজধানী স্থাপন করিয়া মারাঠা-নায়কদের সংঘবদ্ধ করিলেন। মোগলবাহিনী আট বৎসর যুদ্ধ করিবার পর জিঞ্জি দুর্গ দখল করিলে রাজারাম সাতারায় নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। কয়েকদিন বাদে ১৭০০ সালে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। অতঃপর তাঁহার বীরপত্নী তারাবাঈ শিশুপুত্র তৃতীয় শিবাজীকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া মোগলদের বিরুদ্ধে যোগ্যতার সহিত সংগ্রাম পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে শাহু মুক্তি পাইয়া সাতারায় আসিলে সিংহাসন লইয়া গৃহবিবাদ শুরু হইয়া যায়। শাহুর প্রধান সমর্থক ছিলেন কূটনীতিবিদ বালাজী বিশ্বনাথ। তাঁহার চেষ্টায় তারাবাঈ পরাস্ত হইলেন। ইতিমধ্যে তারাবাঈ-এর মৃত্যু হইলে রাজারামের অপর পত্নী রাজসবাঈ স্বীয় পুত্র দ্বিতীয় শম্ভুজীকে কোলাপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন ফলে গৃহবিবাদের পরিসমাপ্তি ঘটিল না, উপরন্তু শাহুর রাজ্যে নানারকম বিশৃংখলা দেখা দিল। এই অবস্থায় বালাজী বিশ্বনাথ বিচ্ছিন্ন এবং আত্মকলহে লিপ্ত মারাঠাগণকে পুনরায় সংঘবদ্ধ করিয়া মারাঠা জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন

● **বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৩-১৭২০ খ্রীঃ) ঃ** বালাজী বিশ্বনাথ এক দরিদ্র চিৎপাবন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম জীবনে রাজস্ব বিভাগের এক সামান্য কেরানীর পদে নিযুক্ত হন। সেখান হইতে তিনি শাহুর 'সেনাপতি' পদে আসীন হন। অসাধারণ কর্মদক্ষতা ও কূটনৈতিক প্রতিভার সাহায্যে তিনি সমগ্র মারাঠা সামন্তদের শাহুর আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করেন। কৃতজ্ঞ শাহু তাঁহাকে ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে 'পেশোয়া' বা প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী হইলেও কার্যতঃ রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা তাঁহার হাতে চলিয়া আসে। শাহু নামেমাত্র শাসক থাকেন। অতঃপর 'ছত্রপতি' বা রাজা সাতারার দুর্গে বাস করিতে থাকেন

পেশোয়া তন্ত্রের সৃষ্টি

আর পুণায় পেশোয়ার দপ্তর হইতে শাসনকার্য পরিচালিত হইতে থাকে। এইভাবে মহারাষ্ট্রে 'পেশোয়াতন্ত্রে'র সৃষ্টি হয়। পেশোয়ার পদ বংশানুক্রমিক করা হইল।

বালাজী বিশ্বনাথ তীক্ষ্ণধী রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া তিনি মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপনে ব্রতী হইলেন, এই সময় সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় মোগল শাসন পরিচালনা করিতেছিলেন। ১৭১৪ সালে বালাজী বিশ্বনাথ সৈয়দ হুসেন আলী খাঁর সহিত এক চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন। এই চুক্তির মাধ্যমে তিনি মোগলদের নিকট বিজিত শিবাজীর রাজ্যের অংশগুলি পুনরুদ্ধার করেন এবং দক্ষিণ ভারতের ছয়টি মোগল সুবা হইতে (খান্দেশ, বেরার, ঔরঙ্গাবাদ, বিদর, বিজাপুর ও হায়দ্রাবাদ) 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' আদায় করিবার অধিকার অর্জন করেন। বিনিময়ে শাহু মোগল সম্রাটের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া লন এবং ফর্‌রুখ-শিয়রকে বৎসরে ১০ লক্ষ টাকা প্রদানে এবং ১০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের সাহায্য দিতে স্বীকৃত হন। ১৭১৪ সালের এই চুক্তি মারাঠা ঐতিহ্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু নামেমাত্র মোগল আনুগত্য স্বীকার করিয়া মারাঠা রাজ্যের পুনরুত্থানের কথা বিবেচনা করিলে বালাজী বিশ্বনাথের প্রচেষ্টা সঠিক ও সফল হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। এই সন্ধির বলে মারাঠারা হুসেন আলীর সহিত দিল্লী প্রবেশ করেন এবং উত্তর ভারতের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিবার প্রথম সুযোগ পান। বালাজী বিশ্বনাথ রাজস্ব বিভাগে বিবিধ সংস্কার প্রবর্তন করিয়া মহারাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থাও শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে পুত্র প্রথম বাজীরাও পেশোয়া পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

হুসেন আলী খাঁর সহিত চুক্তি

কূটনীতিতে ও সমর কুশলতায় প্রথম বাজীরাও (১৭২০-'৪০ খ্রীঃ) পিতা অপেক্ষাও অধিকতর নিপুণ ছিলেন। পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের উপর চরম আঘাত হানিয়া তিনি 'হিন্দু পাদ পাদশাহী' অর্থাৎ শক্তিশালী হিন্দু সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপনের স্বপ্ন দেখিতেন। তাঁহার কথায়, 'গাছ যখন শুকিয়ে আসছে, তখন গুঁড়িতে ঘা দিলেই সব ডালপালা ভেঙ্গে পড়বে।' যাহা হউক, পরিকল্পনা রূপায়িত করিবার জন্য তিনি সাধারণভাবে হিন্দু এবং বিশেষ করিয়া রাজপুত শাসকদের মিত্রতালাভ করিবার চেষ্টা করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, 'হিন্দু'রাষ্ট্র স্থাপনের ধ্বনির আড়ালে মারাঠা সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। প্রথম বাজীরাও-এর আবেদনে সাড়া পাওয়া গেল। বিভিন্ন হিন্দু শাসক তাঁহার পক্ষে আসিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অম্বর (জয়পুর) অধিপতি দ্বিতীয় জয়সিংহ এবং বুন্দেলরাজ ছত্রশালের সহিত একত্রিত হইয়া তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হইলেন এবং কালক্রমে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মারাঠা আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। মারাঠা শক্তিবৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হইয়া মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহ নিজামের সাহায্য প্রার্থনা করেন। দক্ষিণভারতে মারাঠা প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইলে আপন স্বার্থ বিপন্ন হইবে বিবেচনা করিয়া নিজাম মারাঠাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত পরাজিত হইয়া প্রথম বাজীরাও-এর সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। সন্ধির শর্তানুযায়ী মালব এবং নর্মদা ও চম্বল নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল মারাঠা অধিকারে আসে। অতঃপর মারাঠা বাহিনী পর্তুগীজদের পরাস্ত করিয়া সলসেট এবং বেসিন দখল করিয়া লয়। এইসময় নাদির শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে বাজীরাও প্রতিবেশী মুসলমান রাজ্যগুলির সহিত বিরোধের অবসান করিয়া সম্মিলিতভাবে বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু অকস্মাৎ ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইল।

প্রথম বাজীরাও হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

প্রথম বাজীরাও মারাঠাদের সংঘবদ্ধ করিয়া এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য সংগঠনের প্রাথমিক এক বলিষ্ঠ প্রয়াস গ্রহণ করিলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার মৃত্যুর পর অভ্যন্তরীণ বিপদে মারাঠা সাম্রাজ্যের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হইয়া যায়। মারাঠা সাম্রাজ্যে পাঁচজন শক্তিশালী সামন্ত—বেরারের ভোঁসলে, বরোদার গাইকোয়াড়, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার এবং মালবের (ধার রাজ্যের) পাবার—আপন আপন ক্ষমতা বিস্তারে

সামন্ততান্ত্রিক অন্তর্কলহ

যত্নবান হইলে সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ক্ষুণ্ণ হইবার আশংকা দেখা দিল।

প্রথম বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বালাজী বাজীরাও (১৭৪০-৬১ খ্রীঃ) পেশোয়া পদ লাভ করিলেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াই তিনি মারাঠা শক্তি সম্প্রসারণে ব্রতী হইলেন। কিন্তু পিতার ন্যায় তিনি শুধু মুসলিম শক্তির ধ্বংসসাধন করিতেই উৎসুক ছিলেন না। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে তিনি সকল রাজ্যই আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার সামরিক বাহিনী নূতন করিয়া গড়িয়া তোলেন। তিনি চিরাচরিত গেরিলা যুদ্ধের কৌশল ত্যাগ করিয়া সেনাবাহিনীর কামান-বন্দুক লইয়া সম্মুখ যুদ্ধ করিতে শিক্ষা দিলেন। পদাতিক বাহিনীকে শক্তিশালী করিবার জন্য রাজপুত, ছত্রী এমনকি পাঠান সেনা নিয়োগ করিলেন। কিন্তু ইহার ফল তাঁহার পক্ষে শুভ হয় নাই। মারাঠা সেনাবাহিনী যুদ্ধের নূতন কৌশল রপ্ত করিতে পারিল না। অন্যদিকে, বিভিন্ন জাতির সৈন্য নিয়োগ করায় মারাঠা বাহিনীর জাতীয় চরিত্র বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সংহতিও হ্রাস পায়। ইহা ভিন্ন, তিনি একই সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান শাসকবর্গকে তাঁহার শত্রুতে পরিণত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তাঁহার আমলেই মারাঠা সাম্রাজ্যের চরম বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল। এইসময় শাহুর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে শাহু এক উইলের মাধ্যমে পেশোয়াকে রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব দান করিয়া যান। এই উইল পেশোয়ার ক্ষমতাকে আইনগত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিল।

বালাজী বাজীরাও

আইনগত কর্তৃত্বলাভ

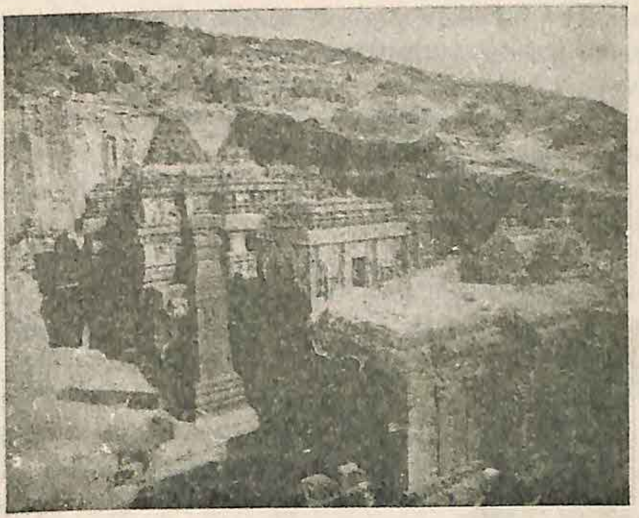
১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে উদ্‌গীরের যুদ্ধে নিজামকে পরাজিত করিয়া বালাজী বাজীরাও বিজাপুর, দৌলতাবাদ, আসীরগড় দুর্গ দখল করেন। এইসঙ্গে মহীশূরের কিছু অংশ এবং কর্ণাটকও মারাঠা সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। অতঃপর তিনি উত্তর ভারতে অগ্রসর হন। মারাঠা সেনাদল দিল্লী প্রবেশ করিয়া মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে পেশোয়ার ক্রীড়নকে পরিণত করে। বালাজী বিশ্বনাথের এক সেনাপতি রঘুজী ভোঁসলে বাংলার নবাবের নিকট হইতে উড়িষ্যা দখল করিয়া লইলেন। অন্যদিকে, পেশোয়ার ভ্রাতা রঘুনাথ রাও আহম্মদ শাহ আবদালীর পুত্র তৈমুরকে পরাজিত করিয়া পাঞ্জাব অধিকার করেন। মারাঠা সাম্রাজ্য কটক (উড়িষ্যায়) হইতে আটক (পাঞ্জাব) পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। কিন্তু মারাঠা সাফল্য বেশী দিন স্থায়ী হইল না। আহম্মদ শাহ আবদালী দিল্লী ও পাঞ্জাব পুনর্দখলের জন্য অগ্রসর হইলেন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইতিহাস-খ্যাত পানিপথের প্রান্তরে মারাঠা ও আহম্মদ শাহ আবদালীর সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এক যুদ্ধ হইল। ইহাই পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত। বাজীরাও-এর ভ্রান্ত রাষ্ট্রনীতি এবং মারাঠা বাহিনীর আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ফলে ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান রাজশক্তিসমূহ মারাঠা-বিরোধী হইয়া পড়িয়াছিল। পানিপথের যুদ্ধে মারাঠা শক্তিকে এককভাবে লড়াই করিতে হইয়াছিল। অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াও মারাঠাবাহিনী পর্যুদস্ত হইল। পরাজয়ের সংবাদে অসুস্থ পেশোয়ার মৃত্যু ঘটিল।

প্রথম ও দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধের ন্যায় তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধও ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই যুদ্ধে মারাঠাগণ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। প্রায় দুইলক্ষ মারাঠা সৈনিক যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। এই প্রচণ্ড ক্ষতি সাময়িকভাবে মারাঠা রাষ্ট্রকে পঙ্গু করিয়া দিয়াছিল। কিছুকালের জন্য উত্তর ভারতে মারাঠা-প্রাধান্য বিনষ্ট হয় এবং দক্ষিণ ভারতেও নিজাম প্রভৃতি মারাঠাদের শত্রুরা শক্তিশালী হইয়া উঠে। এই বিপর্যয়ের ফলে ভারতবর্ষে এক অখণ্ড মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপনের সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইল। আরও উল্লেখযোগ্য হইল, ইহার পর হইতেই বাংলাদেশে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইংরেজশক্তি ক্রমে ক্রমে ভারতের রাজশক্তিতে পরিণত হইল।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে সাময়িকভাবে পেশোয়ার মানমর্যাদা হ্রাস পায় এবং মারাঠা নায়কগণের শক্তিবৃদ্ধি ঘটে।

মারাঠা ঐতিহাসিক সরদেশাই মনে করেন, পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পরাজিত হইলেও মারাঠা শক্তির পতন ঘটে নাই। যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই বালাজী বাজীরাওয়ের তরুণ পুত্র প্রথম মাধবরাও পেশোয়া

হন। অসাধারণ রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন মাধবরাও-এর নেতৃত্বে মারাঠা শক্তি পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের বিপর্যয় হইতে মুক্ত হইয়া নূতনভাবে সংগঠিত হইল। তিনি মহীশূর অধিপতি হায়দর আলীকে একাধিকবার পরাজিত করেন। ইহা ব্যতীত, তিনি মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে দিল্লী পুনরুদ্ধার করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার অকালমৃত্যু ঘটিলে মারাঠা শক্তির পুনরুজ্জীবনের আশা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল।



দ্বাদশ অধ্যায় ‖ ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব

● ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রসার ●

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের সহিত রোমান সাম্রাজ্যের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় ছিল। কিন্তু মধ্যযুগে জলপথে আরবদের এবং স্থলপথে তুর্কীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভারতের সহিত ইউরোপের বাণিজ্যিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ভারতের মশলা, সূক্ষ্মবস্ত্র ও বিলাস দ্রব্যের প্রবল চাহিদা থাকায় ইউরোপীয়গণ কিন্তু দীর্ঘদিন ধরিয়া ভারতে আসিবার নূতন এক জলপথ আবিষ্কারের চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছিলেন। অতঃপর ভাস্কো দা গামা এই প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ণ ঘটান।

১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগালের নাবিক ভাস্কো ডা গামা আফ্রিকার দক্ষিণতম প্রান্তে অবস্থিত উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলস্থ কালিকট বন্দরে অবতরণ করেন। কালিকট বন্দরে ভাস্কো ডা গামার পদার্পণ ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। তাঁহার এই সার্থক অভিযানের সূত্র ধরিয়া পর্তুগীজ ব্যবসায়িগণ ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিতে থাকেন। বর্তমান কেরালা রাজ্যের কালিকট, কোচিন, ক্যানানোড় প্রভৃতি স্থানে পর্তুগীজগণ প্রথমে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করেন। ক্রমে তাঁহারা ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনেরও প্রচেষ্টা শুরু করিয়া দেন। এদেশে পর্তুগীজ শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আল্‌ফাঁসো আল্‌বুকার্ক। ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতস্থিত পর্তুগীজ বাণিজ্যকুঠিগুলির গভর্নর নিযুক্ত হইয়া আসেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল এক বিরাট প্রাচ্য সাম্রাজ্য গঠন। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিজাপুরের সুলতানের নিকট হইতে গোয়া বন্দরটি দখল করিয়া নেন। গোয়ার নিরাপত্তার জন্য সামরিক ব্যবস্থাদিও গ্রহণ করা হইয়াছিল। অতঃপর গোয়াই ভারতে পর্তুগীজ শক্তি ও বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠে ক্রমে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও পর্তুগীজ বাণিজ্য ও কর্তৃত্বের প্রসার ঘটে। এক সময় ভারতের পশ্চিম উপকূলে কোচিন, কুইলন, কালিকট, গোয়া, দমন, দিউ, সালসেট, বেসিন, চৌল, সুরাট, বোম্বাই এবং পূর্ব উপকূলে নেগাপত্তম, স্যানটম (মাদ্রাজ), মসুলিপত্তম ও হুগলীতে পর্তুগীজ বাণিজ্য কুঠি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।



ভাস্কো দা গামা

ভারতে পর্তুগীজ বাণিজ্য

তাঁহাদের সাফল্য অবশ্য অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। পর্তুগীজরা যে ভারতে প্রভুত্ব করিতে পারিবেন না তাহা প্রথম হইতেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল। তাঁহারা বৈধ উপায়ে বাণিজ্যের পরিবর্তে জলদস্যুতা ও দাস-ব্যবসায়ের উপর অধিকতর মনোযোগ দিয়াছিলেন।

ধর্মের ব্যাপারেও তাঁহারা চরম অসহিষ্ণু মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, তৎকালীন ভারতের বণিক অপেক্ষা বোম্বেটে হিসাবেই পর্তুগীজগণ কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। এই লুণ্ঠন মনোবৃত্তি এবং সামরিক ও প্রশাসনিক সংগঠনের অভাবে তাঁহারা প্রথমে ওলন্দাজের নিকট এবং পরে ইংরেজদের কাছে পরাভূত হইয়া পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

পর্তুগীজদের পর আসেন ওলন্দাজেরা। ওলন্দাজগণ সুরাট, কালিকট, মসুলিপত্তম, চুঁচুড়া, বরানগর, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। নীল, রেশম, সোরা, চাউল, সূতীবস্ত্র ইত্যাদি ছিল তাহাদের প্রধান রপ্তানি সামগ্রী। কিন্তু ওলন্দাজ বণিকগণ ভারতবর্ষ অপেক্ষা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 'মশলা দ্বীপপুঞ্জে' বাণিজ্য করিতে অধিকতর আগ্রহী ছিলেন। সুতরাং এদেশে তাঁহারা বাণিজ্যিক দ্বন্দ্বে গভীরভাবে লিপ্ত হন নাই। ইহা ব্যতীত, তাহারা ছিলেন একান্তভাবেই বণিক ধর্মাবলম্বী। মাত্র একবার ব্যতীত (মীরজাফরের শাসনকালে) তাহারা ভারতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন নাই।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিখ্যাত ফরাসী পর্যটক টেভার্নিয়ে মোগল দরবার এবং ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য ও সম্পদ সম্পর্কে একটি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এই পুস্তক পাঠে ফরাসী বণিকগণ ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে উৎসাহী হন। ১৬৬৪ সালে সম্রাট চতুর্দশ লুইয়ের অর্থসচিব কোলবার্টের চেষ্টায় ফরাসী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়। ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঁসোয়া ক্যারোঁ সুরাটে সর্বপ্রথম ফরাসী বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেন। ইহার পর মসুলিপত্তমে (১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে) এবং ফ্রাঁসোয়া মার্টিন নামে এক ফরাসী ঔপনিবেশিকের চেষ্টায় ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিচেরীতে ফরাসী বাণিজ্য কেন্দ্র গড়িয়া উঠে। কালক্রমে পণ্ডিচেরী ভারতবর্ষের ফরাসী বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির মধ্যে সর্বাধিক সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। তথায় ফরাসীদের উপনিবেশও স্থাপিত হইয়াছিল। ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার শাসনকর্তা শায়েস্তা খানের অনুমতি লইয়া ফরাসীগণ চন্দননগরে কুঠি প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবে সুরাট, মসুলিপত্তম, পণ্ডিচেরী-কারিকল-মাহে, চন্দননগর এবং ঢাকা, কাশিমবাজার, পাটনা ও বালেশ্বরে ফরাসী বাণিজ্য ব্যাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু ফরাসী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ফরাসী সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে থাকায় ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোন সংকট উপস্থিত হইলে ভারতে কোম্পানীর কাজকর্মে জটিলতা দেখা দিত। তাহা সত্ত্বেও, ফরাসীদের বাণিজ্য সন্তোষজনক ভাবে প্রসারিত হইতেছিল।

ভারতে ফরাসী বাণিজ্য

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী প্রথম এলিজাবেথ ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নামে এক বণিক প্রতিষ্ঠানকে প্রাচ্য দেশে ১৫ বৎসরের জন্য একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকারের সনদ প্রদান করেন। এই বণিক কোম্পানী সর্বপ্রথম সুরাটে কুঠি নির্মাণ করেন ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে। ইংরেজ কোম্পানীর এই বাণিজ্যিক সুযোগাধিকার লাভ করিবার ব্যাপারে যাঁহাদের অবদান সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, তাঁহারা হইলেন মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজসভায় আগত ক্যাপ্টেন উইলিয়ম হকিন্স এবং বিশেষ করিয়া ইংরেজ সম্রাট প্রথম জেমসের রাষ্ট্রদূত স্যার টমাস রো। রো ভারতে অবস্থান করেন ১৬১৫ হইতে ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এবং এই সময়ের মধ্যে ইংরেজ কোম্পানী আগ্রা, আমেদাবাদ ও ভারুচ অঞ্চলে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অনুমতি লাভ করেন। ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া ফ্রান্সিস ডে মাদ্রাজে একটি সুরক্ষিত বাণিজ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই মাদ্রাজ নিকটবর্তী অঞ্চলে ইংরেজদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। ক্রমে পাটনা, হুগলী ও কাশীমবাজারে ইংরেজ কুঠি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডরাজ দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগীজ রাজকন্যা ক্যাথরিন বারগাঞ্জাকে বিবাহ করিয়া যৌতুক হিসাবে বোম্বাই শহরটি লাভ করেন। ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাভাব হেতু সম্রাট দ্বিতীয় চার্লস কয়েক পাউন্ডের বিনিময়ে বোম্বাই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হস্তান্তরিত করেন। অতঃপর বোম্বাই পশ্চিম ভারতে প্রধান ইংরেজ কুঠিতে পরিণত হয়।

এদিকে, হুগলীর বাণিজ্য কুঠি দুর্গে পরিণত করিতে যাইয়া ইংরেজ ও মোগলদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। ইংরেজগণ পরাজিত হইয়া বাংলা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিছুদিনের মধ্যেই মোগল সম্রাট

আওরঙ্গজেবের অনুমতি লইয়া জবচার্নকের নেতৃত্বে ইংরেজ বণিক সংস্থা বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে। অতঃপর জব চার্নক ১৬৯০ সালে সুতানুটি গ্রামে (বর্তমান শোভাবাজার এলাকায়) এক বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করেন। এই সুতানুটিকেই কেন্দ্র করিয়া কালক্রমে কলিকাতা মহানগরী গড়িয়া উঠে। ১৭০০ সালে কোম্পানী নূতন বাণিজ্য কেন্দ্রকে সুরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ করে। ১৭১৭ সালে মোগল সম্রাট ফাররুখ-শিয়রের 'ফারমান' অনুযায়ী ইংরেজ বণিকগণ ভারতবর্ষে বিনাশুল্কে অবাধ বাণিজ্য পরিচালনার অধিকার লাভ করে। এমন কি কোম্পানী নিজস্ব মুদ্রা প্রবর্তনেরও অধিকার পায়।

প্রথম হইতেই বাণিজ্যে ইংরেজদের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটিতেছিল। কোম্পানীর লাভ ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছিল। সরকারী দলিল ও নথীপত্র হইতে জানা যায়, "যেখানে ১৬৬২ সালে অংশীদারদের লভ্যাংশ ছিল শতকরা বিশ ভাগ, ১৬৮২ সালে সেখানে লভ্যাংশের পরিমাণ হইল শতকরা পঞ্চাশ। ১৭০৮-৪৮ খ্রীঃ—এই চল্লিশ বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে কোম্পানীর উদ্যোগে ইংল্যান্ডে আমদানি প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা বেড়ে ১ কোটি ৬০ লক্ষে দাঁড়িয়েছিল, রপ্তানির দাম প্রায় ৮৪ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি ৬৫ লক্ষে দাঁড়িয়েছিল।... ১৭২৫ সাল নাগাদ দেখা যায় যে, কলিকাতা বন্দরে কোম্পানীর হাত দিয়ে বৎসরে ১০ হাজার টন মাল যাতায়াত করছে।" বস্তুতঃ ইউরোপীয় বণিকসংস্থাগুলির মধ্যে ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্য সবচেয়ে সমৃদ্ধ ছিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এই ক্রমপ্রসারমান বাণিজ্য ফরাসীদের ঈর্ষান্বিত করিয়াছিল। ফলে, ভারতীয় বাণিজ্যে প্রভুত্বের প্রশ্ন লইয়া ইংরেজ ও ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দুইটির মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়।

● **দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধ**ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় রাজনীতির প্রধান বিষয় ছিল ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতা। ১৭৪০ সালে এই দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করিয়া অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স পরস্পর বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে। ইহার সূত্র ধরিয়া ভারতবর্ষেও ইউরোপীয় বণিক কোম্পানী দুইটির মধ্যে সশস্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হইয়া যায়। দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটক উপকূলে এই দ্বন্দ্বের শুরু ও সমাপ্তি ঘটায় ভারতের ইতিহাসে ইহা 'কর্ণাটকের যুদ্ধ' নামে পরিচিত।

করমণ্ডল উপকূলে ব্যবসা

বঙ্গোপসাগরস্থিত করমণ্ডল উপকূলকে ইংরেজরা বলিতেন কর্ণাটক। অঞ্চলটি ছিল হায়দ্রাবাদের নিজামের রাজ্যের অন্তর্গত। ইহার রাজধানী ছিল আর্কট। সেইজন্য কর্ণাটকের শাসনকর্তাকে বলা হইত আর্কটের নবাব। করমণ্ডল উপকূলে ইংরেজ ও ফরাসী বাণিজ্য কোম্পানীর লাভজনক ব্যবসায় ছিল। ইংরেজদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল মাদ্রাজ, ফরাসীদের পণ্ডিচেরী। উভয় পক্ষই স্থানীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ না করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে আপন আপন ব্যবসা চালাইয়া যাইতেছিলেন। নৌ-শক্তিতে বলীয়ান ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়কে স্থানীয় মানুষরা ভীতির চক্ষে দেখিতেন।

কর্ণাটকের রাজনৈতিক পরিস্থিতি

হায়দ্রাবাদের নিজাম উত্তর ভারতে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গভীর ভাবে লিপ্ত থাকায় কর্ণাটকের শাসনের প্রতি নজর রাখিতে পারিতেন না। ফলে আর্কটের নবাব স্বাধীনভাবেই শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণাটকে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিল। মারাঠারা অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া আর্কটের নবাব দোস্ত আলীকে পরাজিত ও নিহত করেন এবং তাঁহার জামাতা চাঁদ সাহেবকে বন্দী করিয়া সাতারায় লইয়া যান। মারাঠারা কিন্তু কর্ণাটক দখল করিলেন না। যাহা হউক, আক্রমণকারীরা চলিয়া যাইবার পর নিজাম আসফ জা তাঁহার এক বিশ্বস্ত অনুচর আনোয়ারউদ্দিনকে কর্ণাটকের নূতন শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করেন। ঠিক এই সময়ে ইউরোপীয় যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষে অনুভূত হইল।

পন্ডিচেরীর ফরাসী শাসনকর্তা ডুপ্লে মাদ্রাজের ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট পারস্পরিক অনাক্রমণের

প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানী বেসরকারী সংস্থা থাকায়, মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষ সমুদ্রে নিরপেক্ষতার আশ্বাস দিতে পারিল না। উভয় পক্ষের মধ্যে এই আলাপ-আলোচনা চলাকালীন সময়ে বার্নেটের অধিনায়কত্বে ইংল্যান্ডের রাজকীয় নৌ-বিভাগের এক বাহিনী ভারতীয় উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইল (১৭৪৩ খ্রীঃ)। বার্নেট কয়েকটি ফরাসী রণপোত বলপূর্বক দখল করিলে ইংরেজ ও ফরাসী কোম্পানীর মধ্যে যুদ্ধের সূত্রপাত হইল। ইহাই হইল কর্ণাটকের প্রথম যুদ্ধ।

কর্ণাটকের প্রথম যুদ্ধ

ভারতবর্ষে ফরাসীদের শক্তিশালী নৌবহর না থাকায় ডুপ্লে ভারত মহাসাগরস্থিত মরিশাসের ফরাসী শাসক লা-বুরদনের নিকট নৌ-সাহায্যের আবেদন করিলেন। বুরদনে অবিলম্বে কয়েকটি রণপোত লইয়া ভারতে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার নাটকীয় পরিবর্তন ঘটিল। বার্নেটের পরবর্তী ইংরেজ নৌ-সেনাপতি যুদ্ধ না করিয়া বাংলায় পলায়ন করিলে বুরদনে বিনা বাধায় মাদ্রাজ দখল করিয়া লইলেন। ফরাসীদের মাদ্রাজ অবরোধ করিবার সময় ইংরেজ বণিকরা আনোয়ারউদ্দিনের সাহায্য ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন। ইহার পূর্বে বার্নেটের আগমনে পন্ডিচেরী যখন বিপন্ন তখন ফরাসীগণও অনুরূপ আবেদন জানাইয়াছিলেন। নবাব যেমন ইংরেজদের নির্দেশ দিয়াছিলেন যে পন্ডিচেরীতে ফরাসীদের অধিকারচ্যুত করা যাইবে না, তেমনি তিনি ফরাসীদেরও মাদ্রাজ অবরোধ প্রত্যাহার করিবার আদেশ জারী করেন। কিন্তু উভয়পক্ষই নবাবের নির্দেশ পালনে চরম অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ডুপ্লে অবশ্য নবাবকে প্রতারিত করিলেন। তিনি জানাইলেন ইংরেজদের নিকট হইতে মাদ্রাজ জয় করিয়া নবাবের হাতে তাহা অর্পণ করা হইবে—ডুপ্লের এই প্রতিশ্রুতি আনোয়ারউদ্দিন বিশ্বাস করিলেন। এদিকে মাদ্রাজ অধিকার করিবার পর লা-বুরদনে উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণের প্রতিদানে তাহা ইংরেজদের ফিরাইয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। ডুপ্লে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন না। ফলে, লা-বুরদনে এবং ডুপ্লের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হইল। কিছুদিন বাদে বুরদনে তাঁহার নৌবাহিনী সহ মরিশাসে ফিরিয়া গেলেন। বুরদনে চলিয়া যাইবার পর ডুপ্লে ইংরেজদের অপর একটি বাণিজ্য ঘাঁটি ফোর্টসেন্ট ডেভিড জয় করিবার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হন। ইতিমধ্যে আনোয়ারউদ্দিন ডুপ্লের চাতুরী বুঝিতে পারিয়া এক বিশাল বাহিনী লইয়া ফরাসী ফৌজকে আক্রমণ করিলেন। ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মাইলাপুরের যুদ্ধে ফরাসীদের স্বল্প কিন্তু সুসংগঠিত সেনাদলের নিকট নবাবের বিপুল বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটিল। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়া ভারতের সামন্ত রাজা-নবাবদের সামরিক দুর্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়িল। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ডুপ্লে ভারতীয় শাসকদের সামরিক দুর্বলতা ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলতার সুযোগ লইয়া দক্ষিণভারতে ফরাসী প্রাধান্য স্থাপনের সম্ভাবনায় উদ্দীপ্ত হইলেন। যাহা হউক, মাদ্রাজ ফরাসীগণ কর্তৃক লুণ্ঠিত হইতে থাকিলে, ইংরেজগণ বোসকাওয়নের নেতৃত্বে পন্ডিচেরী অবরোধ করিলেন। ইতিমধ্যে আই-লা-সাপেলের (Aix-la-Chapelle) সন্ধির মাধ্যমে ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। ইউরোপীয় যুদ্ধের সাথে সাথে কর্ণাটকের প্রথম যুদ্ধেরও পরিসমাপ্তি ঘটিল। ইংরেজগণ পন্ডিচেরীর অবরোধ প্রত্যাহার করিয়া নেয়। মাদ্রাজও ইংরেজদের হস্তে প্রত্যর্পিত হয়। কিন্তু দ্বন্দ্বের মূল প্রশ্নের মীমাংসা না হওয়ায় পুনরায় যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা থাকিয়া গেল।

ফরাসীদের মাদ্রাজ দখল

মাদ্রাজ লইয়া মতবিরোধ

আনোয়ার উদ্দিনের পরাজয়

আই-লা-সাপেলের চুক্তি

কর্ণাটকের দ্বিতীয় যুদ্ধ ঃ আনোয়ারউদ্দিনের বিরুদ্ধে জয়লাভের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া ফরাসী গভর্নর ডুপ্লে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যুদ্ধরীতিতে ও সমর শক্তিতে ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনী ভারতীয়দের অপেক্ষা উন্নততর। তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ

ভারতের তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে স্থানীয় রাজগণ তাঁহাদের পারস্পরিক বিবাদে ইংরেজ অথবা ফরাসীদের সাহায্য গ্রহণে উৎসুক হইবেই এবং এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ লইয়া ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হইবে। অতএব তিনি সুযোগের অপেক্ষায় থাকিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় তাঁহার পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের সম্ভাবনা শীঘ্রই আসিয়া গেল। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে নিজামের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র নাসিরজঙ্গ এবং অন্যতম পৌত্র মুজাফ্‌ফর জঙ্গ উভয়েই নিজাম পদ দাবি করিলেন। অন্যদিকে, চাঁদ সাহেব মুক্তি পাইয়া কর্ণাটকের নবাব পদ অধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন। ডুপ্লে এই দ্বন্দ্বে মুজাফ্‌ফর জঙ্গ এবং চাঁদ সাহেবকে সমর্থন করিলে ত্রি-পাক্ষিক জোট গঠিত হইল। অতঃপর এই তিন মিত্র ১৭৪৯ সালে ভেলোরের নিকট এক যুদ্ধে আনোয়ারউদ্দিনকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। আনোয়ার উদ্দিনের পুত্র মহম্মদ আলী ত্রিচিনাপল্লীতে পলাইয়া গেলেন। চাঁদ সাহেব কর্ণাটকের সিংহাসনে উপবেশন করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বরূপ পন্ডিচেরীর আশেপাশের ৮০টি গ্রাম ফরাসীদের দান করিলেন। ফরাসীদের এই ক্ষমতাবৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হইয়া ইংরেজগণ নাসির জঙ্গ ও মহম্মদ আলীর পক্ষাবলম্বন করিলেন। ফলে, ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে আবার এক যুদ্ধের সূত্রপাত হইল। ইতিহাসে ইহাই কর্ণাটকের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৭৫১-৫৪ খ্রীষ্টাব্দ)।

উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ

কর্ণাটকের দ্বিতীয় যুদ্ধ

কর্ণাটকের সিংহাসন দখল করিবার পর চাঁদ সাহেব তাঞ্জোর আক্রমণ করিয়া অযথা কালক্ষেপ করিতে থাকিলেন। এই সময় ত্রিচিনাপল্লী অবরোধ করিলে তিনি কিন্তু সহজেই সফল হইতেন। এদিকে, ইংরেজদের পরামর্শমত নাসির জঙ্গ (তিনি ইতিমধ্যেই বাদশাহর অনুমতিলাভ করিয়া নিজামের পদ লাভ করিয়াছিলেন) এক বিরাট বাহিনী লইয়া কর্ণাটকে উপস্থিত হইলেন। মেজর লরেন্সের নেতৃত্বে এক ইংরেজবাহিনী তাঁহার সহিত যুক্ত হইল। এই যুক্ত বাহিনীর আক্রমণে চাঁদ সাহেব পরাজিত হইয়া পন্ডিচেরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মুজাফ্‌ফর জঙ্গ পিতৃব্যের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। ডুপ্লের পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবার উপক্রম ঘটিল। কিন্তু ভাগ্য আবার ফরাসীদের প্রতি প্রসন্ন হইল। নাসিরজঙ্গ এক আততায়ী কর্তৃক নিহত হইলেন। পন্ডিচেরী হইতে মুজাফ্‌ফর জঙ্গকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ডুপ্লে তাঁহার এক দক্ষ সেনাপতি বুসির সঙ্গে মুজাফ্‌ফর জঙ্গকে হায়দ্রাবাদে পাঠাইলেন। কিন্তু পথিমধ্যে মুজাফ্‌ফর জঙ্গও আততায়ী কর্তৃক নিহত হইলে ডুপ্লে কালবিলম্ব না করিয়া নিজাম-উল-মুলকের তৃতীয় পুত্র সালাবৎ জঙ্গকে হায়দ্রাবাদের নিজাম বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাঁহার নির্দেশে বুসি নিজামের দরবারে সসৈন্যে উপস্থিত থাকিলেন। এইভাবে হায়দ্রাবাদেও ফরাসীরা সফল হইলেন। কৃতজ্ঞ নিজাম মসুলিপত্তম সহ দক্ষিণভারতের এক সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল ফরাসী কোম্পানীকে দান করিলেন। তাহাদের বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধাও বৃদ্ধি করা হইল। কৃষ্ণা নদী হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত অঞ্চলের শাসনকর্তা হিসাবে ডুপ্লেকে নিযুক্ত করা হইল। ইহা ব্যতীত, ফরাসী কোম্পানী এবং ব্যক্তিগত ভাবে ডুপ্লে যথাক্রমে প্রচুর অর্থ ও একটি জায়গির লাভ করিলেন। নিজামের দরবারে বুসির অবস্থানের ফলে হায়দ্রাবাদে ফরাসী আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

ফরাসী সাফল্য প্রতিষ্ঠা

এই সময় ফোর্টসেন্ট ডেভিডে একজন নূতন ইংরেজ গভর্নর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল সন্ডার্স। তিনি ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ত্রিচিনাপল্লীতে মহম্মদ আলীর সাহায্যার্থে ইংরেজ ফৌজ পাঠাইলেন। এই সময় ডুপ্লের নির্দেশে চাঁদ সাহেব ত্রিচিনাপল্লী অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। চাঁদ সাহেবের এই অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া তাঁহার রাজধানী আর্কট আক্রমণ করিবার এক পরিকল্পনা গভর্নর সন্ডার্সের নিকট ব্যক্ত করিলেন এক তরুণ সৈন্যাধ্যক্ষ। গভর্নর সন্ডার্স যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া তাঁহার উপর আর্কট আক্রমণের দায়িত্বভার অর্পণ করিলেন। এই তরুণ সৈন্যাধক্ষের নামই হইল রবার্ট ক্লাইভ। ক্লাইভ সহজেই আর্কট দখল করিলেন। রাজ্যের পতনের খবর পাইয়া চাঁদ সাহেব ত্রিচিনাপল্লী হইতে কর্ণাটকে উপস্থিত হইলেন। ফরাসী সেনাবাহিনীর সাহায্য লইয়া চাঁদ সাহেব আর্কট অবরোধ করিলেন। প্রায় দুইমাস ধরিয়া অসীম বীরত্বের সহিত ক্লাইভ এই আক্রমণ প্রতিহত করেন। অবশেষে চাঁদ সাহেব আত্মসমর্পণ করিতে

ক্লাইভের কূটনীতি

বাধ্য হন। তাঁহাকে অবশ্য নৃশংসভাবে হত্যা করা হইল। অন্যদিকে ত্রিচিনাপল্লী অবরোধকারী ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষও আত্মসমর্পণ করিলেন। ভাগ্য এইবার ইংরেজদের প্রতি প্রসন্ন হইল। তাঁহাদের সমর্থনপুষ্ট মহম্মদ আলী কর্ণাটকের নবাব পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

ডুপ্লে কিন্তু সহজেই আশা হারাইতে রাজী ছিলেন না। তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহ ও সংগঠিত করিয়া নূতন করিয়া আক্রমণ করিবার পরিকল্পনা করিলেন। কিন্তু ফ্রান্সের কর্তৃপক্ষ ডুপ্লের যুদ্ধনীতিকে সমর্থন করিতে পারিলেন না। ভারতবর্ষস্থিত ফরাসী সেনাপতি ও প্রশাসকগণও ডুপ্লেকে পছন্দ করিতেন না। ফলে কর্তৃপক্ষ তাঁহার উপর অপ্রসন্ন হইলেন। অন্যদিকে, ফ্রান্স এইসময় শান্তিস্থাপনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িল। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ডুপ্লেকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হইল। ডুপ্লের পরিবর্তে গডেহু নামক এক ব্যক্তিকে পন্ডিচেরীতে প্রেরণ করা হইল শান্তিচুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশে। তদনুসারে ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হইল। পরস্পর অধিকৃত স্থান প্রত্যর্পণের এবং ভারতীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ না করিবার শর্তে কর্ণাটকের দ্বিতীয় যুদ্ধের অবসান হইল।

ডুপ্লের প্রত্যাবর্তন

যুদ্ধের অবসান

কর্ণাটকের দ্বিতীয় যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিলেও, ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধের অবসান হইল না। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধের সূত্র ধরিয়া ভারতবর্ষের দুই ইউরোপীয় কোম্পানীর মধ্যে প্রকাশ্য যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইহাই ছিল কর্ণাটকের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৫৬-৬৩ খ্রীষ্টাব্দ)। দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশেও এই দ্বন্দ্ব সম্প্রসারিত হইল।

কর্ণাটকের তৃতীয়যুদ্ধ

১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কাউন্ট লালী পন্ডিচেরীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আসেন এবং দক্ষিণ ভারতে ফরাসী বাহিনীর পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। লালী সূচনা হইতেই সাফল্য অর্জন করিলেন। সেন্ট ডেভিড দুর্গ সহজেই জয় করিয়া তিনি মাদ্রাজ আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি হায়দ্রাবাদ হইতে সসৈন্য বুসিকে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে আদেশ করেন। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত কিন্তু রাজনৈতিক ভাবে ভ্রান্ত ছিল। বুসির অবর্তমানে হায়দ্রাবাদে ফরাসী প্রভাবের অবসান ঘটিল। অন্যদিকে, ইংরেজ বাহিনীর চাপে পড়িয়া লালী মাদ্রাজ অবরোধ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইলেন। ইতিমধ্যে চন্দননগর (বাংলাদেশের ফরাসী বাণিজ্য কেন্দ্র) অধিকার করিয়া ও পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ) রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন করিয়া ইংরেজ কোম্পানী বাংলাদেশে আপন প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিল। দক্ষিণ ভারতেও ফরাসীদের নূতন করিয়া বিপর্যয় ঘটিল। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে বন্দীবাসের যুদ্ধে স্যার আয়ার কুটের হস্তে পরাজিত হইয়া লালী আত্মসমর্পণ করেন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পন্ডিচেরীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ভারতে ফরাসী শক্তি সমূলে বিনষ্ট হইল। অল্পকাল পরে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধি দ্বারা ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসান ঘটে। সেই চুক্তি অনুসারে ভারতবর্ষের কর্ণাটকের তৃতীয় যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয়। সন্ধির শর্তানুসারে ফরাসী কোম্পানী পন্ডিচেরী সমেত তাহাদের পূর্ব-অধিকৃত স্থানসমূহ ফেরৎ পাইল বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি দিতে হইল যে, ঐ স্থানগুলি অতঃপর সামরিক কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত না হইয়া নিছক বাণিজ্যকেন্দ্ররূপেই থাকিবে। ফলে ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা বিলুপ্ত হইয়া গেল।

দক্ষিণভারত ও বাংলা উভয়স্থানেই ইংরেজ সাফল্য

ফরাসী শক্তির বিপর্যয়

● **কর্ণাটকের যুদ্ধের ফলাফল ঃ** কর্ণাটকের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন বিলীন হইয়া যায়। ফরাসী কোম্পানী বাণিজ্য কুঠিগুলি ফেরৎ পাইলেও, সেগুলিকে অরক্ষিত রাখিতে বাধ্য হইল। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে, ভারতে বাণিজ্যের ব্যাপারেও ফরাসীগণ নানা অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। অন্যদিকে, ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে মুক্ত হইয়া ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নিশ্চিন্ত মনে ভারতে বাণিজ্য ও রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করিতে সক্ষম হইল। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে এবং ১৭৬০ সালের বন্দীবাসের যুদ্ধে রাজনৈতিক ও সামরিক সাফল্য অর্জন করিয়া

ইংরেজ কোম্পানী ভারতে এক বিশিষ্ট শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিল। অতঃপর শুরু হয় ভারত-ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়।

ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের দুর্বলতাও প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। কেন্দ্রীয় শক্তির অক্ষম শাসন-নীতি, সার্বিক জাতীয় চেতনা বোধের অভাব এবং আঞ্চলিক রাজ্যগুলির মধ্যকার স্বার্থপরতা ও ভেদবুদ্ধি ভারতের রাজনৈতিক অসহায়হীনতা নগ্নভাবে প্রকটিত করিয়া তুলিয়াছিল। সামন্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের সামরিক বাহিনীর রণনীতি ও রণকৌশলের অকার্যকারিতাও এই যুদ্ধে মর্মান্তিক ভাবে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন সাম্রাজ্য অভিলাষী ডুপ্লে ইহার সুযোগ গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হইলেও, ইংরেজগণ কিন্তু তাহার পরিপূর্ণতম সদ্ব্যবহার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধে সাফল্যই ভারতে ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের সূচনা করে। এই যুদ্ধে আরও প্রমাণিত হইল যে, ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ইউরোপীয় যুদ্ধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিলে তাহারা এক কার্যকর শক্তিতে পরিণত হইতে পারে। বস্তুতঃ ইংরেজগণ এই নীতি অনুসরণ করিয়া যে ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনী সংগঠিত করেন, তাহারই সাহায্যে তাঁহারা কালক্রমে বিশাল ভারতীয় সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।



রবার্ট ক্লাইভ



ডুপ্লে

● **ফরাসীদের বিফলতার কারণ**ঃ ভারতবর্ষে বাণিজ্যিক দ্বন্দ্বে ইংরেজ কোম্পানীর নিকট ফরাসী কোম্পানীর পরাজয়ের পশ্চাতে বহুবিধ কারণ আছে। প্রথমতঃ, নৌ-শক্তির ক্ষেত্রে ফ্রান্সের দৌর্বল্য। ইংল্যান্ড ছিল তদানীন্তন পৃথিবীতে নৌশক্তিতে সর্বাপেক্ষা বলবান রাষ্ট্র। কর্ণাটকের প্রথম যুদ্ধের সময়ই উপলব্ধি করা গিয়াছিল, সমুদ্রবক্ষে যাহাদের আধিপত্য থাকিবে, সাফল্য তাহাদের অনুকূলেই আসিবে।

নৌশক্তিতে দুর্বলাত

সামুদ্রিক প্রাধান্য ইংরেজদের হাতে থাকায়, শেষপর্যন্ত ফরাসীরাই পরাভূত হইলেন। এই শক্তির জোরে ইংরেজগণ একদিকে যেমন ইংল্যান্ড হইতে সৈন্যবাহিনী লইয়া আসিতে পারিলেন, অপরদিকে তেমনি সহজেই বাংলাদেশ হইতে দক্ষিণ ভারতে প্রয়োজনীয় রসদ পাঠাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মরিশাস করমণ্ডল উপকূল হইতে অনেক দূরে থাকায়, সেখানকার নৌঘাঁটি হইতে ধারাবাহিক সাহায্য পাওয়া সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজগণ তাঁহাদের মুখ্যনীতি—বাণিজ্য-হইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই। তাঁহারা জানিতেন, সামরিক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সাফল্য নির্ভর করে অনেকাংশেই আর্থিক স্বচ্ছলতার উপর। কর্ণাটকের তৃতীয় যুদ্ধে জয়লাভের অন্যতম

নিয়ামক শর্ত ছিল বাংলায় প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ। আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য ডুপ্লের পরিকল্পনা বারবার ব্যাহত হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, গঠনের দিক হইতে ইংরেজ ও ফরাসী কোম্পানীর মধ্যে মূলগত পার্থক্য ছিল। ফরাসী কোম্পানী ছিল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রীয় সহায়তার উপর একান্ত নির্ভরশীল। জন্মলগ্নে এই কোম্পানী সরকার এবং জনগণের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু অষ্টদশ শতকে অভ্যন্তরীণ, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংকটে গভীরভাবে নিমজ্জিত থাকিবার ফলে ফরাসী স্বৈরাচারী রাজতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে বাণিজ্যিক সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়া আর সম্ভব হইল না। অপরদিকে, ইংরেজ কোম্পানী ছিল উদ্যমশীল ইংরেজ বণিকদের প্রতিষ্ঠান। 'রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষিতা অপেক্ষা ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রযত্নের' উপর তাঁহারা অধিকতর আস্থাশীল ছিলেন। ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব তাঁহাদের কর্মনীতি এবং কর্মধারাতে গতিবেগ সঞ্চারিত করিয়াছিল। চতুর্থতঃ, সামরিক নেতা এবং রাষ্ট্রনীতিক হিসাবেও ফরাসী পক্ষ কতকগুলি মারাত্মক ত্রুটি করিয়াছিলেন। ডুপ্লের উচিত ছিল তাঞ্জোরের পরিবর্তে প্রথমেই ত্রিচিনাপল্লী অবরোধ করিতে চাঁদ সাহেবকে নির্দেশ দেওয়া। এই বিলম্বের সুযোগ ইংরেজ পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিল। কাউন্ট লালী হায়দ্রাবাদ হইতে বুসিকে সরাইয়া আনিলে সেখানে ফরাসী আধিপত্যের অবসান হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ফরাসী কর্তৃপক্ষের মধ্যকার ঈর্ষা-বিবাদ ও মতানৈক্যও তাহাদের কর্মদক্ষতা নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। ডুপ্লের সহিত লা-বুরদনের বিরোধ, লালীর সহিত পন্ডিচেরীর কাউন্সিলের বিরোধ ফরাসী বিফলতার অন্যতম কারণ। ষষ্ঠতঃ, ফরাসীদের মধ্যে ইংরেজদের ন্যায় দক্ষ সেনাপতি ও রাজনীতিজ্ঞের অভাব ছিল। যোগ্য হইলেও ডুপ্লে ছিলেন দাম্ভিক, লালীর ছিল বিচক্ষণতাবোধ কম। অন্যদিকে, ইংরেজদের মধ্যে ছিলেন সণ্ডার্স এবং ক্লাইভের ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজনীতিবিদ, লরেন্স ও কূটের ন্যায় দক্ষ সেনাপতি। সর্বশেষে বলা যায়, পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ সাফল্য প্রধান নিয়ামক সূত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঐতিহাসিকের ভাষায়, "বাংলা যাদের হাতে আর সমুদ্রে যারা বিপুল শক্তির অধিকারী, পন্ডিচেরীর ঘাঁটি থেকে তাদের হারাতে হলে আলেকজান্ডার বা নেপোলিয়নের প্রতিভাও পর্যাপ্ত ছিল না।'

আর্থিক অসচ্ছলতা

উদ্দীপনার অভাব

রাজনীতিজ্ঞের অভাব

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বাংলায় ইংরেজ শক্তির উত্থান পলাশী হইতে বক্সার

● **অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলায় ইংরেজ বাণিজ্যের প্রসার :** ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীতে বাণিজ্য করিবার সুযোগ লাভ করিয়া ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলা সুবায় প্রথম প্রবেশ করে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহাদের বাণিজ্যের বিস্তৃতি ঘটে এবং পাটনা, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানে ইংরেজ বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৬৮৬ সালে স্থানীয় মোগল শাসকদের সহিত বিরোধ হওয়ায় ইংরেজগণ হুগলী আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিলে তৎকালীন মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব বাংলায় কোম্পানীর বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দেন। বিদেশী বণিকদের তাহাদের বাণিজ্য কুঠি ও কেন্দ্র হইতেও বিতাড়িত করা হইল। এক বৎসরের মধ্যেই দেড় লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করায় ইংরেজরা আবার বাংলাদেশে ব্যবসা করিবার অধিকার লাভ করেন। ১৬৯০ সালে জব চার্নক বাংলা সুবায় ফিরিয়া আসিয়া সুতানটীতে ইংরেজদের নূতন বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করেন। কালক্রমে এই কেন্দ্রটিই কলিকাতা মহানগরী হিসাবে রূপান্তরিত হয়। ১৬৯১ সালে বাৎসরিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে ইংরেজ বণিকগণ বাংলা সুবায় নিঃশুল্ক বাণিজ্য করিবার অধিকার অর্জন করেন। ১৬৯৬ সালে তাঁহারা তাঁহাদের বাণিজ্য কুঠি সুরক্ষিত করিবার অনুমতি লাভ করেন। ১৬৯৮ সালে বাৎসরিক বারো শত টাকা খাজনা দিবার শর্তে সুতানটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা নামে তিনটি গ্রামের জমিদারী কোম্পানীর হাতে আসে। ১৭০০ সালে কলিকাতার কুঠি ও বাণিজ্য সুরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে নির্মিত হয় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ। অতঃপর বাংলায় ইংরেজ বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হইল ফোর্ট উইলিয়ম।

হুগলীতে প্রথম বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ

কলিকাতা মহানগরীর প্রতিষ্ঠা

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোঁড়া হইতেই বাংলায় ইংরেজ বাণিজ্য বাড়িয়া চলিল। বস্তুতঃপক্ষে, এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সিংহভাগ নিয়ন্ত্রিত করিত তিনটি ইউরোপীয় কোম্পানী—ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ। কিন্তু চন্দননগরে ডুপ্লের স্বল্পকাল গভর্নর থাকাকালীন সময় (১৭৩১-৪১ খ্রীঃ) ভিন্ন ফরাসী বাণিজ্য তেমন জোরদার ছিল না। অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মশলার ব্যবসা অধিকতর লাভজনক বিবেচনা করায় ওলন্দাজগণ বাংলার বাণিজ্যে ক্রমশঃ আগ্রহ হারাইয়া ফেলিল। ফলে ইংরেজ বণিকগণের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিল না। কলিকাতা, হুগলী, ঢাকা, কাশিমবাজার, মালদা, রাজমহল প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্য কুঠি প্রতিষ্ঠিত হইল। কলিকাতা ছিল সর্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বন্দরে ইংরেজ বণিকদের দশ হাজার টন পণ্য আদান-প্রদান করা হইয়াছিল। অর্থের বিচারে মোট বাণিজ্যের পরিমাণ হইল এক কোটি টাকা। ক্রমশঃ ইংরেজদের ব্যবসা আরও বিপুল হইয়া

বাণিজ্যের ক্রমপ্রসার

উঠিল। সূতীবস্ত্র, রেশম বস্ত্র, মসলিন, আফিম, সোরা, ইত্যাদি ছিল প্রধান বাণিজ্যিক পণ্য। ইংরেজ কোম্পানীর মোট এশীয় বাণিজ্যের শতকরা ৬০ ভাগ বাণিজ্য পরিচালিত হইত বাংলা সুবার মাধ্যমে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে, ১৭০০ সালে যেখানে ইংরেজ কোম্পানীর রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় উনিশ লক্ষ টাকা, সেখানে ১৭৫৫ সালে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া হইল প্রায় তেত্রিশ লক্ষ টাকা। কোম্পানীর অংশীদারদের লভ্যাংশের (Dividend) পরিমাণ বাড়িয়া গেল বিপুলভাবে।

১৭১৭ সালে কোম্পানী বাৎসরিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে মোগল সম্রাট ফররুখশিয়রের নিকট হইতে প্রাপ্ত এবং ফারমানের জোরে বাংলায় বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ করে। এই সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল কোম্পানীর আমদানি-রপ্তানি অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। কিন্তু কোম্পানীর সর্বশ্রেণীর কর্মচারিগণ বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ব্যক্তিগত ভাবে অংশগ্রহণ করিতেন। 'দস্তক' বা ছাড়পত্র দেখাইয়া তাঁহারা নিঃশুল্ক ব্যবসা চালাইয়া যাইতেন। তাঁহাদের এই অবৈধ বাণিজ্য বাংলার আর্থিক ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফলে মুর্শিদকুলি খাঁ হইতে সিরাজউদ্দৌল্লা (পরবর্তিকালে মীরকাশিম) পর্যন্ত বাংলার নবাবগণ সম্রাট-প্রদত্ত বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার রোধ করিতে সচেষ্ট হন। ইহারই সূত্র ধরিয়া বাংলার নবাবদের সহিত ইংরেজ কোম্পানীর বিরোধ বাধে। নবাবগণ অবশ্য, সাধারণভাবে ইংরেজ বাণিজ্যের বিরোধিতা করেন নাই। বহির্বাণিজ্যে দেশের সমৃদ্ধি ঘটে—এই চেতনা তাঁহাদের ছিল। কিন্তু তাঁহারা বিদেশী বণিকদের সামরিক বা রাজনৈতিক ক্ষমতাবৃদ্ধি সহ্য করিতে রাজী ছিলেন না। ইংরেজ বণিকদের তাঁহারা আর্মেনীয় বণিকদের মত শুধু বণিক হিসাবেই গণ্য করিতে চাহিতেন। যাহা হউক, ইংরেজ বণিকদের অবৈধ ব্যক্তিগত ব্যবসা এবং তজ্জনিত বাংলার নবাবদের সহিত বিরোধ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইংরেজ-ফরাসী স্বার্থদ্বন্দ্ব এবং সমকালীন সংকটের সুযোগ লইয়া ভারতবর্ষে রাজনৈতিক-সামরিক প্রাধান্য স্থাপনের সম্ভাবনা—ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশী বণিক সম্প্রদায় ভারতের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করিতে শুরু করে। পলাশীর যুদ্ধ এই ঘটনাচক্রের প্রথম উল্লেখযোগ্য পর্ব।

বাংলার নবাবের সঙ্গে সম্পর্ক

বাংলাদেশের বাণিজ্যে অতিরিক্ত সুবিধা আদায় করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতার ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ১৭১৪ সালে জন সারম্যান নামে এক ব্যক্তিকে মোগল সম্রাট ফররুখশিয়রের দরবারে প্রেরণ করেন। ১৭১৭ সালে কোম্পানীকে এক বাদশাহী 'ফারমান' প্রদান করা হয়। এই ফারমানে বলা হইল, (১) বাৎসরিক ত্রিশ হাজার টাকার বিনিময়ে ইংরেজ কোম্পানী বাংলাদেশে নিঃশুল্ক বাণিজ্য করিতে পারিবে এবং (২) 'দস্তক' অর্থাৎ পরিচয় পত্র প্রদর্শন করিলেই পণ্যকে শুল্ক-মুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন, কোম্পানী নিজস্ব মুদ্রা প্রবর্তনেরও অধিকার লাভ করিল। বাংলার তৎকালীন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ কিন্তু সম্রাট প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা পুরোপুরি কার্যকর হইতে দিলেন না। দস্তকের অপব্যবহারও তিনি দৃঢ় হস্তে রোধ করেন। তাঁহার সময় হইতেই বাংলার নবাবদের সহিত ইংরেজ কোম্পানীর বিরোধের সূত্রপাত হয়।

বিনাশুল্কে বাণিজ্য অধিকার লাভ

মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর পর হইতে অবশ্য ব্রিটিশ কোম্পানীর ব্যবসার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতে থাকে। তথাপি বাংলার শাসকদের সহিত তাহাদের প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইল না। সুজাউদ্দিনও ইংরেজ কোম্পানীকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখিয়াছিলেন। আলীবর্দি খাঁর আমলে তাহাদের ব্যবসা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল। কিন্তু ইংরেজগণ যাহাতে নূতন কোনো দুর্গ নির্মাণ বা অনুরূপ কোনো সামরিক অথবা রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ না পায় তাহার দিকে নবাব আলীবর্দির সতর্ক দৃষ্টি ছিল। অবশ্য নৌশক্তিতে বলীয়ান ব্রিটিশ কোম্পানীর সহিত তিনি যথাসম্ভব 'সতর্কতামূলক বন্ধুত্বনীতি' অনুসরণ করিতেন।

সর্তকতামূলক বন্ধুত্ব নীতি

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অপুত্রক আলীবর্দির মৃত্যু হইলে তাঁহার মনোনীত দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌল্লা বাংলার সিংহাসনে উপবেশন করেন। বিভিন্ন কারণে নূতন নবাবের সহিত ইংরেজদের প্রীতির সম্পর্ক ছিল না। প্রথমতঃ, ইংরেজগণ সিরাজের প্রতিদ্বন্দ্বিনী ঘসেটি বেগমকে সমর্থন করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, এই সময়ে বাংলার সিংহাসনে তিনজন দাবিদার ছিলেন, যথাক্রমে আলীবর্দির কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র সিরাজউদ্দৌলা, আলীবর্দির জ্যেষ্ঠা কন্যা ও ঢাকার শাসনকর্তার বিধবা পত্নী ঘসেটি বেগম, এবং পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা ও আলীবর্দির দ্বিতীয়া কন্যার পুত্র সৌকৎ জঙ্গ। এই দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত সিরাজউদ্দৌল্লার সাফল্য ঘটিলেও ইংরেজগণ নূতন নবাবের প্রতি উপযুক্ত আনুগত্য প্রকাশ এবং চিরাচরিত উপঢৌকন প্রেরণ না করায় বাংলার শাসক অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত, ঘসেটি বেগমের দেওয়ান রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসের বিরুদ্ধে সিরাজউদ্দৌল্লা ঢাকার রাজস্বের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ আনিলে তিনি মুর্শিদাবাদের পরিবর্তে কলিকাতায় ইংরেজদের আশ্রয়ে চলিয়া যান। নবাবের অনুরোধ সত্ত্বেও ইংরেজ কর্তৃপক্ষ কৃষ্ণদাসকে নবাবের হস্তে সমর্পণ করিতে অস্বীকৃত হন। ফলে, ইংরেজদের সহিত সিরাজের বিবাদ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছিল। ঠিক এই সময় দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধের অজুহাতে ইংরেজ ও ফরাসীগণ নবাবের বিনা অনুমতিতে বাংলাদেশে সামরিক তৎপরতা শুরু করিয়া দিলেন। ফরাসীরা চন্দননগরে দুর্গ নির্মাণ এবং ইংরেজগণ ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করিলেন। সিরাজ উভয় পক্ষকেই কাজ বন্ধ রাখিবার আদেশ জারী করিলেন। ফরাসীগণ তাহা পালন করিলেও ইংরেজগণ নবাবের আদেশ উপেক্ষা করিলেন। সিরাজ এই সময় সৌকৎ জঙ্গের বিরুদ্ধে মুঙ্গের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে রাজমহলের নিকট তিনি ইংরেজ গভর্নর ড্রেকের মনোভাব অবগত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উদ্ধত ইংরেজ বণিকদের সমুচিত শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে সসৈন্যে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং কলিকাতাস্থিত ইংরেজ দুর্গ ফোর্ট উইলিয়ম দখল করিলেন। ইংরেজ গভর্নর ড্রেক নবাবের ফৌজের আগমন সংবাদ পাইয়াই কলিকাতা হইতে পলাইয়া ফলতায় আশ্রয় নেন। সিরাজউদ্দৌল্লার ফোর্ট উইলিয়ম দখল প্রসঙ্গে হলওয়েলের বিবরণীর উপর নির্ভর করিয়া ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ নবাবের বিরুদ্ধে নির্মম হত্যা-আয়োজনের অভিযোগ আনিয়াছেন। বলা হয় নবাবের আদেশে নারী ও শিশুসহ ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দীকে ১৮′×১২′ মাপের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে সারারাত বন্দী করিয়া রাখা হয়। পরদিন প্রভাতে, তাহাদের মধ্যে ১২৩ জনই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ঘটনাটিই হইল 'অন্ধকূপ হত্যা'। আধুনিক ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ সাক্ষ্য-প্রমাণাদি উপস্থাপিত করিয়া অভিযোগটির অসত্যতা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, সিরাজ কলিকাতার দায়িত্বে মাণিকচাঁদকে নিযুক্ত করিয়া রাজধানী মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া গেলেন।



সিরাজউদ্দৌলা

সিরাজের সহিত বিরোধ

ফোর্ট উইলিয়ম দখল

কলিকাতার দুর্গ ইংরেজদের হস্তচ্যুত হইবার সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছাইলে, তথাকার কর্তৃপক্ষ ক্লাইভ ও ওয়াটসনের নেতৃত্বে এক নৌবাহিনী বাংলায় প্রেরিত হয়। দুর্গাধিপতি মাণিকচাঁদের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্লাইভ সহজেই দুর্গ পুনরধিকার করিয়া লইলেন। অনতিবিলম্বে ইংরেজগণ হুগলী বিধ্বস্ত করিয়া আপনাদের পরাক্রম প্রদর্শন করিলেন। সিরাজউদ্দৌল্লা তাহাদের এই স্পর্ধিত আচরণে রুষ্ট হইয়া ১৭৫৬

সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পুনরায় কলিকাতায় আসেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধ কিন্তু বেশি দিন চলিল না। আলীনগরের সন্ধির মাধ্যমে সিরাজ সংঘর্ষের অবসান করিলেন। ইংরেজদের সব দাবিই তিনি মানিয়া লইলেন। কোম্পানী দুর্গ সম্প্রসারণ ও নিজস্ব মুদ্রা প্রবর্তনের অধিকার লাভ করিল। ইহা ব্যতীত, বাণিজ্যের বাড়তি সুযোগ এবং ফোর্ট উইলিয়ম দখলের দরুন যে ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতেও নবাব সম্মত হইলেন। নবাবের দুর্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়িল। শুরু হইল তাঁহার সর্বনাশের সূচনা। কয়েকদিনের মধ্যেই (মার্চ, ১৭৫৭ খ্রীঃ) ইংরেজগণ চন্দননগর অধিকার করেন।

আলীনগরের সন্ধি

ইতিমধ্যে সিরাজউদ্দৌল্লার বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদে ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হইল। বাংলাদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট রাজকর্মচারী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি নানা কারণে নবাবের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। মীরজাফর, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, ইয়ারলতিফ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ প্রমুখ ব্যক্তিগণ সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তৎস্থলে মীরজাফরকে অধিষ্ঠিত করিবার জন্য চক্রান্ত শুরু করিল। উমিচাঁদের মাধ্যমে ষড়যন্ত্রকারীরা ইংরেজদের সহিত যোগাযোগ করিলেন। কোম্পানী ইতিপূর্বে আর্কটে 'পুতুল শাসন' স্থাপন করিয়া দক্ষিণ ভারতে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল। বাংলাদেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহারা প্রস্তুত হইতেছিলেন। সুতরাং উভয় পক্ষের স্বার্থের মিল ছিল সিরাজের অপসারণে। যাহা হউক, ১৭৫৭ সালের জুন মাসের প্রথম দিকে সিরাজ-বিরোধী চুক্তি সম্পাদিত হইল। এই ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার চূড়ান্ত রূপ ঘটিল পলাশীর যুদ্ধে (২৩শে জুন, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ)।

ষড়যন্ত্র

সিরাজের বিরুদ্ধে উদ্যোগ-আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে ক্লাইভ নবাবের বিরুদ্ধে আলীনগরের সন্ধির শর্তভঙ্গের অভিযোগ আনিলেন। তিনি সিরাজউদ্দৌল্লাকে কলিকাতা আক্রমণের জন্য ক্ষতিপূরণের অর্থ দাবি করিয়া এক চরমপত্র প্রেরণ করিলেন এবং উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ইংরেজ ফৌজ মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলে নবাবও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি পূর্বেই তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কথা অবগত হইয়াছিলেন। ১৭৫৭ সালের ২২শে জুন তারিখে কোম্পানীর সেনাবাহিনী নদীয়া জেলার পলাশী গ্রামের আম্রকুঞ্জে উপস্থিত হইলেন। নবাবও শত্রুকে বাধাদানের জন্য তথায় অগ্রসর হন। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন ভাগিরথীর তীরে পলাশীর প্রান্তে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ইহাই হইল ইতিহাস-বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধ। সৈন্যসংখ্যার দিক হইতে সিরাজউদ্দৌল্লা ছিলেন অনেক বেশী শক্তিশালী। নবাবের ৫০,০০০ সেনার বিরুদ্ধে কোম্পানীর ফৌজের সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র ৩,০০০। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের নেতৃত্বে নবাবের সেনাবাহিনীর এক বিরাট অংশ যুদ্ধ হইতে নিরস্ত রহিল। নবাবের অপর সেনাপতি রায়দুর্লভও রণক্ষেত্রে নিশ্চুপ থাকিলেন। একমাত্র মীরমদন এবং মোহনলাল নামে দুই অনুগত সেনাপতির অধীনে স্বল্পসংখ্যক সৈন্য বীরত্বের সহিত যুদ্ধ শুরু করেন। অবশ্য সিনফ্রে নামক জনৈক ফরাসী সেনাপতির নেতৃত্বে অল্প কয়েকজন ফরাসী সৈন্যও সিরাজউদ্দৌল্লার বাহিনীর সহিত একত্রিত হইয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। মীরমদনের নেতৃত্বে নবাব বাহিনীর রণকুশলতার সম্মুখে ইংরেজ বাহিনী বেশীক্ষণ যুঝিতে পারিলেন না। ক্লাইভ তাঁহার সৈন্যবাহিনী লইয়া নিকটস্থ আম্রকাননে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। ইতিমধ্যে এক আকস্মিক আঘাতে মীরমদন বীরোচিত মৃত্যুবরণ করেন। সাথীর মৃত্যুর পরও মোহনলাল বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। নবাবের জয় সুনিশ্চিত হইয়াউঠিল। ঠিক সেইসময় মীরমদনের মৃত্যুতে বিচলিত নবাব মীরজাফরকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবার কাতর আবেদন করিলেন। বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর সিরাজের অসহায়তার সুযোগ লইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি নবাবকে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিলেন। "নিজ অদূরদর্শিতা ও মানসিক দুর্বলতা-হেতু" সিরাজ যুদ্ধ বিরতির আদেশ দিলেন। অনিচ্ছুক মোহনলাল রণক্ষেত্র হইতে সরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্লাইভ পাল্টা আক্রমণ

পলাশীর যুদ্ধ

হানিয়া নবাবের সৈন্যবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন। "যেখানে পরাজয়ের সমূহ সম্ভাবনা সেখানে শেষপর্যন্ত ইংরেজরাই জয়ী হলেন।" নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা রণক্ষেত্র হইতে রাজধানীতে পলাইয়া গেলেন। সেখানে নূতন করিয়া সৈন্য সংগ্রহ ও সংগঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াও তিনি বিফল হইলেন, মুর্শিদাবাদ হইতে তিনি ভাগলপুরের দিকে যাত্রা করেন। সম্ভবতঃ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ফরাসী সাহায্য সংগ্রহ করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজমহলের নিকট ধৃত হইয়া তিনি মুর্শিদাবাদে আনীত হইলেন। অতঃপর রাজধানীতে মীরজাফরের পুত্র মীরণের আদেশে মহম্মদী বেগের নির্মম ছুরিকাঘাতে সিরাজউদ্দৌল্লার অপমৃত্যু ঘটিল। ক্লাইভের সাহায্যে মীরজাফর বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন।

বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভাগ্য বিবর্তনের ইতিহাস পলাশীর যুদ্ধ এক বিরাট তাৎপর্যময় ঘটনা। ক্ষয়ক্ষতির বিচারে অবশ্য পলাশীর যুদ্ধকে অনেক ঐতিহাসিক নিছক একটি 'হাতাহাতির লড়াই' (Skirmish) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের সমর-কুশলতার কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় নাই। তথাপি পলাশীর যুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে অস্বীকার করা যায় না। ইংরেজগণ কোন সামরিক শক্তির জোরে সিরাজউদ্দৌল্লাকে পরাজিত না করিলেও সাধারণ মানুষের মনে তাহাদের সমরকুশলতা ও রাজনৈতিক চাতুর্য সম্বন্ধে ভীতিপূর্ণ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল। শুধু ভারতীয়গণই নয়, ওলন্দাজ, ফরাসী প্রভৃতি অন্যান্য প্রতিযোগী ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ও ইংরেজদের পূর্বাপেক্ষা অধিক সমীহ করিতে লাগিলেন। অবশ্য, মীরজাফরকে মসনদে আরোহণ করিতে সাহায্য দানের বিনিময়ে ইংরেজ কোম্পানী আনুষ্ঠানিকভাবে কেবলমাত্র চব্বিশ পরগণার জমিদারি লাভ করিয়াছিলেন। বাণিজ্যক্ষেত্রেও তাঁহারা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সুযোগ-সুবিধা অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলার নবাবের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এইরূপ কোন শর্ত মীরজাফরের সহিত সম্পাদিত চুক্তিপত্রে ছিল না। বস্তুতঃপক্ষে, আইনের দিক হইতে মীরজাফর স্বাধীন শাসক ছিলেন। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলার সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হইতে না পারিলেও, এই জয়লাভের ফলে, পরোক্ষভাবে, কোম্পানী বাংলার ক্ষমতা হস্তগত করে। মীরজাফর নামেমাত্র শাসক ছিলেন। তাঁহার দুর্বলতার সুযোগ লইয়া বাংলায় ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। অতঃপর কোম্পানী "নৃপতি-স্রষ্টার" (King-maker) ভূমিকায় অবতীর্ণ হইল। আবার অন্যদিকে, পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের ফলেই দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের চূড়ান্ত জয়লাভ সম্ভব হইয়াছিল।

পলাশী যুদ্ধের গুরুত্ব

বাংলার অর্থনৈতিক জীবনেও পলাশীর যুদ্ধ চরম সর্বনাশের সূচনা করিয়াছিল। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং তাঁহার কর্মচারিগণ নির্বিচারে বাংলার সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে পাঠাইতে থাকেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকদ্বয় টমসন ও গ্যারেটের কথায়, "রাজ্যটিকে শুষে, নিংড়ে, একেবারে রক্তশূন্য করে দেওয়া হল।" এই নির্লজ্জ শোষণকে বলা হয় 'পলাশী লুণ্ঠন'। অন্যদিকে, পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে রাজ্যের অর্থনীতিতে কোম্পানী প্রধান শক্তিতে পরিণত হওয়ায় বাংলার চিরাচরিত গ্রামীণ অর্থনীতিতে ভাঙন ধরিল। এইভাবে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই পলাশীর যুদ্ধ বাংলাদেশে পরিবর্তন সূচিত করিয়াছিল।

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, পলাশীর যুদ্ধে বাংলার মধ্যযুগের অবসান হইয়া আধুনিক যুগের সূচনা হয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইংরেজ সাফল্য ভারতবর্ষে যুগ পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল। "পশ্চিম থেকে নূতন ভাবধারার সঞ্জীবনী স্পর্শে যেন শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, মানুষের কাজ এবং রাজনৈতিক জীবন, সর্বত্র আবার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল। স্বর্গ থেকে প্রেরিত এক জাদুকর যেন এসে তার দণ্ড ছুঁইয়ে প্রাচ্য দেশের স্থাণু সমাজের শুষ্ক কঙ্কালগুলিকে জীবন্ত করে তুলল।" স্যার যদুনাথ সরকারের এই মূল্যায়ন কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণের নিকট 'অতিশয়োক্তি' বলিয়া বোধ হইয়াছে।

● **মীরজাফরের শাসনকাল** ঃ পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইংরেজ কোম্পানী সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী না হইলেও নবাবের অপরিহার্য সহায়ক শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। অতঃপর ক্লাইভ বাংলার রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে এবং এদেশের সম্পদ লুণ্ঠনে অগ্রসর হইলেন। ইংরেজদের শোষণের মাত্রা এমন পর্যায়ে পৌছিয়াছিল যে, মীরজাফরের মত হীনচেতা মানুষও তাহাদের লুণ্ঠন ও ঔদ্ধত্য সহ্য করিতে পারিলেন না। নিরুপায় হইয়া তিনি ওলন্দাজদের সাহায্যে আপনাকে ইংরেজ প্রভাব ও কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। গোপনে তিনি তাহাদের সহিত ইংরেজ-বিরোধী চুক্তি সম্পাদন করিলেন। তাঁহার এই গোপন যোগাযোগ কিন্তু প্রকাশ হইয়া পড়িল। নবাব কোম্পানীর আস্থা ও বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিলেন। অন্যদিকে, ইংরেজরা ওলন্দাজদের যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। অতঃপর মীরজাফরকে মসনদচ্যুত করিবার জন্য কোম্পানী নবাবের জামাতা মীরকাশিমের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলেন (১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ)। চুক্তিতে স্থির হইল, নবাব পদ লাভ করিবার বিনিময়ে মীরকাশিম কোম্পানীকে মীরজাফরের নিকট প্রাপ্য সমস্ত বকেয়া অর্থ পরিশোধ করিয়া দিবেন। ইহা ছাড়া, কোম্পানীকে এবং উহার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ব্যক্তিগতভাবেও অর্থপ্রদান করা হইবে। বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্বও ইংরেজ অধিকারে আসিবে। চুক্তির শর্তে সম্মত হইলে বাংলার মসনদে নূতন শাসক হিসাবে উপবেশন করিলেন মীরকাশিম আলী খাঁ।

ইংরেজ বিরোধী চুক্তি সম্পাদন

● **মীরকাশিম** ঃ ইংরেজ সামরিক সাহায্যে সিংহাসন অধিকার করিলেও মীরকাশিম স্বাধীনচেতা শাসক ছিলেন। মীরজাফরের ন্যায় ইংরেজদের হস্তে ক্রীড়নক হইয়া থাকিতে তিনি রাজী ছিলেন না। নবাবের সার্বভৌম অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁহার প্রধানতম উদ্দেশ্য। বিচক্ষণ রাজনৈতিক পুরুষ হিসাবে তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, সামরিক ও আর্থিক দুর্বলতাই মীরজাফরের পতন ঘটাইয়াছিল। সুতরাং প্রথম হইতেই তিনি আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সামরিক শক্তি অর্জনে সচেষ্ট হইলেন। সিংহাসন লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত ইংরেজদের সমস্ত দেনা পাওনা মিটাইয়া দিলেন। অতঃপর তিনি রাজস্ববৃদ্ধির প্রতি মনোযোগী হন। শাসন ব্যবস্থায় অপ্রয়োজনীয় ব্যয়সংকোচ করিয়া এবং নূতন অতিরিক্ত কর ধার্য করিয়া তিনি অর্থাভাব অনেকটা দূর করিতে সমর্থ হইলেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মীরকাশিমের রাজস্ব নীতির কঠোরতা ও অবৈধতার সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ইংরেজ প্রভুত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে সমকালীন পরিস্থিতিতে বিকল্প কোনো পন্থা শ্রেয় হইত না। ইহার পর তিনি ইংরেজদের অনুগত এবং উদ্ধত ও বিদ্রোহী ভূস্বামীদের কঠোর হস্তে দমন করেন। মীরকাশিম জানিতেন, কোম্পানী তাঁহার স্বাধীন কার্যক্রম অনুমোদন করিবে না। সুতরাং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সংঘর্ষের প্রস্তুতি হিসাবে তিনি কতকগুলি রাজনৈতিক ও সামরিক সংস্কার প্রবর্তন করিলেন। রাজধানী মুর্শিদাবাদ কলিকাতার সন্নিকটে থাকায় দরবারে ইংরেজ প্রভাব প্রবল ছিল। আপনাকে কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত করিবার জন্য তাই তিনি মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। নূতন রাজধানীকে সুরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে মুঙ্গেরে তিনি দুর্গ এবং যুদ্ধোপকরণ নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। ইতিপূর্বেই তিনি ইউরোপীয় সৈন্যাধ্যক্ষদের সাহায্যে নবাবী বাহিনীকে পাশ্চাত্য সামরিক পদ্ধতিতে সংগঠিত করেন। অতঃপর মীরকাশিম মোগল সম্রাটের নিকট হইতে ফারমান লাভ করিয়া নিজের নবাবী পদ বৈধকরণ করিলেন। এইভাবে তিনি কোম্পানীর উপর নির্ভরশীলতা হইতে মুক্ত হইলেন।



মীরকাশিম

ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মীরকাশিমের সার্বভৌম ক্ষমতা-প্রয়োগে আতঙ্কিত হইলেন। তাহারা ভালোভাবেই জানিতেন, স্বাধীন নবাব অপেক্ষা দুর্বল ও ব্যক্তিত্বহীন শাসকের আড়ালে কোম্পানীর স্বার্থ অধিকতর নিরাপদে থাকিবে। সুতরাং মীরকাশিমের সহিত ইংরেজদের সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিল।

দস্তকের অপব্যবহার

দস্তকের অপব্যবহারের প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া নবাব ও কোম্পানীর মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হইল। সম্রাট ফররুখশিয়রের নিকট হইতে প্রাপ্ত ফারমানের বলে কোম্পানী বাংলাদেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিত। 'দস্তক' ছিল এই বিনাশুল্কের পরোয়ানাপত্র। দীর্ঘদিন ধরিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা তাহাদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও 'দস্তক' প্রদর্শন করিয়া শুল্কের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া আসিতেছিলেন। এমনকি, তাহারা অনুগত দেশীয় বণিকদেরও দস্তক বিক্রয় করিয়া মুনাফা অর্জন করিত। ফলে, নবাবের রাজস্ব বিপুল পরিমাণে কমিয়া যাইতেছিল। অন্যদিকে, শুল্ক দিবার দরুন ভারতীয় বণিকগণ ইংরেজদের সহিত প্রতিযোগিতায় পিছু হটিতে বাধ্য হইলেন। তাহাদের ব্যবসায় বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। মীরকাশিম দস্তকের অপব্যবহারের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। কিন্তু নবাবের পুনঃপুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও কোম্পানী তাহার কর্মচারীদের বে-আইনী আচরণের সংশোধন করিল না। তখন তিনি আপন রাজস্বের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও দেশীয় বণিকদের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে অভ্যন্তরীণ শুল্ক সম্পূর্ণভাবে রহিত করিয়া দিলেন। এই নির্দেশ অনুসারে, দেশী, বিদেশী, সকল বণিকই নিঃশুল্ক বাণিজ্য করিবার সুযোগ লাভ করে। কিন্তু এই ব্যবস্থা ইংরেজদের মনঃপূত হইল না। তাহারা আপনাদের বিশেষ অধিকার বহাল রাখিবার জন্য দেশীয় বণিকদের উপর শুল্ক পুনঃস্থানের দাবি জানাইলেন। মীরকাশিম ইংরেজদের দাবি পূরণে অসম্মত হইলে কোম্পানী তাঁহাকে অপসারিত করিবার সংকল্প গ্রহণ করে।

বক্সারের যুদ্ধ

পাটনার ইংরেজ বাণিজ্য-কুঠির এজেন্ট এলিস নবাবের উপর চাপ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে বলপূর্বক পাটনা শহর দখল করিয়া লইলে মীরকাশিমও অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা কাউন্সিল যুদ্ধ ঘোষণা করিল। যাহা হউক, মীরকাশিম পাটনা পুনর্দখল করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু প্রথমে সাফল্য লাভ করিলেও কাটোয়া, গিরিয়া, উদয়নালা, মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানে নবাব পরাজিত হইলেন। তাহা সত্ত্বেও, তিনি ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন না। মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম এবং অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া তিনি আবার যুদ্ধে অগ্রসর হন। ১৭৬৪ সালের ২২শে অক্টোবর বক্সারে সংঘটিত হইল এই চরম যুদ্ধ। ইংরেজ সেনাপতি মেজর হেক্টর মুনরোর নিকট মিত্র বাহিনী যুদ্ধে পরাজিত হইল। মীরকাশিম পলায়ন করিলেন এবং পলাতক অবস্থায় ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে নিতান্ত দরিদ্র অবস্থায় দিল্লীর নিকট তিনি মারা যান।

বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব

ঐতিহাসিক বিচারে পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষা বক্সারের যুদ্ধ ছিল অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ সামরিক শক্তি পরীক্ষিত হয় নাই। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজ সেনাবাহিনী তৎকালীন ভারতের এক শক্তিশালী সামরিক জোটকে (মীরকাশিম-সুজাউদ্দৌল্লা-শাহ আলম) সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়া ইংরেজ রণশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে। প্রমাণিত হয় দেশীয় সেনাবাহিনী ইংরেজ সৈন্যদের সমকক্ষ নয়। ডঃ স্মিথের কথায়, "পলাশীর যুদ্ধ ছিল কয়েকটি কামানের লড়াই মাত্র, আর বক্সারের যুদ্ধ ছিল চূড়ান্ত বিজয়।" দ্বিতীয়তঃ, বক্সারের যুদ্ধের পর বাংলার সার্বভৌম ক্ষমতা পাকাপাকিভাবে কোম্পানীর হস্তগত হয়। মীরকাশিমের সহিত যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানী তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে পুনরায় সিংহাসনে স্থাপন করেন। কিন্তু নূতনভাবে গদি পাইবার পর মীরজাফর বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর ইংরেজগণ তাহার পুত্র নাজমউদ্দৌল্লাকে নূতন নবাব নিযুক্ত করেন। ১৭৬৫ সালের ২০শে জানুয়ারী নবাবের সহিত কোম্পানীর যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহারই মাধ্যমে বাংলার শাসনক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলিয়া আসে। এই চুক্তি অনুযায়ী বাংলার নবাব তাঁহার রাজনৈতিক এবং সামরিক ক্ষমতা কোম্পানীর

নিকট বন্ধক রাখিতে বাধ্য হইলেন। বলা হইল, (১) কোনো অবস্থাতেই রাজধানী মুর্শিদাবাদ হইতে স্থানান্তরিত করা যাইবে না, (২) নবাবের দরবারে একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবেন। তাঁহার নির্দেশে শাসনকার্য পরিচালিত হইবে, (৩) নবাবের পরিবর্তে প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনা করিবেন কোম্পানী মনোনীত দুইজন সহকারী সুবাদার এবং (৪) নবাবের সৈন্যবাহিনী হ্রাস করিতে হইবে। কেবলমাত্র দরবারের মর্যাদা বজায় রাখিবার এবং রাজস্ব আদায় করিবার জন্য ন্যূনতম সংখ্যক সেনা থাকিবে। এইভাবে বাংলায় কোম্পানীর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। তৃতীয়তঃ, কোম্পানীর ক্ষমতা এবং মর্যাদা বাংলার বাহিরেও প্রসারিত হইল। বক্সারের যুদ্ধে অপর দুই পরাজিত শক্তি—মোগল সম্রাট এবং অযোধ্যার নবাবের সহিত ক্লাইভ আলাদাভাবে দুইটি চুক্তি সম্পাদন করেন। ইহার ফলে মোগল সম্রাট শাহ আলম ইংরেজ কোম্পানীর হস্তে ক্রীড়নকে এবং অযোধ্যা ইংরেজদের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হইল। ভারতীয় রাজন্যবর্গের এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ইংরেজদের সম্মান অভাবনীয় রূপে বৃদ্ধি পাইল। চতুর্থতঃ, বক্সারের যুদ্ধের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে কোম্পানী মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট হইতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার 'দেওয়ানী' অর্থাৎ রাজস্ব আদায় করিবার অধিকার অর্জন করে। ইহার ফলে, বাংলার অর্থনীতির উপর ইংরেজদের কর্তৃত্ব আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর শুরু হয় বাংলায় কোম্পানীর নির্লজ্জ শোষণ। এইভাবে রাজনৈতিক, সামরিক এবং অর্থনৈতিক সমস্ত ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও অধিকার ইংরেজ কোম্পানীর হস্তগত হয়। বক্সারের যুদ্ধের পর কোম্পানী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হইতে রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হইল। সমগ্র ভারতে ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারে বক্সারের যুদ্ধের সাফল্য ছিল ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

● **কোম্পানীর দেওয়ানী পদ লাভ ও দ্বৈত শাসনব্যবস্থা ঃ** মীরকাশিমকে নবাব পদে অধিষ্ঠিত করিবার পর ক্লাইভ স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। ১৭৬৫ সালে তিনি পুনরায় বাংলার গভর্নর হিসাবে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিলেন। দ্বিতীয়বার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার পর ক্লাইভের প্রধান কাজ ছিল বাংলা ও অযোধ্যার নবাবদ্বয় এবং মোগল সম্রাটের সহিত নূতন সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া কোম্পানীর রাজনৈতিক প্রভাবকে সম্প্রসারিত করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি অযোধ্যার নবাবকে কোম্পানীর সহিত আত্মরক্ষামূলক মিত্রতা করিতে বাধ্য করেন। অযোধ্যার দুইটি জেলা—কারা ও এলাহাবাদ এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ নগদ ৫০ লক্ষ টাকা সহ অযোধ্যায় বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার অবাধ সুযোগও কোম্পানী লাভ করিল। দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ক্লাইভ অতঃপর কারা ও এলাহাবাদ জেলা দুইটি এবং বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা করদানের বিনিময়ে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট হইতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ আদায় করিলেন। এই বাদশাহী ফারমান বলে কোম্পানী বাংলা সুবার রাজস্ব আদায়ের অধিকার প্রাপ্ত হইল (১৭৬৫ খ্রীঃ)। অতঃপর ক্লাইভ বাংলার নবাবের সহিত এক চুক্তি করিলেন। ইহার শর্তানুসারে বাৎসরিক ৫৩ লক্ষ টাকা প্রাপ্তির বিনিময়ে নবাব কোম্পানীর নিকট বাংলার রাজস্বের উপর সকল দাবি পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু কোম্পানী স্বহস্তে এই দায়িত্ব ভার গ্রহণ না করিয়া দুইজন দেশীয় কর্মচারীর হস্তে তাহা অর্পণ করিল। এইভাবে কোম্পানী কার্যতঃ সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হইল, কিন্তু কোনো দায়িত্বভার গ্রহণ করিল না। এই অবস্থার নাম ছিল 'দ্বৈত শাসনব্যবস্থা'। যাহা হউক, দেওয়ানী পদ গ্রহণ করিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষের সার্বভৌম শক্তি অর্জনের পথে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিল। [দেওয়ানী লাভ এবং দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হইল]

● **ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঃ** কোম্পানীর দ্বৈত শাসনের আমলে এক বিকট দুর্ভিক্ষ বাংলা ও বিহারের সাধারণ মানুষের জীবনে দুঃসহ অভিশাপ বহন করিয়া আনিয়াছিল। ইতিহাসে ইহা "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে পরিচিত। বাংলা ১১৭৬ সনে (ইংরেজী ১৭৭০ সাল) এই বিপর্যয়টি ঘটিয়াছিল বলিয়া ইহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। ১৭৬৮ এবং ১৭৬৯ সালে পর পর দুই বৎসর একটানা অনাবৃষ্টির ফলে বাংলা ও

বিহারে শস্যের অভাবনীয় ক্ষতি হয়। খাদ্যবস্তুর আকাল দেখা দেয়। পর বৎসর পুনরায় ব্যাপক খরা হওয়ায় দুর্ভিক্ষ প্রকট হইয়া উঠে। কিন্তু শস্যের ঘাটতি দেখা দিলেও বিদেশী কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ বাংলার শস্য বলপূর্বক মাদ্রাজের ইংরেজ সেনাবাহিনীর জন্য প্রেরণ করেন। ফলে বাংলাদেশে শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। শস্যের অভাবে অখাদ্য-কুখাদ্য খাইয়া বা দীর্ঘদিন অনাহারে থাকিয়া, ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অগণিত মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সরকারী হিসেবেই বলা হইয়াছিল, বাংলার জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য হইয়া জঙ্গল ও শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। কৃষিযোগ্য জমি অকর্ষিত থাকিয়া পতিত হইয়া থাকিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মর্মস্পর্শী বর্ণনা পাওয়া যায়।

এই দুর্ভিক্ষ কিন্তু কেবলমাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্যই ঘটে নাই। বস্তুতঃ, ইংরেজ কোম্পানীর অর্থনৈতিক শোষণ এবং নিষ্ঠুর রাজস্বনীতিই ইহার জন্য দায়ী ছিল। মোগল আমলে রায়ত বা কৃষকদের রাজস্বের হার নির্দিষ্ট ছিল এবং তাহাদের জমি হইতে উচ্ছেদ করা যাইত না। কিন্তু দেওয়ানি লাভ করিবার পর হইতে বিদেশী শাসকের দল বাংলার সম্পদ লুণ্ঠন করিবার উন্মত্ত নেশায় মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রশ্রয়ে রাজস্ব সংগ্রহকারিগণ—রেজা খাঁ ও সিতাব রায়ের দল—নানারকম অবৈধ উপায়ে, নিপীড়ন ও নির্যাতনের মধ্য দিয়া কৃষকদের নিকট হইতে অবিশ্বাস্য উচ্চ হারে রাজস্ব আদায় করিতে থাকেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, নবাব আলীবর্দির আমলে পূর্ণিয়া জেলা হইতে রাজস্ব আদায় করা হইয়াছিল ৪ লক্ষ টাকা, ইংরেজ কোম্পানী সেখান হইতে আদায় করিলেন ২৫ লক্ষ টাকা। শুধু তাই নয়, দুর্ভিক্ষের পরের বৎসরও (১৭৭১ খ্রীঃ) পূর্বাপেক্ষা অধিকতর অর্থ রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হইয়াছিল। সুতরাং কোম্পানীর এই নিষ্ঠুর কর আদায় নীতিই দুর্ভিক্ষের জন্য বিশেষভাবে দায়ী ছিল। মোগল আমলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়—অনাবৃষ্টি বা খরা এবং অতিবৃষ্টি ও বন্যা দেখা দিলে শাসক শক্তি খাজনা মকুব, খয়রাতি সাহায্য দান ইত্যাদির মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিতেন। বিদেশী কোম্পানী নামমাত্র খয়রাতি সাহায্য করিয়া এবং বাংলায় যে স্বল্প পরিমাণ শস্য উৎপাদিত হইয়াছিল জোর করিয়া তাহা ইংরেজ সৈন্যদের জন্য কাড়িয়া লইয়া এই ব্যাপক মন্বন্তরের সৃষ্টি করিয়াছিল। বস্তুতঃপক্ষে, ইংরেজ আমলে দুর্ভিক্ষ একটি "বাৎসরিক অনুষ্ঠানে" পরিণত হইয়াছিল।

দুর্ভিক্ষের কারণ

চতুর্দশ অধ্যায়

১৭৬৭ হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ইতিবৃত্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার

● ইঙ্গ-মারাঠা সম্পর্ক ●

সপ্তদশ শতাব্দীতে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির উত্থান ভারতের রাজনীতিতে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যের ক্রমক্ষীয়মাণ শক্তির সুযোগ গ্রহণ করিয়া মারাঠাগণ পেশোয়াদের নেতৃত্বে উত্তর ভারতেও রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। উদীয়মান শক্তি হিসাবে ভারতবর্ষে মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপনের সম্ভাবনা এই সময় উজ্জ্বল হইয়া উঠে। কিন্তু তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে (১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দ) আহম্মদ শাহ আবদালীর নিকট মারাঠা শক্তি শোচনীয়ভাবে বিপর্যস্ত হইল। মারাঠাদের এই পরাজয়ের সুযোগে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলায় এবং কর্ণাটক অঞ্চলে রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপিত করে। বক্সারের যুদ্ধের পর ইংরেজ আধিপত্য অযোধ্যায়ও সম্প্রসারিত হইল। মোগল দরবারেও ইংরেজ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইল। অন্যদিকে, পানিপথের সাময়িক বিপর্যয় অতিক্রম করিয়া তরুণ পেশোয়া মাধব রাও-এর নেতৃত্বে মারাঠাগণও নূতনভাবে সংগঠিত হইল। প্রতিবেশী দক্ষিণী শক্তি—নিজাম ও মহীশূর অধিপতি হায়দর আলীকে পরাভূত করিয়া মারাঠারা পুনরায় উত্তর ভারতে শক্তি সংগঠিত করিতে প্রয়াসী হন। ভারতবর্ষের সমকালীন বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ইংরেজ কোম্পানীও আপন ক্ষমতা সম্প্রসারণের সম্ভাবনায় উদ্দীপ্ত হইল। অর্থাৎ, ইংরেজ ও মারাঠা উভয় শক্তিরই আকাঙ্ক্ষা ছিল ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন। স্বাভাবিকভাবেই ইঙ্গ-মারাঠা সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিল। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়া মাধব রাও-এর মৃত্যুর পরই ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সূচনা হয়।

ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের পটভূমিকা

ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা

মাধব রাও-এর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশোয়া পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি নিজ পিতৃব্য রঘুনাথ রাও বা রাঘোবার চক্রান্তে নিহত হইলেন। রাঘোবা পেশোয়া পদ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু শীঘ্রই নানা ফড়নবীশ নামে এক ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে মারাঠা রাজ্যের প্রভাবশালী নায়কগণ নারায়ণ রাও-এর শিশুপুত্রকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করিলেন। রাঘোবা পুণা হইতে বিতাড়িত হইয়া বোম্বাই-এর ইংরেজ কাউন্সিলের সহিত সুরাটের চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন (১৭৭৫ খ্রীঃ)। কিন্তু কলিকাতার ইংরেজ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের কাউন্সিল সুরাটের সন্ধি অনুমোদন না করায় বোম্বাই কাউন্সিল রাঘোবার পক্ষ ত্যাগ করিয়া মারাঠাদের সহিত পুরন্দরের চুক্তি স্বাক্ষর করিল। ইতিমধ্যে কোম্পানীর ইংল্যান্ডস্থিত ডাইরেক্টর বোর্ড সুরাটের সন্ধি অনুমোদন করিলে বোম্বাই কাউন্সিল পুনরায় রাঘেবার পক্ষে যোগদান করিল। কিন্তু তেলেগাঁও-এর যুদ্ধে মারাঠা বাহিনী ইংরেজদের পরাজিত এবং

ওয়াড় গাঁও চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিল। চুক্তি অনুযায়ী ইংরেজগণ মারাঠা অধিকৃত স্থানসমূহ এবং রাঘোবাকে মারাঠাদের হস্তে প্রদান করিতে স্বীকৃত হইল। এই সন্ধি ব্রিটিশ মর্যাদায় চরম আঘাত হানিলে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস চুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া একে একে আহম্মদাবাদ, বেসিন, গোয়ালিয়র জয় করিলেন এবং সিন্ধিয়াকে পরাজিত করিয়া মারাঠা শক্তিকে পরাভূত করিলেন। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাগণ ইংরেজ কোম্পানীর সহিত সলবই-এর চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। সন্ধির শর্তানুসারে নারায়ণ রাও-এর পুত্র মাধব রাও নারায়ণকে পেশোয়া বলিয়া স্বীকার করা হইল। রাঘোবাকে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা হইল এবং ইংরেজগণ সলসেট লাভ করিলেন। প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান হইল।

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ

সলবই-এর সন্ধির মাধ্যমে মারাঠাদের সহিত ইংরেজ কোম্পানীর মৈত্রী স্থাপিত হইয়াছিল। পরবর্তী বিশ বৎসর এই মৈত্রীর সুযোগে ইংরেজপক্ষ ভারতস্থ অন্যান্য প্রতিযোগীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সর্বশক্তি ও সামর্থ্য নিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।


নানা ফড়নবীশ

সলবই-এর সন্ধির পর মারাঠাগণ নূতন করিয়া শক্তি সঞ্চয়ে যত্নবান হইলেন। এই সময় পুণাতে নাবালক পেশোয়ার অভিভাবক হিসাবে নানা ফড়নবীশ শক্তিশালী হইয়া উঠিলেন। অপরদিকে গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া এবং ইন্দোরের হোলকারগণের মধ্যে ক্ষমতা লাভের দ্বন্দ্বে অনৈক্য ও অন্তর্বিপ্লবের সূচনা হইল।

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সাম্রাজ্যবাদী লর্ড ওয়েলেসলী গভর্নর জেনারেল রূপে ইংরেজ কোম্পানীভুক্ত অঞ্চলের শাসন দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। ভারতে পরবর্তী ইংরেজ অধিকার সম্প্রসারণের নিমিত্ত তিনি অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি উদ্ভাবন করিলেন। এই সময় মারাঠাদের তিন বিশিষ্ট নেতা ও নেত্রীর—নানা ফড়নবীশ, মহাদাজি সিন্ধিয়া ও মহারাণী অহল্যাবাঈ—মৃত্যু হইলে মারাঠা রাজ্যে সংকট ঘনাইয়া আসিল। দৌলত রাও সিন্ধিয়া এবং যশোবন্ত রাও হোলকারের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হইল। উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল পেশোয়ার আড়ালে আপন আধিপত্য কায়েম করা। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও (রাঘোবার পুত্র নূতন পেশোয়া) ছিলেন দৌলতরাও সিন্ধিয়ার প্রভাবাধীন। সুতরাং যশোবন্ত রাও হোলকার তাঁহাকে পরাজিত ও পুণা হইতে বিতাড়িত করিলেন। যশোবন্ত পেশোয়া পদে আপন অনুগত অমৃত রাওকে স্থাপন করিলেন। অনন্যোপায় হইয়া পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও বেসিনের সন্ধির (১৮০২ খ্রীঃ) মাধ্যমে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণ করিয়া ইংরেজদের সাহায্যে পুণা পুনরুদ্ধার করিলেন। কিন্তু অন্যান্য মারাঠা শক্তি, বিশেষ করিয়া সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে ইংরেজদের নিকট স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে রাজী হইলেন না। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সমগ্র মারাঠা জাতি কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হইলেন না। গাইকোয়াড় ইংরেজদের অনুগত থাকিলেন, হোলকারও বিচ্ছিন্ন থাকিলেন। পেশোয়া কিন্তু নিজের হঠকারিতার জন্য অনুতপ্ত হইলেন এবং অবশেষে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের সহিত একত্রিত হইয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এই যুদ্ধই দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ নামে পরিচিত। কিন্তু যুদ্ধে মারাঠাগণ পরাজিত হইলেন। পরাজিত ভোঁসলে দেওগাঁও সন্ধি (১৮০৩ খ্রীঃ) এবং সিন্ধিয়া সুর্জী-অঞ্জন গাঁও-এর সন্ধি (১৮০৩ খ্রীঃ) স্বাক্ষর করিয়া অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণ করিলেন। সন্ধি দুইটির মাধ্যমে ইংরেজ কোম্পানী ভোঁসলের নিকট হইতে কটক, বালেশ্বর সমেত তাঁহার রাজ্যের একাংশ এবং সিন্ধিয়ার নিকট হইতে গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল, আহম্মদনগর, ভারুচ এবং রাজস্থানের জয়পুর, যোধপুর প্রভৃতি যে সব অঞ্চলে সিন্ধিয়ার অধিকার

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ

ছিল—সমস্ত ভূভাগ অধিকার করিয়া লইল। অতঃপর হোলকারের পালা আসিল। সেনাপতি লর্ড লেকের হস্তে লীগের যুদ্ধে হোলকার পরাজিত হইলেন। রাজধানী ইন্দোর ইংরেজ অধিকারে চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলীকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে হইল। অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল স্যার জর্জবার্লো হোলকারের সহিত সন্ধি করিলেন (১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দ)। কিছু কিছু অঞ্চল ইংরেজদের ছাড়িয়া দিলেও হোলকার নিজ রাজ্যের অধিকাংশই ফিরিয়া পাইলেন। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান হইল।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের গুরুত্ব

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে ইংরেজদের শক্তি বৃদ্ধি ও সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটিল। অন্যদিকে এই যুদ্ধে পতন না ঘটিলেও 'মারাঠা শক্তির শিরদাঁড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।' লর্ড ওয়েলেসলী বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মারাঠা শক্তি পদানত করিতে পারিলেই ভারতে সাম্রাজ্য স্থায়ী করা যাইবে। পেশোয়া, সিন্ধিয়া ও ভোঁসলেকে অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ করিয়া এবং হোলকারের সামরিক শক্তির আঘাত হানিয়া তিনি তাঁহার পরিকল্পনার বাস্তব বিকাশে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেন। বেসিনের সন্ধির সুযোগ লইয়া ইংরেজগণ অতঃপর পেশোয়ার সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করিতে প্রয়াসী হন। অন্যদিকে, দিল্লীর মোগল সম্রাটের উপর হইতে সিন্ধিয়ার কর্তৃত্বের অবসান হয়। বাদশাহ ইংরেজদের আশ্রিত ব্যক্তিতে পরিণত হন। মারাঠা শক্তিকে পর্যুদস্ত করিয়া ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী উত্তর ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে পরিণত হইল।

লর্ড হেস্টিংসের আমলে মারাঠা ও ইংরেজদের মধ্যে তৃতীয় বা শেষ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণ করিলেও ইংরেজ আধিপত্য বেশী দিন মানিয়া লইতে পারিলেন না। তাঁহার প্রিয় অনুচর ও মন্ত্রী ত্রিম্বকজী ডিংলের সাহায্যে তিনি সিন্ধিয়া, ভোঁসলে ও হোলকারের নিকট মারাঠা সংঘ স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। ইতিমধ্যে পেশোয়ার সহিত গাইকোয়াড়ের বিরোধের সৃষ্টি হয়। গাইকোয়াড় ছিলেন পেশোয়ার সামন্ত। পেশোয়াকে দেয় তাঁহার কর বাকী পড়ায় এই বিরোধের উদ্ভব হইয়াছিল। যাহা হউক, পেশোয়ার নির্দেশে গাইকোয়াড়ের মন্ত্রী গঙ্গাধর শাস্ত্রী পুণায় আসিলে জনৈক আততায়ী তাঁহাকে হত্যা করে। পুণার ইংরেজ রেসিডেন্ট এই হত্যাকাণ্ডের জন্য ত্রিম্বকজীকে দায়ী করিয়া বন্দী করেন। অল্পদিনের মধ্যেই ত্রিম্বকজী কিন্তু কারাগার হইতে পলাইতে সক্ষম হন। এই পলায়নের পশ্চাতে পেশোয়ার চক্রান্ত রহিয়াছে সন্দেহ করিয়া গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস পেশোয়ার ক্ষমতা কাড়িয়া লইবার মনস্থ করিলেন। তাঁহার নির্দেশে ইংরেজ রেসিডেন্ট এলফিন্‌স্টোন ১৮১৭ সালে পেশোয়াকে পুণার সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করেন। সন্ধির শর্তানুযায়ী পেশোয়াকে মারাঠা নেতৃত্ব পদ ছাড়িয়া দিতে হইল। তাঁহার রাজ্যের একাংশও ইংরেজদের দখলে আসিল। দ্বিতীয় বাজীরাও এই অপমানজনক সন্ধি মানিয়া চলিতে রাজী হইলেন না। হোলকার প্রমুখ সামন্তগণ তাঁহার পক্ষে আসিলেন। এই সময় পেশোয়ার নূতন মন্ত্রী গোক্‌লার পরামর্শে পুণার ইংরেজ রেসিডেন্টের আবাসগৃহে অগ্নিসংযোগ করা হইল। এলফিন্‌স্টোন পুণা হইতে পলায়ন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় বা শেষ ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সূচনা হইল। ইতিমধ্যে রঘুজী ভোঁসলের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র পার্শজো এবং জ্ঞাতিসম্পর্কে ভ্রাতুষ্পুত্র আপ্পা সাহেবের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিরোধের সৃষ্টি হইল। ইংরেজরা এই বিরোধে হস্তক্ষেপ করিয়া আপ্পা সাহেবকে নাগপুরের সন্ধির মাধ্যমে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন। কিন্তু তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সৃষ্টি হইলে হোলকারের সহিত ভোঁসলেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করিলেন। শেষ পর্যন্ত আপ্পা সাহেব, হোলকার এবং সর্বশেষে পেশোয়া ইংরেজদের নিকট পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণে বাধ্য হইলেন। তৃতীয় বা শেষ ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিল।

তৃতীয় বা শেষ ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ

যুদ্ধের ফলে পেশোয়ার এবং ভোঁসলের রাজ্য ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত হইল এবং পেশোয়া পদ বিলুপ্ত

হইল। দ্বিতীয় বাজীরাওকে বাৎসরিক ৬ লক্ষ টাকা ভাতা দিয়া কানপুরের নিকট বিঘৌরে নির্বাসিত করা হইল। পেশোয়া রাজ্যের একাংশে শিবাজীর জনৈক উত্তরাধিকারীকে স্থাপন করিয়া নূতন সাতারা রাজ্য গঠিত হইল। অতঃপর হোলকারকে অধীনতা-মূলক মিত্রতা নীতিগ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইল।

এইভাবে ভারতবর্ষে মারাঠা শক্তির পতন ঘটিল। শিবাজী আপন বাহু বলে ও কূটনীতিতে যে সাম্রাজ্য সৌধ নির্মাণ করিয়াছিলেন, পারস্পরিক ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব, ক্ষমতা-লোলুপতা ও অনৈক্য সেই সাম্রাজ্যের ভিত্তি উৎপাটিত করিয়াছিল। ইহার ফলে, কোম্পানীর সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ সহজতর হইল।

● **মারাঠা শক্তির পতনের কারণ ঃ** তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে মারাঠা রাষ্ট্র ক্ষমতার অবসান ঘটে। কিন্তু তাহাদের এই পতন কোন আকস্মিক ঘটনা নহে। বহুবিধ কারণে মারাঠা শক্তির চূড়ান্ত পতন ঘটিয়াছিল।

প্রথমতঃ, শিবাজী হইতে মাধব রাও এবং নানা ফড়নবীশ ও সিন্ধিয়া পর্যন্ত মারাঠা শক্তি ব্যক্তিগত প্রতিভা ও কর্মদক্ষতার উপর নির্ভরশীল হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ১৮০০ সালের পর তাঁহাদের মধ্যে নেতৃত্ব দিবার উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব দেখা দিয়াছিল। উনিশ শতকের মারাঠা নায়কগণ ছিলেন স্বার্থপর, ক্ষমতালিপ্সু ও ষড়যন্ত্রপ্রিয়। জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া সমকালীন মারাঠা সামন্ত নায়করা—সিন্ধিয়া, ভোঁসলে, হোলকার সংকীর্ণ স্বার্থসর্বস্বতায় আত্মমগ্ন থাকিতেন। এই স্বার্থদুষ্ট অভিজাতদের নিয়ন্ত্রণে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও শুধু যে ব্যর্থ হইয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহার দুর্বল নীতি ও অদক্ষ পরিচালনা এই স্বার্থদ্বন্দ্বকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছিল। পেশোয়া পদকে কেন্দ্র করিয়াও মারাঠা রাজ্যে অন্তর্বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ এই অন্তর্বিরোধেরই ফল। ইংরেজদের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে মারাঠারা কোনদিনও ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করিতে পারেন নাই।

পেশোয়া পদ লইয়া অন্তর্বিরোধ

দ্বিতীয়তঃ, মারাঠা-সংহতির ঐক্য-সূত্র শিবাজী-পরবর্তিকালে তেমন দৃঢ় ছিল না। মোগলদের বিরুদ্ধে আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শিবাজী মারাঠাদের মধ্যে যে আদর্শবোধ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, পরবর্তিকালে তাহা তাহাদের মধ্য হইতে সম্পূর্ণভাবে অন্তর্হিত হইয়াছিল। উপরন্তু মারাঠা সৈন্যরা প্রতিবেশী রাজ্যের স্বাধীনতা হরণ করিয়া এবং চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের নামে লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তি করিয়া শাসনের নৈতিক ভিত্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিল। এই আদর্শচ্যুতি মারাঠা শক্তির পতনের ভিত্তি রচিত করিয়াছিল।

ঐক্যের অভাব

মারাঠা সাম্রাজ্যের পতনের তৃতীয় কারণ ছিল উহার দুর্বল অর্থনৈতিক ভিত্তি। আর্থিক স্বচ্ছলতা ভিন্ন রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন স্থায়ী হইতে পারে না। পর্বতসংকুল মহারাষ্ট্রে কৃষি উৎপাদন কোনদিনই উন্নত ছিল না। অন্যদিকে পরিপূরক ব্যবস্থা হিসাবে শিল্প বা ব্যবসা-বাণিজ্য গড়িয়া তুলিবার কোন আন্তরিক চেষ্টাও মারাঠা নায়কদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় নাই। মারাঠা রাজস্বের একমাত্র উৎস ছিল চৌথ ও সরদেশমুখী। চরিত্রের দিক হইতে ইহা জবরদস্তিমূলক থাকায় ইহা শেষ পর্যন্ত জনপ্রিয় হয় নাই। শিবাজী-পরবর্তিকালে ইহার আদায় ছিল অনিশ্চিত ও অনিয়মিত। সংক্ষেপে বলা যায়, মারাঠা রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল অসফল ও অপ্রিয়।

চতুর্থতঃ, মারাঠা রণনীতি ও রণ কৌশলের পরিবর্তন ঘটিলে উহাদের সামরিক শক্তিও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। চিরাচরিত 'গেরিলা' যুদ্ধ নীতি এবং অশ্বারোহী সেনাদলের উপর নির্ভরশীলতা পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য প্রথায় কামান-বন্দুক সহ পদাতিক বাহিনী লইয়া সম্মুখ যুদ্ধের কৌশল গ্রহণ মারাঠাদের পক্ষে শুভ হয় নাই। তাহারা নূতন রীতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে পারিল না, অথচ পুরাতন প্রথা বাতিল করিল। সামরিক ক্ষেত্রে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয় যাহা তাহাদের পরাজয়ের কারণ। পরিশেষে বলা যায়, 'অর্থনীতির দিক দিয়ে যারা সমুন্নত এবং সমরবিদ্যায় যারা অগ্রসর' সেই ইংরেজদের নিকট মারাঠাদের পরাজয় ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবী ঘটনা।

● ইঙ্গ-মহীশূর সম্পর্ক ●

ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্বে উদীয়মান ইংরেজ শক্তির সর্বাপেক্ষা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল হায়দর আলী ও টিপু সুলতানের নেতৃত্বে মহীশূর শক্তি। শুধু ইংরেজ নয়, মহীশূরের উত্থান মারাঠা ও নিজামের পক্ষেও অস্বস্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফলে, হায়দর এবং বিশেষ করিয়া টিপু সুলতানকে এই তিন শক্তির মিলিত জোটের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হইয়াছিল। অবশ্য ইংরেজগণই ছিলেন মহীশূরের প্রধানতম শত্রু, কারণ হায়দর আলী সঠিকভাবেই বুঝিয়াছিলেন, ইংরেজদের দ্বারাই সৃষ্টি হইবে ভারতের দুর্ভাগ্য। অপরদিকে, যে দ্রুততার সহিত হায়দর আলী শক্তি সঞ্চয় ও সংহত করিয়াছিলেন তাহা ইংরেজদের নিকট ভীতিপ্রদ হইয়া দেখা দিয়াছিল। দক্ষিণ ভারতে ইংরেজ অধিকারের নিরাপত্তা ও প্রসারের স্বার্থে মহীশূরের সহিত সংঘাত তাই অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল।

হায়দর আলীর উত্থান ভারত-ইতিহাসের এক চমকপ্রদ ঘটনা। এক সাধারণ সৈনিক হিসাবে জীবন শুরু করিয়া আপন সামরিক ও কূটনৈতিক দক্ষতা ও প্রতিভার জোরে তিনি ক্রমে মহীশূর রাজ্যের অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৬১ সালে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিয়া তিন বৎসরের মধ্যে প্রতিবেশী স্থানসমূহ হায়দর আপন রাজ্যভুক্ত করিলে মারাঠারা ঈর্ষান্বিত হইয়া ১৭৬৫ সালে মহীশূর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হায়দর রাজ্যাংশ ও অর্থ-ক্ষতিপূরণ দিয়া সন্ধি করেন। পরের বৎসর মারাঠারা নিজামের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইয়া মহীশূর আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলে ইংরেজ কোম্পানীও তাহাদের সঙ্গে যুক্ত হইল। এককভাবে এই ত্রিশক্তি জোটকে মোকাবিলা করা সম্ভব নয় বলিয়া হায়দর কূটনীতির সাহায্যে মারাঠা ও নিজামকে স্বীয় পক্ষে আনিয়া ইংরেজদের মিত্রহীন করেন। এইভাবেই শুরু হয় প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ। যুদ্ধের সূচনাতেই হায়দর পরাজিত হন। ইতিমধ্যে নিজাম পুনরায় ইংরেজ পক্ষে যোগদান করেন। যাহা হউক, পরাজয় সত্ত্বেও হায়দর নিরুৎসাহ হইলেন না। পাল্টা আক্রমণ হানিয়া তিনি দক্ষিণ ভারতে সেই সময়ে ইংরেজদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র মাদ্রাজের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। ইহার পূর্বেই তিনি ম্যাঙ্গালোর অধিকার করিয়াছিলেন। হায়দরের অবরোধের ফলে মাদ্রাজের পতন আসন্ন হইয়া উঠিলে ইংরেজপক্ষ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। বাধ্য হইয়া মাদ্রাজ কাউন্সিল হায়দরের সঙ্গে সন্ধি করিলেন (১৭৬৯ খ্রীঃ)। সন্ধির শর্তানুসারে উভয় পক্ষ পরস্পরের অধিকৃত স্থান এবং যুদ্ধ বন্দীদের প্রত্যর্পণ করিল। অপর একটি শর্তে বলা হইল, মহীশূর রাজ্য কোন তৃতীয় শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হইলে ইংরেজগণ তাঁহাকে সামরিক সাহায্য প্রদান করিবে। এইভাবে প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান ঘটিল।



হায়দর আলি

প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

কিন্তু ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাগণ যখন হায়দরের রাজ্য আক্রমণ করেন তখন ইংরেজগণ পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁহাকে কোন সাহায্য দেন নাই। স্বাভাবিক ভাবেই হায়দর ইংরেজদের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। অল্পকাল পরে আমেরিকায় ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের সূত্র ধরিয়া নিরাপত্তার অজুহাতে ইংরেজ কোম্পানী ফরাসী বাণিজ্য কেন্দ্র মাহে দখল করিয়া নেন। মাহে ছিল মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত একটি সমৃদ্ধ বন্দর। হায়দর স্বয়ং সেখান হইতে পারস্যে বাণিজ্য করিতেন। মাহে ইংরেজ কর্তৃক অধিকৃত হইলে মহীশূরেরও স্বার্থ বিপন্ন হইল। অন্যদিকে তাঁহার বিনা অনুমতিতে ইংরেজদের এই অধিকারকে

হায়দর তাঁহার সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত বলিয়া চিহ্নিত করিলেন। ফলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন। এই উপলক্ষে তিনি মারাঠা ও নিজামের সহিত ব্রিটিশ বিরোধী শক্তি সংঘ গঠন করিলেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে হায়দরের সহিত ইংরেজদের নূতন করিয়া যুদ্ধ—দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ শুরু হইল।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

যুদ্ধের প্রথম পর্বে হায়দর সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। ইংরেজ সেনাপতি কর্নেল বেলী তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু সুচতুর গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস মারাঠাদের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন। নিজামকেও হায়দর আলী হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন। অতঃপর বন্দীবাসের যুদ্ধ-খ্যাত স্যার আয়ার কূটকে মহীশূরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ১৭৮১ সালের পোর্টো নোভোর যুদ্ধে হায়দর পরাজিত হইলেন। তাহা সত্ত্বেও তিনি পাল্টা আক্রমণ চালাইলেন, তাঁহার পুত্র টিপুও অন্য একটি যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজিত করেন।

ম্যাঙ্গালোরের চুক্তি

ইতিমধ্যে ফরাসীদের সহিত হায়দরের যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল। তদনুসারে এক ফরাসী ফৌজ তাহার সাহায্যার্থে ভারত অভিমুখে যাত্রা করে। কিন্তু সেই ফৌজ পৌঁছিবার পূর্বেই ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে হায়দরের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র টিপু সুলতান যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষই রণক্লান্ত হইয়া সন্ধি স্থাপনে আগ্রহী হন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত হইল ম্যাঙ্গালোরের চুক্তি। উভয় পক্ষই পরস্পরের অধিকৃত স্থান ফিরাইয়া দিতে স্বীকৃত হইল।

ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি ইংরেজ-মহীশূর দ্বন্দ্বের মূল প্রশ্নের মীমাংসা করে নাই। দক্ষিণ ভারতে টিপুর অবস্থান ইংরেজ স্বার্থের অনুকূল না থাকায় কোম্পানী নূতন করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। অপর দিকে টিপুও জানিতেন, অদূর ভবিষ্যতে ইংরেজগণ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবেন, কারণ ইংরেজদের লক্ষ্য ছিল ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য গঠন। নিজেকে প্রস্তুত করিবার জন্য টিপু ফরাসী দেশে ও তুরস্ক সাম্রাজ্যে এবং কাবুলে দূত পাঠাইলেন ইংরেজ বিরোধী মহাজোট গঠন করিবার উদ্দেশ্যে। ঠিক এই সময় ভারতবর্ষে গভর্নর-জেনারেলের দায়িত্বভার গ্রহণ করিলেন লর্ড কর্নওয়ালিশ। ইতিমধ্যে পিটের ভারত আইনে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, আত্মরক্ষার প্রয়োজন ব্যতিরেকে যুদ্ধ করা যাইবে না। কর্নওয়ালিশ কিন্তু এই নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া টিপুর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের পরিকল্পনা করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন টিপুকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিতে না পারিলে দক্ষিণ ভারতে ইংরেজ একচ্ছত্র-আধিপত্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে না।



টিপু সুলতান

কর্নওয়ালিশ তাই যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে নিজামের সহিত একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন। চুক্তি অনুযায়ী নিজাম গুন্টুর জেলা কোম্পানীকে দান করিলেন, বিনিময়ে ইংরেজগণ তাঁহাকে বালাঘাট জেলা অধিকারে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। অথচ ম্যাঙ্গালোর সন্ধিতে বালাঘাট জেলা টিপুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছিল। প্রসঙ্গতঃ কর্নওয়ালিশ নিজামকে জানাইয়াছিলেন, ইংরেজ সামরিক সাহায্য কোম্পানীর সহিত মৈত্রীভাবাপন্ন কোন ভারতীয় শাসকদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যাইবে না। এই মর্মে তিনি ভারতীয় শক্তির যে তালিকা প্রদান করেন তাহাতে মহীশূরের উল্লেখ ছিল না।

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

টিপু বুঝিতে পারিলেন ইংরেজগণ ইচ্ছাকৃত ভাবে চুক্তির (ম্যাঙ্গালোরের চুক্তি) শর্ত ভঙ্গ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই বিশ্বাসঘাতকতা যুদ্ধের অজুহাত সৃষ্টি করে। টিপুও প্রস্তুত হইলেন। অল্পকালের মধ্যে তিনি ইংরেজদের অনুগত ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যুদ্ধ ঘোষণা

করিলেন। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ শুরু হইয়া গেল। যুদ্ধের প্রথম দিকে টিপু সাফল্য অর্জন করিলেও দুই বৎসর পরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। এই যুদ্ধে নিজাম ও মারাঠারা ইংরেজ পক্ষভুক্ত ছিলেন। এই মারাঠারা এবং স্বয়ং কর্নওয়ালিশের নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনী একযোগে টিপুর রাজধানী আক্রমণ করিলেন। অসীম বীরত্বের সহিত লড়াই করিলেও টিপু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইলেন এবং শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন (১৭৯২ খ্রীঃ)। এই সন্ধির দ্বারা টিপু তাঁহার রাজ্যের প্রায় অর্ধাংশ ইংরেজ এবং তাহাদের ভারতীয় মিত্রদ্বয়কে-মারাঠা ও নিজাম ছাড়িয়া দিলেন। ইহা ব্যতীত, ক্ষতিপূরণ হিসাবেও কোম্পানী নগদ তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা লাভ করিল। টিপুর দুই শিশু পুত্রকে জামিন'স্বরূপ বন্দী করিয়া কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হইল।

শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের ফলে বরমহল, কুর্গ, মালাবার প্রভৃতি অঞ্চল ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। কর্নওয়ালিশ তাঁহার এই আক্রমণাত্মক নীতির সমর্থনে কর্তৃপক্ষের নিকট যুক্তি দেখাইলেন যে ইহার দ্বারা কোম্পানীর ভারতস্থ সাম্রাজ্যের একটি শক্তিশালী আত্মরক্ষার সীমান্ত সৃষ্টি হইয়াছে।

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, সুযোগ উপস্থিত হইলেও মহীশূর রাজ্যের চূড়ান্ত ধ্বংসসাধন না করিয়া কর্নওয়ালিশ ভুল করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্নওয়ালিশের সমর্থনে বলা যায়, মহীশূর রাজ্য পুরোপুরি ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া গেলে তাহাদের তৎকালীন ভারতীয় মিত্রপক্ষীয় মারাঠা ও নিজাম রুষ্ট এবং অসন্তুষ্ট হইতেন। এই অসন্তোষ ইংরেজ-স্বার্থের পক্ষে শুভ হইত না। দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপে নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানীর ইংল্যান্ডস্থ কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষে শান্তি রক্ষার জন্য উদগ্রীব হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং কর্নওয়ালিশের মহীশূর নীতির সমালোচনা অযৌক্তিক ছিল।

টিপুর ন্যায় স্বাধীনচেতা মানুষের পক্ষে শ্রীরঙ্গপত্তমের অপমানজনক সন্ধি মানিয়া চলা সম্ভব ছিল না। তিনি তাঁহার পরাজয়কে চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিলেন না। পরিবর্তে, তিনি নূতন করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। যথার্থ কূটনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়া তিনি ফরাসীদের সহিত যোগাযোগ করিলেন। মরিশাসের ফরাসী শাসক টিপুর পক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য কয়েকজন ফরাসী স্বেচ্ছাসৈন্য ভারতবর্ষে পাঠাইলেন। ফরাসী বিপ্লবের স্মারক হিসাবে টিপু তাঁহার রাজধানীতে 'স্বাধীনতার স্মারক' (Tree of Liberty) স্থাপন করেন এবং ফরাসী দেশের সর্বাপেক্ষা বিপ্লবী দল 'জ্যাকোবিন ক্লাবের' সদস্য পদ গ্রহণ করেন। তুরস্ক ও আফগানিস্থানের শাসকদের নিকটও তিনি সাহায্যের আবেদন করিয়াছিলেন।

চতুর্থ বা শেষ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

এই সময় ভারতবর্ষে নূতন গভর্নর জেনারেল হিসাবে আসিলেন এক জবরদস্ত সাম্রাজ্যবাদী শাসক—লর্ড ওয়েলেসলী। ভারতে ইংরেজ শাসন প্রসারিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি এক নূতন পরিকল্পনা 'অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি' রচনা করিয়া ভারতীয় শাসকদের বশ্যতামূলক মৈত্রী গ্রহণের দাবি জানান। টিপু এই দাবি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিলেন। ওয়েলেসলী টিপুকে আক্রমণ করিবার সংকল্প গ্রহণ করেন। যুদ্ধের অজুহাত হিসাবে তিনি মহীশূরের শাসকের নিকট তাঁহার ফরাসী মিত্রতার কৈফিয়ৎ তলব করেন। স্বাধীন শাসক হিসাবে টিপু ইহার উত্তর দিতে বাধ্য ছিলেন না। যাহা হউক, গভর্নর জেনারেল মহীশূর শক্তি ধ্বংস করিবার জন্য নিজামকে সঙ্গে লইলেন, মারাঠাদের আহ্বান করিলেও তিনি তাঁহাদের সাহায্য পাইলেন না। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইল। ইহাই ছিল চতুর্থ বা শেষ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মহীশূর-নায়ক রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তমের প্রাচীর-বেষ্টিত শহরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। একমাস অবরোধের পর, বিশ্বাসঘাতকদের সাহায্যে ইংরেজ সৈন্য শহরে প্রবেশ করে। বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে করিতে টিপু রণক্ষেত্রেই প্রাণ দিলেন (৪ঠা মে ১৭৯৯) টিপুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন মহীশূরের অস্তিত্বের অবসান ঘটিল। মহীশূর রাজ্যটিকে তিন ভাগে ভাগ করা হইল। একটি অংশ পাইল নিজাম, রাজ্যের অধিকাংশ লাভ করিল ব্রিটিশ কোম্পানী, প্রাচীন হিন্দুরাজবংশের জনৈক

টিপুর পতন, স্বাধীন মহীশূর রাজ্যের অবসান

বংশধরকে অবশিষ্ট ক্ষুদ্র অংশের সিংহাসনে ইংরেজ আশ্রিত শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হইল।

• লর্ড ওয়েলেসলী প্রবর্তিত অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি •

১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে সাফল্য অর্জন এবং ১৭৬৫ সালে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করিবার পর ভারতে কোম্পানীর অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটে। কোম্পানী বাণিজ্যিক সংস্থা হইতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হয়। বাংলা ও অযোধ্যার নবাব এবং মোগল সম্রাটের সহিত চুক্তি ও সন্ধির মাধ্যমে কোম্পানী দেশীয় রাজ্যগুলির সমমর্যাদা লাভ করে। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের এই নবলব্ধ ক্ষমতা, মর্যাদা ও অবস্থানকে দৃঢ়ভিত্তিক কবিরার প্রয়াসে প্রথম হইতেই সতর্ক ছিলেন। বক্সারের যুদ্ধের পর কয়েকজন স্বল্পদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি দিল্লী অধিকার করিবার সংকল্প প্রকাশ করিলে ক্লাইভ তাহাদের নিবৃত্ত করেন। সমকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ক্লাইভ আত্মরক্ষার নীতি গ্রহণ করেন। ওয়ারেন হেস্টিংসও একই নীতি অনুসরণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কিন্তু ঘটনার চাপে তাঁহাকে জড়াইয়া পড়িতে হইয়াছিল প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে। ক্লাইভ ও হেস্টিংসের এই আত্মরক্ষার নীতিকে ঐতিহাসিক গ্রান্ট ডাফ আখ্যা দিয়েছেন "বেড়াজালনীতি" (Ring Fence Policy)। পিটের ভারত-শাসন আইনেও সতর্ক মনোভাব প্রতিফলিত হয়। কোম্পানীকে ভারতে নূতন করিয়া কোন যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িতে নিষেধ করা হইয়াছিল। কর্নওয়ালিশের আমলে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ ঘটিলেও, তিনি এবং পরবর্তী গভর্নর জেনারেল স্যার জন শোর মোটামুটিভাবে পিটের ভারত শাসন আইন নির্দেশিত 'না হস্তক্ষেপ নীতি' (Policy of Non-Intervention) অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন।

লর্ড ওয়েলেসলী ভারতে গর্ভনর জেনারেল নিযুক্ত হইলে (১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে) দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে ইংরেজ-নীতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। লর্ড ওয়েলেসলীর সমকালে ফ্রান্সে নেপোলিয়নের উত্থান এবং ইংল্যান্ডের প্রতি তাঁহার আক্রমণাত্মক নীতি এক গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করে। নেপোলিয়ন ভারতে ইংরেজ আধিপত্য অবসানের জন্য মিশরে অভিযান করিয়াছিলেন। ওয়েলেসলীর আশংকা হইল, ফরাসীদের সাহায্য লইয়া মারাঠা, মহীশূর প্রভৃতি প্রধান প্রধান ভারতীয় শক্তি কোম্পানীর অধিকার নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে। সুতরাং ভারতে যাহাতে ফরাসী প্রভাব শক্তিশালী না হইতে পারে, তাহার জন্য প্রথম হইতেই তিনি সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু শুধুমাত্র পরিস্থিতিগত পরিপ্রেক্ষিতেই নয়, বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বার্থে তিনি ভারতীয় রাজ্যগুলিকে ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার সংকল্প করেন। মানসিক দিক হইতে তিনি ছিলেন ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী। ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলির সহিত সহ-অবস্থানকে তিনি কোম্পানীর স্বার্থ ও মর্যাদার অনুকূল বলিয়া মনে করিতেন না। সমস্ত দেশীয় রাজ্যকে অনুগত রাখিয়া কোম্পানীকে ভারতবর্ষে প্রধান বা মুখ্য শক্তিতে পরিণত করাই ছিল তাহার উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব শুরু হইয়া গিয়াছে। অতএব অর্থনৈতিক স্বার্থেও সমগ্র ভারতবর্ষে ইংরেজ প্রভাবে বিস্তৃতি সাধনের প্রয়োজন ছিল। সুতরাং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে লর্ড ওয়েলেসলী ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তিকে সর্বাত্মক (Paramount) করিয়া তুলিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। শোরের নিরপেক্ষতা নীতি বর্জন করিয়া তিনি এক আগ্রাসী নীতির সূচনা করেন।

ওয়েলেসলী তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে কার্যকর করিতে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তাহার নাম ছিল অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি (Policy of Subsidiary Alliance) সমকালীন ভারতীয় রাজশক্তির পারস্পরিক স্বার্থ সংঘাত এবং সামরিক দুর্বলতা তাঁহার নীতির সাফল্যের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি জানিতেন, পরস্পর বিবদমান ভারতীয় রাজ্যগুলি একে অপরের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় সামরিক সাহায্যের প্রত্যাশী হইবেই। সুতরাং ফরাসী সামরিক শক্তির পরিবর্তে তিনি ভারতীয় নৃপতিদের ইংরেজ সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়া তুলিতে যত্নবান হন এবং এই উদ্দেশ্যেই অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণ করেন।

এই নীতি অনুসারে (১) যে সমস্ত দেশীয় নৃপতি ইংরেজদের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইবেন, তাঁহাদিগকে আনুগত্য স্বীকার পূর্বক বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত সন্ধি-বিগ্রহ করিবার অধিকার ত্যাগ করিতে হইবে। (২) মিত্র রাজ্যগুলি হইতে ইংরেজ ভিন্ন অপরাপর সামরিক ও বেসামরিক ইউরোপীয়দের বিতাড়িত করিতে হইবে। (৩) মিত্র রাজ্যে ইংরেজ প্রতিনিধি বা রেসিডেন্ট থাকিবেন। (৪) কুশাসন বা অন্য কোন কারণ ভিন্ন মিত্র রাজ্য অধিকৃত হইবে না। (৫) চুক্তিবদ্ধ রাজ্যগুলিকে বহিঃশত্রু এবং গৃহশত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে ইংরেজ কোম্পানী। অতএব, (৬) তাহাদের নিজস্ব সামরিক বাহিনী গঠন করিবার প্রয়োজন নাই। অবশ্য দেশীয় রাজগণের মধ্যে যাহারা বিশেষ শক্তিশালী তাঁহারা নিজস্ব সৈন্যবাহিনী রাখিতে পারিবেন। কিন্তু সেই সৈন্যবাহিনী ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ দ্বারা পরিচালিত হইবে।-(৭) ইংরেজ সামরিক শক্তির ব্যয় সংকুলানের জন্য আশ্রিত রাজগণকে তাঁহাদের রাজ্যের একাংশ কোম্পানীকে প্রদান করিতে হইবে।


ওয়েলসলী

অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির শর্তাবলী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ইহার মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ রাজ্যগুলিকে নিরাপত্তার অজুহাতে কোম্পানীর নিকট তাঁহাদের রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা বন্ধক রাখিতে হইল। তাঁহাদের উপর আর্থিক দায়িত্বও চাপাইয়া দেওয়া হইল এবং এই দায়িত্ব পালন করিবার জন্য তাঁহাদের ভৌমিক ক্ষতিও মানিয়া লইতে হইল। এইভাবে, কোম্পানী আশ্রিত রাজ্যগুলিতে বিনা যুদ্ধে প্রভাব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইল।

ভারতীয় শাসকবর্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল, ভীরু ও আত্মমর্যাদাহীন হায়দ্রাবাদের নিজাম ইংরেজদের সহিত অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হইয়া (১৮০০ খ্রীঃ) ব্রিটিশ কোম্পানীকে তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণস্থ অংশ ছাড়িয়া দিলেন। পর বৎসর অযোধ্যা ইংরেজ কোম্পানীর অধীনতামূলক মিত্র রাজ্যে পরিণত হইল এবং রোহিলাখণ্ড, গোরক্ষপুর ও দোয়াব রাজ্যের একাংশ ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হইল। জয়পুর, যোধপুরের ন্যায় রাজপুত রাজ্যগুলিও বশ্যতামূলক সন্ধি চুক্তি গ্রহণ করেন। যতদিন মারাঠা নেতা নানা ফড়নবীশ জীবিত ছিলেন, লর্ড ওয়েলেসলী তাঁহাদের প্রভাবিত করিতে পারেন নাই। নানার মৃত্যুর পর প্রথমে পেশোয়া ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে বেসিনের সন্ধির মারফৎ এবং পরে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভোঁসলে, সিন্ধিয়া অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণে বাধ্য হইলেন। একমাত্র ভারতীয় শক্তি—টিপু সুলতান-ওয়েলেসলীর চুক্তিকে বলিষ্ঠভাবে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। রণক্ষেত্রে আত্মবিসর্জন দিয়া তিনি বিদেশীর দাসত্বকে উপেক্ষা করিয়া শহীদের মর্যাদা অর্জন করেন।

□ সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা □

● নেপাল, ব্রহ্মদেশ ও আফগানিস্থান ●

মারাঠা ও মহীশূরের পতনের পর ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারে ইংরেজদের কার্যতঃ আর বিশেষ কোনও বাধা থাকিল না। ১৭৫৭ হইতে ১৮১৮ সালের মধ্যে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। অধিকৃত অঞ্চলের কতক অংশে তথাকথিত দেশীয় শাসকদের শাসন কায়েম থাকিলেও, তাঁহাদের রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। অভ্যন্তরীণ শাসনক্ষেত্রে স্থানীয় শাসকদের পরিবর্তে ইংরেজ রেসিডেন্টের মতামত ও নির্দেশ কার্যকর হইল। অবশিষ্ট বৃহত্তর ভারতবর্ষে ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপিত হইল।

অতঃপর ইংরেজ কোম্পানীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির উপর। নেপাল, ব্রহ্মদেশ,

আফগানিস্থান প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যগুলিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আপন নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা শুরু হইয়া গেল। লর্ড ময়রা বা লর্ড হেস্টিংসের শাসনকাল (১৮১৩-২৩ খ্রীঃ) হইতে সীমান্তের রাজ্যগুলির সহিত বিরোধের সূচনা হয়। লর্ড হেস্টিংসকে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে লর্ড ওয়েলেসলীর পরিপূরক।

১৮০১ সালে অযোধ্যার নবাব অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণ করিলে গোরক্ষপুর ইংরেজ অধিকারভুক্ত হয়। এই জেলাটি নেপাল সীমান্তের সন্নিকটে অবস্থিত থাকায় ইংরেজ কোম্পানীর প্ররোচনায় সেখানে মাঝে মাঝেই সীমান্ত সংঘর্ষ দেখা দিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত ১৮১৪ সালে যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। নেপালের ডোগরা বংশীয় রাজা পরাজিত হইয়া কুমায়ুন জেলা (উত্তর প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চল) ইংরেজদের হস্তে অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তিনি অধীনতামূলক মিত্রতার শর্ত গ্রহণ করিতে সম্মত না হওয়ায় ইংরেজরা পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সেনাপতি অক্টারলোনীর নেতৃত্বে ইংরেজ সেনাবাহিনী কাঠমাণ্ডু অবরোধ করিলে, নেপাল পরাজয় স্বীকার করিয়া সগৌলির সন্ধি (১৮১৯) স্বাক্ষর করিল। এই সন্ধির মারফৎ সিমলা, মুসৌরী, নৈনিতাল, আলমোড়া প্রভৃতি 'রমণীয়' পার্বত্য বসতি সমেত গাড়োয়াল ও কুমায়ুন অঞ্চল ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হইল। নেপালের রাজধানীতে একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট বহাল হইলেন। এই জয়ের সূত্রে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর জন্য গোর্খা সৈন্য সংগ্রহের পথ খুলিয়া যায়। পরবর্তিকালে রণনিপুণ গোর্খা সৈন্যবাহিনী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত বাহিনীতে পরিণত হইয়াছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, নেপাল যুদ্ধে সাফল্যের জন্য লর্ড ময়রা 'মার্কুইস অফ হেস্টিংস' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন এবং সেনাপতি অক্টারলোনীর সম্মানে কলিকাতায় একটি স্মারক স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছিল যাহা বর্তমানে শহীদ মিনার নামে পরিচিত।

নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
সগৌলির সন্ধি

ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের স্বাধীন ব্রহ্মদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই সম্পদ লুণ্ঠন করিতে কোম্পানী প্রলুব্ধ হইলে ব্রহ্মরাজ্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। লর্ড আমহার্স্টের শাসনকালে (১৮২৩-২৮ খ্রীঃ) ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশ আধিপত্যের সূচনা ঘটে।

ব্রহ্মের রাজা আরাকান, মণিপুর এবং আসাম দখল করিয়া চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হইলে ইংরেজ কোম্পানী শংকিত হইয়া উঠে। পাল্টা অভিযান করিয়া তাহারা কাছাড় ও জয়ন্তিয়া অধিকার করিয়া নেয়। এইভাবে উভয় শক্তি পরস্পর মুখোমুখি হইলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হইল। প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ শুরু হয় ১৮২৪ সালে, দুই বৎসর পরে ইয়ান্দাবোর সন্ধি মারফৎ যুদ্ধের অবসান ঘটিল। যুদ্ধে ব্রহ্মরাজ পরাজিত হন। এই জয় লাভের ফলে আরাকান ও তেনাসরিম অঞ্চল ব্রিটিশ কোম্পানীভুক্ত হইল। ইহা ব্যতীত, আসাম ও মণিপুরের উপর ব্রহ্মরাজ তাঁহার দাবি প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। মণিপুরে স্থাপিত হইল ইংরেজ আধিপত্য। ব্রহ্মের রাজধানীতে একজন ইংরেজ প্রতিনিধিকে বহাল করা হইল। কোম্পানী বাণিজ্যিক সুবিধা অর্জন করিল। লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে নূতন করিয়া ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ (২য়) শুরু হইয়াছিল। ইংরেজ বণিকদের প্রতি দুর্ব্যবহার এবং জনৈক ইংরেজ দূতকে অপমান করিবার অজুহাতে এই যুদ্ধের সৃষ্টি হইলেও, ইহার পশ্চাতে প্রধান কারণ ছিল ইংরেজ কোম্পানীর সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব। যুদ্ধে ইংরেজপক্ষ জয়লাভ করে এবং সমগ্র নিম্ন ব্রহ্মদেশই কোম্পানীর ভারতস্থিত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে রাশিয়া মধ্য এশিয়াতে সাম্রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট হইলে ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেলগণ এবং ইংল্যান্ডের শাসক কর্তৃপক্ষ শংকিত হইয়া উঠেন। তাঁহাদের আশংকা হইল পারস্য ও আফগানিস্থানে আধিপত্য স্থাপনের পর রাশিয়া ভারতস্থ ইংরেজ সাম্রাজ্য আক্রমণ করিবে। রুশ ভীতিতে সন্ত্রস্ত ইংরেজ কোম্পানী তাই আফগানিস্থানে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা শুরু করিয়া দিল। গভর্নর-জেনারেল লর্ড অকল্যান্ডের আমলে বার্নেসের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল কাবুলে যান। আফগানিস্থানের তদানীন্তন আমীর দোস্ত মহম্মদ ইংরেজ মৈত্রীর পূর্ব শর্ত হিসাবে রণজিৎ সিংহের নিকট হইতে পেশোয়ার প্রত্যর্পণের দাবি জানাইলেন। কোম্পানী দাবি পূরণে অসমর্থ হইলে দোস্ত মহম্মদ রুশ রাষ্ট্রদূতের সহিত সুসম্পর্ক গড়িয়া তোলেন। ইহাতে রুষ্ট হইয়া অকল্যান্ড দোস্ত মহম্মদকে উচ্ছেদ করিয়া শাহ্ সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে স্থাপন

ইঙ্গ-আফগান সম্পর্ক


ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার
১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ
কাবুল
পেশোয়ার
কাশ্মীর
শ্রীনগর
আফগানিস্তান
লাহোর
মুলতান
পাতিয়ালা
রোহিল খণ্ড
কুমায়ুন
নেপাল
ভুটান
সিন্ধু নং
রাজপুতানা
জয়পুর
যোধপুর
আজমীর
যমুনা
পাটনা
বারাণসী
বিহার
আসাম
গোয়ালিয়র
এলাহাবাদ
বুন্দেলখণ্ড
ত্রিপুরা
মারাঠারাজ্য
ঢাকা
চন্দননগর
কলিকাতা
গুজরাট
বরোদা
নর্মদা নং
কাথিয়াওয়াড়
সম্বলপুর
সুরাট
নাগপুর
উড়িষ্যা
কটক
দিউ
দমন
অওরঙ্গাবাদ
গোদাবরী
নিজাম
হায়দ্রাবাদ
আরবসাগর
বঙ্গোপসাগর
বীজাপুর
কৃষ্ণা নং
গোয়া
তুঙ্গভদ্রা নং
কর্ণাটক
মহীশূর
মাদ্রাজ
মাঙ্গালোর
মাহে
কাবেরী নং
কোচিন

করিবার সংকল্প গ্রহণ করেন। তদনুযায়ী ইংরেজ কোম্পানী, রণজিৎ সিংহ এবং আফগানিস্থানের প্রাক্তন আমীর শাহ সুজার মধ্যে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির ফলেই প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ (১৮৩৮-৪২ খ্রীঃ) শুরু হইয়াছিল। যুদ্ধের প্রথম পর্বে ইংরেজপক্ষ জয়লাভ করিয়াছিল। তাহাদের মনোনীত প্রার্থী শাহ্ সুজা কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। আফগানিস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজগণ সেনানিবাস স্থাপন করেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই স্বাধীনতাপ্রিয় আফগানগণ ইংরেজ সেনাবাহিনীকে পরাজিত করিয়া তাহাদের রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। গভর্নর-জেনারেল লর্ড অকল্যান্ড পদত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। নূতন দায়িত্বভার গ্রহণ করেন লর্ড এলেনবরা (১৮৪২—৪৪ খ্রীঃ)। গভর্নর-জেনারেল এলেনবরা আফগানিস্থান হইতে অবশিষ্ট ইংরেজ সৈন্য প্রত্যাহারের নির্দেশ দিলেও, ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষগণ যুদ্ধ চালাইয়া যাইলেন ; সাফল্যও অর্জন করিলেন। ইতিমধ্যে শাহ্ সুজার মৃত্যু হইলে, ইংরেজরা দোস্ত মহম্মদকে মুক্তি দিলেন। ইংরেজদের অনুগত মিত্র হিসাবে দোস্ত মহম্মদ আফগানিস্থানের সিংহাসনে উপবেশন করেন। যাহা হউক, কোম্পানী আফগানিস্থানে পুরোপুরি প্রভাব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে তখনও সক্ষম হয় নাই।

প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ

●**সিন্ধুর ভাগ্য বিপর্যয়** ঃ ইংরেজ কোম্পানীর আফগান নীতি সফল না হওয়ায় তাহাদের রুশ ভীতি আরও বাড়িয়া গেল। সম্ভাব্য রুশ আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে তাই তাহারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা বিধানে তৎপর হইলেন। পাঞ্জাব ও সিন্ধু রাজ্য দুইটি সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ১৮০৯ সালে পাঞ্জাবের রঞ্জিৎ সিংহের সহিত মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার পর সিন্ধুর প্রতি নজর দেন। ১৮৩২ সালে সিন্ধুর আমীরদের সহিত কোম্পানীর একটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে আমীরগণ অধীনতার চুক্তি স্বাক্ষর করেন। অতঃপর পূর্ব সম্পাদিত চুক্তির শর্ত এবং প্রতিশ্রুতি অগ্রাহ্য করিয়া কোম্পানী ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধু জয় করিয়া নেয়।

● শিখ শক্তির উত্থান ঃ মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহ ●

আহম্মদ শাহ আবদালীর দুর্বল উত্তরাধিকারী তৈমুর শাহর নিকট হইতে শিখগণ পাঞ্জাবের অধিকৃত অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হন। অতঃপর ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহারা পূর্বে শাহারাণপুর হইতে পশ্চিমে আটক এবং উত্তরে কাংড়া হইতে দক্ষিণে মুলতান পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করেন। এই গৌরব অবশ্য কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রাপ্য ছিল না, ইহা ছিল সমগ্র জাতিরই প্রাপ্য। যাহা হউক, পাঞ্জাবে এই সময় কোন কেন্দ্রীয় শাসন ছিল না। শিখগণ বারটি দল বা 'মিশলে' বিভক্ত হইয়া এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ শাসন করিত। মিশলের দলপতিগণ স্ব স্ব এলাকায় আপন আপন সংকীর্ণ স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। এইভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে শিখগণের মধ্যে যে ঐক্যভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, শত্রুর অন্তর্ধানের পর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষে তাহা নষ্ট হইয়া গেল। অবশেষে পাঞ্জাব কেশরী রঞ্জিৎ সিংহ বিভক্ত ও বিবদমান শিখজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া পাঞ্জাবের এক বৃহত্তর অংশে নূতন করিয়া শিখসাম্রাজ্য গড়িয়া তোলেন।

রঞ্জিৎ সিংহ ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং বার বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যুর পর 'সুকারচুকিয়া মিশলে'র সর্দার পদ লাভ করেন। সতের বৎসর বয়স হইতেই তিনি অন্যান্য শিখ মিশলগুলির উপর রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপন করিতে প্রয়াসী হন। ১৭৯৮ সালে কাবুল অধিপতি জামান শাহ্ পাঞ্জাব আক্রমণ করিলে রঞ্জিৎ সিংহ তাঁহাকে সাহায্য করেন এবং বিনিময়ে লাহোরের শাসনকর্তার পদ এবং 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই শিখতীর্থ অমৃতসর তাঁহার অধিকারে আসে। ফলে, সমগ্র শিখ জাতির নিকট তাঁহার সম্মান ও প্রতিপত্তি প্রসারিত হইল। অতঃপর তিনি আফগান

প্রভুত্ব হইতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া শতদ্রু নদীর পশ্চিমতীরস্থ মিশলগুলি অধিকার করিয়া লইলেন। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সময় যশোবন্ত রাও হোলকার রঞ্জিৎ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া যুক্তিসঙ্গত নয় বিবেচনা করিয়া তিনি মারাঠা প্রস্তাব নামঞ্জুর করিলেন। ফলে ১৮০৬ খ্রীঃ লাহোর সন্ধির মাধ্যমে হোলকার পাঞ্জাব পরিত্যাগ করিলে রঞ্জিত সিংহ শতুদ্রুর দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চলে আপন অধিকার বিস্তৃত করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ঐক্যবদ্ধ ও বৃহত্তর শিখ সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলা। এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার জন্য শতদ্রু নদীর পূর্বতীরস্থ মিশলগুলির উপর আধিপত্য স্থাপন করিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ঠিক সেইসময় ওই অঞ্চলগুলিতে আত্মকলহ দেখা দিলে কেহ কেহ রঞ্জিৎ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা কারলেন। সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া তিনি লুধিয়ানা অধিকার করিয়া লইলে তাঁহার আমন্ত্রণকারীরা আতঙ্কিত হইয়া ইংরেজ সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। এই সময় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ফরাসী আক্রমণের ভয়ে ভীত ছিল। সুতরাং সীমান্তস্থিত পাঞ্জাবে তাঁহারা কোন রাজনৈতিক সংকটে জড়াইয়া পড়িতে রাজী ছিলেন না। অন্যদিকে রঞ্জিৎ সিংহের ক্ষমতাবৃদ্ধিও তাঁহাদের পছন্দ ছিল না। ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল, যে কোন উপায়ে পাঞ্জাব সীমান্তে রঞ্জিৎ সিংহের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার সাথে সাথে তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করা। তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টো তাই মেটকাফকে রঞ্জিৎ সিংহের দরবারে দূত হিসাবে প্রেরণ করিবার সময় চুক্তি সম্পাদন করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। তদনুযায়ী ১৮০৯ সালে অমৃতসরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। সন্ধির শর্তানুসারে শতদ্রু নদী রঞ্জিৎ সিংহের রাজ্যের সীমারেখা বলিয়া নির্ধারিত হইল এবং উহার পূর্বতীর ইংরেজ রক্ষণাবেক্ষণে চলিয়া আসে। এইভাবে বিনাযুদ্ধে যমুনা হইতে শতদ্রু নদীর পূর্বতীর পর্যন্ত ভূখণ্ডে ইংরেজ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইল। ইংরেজ সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে রঞ্জিতের উক্তি 'সব লাল হো যায়েগা' বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।



রঞ্জিৎ সিংহ

অমৃতসরের সন্ধি (১৮০৯ খ্রীঃ)

অমৃতসরের সন্ধি রঞ্জিতের ক্ষমতা ও মর্যাদার উপর আঘাত দিলেও, অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি পাঞ্জাবের পার্বত্য রাজ্যগুলি, কাশ্মীর, মুলতান ডেরাগাজী খান, জেরা ইসমাইল খান, পেশোয়ার প্রভৃতি স্থান জয় করিলেন। এইভাবে তাঁহার রাজ্য পাঞ্জাব হইতে খাইবার গিরিপথ ও সিন্ধুদেশের সীমা পর্যন্ত প্রসারিত হইল। এইসময় কাবুলের বিতাড়িত আমীর শাহ সুজা রঞ্জিৎ সিংহের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বিখ্যাত কোহিনূর হীরক উপহার দেন। অতঃপর তিনি সিন্ধু উপত্যকা জয় করিতে গেলে ইংরেজগণ বাধা দেন। অবশ্য ব্রিটিশ কোম্পানী রঞ্জিৎ সিংহের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখিতে সচেষ্ট ছিল। লর্ড বেন্টিংক স্বয়ং তাঁহার সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি একটি জাতীয় সাম্রাজ্য, কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা এবং এক শক্তিশালী সেনাদল রাখিয়া যান।

রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যু (১৮৩৯ খ্রীঃ)

রঞ্জিৎ সিংহর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র খড়ক সিংহ শাসনকার্য পরিচালনা করিতে শুরু করেন। দক্ষতা ও ব্যক্তিত্বের অভাবের জন্য তাঁহার শাসনকালে বিশৃংখলা দেখা দেয় এবং এক বৎসরের মধ্যেই তিনি নিহত হন। পিতার মৃত্যুর পরের দিনই খড়ক সিংহের পুত্র দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। তখন শের সিংহ নামে রঞ্জিতের অপর এক পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনিও নিহত হইলেন। অবশেষে শিখ

সেনাবাহিনী নাবালক পুত্র দলীপ সিংহকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। রাণীমাতা ঝিন্দন হইলেন তাঁহার অভিভাবিকা। রাজা লালসিংহ হইলেন ওয়াজীর (প্রধানমন্ত্রী) এবং সর্দার তেজসিংহ হইলেন সেনাপতি।

ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ ও পাঞ্জাব অধিকার

রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যেই শিখরাজ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা হইল। গুরু গোবিন্দ সিংহ যে খালসা বাহিনী তৈয়ারি করিয়াছিলেন তাহা রাষ্ট্রশক্তিকে অগ্রাহ্য করিতে শুরু করে। খালসাবাহিনীর এই ঔদ্ধত্য হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া রাষ্ট্রশক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে রাণীমাতা ঝিন্দন এবং অপরাপর শিখনেতাগণ খালসা সেনাবাহিনীকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্ররোচিত করিতে লাগিলেন। লাহোরের শাসনকার্যে ইংরেজ কোম্পানীর হস্তক্ষেপে খালসা সেনাবাহিনী ইতিপূর্বেই উত্তেজিত হইয়া ছিলেন। ইংরেজগণ শতদ্রু নদীর তীরে সৈন্য সমাবেশ করিয়া পাঞ্জাব আক্রমণের হুমকি দিলে খালসা বাহিনী অমৃতসরের সন্ধির শর্ত অগ্রাহ্য করিয়া শতদ্রু নদী অতিক্রম করিলেন। ইহার ফলে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ইঙ্গ-শিখযুদ্ধ আরম্ভ হইল। অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াও নেতৃত্বের আত্মকলহে ও বিশ্বাসঘাতকতায় শিখ সৈন্য একে একে মুদকী, ফিরোজশা, আলিওয়াল ও সোব্রাওঁ-য়ের যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি হিউ গাফের হস্তে পরাজিত হন। লাহোরের সন্ধি দ্বারা (১৮৪৬ খ্রীঃ) প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের অবসান হইল।

লাহোরের সন্ধি (১৮৪৬ খ্রীঃ)

সন্ধির শর্ত অনুযায়ী শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হইল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে শিখরাজ্যের নিকট অর্থ দাবি করা হইলে তাহারা অর্থের পরিবর্তে কোম্পানীকে কাশ্মীর ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ইংরেজরা কাশ্মীর এক কোটি টাকায় বিক্রয় করিয়া দিলেন গোলাব সিংহকে। অতঃপর আটজন শিখ সর্দার লইয়া গঠিত এক অভিভাবক সভার উপর দলীপ সিংহের শাসনকার্য পরিচালনার ভার দেওয়া হইল। ব্রিটিশ রেসিডেন্ট স্যার হেনরী লরেন্সের নির্দেশে এই অভিভাবক সভা চালিত হইত।

অল্পকালের মধ্যেই শিখ নেতাগণ ইংরেজ আধিপত্য হইতে মুক্তি পাইবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে শুরু করিলেন। শীঘ্রই যুদ্ধের কারণও ঘটিল। লাহোরের ইংরেজ রেসিডেন্ট মুলতানের শিখ শাসনকর্তা মূলরাজকে লাহোরের দরবারে দেয় অর্থের গোলযোগ সংক্রান্ত হিসাব দাখিল করিতে আদেশ করায় অপমানিত মূলরাজ পদত্যাগ করিলেন। ইংরেজরাও নূতন গভর্নর নিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে মুলতানে দুইজন ব্রিটিশ কর্মচারী ও একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মুলতানবাসীরা কর্মচারীদ্বয়কে হত্যা করিলে বিদ্রোহের আশংকা করিয়া তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসী শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এইভাবে দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখযুদ্ধের সূচনা হইল (১৮৪৮ খ্রীঃ)। চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজিত করিয়াও শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন না করিয়া শিখগণ যে সামরিক ভুল করিয়াছিল, তাহার সুযোগ লইয়া ইংরেজগণ গুজরাটের যুদ্ধে (১৮৪৯ খ্রীঃ) শিখদের পরাজিত করিলেন। পাঞ্জাব ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হইল। দলীপ সিংহের জন্য বাৎসরিক পাঁচ লক্ষ টাকার বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইল এবং রাণীমাতা ঝিন্দন সহ তাঁহাকে পাঞ্জাব হইতে নির্বাসিত করা হইল। অতঃপর ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের সীমা আফগানিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত হইল।

২য় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ

শিখ শক্তির পরাজয়

লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রসার ও বিস্তার সাধনে লর্ড ডালহৌসীর শাসনকাল (১৮৪৮-৫৬ খ্রীষ্টাব্দ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক স্যার রিচার্ড টেম্পল মন্তব্য করিয়াছেন, "ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের মধ্যে লর্ড ডালহৌসীর সমতুল্য কেহ ছিলেন না।"

লর্ড ডালহৌসী ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। ভারতবর্ষে ইংরেজ কর্তৃত্ব সম্প্রসারণ করাই ছিল তাঁহার মূল উদ্দেশ্য এবং এই নীতি কার্যকর করিতে তিনি বৈধ-অবৈধ, সৎ-অসৎ সমস্ত পন্থাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসী সম্পর্কে তাঁহার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস ছিল না। তিনি মনে করিতেন, শাসন ও সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে ভারতীয়গণ নিম্নপর্যায়ে ভুক্ত ঐতিহাসিক পার্সিভ্যাল স্পীয়ারের মতে, তাই তিনি ভারতে উন্নত পশ্চিমী সভ্যতা ও শাসন প্রবর্তনে উদ্যোগী হন এবং সেই উদ্দেশ্যে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিকে পরিপূর্ণভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া নেন। অবশ্য, এই সাম্রাজ্যবাসী নীতি শুধু তাঁহার ব্যক্তিগত ইচ্ছা প্রসূত ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে, শিল্প বিপ্লবের দৌলতে, ইংল্যাণ্ড "সমস্ত পৃথিবীর কারখানায়" পরিণত হইয়াছিল। সস্তায় কাঁচামাল সংগ্রহ এবং শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য অবাধ বাজার—উভয়বিধ প্রয়োজনের দিক হইতে ইংল্যান্ডের শিল্পপতিদের নিকট ভারতবর্ষ ছিল যথার্থ "উর্বর ক্ষেত্র"। কিন্তু ব্রিটিশ পণ্য, ইংরেজ-অধিকৃত ভারতবর্ষের তুলনায় দেশীয় রাজ্যগুলিতে অনেক কম বিক্রীত হইত। ওই সব রাজ্যে আমদানীকৃত দ্রব্যের উপর নানারকম বিধি-নিষেধ ও কর আরোপিত হইত। ফলে ব্রিটিশ শিল্পপতিদের স্বার্থ বিশেষভাবে ব্যাহত হইতে থাকে। ইংল্যান্ডের "শিল্পোন্নত সাম্রাজ্যবাদের" রক্ষক লর্ড ডালহৌসী তাই বাজারের সম্প্রসারণের প্রয়োজনে ভারতে কোম্পানীর প্রত্যক্ষ শাসনাধিকার প্রসারে যত্নবান হন।

রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে লর্ড ডালহৌসী তিনটি পন্থা বা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। (১) সরাসরি যুদ্ধ দ্বারা রাজ্য অধিকার, (২) কুশাসনের অজুহাতে রাজ্য দখল এবং (৩) স্বত্ব-বিলোপ নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ। প্রত্যক্ষ যুদ্ধ মারফৎ লর্ড ডালহৌসী ১৮৪৯ সালে পাঞ্জাব এবং ১৮৫২ সালে সমগ্র নিম্ন ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ১৮৫০ সালে তিনি সিকিম রাজ্যের একাংশও যুদ্ধদ্বারা জয় করিয়াছিলেন। সিকিমে ইংরেজ আধিপত্য স্থাপিত হইলে তথায় ব্রিটিশ চা বাগিচা মালিকদের স্বার্থ প্রসারিত হয়।

কুশাসনের অজুহাতেও লর্ড ডালহৌসী কয়েকটি রাজ্য গ্রাস করিয়াছিলেন। ১৮৫৬ সালে তিনি ব্রিটিশ-আশ্রিত অযোধ্যা রাজ্যের বিরুদ্ধে অপশাসনের অভিযোগ আনিলেন। একথা সত্য, বহুদিন হইতেই অযোধ্যায় দুর্নীতি ও কুশাসন চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু ইহার জন্য দায়ী ছিল মূলতঃ লর্ড ওয়েলেসলীর অধীনতামূলক-মিত্রতা নীতি। এই নীতি অনুযায়ী নবাব ছিলেন নামেমাত্র শাসক। ব্রিটিশ রেসিডেন্টের নির্দেশেই অভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালিত হইত। সুতরাং, ক্ষমতার অধিকারী না হওয়ায় নবাবগণ শাসন-দায়িত্ব সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতেন। ইংরেজ রেসিডেন্টেরও একমাত্র কাজ ছিল, ছলে-বলে-কৌশলে যথাসম্ভব অধিক অর্থ আদায় করা। সুতরাং কুশাসনের জন্য নবাব নয়, ইংরেজগণই প্রধানতঃ দায়ী ছিল। লর্ড ডালহৌসী অবশ্য, ইংরেজ দায়িত্ব উপেক্ষা করিয়া নবাবের বিরুদ্ধেই অনাচারের অভিযোগ আনিলেন।

অযোধ্যা ও বেরার দখল

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, লর্ড ওয়েলসলীর সময় হইতেই অযোধ্যার স্বাধীন নবাবগণ কোম্পানীর প্রতি অপকট আনুগত্য প্রকাশ করিয়া চলিতেন এবং একমাত্র বক্সারের যুদ্ধের সময় (ওয়েলেসলী আসিবার আগেই) ব্যতীত কখনই ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোনরূপ যুদ্ধ বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় নাই। কিন্তু অযোধ্যার এই অতীত আনুগত্যের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া লর্ড ডালহৌসী ১৮৫৬ সালে অযোধ্যার নবাব ওয়াজীর আলীশাহকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। অতঃপর তাঁহাকে কলিকাতায় নির্বাসিত করিয়া রাজ্যটিকে ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। অযোধ্যার বিরাট অঞ্চলে ব্রিটিশ পণ্যের অবাধ বাণিজ্য প্রসারের উদ্দেশ্যেই তিনি উহা দখল করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত, বকেয়া অর্থের দাবিতে তিনি ইংরেজ কোম্পানীর অপর একজন বিশ্বস্ত সেবক, হায়দ্রাবাদের নিজামের নিকট হইতে বিশিষ্ট তূলা উৎপাদক কেন্দ্র বেরার অঞ্চলটিও দখল করিয়া লইয়াছিলেন।

ভারতে রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে ডালহৌসী যে বিশেষ নীতিটি সর্বাপেক্ষা সক্রিয়ভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহাকে বলা হয় স্বত্ববিলোপ নীতি। প্রাচীনকাল হইতেই, হিন্দু আইনে অপুত্রক ব্যক্তির দত্তক পুত্র গ্রহণের অধিকার ছিল। এইরূপ পুত্র আইনসম্মত ভাবেই পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতেন। লর্ড ডালহৌসী এই প্রচলিত রীতি নাকচ করিয়া ঘোষণা করিলেন, ইংরেজদের অধীন বা আশ্রিত কোনো দেশীয় রাজবংশের যদি কোন প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী না থাকেন, তাহা হইলে ঐ রাজ্য সরাসরি ব্রিটিশ অধিকারে চলিয়া আসিবে। যুক্তি হিসাবে তিনি বলিলেন, উত্তরাধিকারী-বিহীন রাজ্য স্বাভাবিকভাবেই সার্বভৌম শক্তির হাতে বর্তায় এবং মোগল শক্তির অবসানে কোম্পানীই ছিল ভারতবর্ষের সার্বভৌম শক্তি। সাম্রাজ্য বিস্তারের এই অভিনব পন্থাই হইল 'স্বত্ববিলোপ নীতি'।

স্বত্ববিলোপ নীতি

অবশ্য লর্ড ডালহৌসীকে যথার্থভাবে স্বত্ববিলোপ নীতির উদ্ভাবক বলা সঙ্গত হইবে না, কারণ ১৮৩৪ সাল হইতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতীয় শাসকদের দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবার অধিকার সংকুচিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু লর্ড ডালহৌসীর আগমনের পূর্বে স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করিয়া কোন রাজ্য অধিকৃত হয় নাই।



লর্ড ডালহৌসী



নানা সাহেব

ঐতিহাসিক ইনেসের কথায়, "ডালহৌসীর পূর্ববর্তী ইংরেজ শাসকগণ পারতপক্ষে রাজ্য দখল এড়াইয়া চলিতেন ; আর ডালহৌসী রাজ্য দখলের বিন্দুমাত্র সুযোগ হাতছাড়া করিতেন না।" স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করিয়া ডালহৌসী প্রথমে সাতারা রাজ্যটি দখল করিয়া লইলেন। ক্রমে তিনি সম্বলপুর, নাগপুর, ভগৎ, উদয়পুর, ঝাঁসি প্রভৃতি রাজ্যও ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। ইহা ভিন্ন, ওই বিশেষ নীতি অনুযায়ী পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর তাঁহার দত্তকপুত্র নানা ধন্ধুপন্থের (নানাসাহেব নামে অধিকতর পরিচিত) এবং তাঞ্জোর ও কর্ণাটকের রাজপরিবারের খেতাব ও ভাতা বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হয়।

এইভাবে নানা অছিলায় ও অজুহাতে লর্ড ডালহৌসী ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ঘটাইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ □ ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থার গোড়াপত্তন

এক □ দেওয়ানী ও দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা

কোম্পানীর সার্বভৌমত্বের সূচনা ঃ পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও, বাংলার সুবার সার্বভৌমত্ব কোম্পানীর হাতে আসে নাই। পূর্বের ন্যায় কোম্পানী তখনও ছিল মূলতঃ একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু পলাশী হইতে বক্সার যুদ্ধের সময়কালের মধ্যে ইংরেজ বাণিজ্যসংস্থা একটি সুসংহত ও রাজনৈতিক শক্তিরূপে গড়িয়া উঠিতে থাকে। অবশেষে ১৭৬৫ সালে, দেওয়ানী লাভের মাধ্যমে, "বণিকের মাণদণ্ড···দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে।"

বক্সারের যুদ্ধের পর মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট হইতে ১৭৬৫ সালের ১২ই আগস্ট তারিখে ক্লাইভ বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে কোম্পানীর পক্ষে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করেন। বাংলার নবাব নবমেদ্দৌলার সহিত সম্পাদিত (৩০শে সেপ্টেম্বর ১৭৬৫ খ্রীঃ) অপর একটি চুক্তির মাধ্যমে বাৎসরিক ৫৩ লক্ষ টাকার পরিবর্তে বাংলার রাজস্বের উপর কোম্পানীর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার ফলে, বাংলার রাজস্ব ও অর্থব্যবস্থার উপর কোম্পানীর অধিকার আইনসঙ্গতভাবে স্থাপিত হইল। দেওয়ানী লাভের রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সুবার শাসনব্যবস্থায় সুবাদার ও দেওয়ান ছিলেন সমমর্যাদাসম্পন্ন। সুতরাং রাজস্ব আদায়ের অধিকার পাইয়া কোম্পানী রাজ্যশাসনের প্রত্যক্ষ অংশীদারে পরিণত হইল। অপরদিকে, পূর্ব সম্পাদিত (২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৭৬৫ সাল) অপর একটি চুক্তি দ্বারা কোম্পানী বাংলার নবাবের রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতাও কাড়িয়া লইয়াছিল। এইভাবে, নবাবকে বৃত্তিভোগী পুতুল শাসকে পরিণত করিয়া নিজামত অর্থাৎ প্রশাসনের উপরও কোম্পানীর পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হইল। দেওয়ানী ও নিজামত উভয়বিধ ক্ষমতায় অধিকারী হওয়ায় বাংলার সার্বভৌমত্ব কোম্পানীর হাতে চলিয়া আসে। দেওয়ানী লাভের অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়াও (impact) গুরুত্বপূর্ণ। ১৭৬৫ সালের পর ভারতের বাণিজ্যের মূলধন ইংল্যান্ড হইতে আসা বন্ধ হইয়া গেল। অতঃপর বাংলার রাজস্বলব্ধ অর্থই ভারতে বিনিয়োগ হইতে থাকিল। 'ইন্‌ভেস্টমেন্ট' নামে পরিচিত এই ব্যবস্থায় বাংলার সম্পদের উপর কোম্পানীর শোষণের মাত্রা মারাত্মকভাবে বাড়িয়া গিয়াছিল।

দেওয়ানী লাভ

দেওয়ানী লাভ করিলেও কোম্পানী রাজস্ব আদায় ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নবাবের উপর ন্যস্ত করিল। রেজা খাঁ এবং সিতাব রায় নামে দুইজন নায়েব-সুবার যথাক্রমে বাংলা ও বিহারের রাজস্ব সংগ্রহ করিবার দায়িত্বভার অর্পিত হইল। নবাবের কর্মচারী হইলেও ইঁহাদের উপর নবাবের কোন প্রশাসনিক কর্তৃত্ব থাকিল না। প্রকৃতপক্ষে, কলিকাতা কাউন্সিলের নির্দেশেই তাঁহারা পরিচালিত হইতেন। এইভাবে আর্থিক শক্তি ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব হইতে বঞ্চিত হওয়ায় নবাবের কিছু করিবারই থাকিল না। অন্যদিকে, প্রশাসনের দায়িত্ব বহন না করিলেও কর্তৃত্বের মালিকানা থাকিল কোম্পানীরই হাতে। ইহাই হইল ক্লাইভের কুখ্যাত দ্বৈত শাসনব্যবস্থা। ইহার অর্থ, একদিকে ক্ষমতাহীন দায়িত্ব (নবাব), অপরদিকে দায়িত্বহীন ক্ষমতা (কোম্পানী)।

দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা

কোম্পানীর কর্মচারীদের শাসনতান্ত্রিক অনভিজ্ঞতা, বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ের ঈর্ষা ইত্যাদির অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়াই সম্ভবতঃ ক্লাইভ এই অদ্ভুত ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ক্লাইভের কথায়, কাগুজে হইলেও নবাবের ছায়ার মূল্য আছে। সুতরাং এমনভাবে চলিতে হইবে যাহাতে কোম্পানীর নীতি এবং আদেশ নবাবের নীতি এবং আদেশ বলিয়া প্রতিভাত হইবে। এইভাবেই ক্লাইভ একটি 'আইনগত ধোঁকা' তৈয়ারি করিলেন।

দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বাংলার জীবনে চরম বিপর্যয় সূচিত করিয়াছিল। নায়েব-সুবাদের কার্যাবলীর উপর নবাবের তত্ত্বাবধান করিবার ক্ষমতা এবং কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ করিবার ইচ্ছা না থাকায়, উহাদের শোষণ ও দুর্নীতি মাত্রাতিরিক্ত হইয়া উঠিল। ইহার সঙ্গে যুক্ত হইল কোম্পানীর ক্রমবর্ধমান রাজস্ব-দাবি ১৭৬৪-৬৫ সালে নবাবী আমলের শেষ বৎসরে রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ ১৭ হাজার পাউন্ড, ১৭৬৫-৬৬ সালে দেওয়ানীর প্রথম বৎসরে উহার বৃদ্ধি ঘটিয়া হইল ১৪ লক্ষ ৭০ হাজার পাউন্ড। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (ইংরেজী ১৭৭০ সাল, বাংলা ১১৭৬ সন)। সঙ্গত কারণেই ঐতিহাসিক কে (Kaye) মন্তব্য করিয়াছেন, "দ্বৈত শাসনব্যবস্থা বিশৃংখলাকে আরও বিশৃংখল এবং দুর্নীতিকে আরও দুর্নীতিগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।"

১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার শাসনদায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে দ্বৈতশাসনের যাবতীয় ত্রুটি ব্যপকভাবে আত্মপ্রকাশ করিল। রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও কোম্পানীর পরিচালক সমিতি উপলব্ধি করিলেন সংগৃহীত রাজস্বের একটা বিরাট অংশ দুর্নীতিপরায়ণ নায়েব-সুবাদারগণ আত্মসাৎ করিতেছেন। সুতরাং কোম্পানীর আপন অর্থনৈতিক স্বার্থে দ্বৈত শাসনের অবসান প্রয়োজনীয় হইয়া দেখা দিল। অবশেষে ডাইরেক্টর সভার নির্দেশে ১৭৭২ সালের এপ্রিল মাসে হেস্টিংস প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব আদায় করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। রেজা খাঁ ও সিতাব রায়কে পদচ্যুত করিয়া দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইল। সরকারী রাজকোষ মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইল। এইভাবে ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈতশাসনব্যবস্থার অবসান ঘটিল হেস্টিংসের আমলে। বাংলার সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হইল কোম্পানী। অতঃপর শুরু হইল তাহার ক্ষমতার ক্রম-প্রসারণ।

দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার ফলাফল

দুই □ প্রশাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীকরণ নীতির প্রবর্তন ও প্রসারণ

● হেস্টিংস ও কর্নওয়ালিশের ভূমিকা ●

ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্যের ইতিহাসে ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকাল (১৭৭২-৮৫ খ্রীঃ) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি বাংলার শাসনদায়িত্ব গ্রহণ করেন তখনও পর্যন্ত ইংরেজ কোম্পানী কোনরূপ শাসনগত অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া উঠিতে পারে নাই। অন্যদিকে, দ্বৈত শাসনব্যবস্থা ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গভীর বিপর্যয়ের উদ্ভব হইয়াছিল। এই সমস্যাসংকুল পরিস্থিতির অবসানে কেন্দ্রীয় শাসনের বিকাশ সাধন করিয়া কোম্পানীর অধিকার-ভিত্তিকে দৃঢ়ভাবে গ্রথিত করাই ছিল তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। তাঁহার এই উদ্দেশ্য অনেকাংশেই সার্থকতা অর্জন করিয়াছিল।

কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন

বাংলার গভর্নর হিসাবে হেস্টিংস প্রথমেই দ্বৈতশাসনের অবসান করিয়া দেওয়ানী পরিচালনার দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে কোম্পানীর উপর ন্যস্ত করিলেন। বাংলায় কোম্পানীর প্রধান পরিচালক হিসাবে এই দায়িত্ব মূলতঃ তাঁহার নিজের উপরই অর্পিত হইল। এইভাবেই প্রশাসনের সমস্ত ক্ষমতা গভর্নরের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইল। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী বাংলার গভর্নরকে গভর্নর-জেনারেলের মর্যাদা প্রদান করা হয়। এই আইনে সপরিষদ বাংলার গভর্নর-জেনারেলকে বোম্বাই ও মাদ্রাজ কাউন্সিলের উপর কর্তৃত্বের অধিকার দেওয়া হয়। প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলির পৃথকভাবে নীতি গ্রহণ এবং কার্যক্রম অনুসরণের স্বাধীনতা খর্ব করিয়া সমস্ত বিষয়টি একটি কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পরিচালনাধীনে লইয়া আসা হইল। ইহার ফলে কোম্পানীর সর্বভারতীয় নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হইল। এই প্রশাসনিক ব্যবস্থার মুখ্য ব্যক্তি হইলেন গভর্নর-জেনারেল।

রেগুলেটিং অ্যাক্ট

গভর্নর-জেনারেলের কর্মকেন্দ্র ছিল কলিকাতা। ইতিপূর্বেই সরকারী কোষাগার মুর্শিদাবাদ হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। এই কোষাগার এবং পরবর্তিকালে সদর দেওয়ানী আদালতও কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত করা হইল। এইভাবেই কলিকাতা ব্রিটিশ ভারতের প্রধান শাসন কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠিল। অতএব সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল হইতেই কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া গভর্নর জেনারেলের শাসন সমগ্র ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকে।

লর্ড কর্নওয়ালিশের শাসনকালে (১৭৮৬-'৯৩ খ্রীঃ) এই প্রশাসনিক কেন্দ্রীকরণের নীতি আরো দৃঢ়বদ্ধ করা হইল। হেস্টিংসের আমলের ব্যবস্থা বাতিল করিয়া তিনি সদর নিজামত আদালতও সপরিষদ গভর্নর জেনারেলের অধীনে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন (১৭৯০ খ্রীঃ)। জমিদারদের নিকট হইতেও আঞ্চলিক শান্তি-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব কাড়িয়া লইয়া একটি সুসংহত কেন্দ্রীয় পুলিসী ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হইল। কর্নওয়ালিশ প্রবর্তিত সংস্কারগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার ছিল 'কোড কর্নওয়ালিশ'। উক্ত কোডে সরকারী কার্যাবলী পরিচালনা করিবার নিয়মবিধি সংকলিত হইয়াছিল। কর্নওয়ালিশ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে ভারতীয়দের নিয়োগ বন্ধ করিয়া দেন। এইভাবে তাঁহার সময় হইতেই ইংরেজ প্রশাসকদের নেতৃত্বে ভারতবর্ষে একটি শক্তিশালী আমলাতন্ত্র গড়িয়া উঠিতে থাকে। ভারতে দৃঢ়, সন্নিবদ্ধ কেন্দ্রাতিগ শাসন প্রতিষ্ঠায় আমলাতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিল।

কোড ক ওয়ালিশ

কর্নওয়ালিশের শাসনকালে পীটের ভারত আইন প্রণয়ন করা হয় (১৭৮৪ খ্রীঃ)। এই আইন অনুযায়ী গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পাইল। বলা হইল, গভর্নর জেনারেলই হইবেন ব্রিটিশ ভারতীয় ফৌজের প্রধান সেনাপতি এবং প্রয়োজনে তিনি তাঁহার কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করিতে পারিবেন। ১৭৯৩ সালের সনদ আইনে গভর্নর জেনারেলের অধিকার নূতন করিয়া বর্ধিত হইল। এইভাবে গভর্নর জেনারেলের নিয়ন্ত্রণে ব্রিটিশ ভারতের শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত করা হইল।

তিন □ বিচার ও পুলিসী ব্যবস্থার সংগঠন

মোগল আমলে দেওয়ানীর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল দেওয়ানী বিচার এবং নিজামতের সঙ্গে যুক্ত ফৌজদারী বিচার। ১৭৭২ সালে দ্বৈতশাসনব্যবস্থার অবসানে কোম্পানী রাজস্ব আদায়ের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করিলে ভূমি সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তির দায়িত্বও তাহার উপর অর্পিত হইল। পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ওয়ারেন হেস্টিংস প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার ও সংগঠনের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করেন। প্রথমেই তিনি বাংলাকে ৩৫টি জেলায় বিভক্ত করেন। অতঃপর Committee of Circuit বা ভ্রাম্যমাণ কমিটির (জমি বন্দোবস্ত করবার উদ্দেশ্যে ইহা গঠন করা হইয়াছিল) সুপারিশ অনুযায়ী, প্রতি জেলায় ইংরেজ কালেক্টর ও দেশীয় কাজীর অধীনে যথাক্রমে মফঃস্বল দেওয়ানী ও মফঃস্বল ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হয়, মৌলবী ও পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এদেশীয় বিধিব্যবস্থা অনুসারে বিচারকার্য সম্পাদিত হইত। ফৌজদারী আদালতেও অবশ্য কোম্পানীর পরোক্ষ কর্তৃত্ব স্থাপিত হইল। মফঃস্বল দেওয়ানী আদালতে রায়ের বিরুদ্ধে আপীল মামলার বিচার করিত সদর দেওয়ানী আদালত। এই



ওয়ারেন হেস্টিংস

আদালত অবস্থিত ছিল কলিকাতায়। কাউন্সিলের দুইজন সদস্য লইয়া গভর্নর জেনারেল বিচারকার্য পরিচালনা করিতেন। ফৌজদারী মামলার সর্বোচ্চ বিচারালয় সদর নিজামত আদালত স্থাপিত হয় মুর্শিদাবাদে। এই আদালতের প্রধান বিচারপতি নবাব কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। এই বিচারালয়ের উপরেও ইংরেজ বিচারকদের পরিদর্শনের অধিকার ছিল।

সুষ্ঠু বিচারের উদ্দেশ্যে হেস্টিংস বিচার বিভাগে কয়েকটি সংস্কার প্রবর্তন করেন। ইহার ফলে মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত নথিপত্রের সংরক্ষণ এবং বিচারে উৎকোচ গ্রহণের রীতি বাতিল করিয়া কাজী-মুফতী প্রভৃতির নিয়মিত বেতন দানের ব্যবস্থা করা হয়।

সুপ্রীম কোর্ট (১৭৭৪খ্রীঃ)

হেস্টিংসের আমলে, রেগুলেটিং এ্যাক্টের বিধি অনুযায়ী ১৭৭৪ সালে স্থাপিত হয় সুপ্রীম কোর্ট। কোম্পানীর ইউরোপীয় ও ভারতীয় প্রজাদের বিলাতী বিচারালয়ের পদ্ধতিতে এই বিচারালয় পরিচালিত হইত। কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন স্যার এলিজা ইম্পে। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের নির্দিষ্ট সীমানা বিভাজন না থাকায় সমস্যার উদ্ভব হয়। বহু পরে, ১৮৫৩ সালের সনদ আইনে এই সমস্যার সমাধান ঘটে।

কর্নওয়ালিস বিচার ব্যবস্থা

বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে লর্ড কর্নওয়ালিশ হেস্টিংসের নীতিকে সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতীয়দের উপর হেস্টিংসের যে আস্থা ও বিশ্বাস ছিল, লর্ড কর্নওয়ালিশের তাহা ছিল না। সেইজন্য তিনি নবাবের বিচারক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া ১৭৯০ সালে সদর নিজামত আদালত কলিকাতায় স্থানান্তরিত করেন। সপরিষদ গভর্নর জেনারেল এই বিচারালয় পরিচালনা করিতেন। মফঃস্বলে ফৌজদারী মামলা বিচার করিত ইংরেজ বিচারপতিদের লইয়া গঠিত ভ্রাম্যমাণ ফৌজদারী আদালত (Criminal Court of Circuit)। দেওয়ানী বিচারের ক্ষেত্রে কর্নওয়ালিশ রাজস্ব বিভাগ হইতে দেওয়ানী বিভাগ বিচ্ছিন্ন করেন। অতঃপর দুইজন করিয়া ইংরেজ বিচারকের অধীনে জেলায় জেলায় বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য চারিটি ভ্রাম্যমাণ বিচারালয় স্থাপিত হইল। জেলা বিচারালয়গুলির উপরে কলিকাতা, ঢাকা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদে প্রাদেশিক আপীল আদালত স্থাপিত হইল। এইগুলির পরিচালনের দায়িত্ব ছিল ইংরেজ বিচারকদের উপর। দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ ছিল সদর দেওয়ানী আদালত। গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিল এই বিচারালয় পরিচালনা করিতেন। সর্বনিম্নে ছিল সদর আপীল ও মুনসেফী আদালত।

বিচার বিভাগে কর্নওয়ালিশও কতকগুলি সংস্কার চালু করিয়াছিলেন। ইহার ফলে, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে আইনগত সমতার নীতি প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহা ব্যতীত, হত্যার অপরাধকে সমাজ-বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের আমলে বিচার বিভাগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করা হয়। তিনি কর্নওয়ালিশ প্রবর্তিত ভ্রাম্যমাণ এবং প্রাদেশিক আপীল আদালতগুলি বাতিল করেন। আদালতে ফারসী ভাষার পরিবর্তে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার চালু করা হয়। অপর দিকে, দেওয়ানী মামলার বিচার কার্যে ভারতীয় বিচারক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের বিচারক্ষমতা ও বেতন উভয়ই বৃদ্ধি করা হইল।

পেনাল কোড ১৮৫৩ সালের সনদ

কোম্পানীর বিচার ব্যবস্থায় একটি মারাত্মক ত্রুটি ছিল। এই সময় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে "কমপক্ষে পাঁচ ধরনের আইন কানুন চালু ছিল।" ১৮৩৩ সালের সনদে ভারতের আইন-বিধি একীকরণের নির্দেশ দেওয়া হইল। গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের নূতন সদস্য (পঞ্চম) আইন সচিব মেকলের নেতৃত্বে ১৮৩৪ সালে গঠিত হয় "আইন কমিশন"। এই কমিশনের প্রচেষ্টায় ভারতীয় 'পেনাল কোড বা দণ্ডবিধি' রচিত হয়। ১৮৫৩ সালের সনদে ঘোষণা করা হইল সমগ্র ভারতবর্ষের সবরকম বিচারালয়ের জন্য একই ধরনের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারবিধি তৈয়ারি করা হইবে। ইহারই সূত্র ধরিয়া ১৮৬১ সালে রচিত হয় ভারতীয় হাইকোর্ট আইন। এইভাবে ১৭৭২ সাল হইতে ১৮৫৩ সালের মধ্যে ধাপে ধাপে বিচার ব্যবস্থাও কেন্দ্রীকরণ করা হইল।

পুলিসী ব্যবস্থার ক্ষেত্রে লর্ড কর্নওয়ালিশের আমলে বিশেষ সংস্কার প্রবর্তন করা হইয়াছিল। হেস্টিংসের শাসনকালে গ্রামাঞ্চলের শান্তিরক্ষার দায়িত্বভার দেওয়া হইয়াছিল জমিদারদের হস্তে। তাঁহারা পাইক, বরকন্দাজ প্রভৃতির মারফৎ তাঁহাদের এই দায়িত্ব পালন করিতেন। কর্নওয়ালিশ এই ব্যবস্থা রদ করিয়া নূতনভাবে পুলিশী ব্যবস্থার সংগঠন করেন। প্রতিটি জেলা কয়েকটি থানায় বিভক্ত করা হইল। থানার শান্তি রক্ষার জন্য ইওরোপীয় দারোগা নিযুক্ত হইল। কলিকাতার শান্তিরক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হইল একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হস্তে। তাঁহার পরিচয় হইল পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট। কর্নওয়ালিশ প্রবর্তিত পুলিসী ব্যবস্থা পরবর্তিকালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভে পরিণত হয়।

পুলিশী ব্যবস্থার সংগঠন

চার □ ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন

১৭৬৫ সালে বাদশাহী ফারমান বলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলা সুবার দেওয়ানী অধিকার লাভ করে। কিন্তু ১৭৬৫ হইতে ১৭৭২ সাল (ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনের সূচনাকাল) পর্যন্ত কোম্পানী রাজস্বসংক্রান্ত ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে নাই। শুধু আমিন ও সুপারভাইজারদের মাধ্যমে যত বেশী সম্ভব রাজস্ব আদায়ের প্রতিও তাহারা তৎপর ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ১৭৬৪ সালে (নবাবী আমলের শেষ বৎসর) আদায়ীকৃত ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৮১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা, ১৭৭১ সালে উহা বাড়িয়া হইল ২ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা। ভূমি-রাজস্ব হইতে এইভাবে আয়ের সম্ভাবনা আরো প্রবল থাকায় ১৭৭২ সালে শাসনদায়িত্ব গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ওয়ারেন হেস্টিংস উক্ত বিষয়ে নানাধিক সংস্কার প্রবর্তন করেন। প্রথমেই তিনি ডাইরেক্টরি সভার নির্দেশ অনুযায়ী ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বাতিল করিয়া প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর রাজস্ব নির্ধারণ ও তাহা আদায়ের জন্য হেস্টিংস কয়েকটি উপায় উদ্ভাবন করিলেন। জমি বিলি করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নেতৃত্বে কাউন্সিলের সদস্যদের লইয়া একটি ভ্রাম্যমাণ কমিটি (Committee of Circuit) গঠিত হইল। এই কমিটি জেলায় জেলায় ঘুরিয়া নীলামে জমি বন্দোবস্ত করিত। সর্বোচ্চ নীলামদারদের পাঁচ বৎসরের জন্য জমির স্বত্ব দেওয়া হইত। রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে থাকিতেন ইংরেজ কালেক্টরগণ। এই ব্যবস্থা 'পাঁচশালা বন্দোবস্ত' নামে পরিচিত। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এই ব্যবস্থার ত্রুটি প্রকাশ হইয়া পড়িল। পাঁচ বৎসরের সময়কালের মধ্যে যতটা সম্ভব আপন আয় স্ফীত করিবার জন্য জমির ইজারাদারগণ দেয় রাজস্ব হইতে অনেক বেশী পরিমাণ অর্থ কৃষকদের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতেন। অন্যদিকে, অনভিজ্ঞ ইংরেজ সংগ্রহকারিগণ রাজস্বের সমস্ত অর্থ আদায় করিতে সমর্থ হইতেন না, আবার যতটা আদায় করা হইত দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মচারিগণ তাহার সম্পূর্ণ অংশ কোম্পানীর কোষাগারে জমা দিতেন না। ফলে, ডাইরেক্টরি সভার নির্দেশমত হেস্টিংস পাঁচশালার পরিবর্তে বাৎসরিক ইজারার ব্যবস্থা চালু করেন এবং কালেক্টর পদ উঠাইয়া দিয়া দেওয়ান নামে ভারতীয় কর্মচারীর হস্তে রাজস্ব আদায়ের ভার দেন। সরকারী দেওয়ানী কোষাগারও মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইল। ইহা ব্যতীত, গভর্নর জেনারেল এবং তাঁহার কাউন্সিলের দুইজন সদস্য ও তিনজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের লইয়া একটি রাজস্ব বোর্ডও গঠিত হইল। সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরিচালনার জন্য একাউন্ট্যান্ট জেনারেল নামে একটি পদও সৃষ্টি করা হইল। ১৭৭৬ সালে আয়ের রাজস্ব বিভাগের কাজ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য হেস্টিংস 'আমিনী কমিশন' গঠন করেন। কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনরায় কালেক্টর পদের প্রচলন করা হইল। জমির একশালা বন্দোবস্তও অনুমোদিত হইল। কিন্তু ইহাতেও রাজস্ব সমস্যার কোন সুষ্ঠু সমাধান ঘটিল না। সুতরাং ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজস্বনীতিকে পরীক্ষামূলক বলা চলে।

ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা

পাঁচশালা বন্দোবস্ত

আমিনী কমিশন

১৭৮৬ সালে বাংলার গভর্নর-জেনারেলের দায়িত্বভার গ্রহণ করিবার পর লর্ড কর্নওয়ালিশ প্রচলিত রাজস্ব-নীতির ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করেন। অনেক সময়ই সর্বোচ্চ নীলামদারগণ প্রতিশ্রুত রাজস্ব দিতে অপারগ হইতেন। আবার, এক বৎসরের জন্য মালিকানা লাভ করায় জমিদারগণ যেমন জমির উন্নতির কোন চেষ্টা করিতেন না, তেমন এই স্বল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব অর্থ আদায়ের জন্য রায়তদের উপর তীব্র শোষণ চালাইতেন। ফলে, অনেক কৃষকই পলায়ন করিতেন। সুতরাং প্রচলিত ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায় অনিয়মিত হইয়া পড়ে। প্রতিশ্রুত ও আদায়ীকৃত রাজস্বের মধ্যে ফারাক পড়ায় রাজস্বে ঘাটতি দেখা দেয়। কোম্পানীর পরিচালক সমিতি এই অবস্থা প্রতিকারের জন্য যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। ইংল্যান্ডের এক ভৌমিক অভিজাত পরিবারের সন্তান লর্ড কর্নওয়ালিশ বংশানুক্রমিক নীতির ভিত্তির উপর নির্দিষ্ট হারে জমিদারদের সহিত জমির বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করিবার পক্ষে মত প্রকাশ করিলেন। অবশ্য ইতিপূর্বে, হেস্টিংসের কাউন্সিলের সদস্য স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস ১৭৭৬ সালে একই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন এই নীতি পরিচালক সমিতি অনুমোদন করেন নাই। কর্নওয়ালিশ অবশ্য জানিতেন, তাঁহার প্রস্তাব কার্যকর হইবেই, কারণ তদানীন্তন ইংল্যান্ডের দুই শক্তিমান পুরুষের সহিত—প্রধানমন্ত্রী পিট এবং কোম্পানীর পরিচালক সমিতির সভাপতি স্যার হেনরী ডান্ডাস—তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল এবং তাঁহাদের নিকট হইতে পরিপূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতার আশ্বাসও তিনি পাইয়াছিলেন। অতঃপর কর্নওয়ালিশ তাঁহার প্রস্তাব সম্পর্কে কোম্পানীর ভারতস্থ কর্মচারীদের মতামত আহ্বান করিলে রাজস্ব বিভাগের প্রবীণ কর্মচারী স্যার জন শোরের সহিত তাঁহার মতবিরোধ ঘটে। শোর জমিদারদের সঙ্গে স্থায়ী ভিত্তিতে জমি বন্দোবস্ত করিবার পক্ষপাতী হইলেও 'ধাপে ধাপে' তিনি উহা প্রবর্তন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি আরও বলেন, সঠিকভাবে জমি জরিপ না করিয়া জমির রাজস্ব স্থায়িভাবে নির্দিষ্ট করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (২২ মার্চ ১৭৯৩)

কর্নওয়ালিশ কিন্তু শোরের আপত্তি গ্রহণ করিলেন না। তিনি নির্দিষ্ট রাজস্বের ভিত্তিতে জমিদারদের বাৎসরিকের পরিবর্তে দশ বৎসরের জন্য জমির মালিকানা দান করিলেন (১০ ফেব্রুয়ারী ১৭৯০ খ্রীঃ) এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করিলেন, ডাইরেক্টর সভার অনুমোদনক্রমে উহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রূপান্তরিত হইবে। ১৭৯২ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর ডাইরেক্টর সভার অনুমোদন আসিয়া পৌঁছিলে ১৭৯৩ সালের ২২শে মার্চ হইতে প্রচলিত ব্যবস্থা চিরস্থায়ী বলিয়া ঘোষিত হইল। স্থির হইল, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (বৎসরের শেষ দিনের সূর্যাস্তের মধ্যে) নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রদান করিতে পারিলে জমিদারগণ বংশ পরম্পরায় চিরকালের জন্য জমি ভোগ করিতে পারিবেন। এই ব্যবস্থাই ইতিহাসে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' নামে পরিচিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার অর্থনীতি ও সমাজে বিরাট পরিবর্তন আনিয়াছিল। ইংরেজ স্বার্থের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া মার্শম্যান তাই ইহাকে 'একটি সাহসিকতাময় বিজ্ঞ ব্যবস্থা' বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন। নিঃসন্দেহে ইহা কোম্পানীর স্বার্থের অনুকূল ছিল। এই ব্যবস্থায় রাজস্বের অর্থ নির্দিষ্ট এবং রাজস্ব আদায় নিয়মিত হওয়ায় কোম্পানীর বাজেট বা আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করা সহজ হইল। জমিদারগণও চিরকালের জন্য জমির মালিকানা স্বত্ব লাভ করিয়া জমির উন্নতির দিকে যত্নবান হইলেন। কোন কোন জমিদার গ্রামোন্নয়নের ব্যাপারেও উৎসাহী হইয়াছিলেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায় বাংলার কৃষককুলের জীবনে চরম সর্বনাশ নামিয়া আসিয়াছিল। রায়তদের নিকট হইতে জমিদারদের প্রাপ্য খাজনার হার নির্দিষ্ট না হওয়ায়, কৃষকগণ নির্মমভাবে নির্যাতিত হইতে থাকেন। জমিদারদের ক্ষুধা মিটাইতে যাইয়া তাহাদের ঋণ-কর্জ করিতে হইল 'মহাজন'দের নিকট হইতে। এইভাবে, "জমিদারী এবং মহাজনী ব্যবস্থা এল গাঁটছড়া বেঁধে।" মোগল আমলে জমিতে রায়তদের স্বত্ব স্বীকৃত ছিল। কিন্তু নূতন ব্যবস্থায় বেশী খাজনা পাইবার লোভে জমিদারগণ বার বার চাষীকে জমি হইতে উচ্ছেদ করিতে থাকিল। এইভাবে বাংলায় ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিল। অন্যদিকে, জমিদারগণ,

নায়েব-গোমস্তা-পেয়াদাদের হাতে খাজনা আদায়ের ভার দিয়া কলিকাতা শহরে অলস, পরিশ্রমহীন, বিলাসী জীবনে মত্ত হইয়া থাকিলেন। আবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্র ধরিয়া জমিদার ও রায়তদের মধ্যে বহু মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে, বাংলার গ্রামের আর্থিক ও সামাজিক শ্রম বিধ্বস্ত হইতে থাকে।

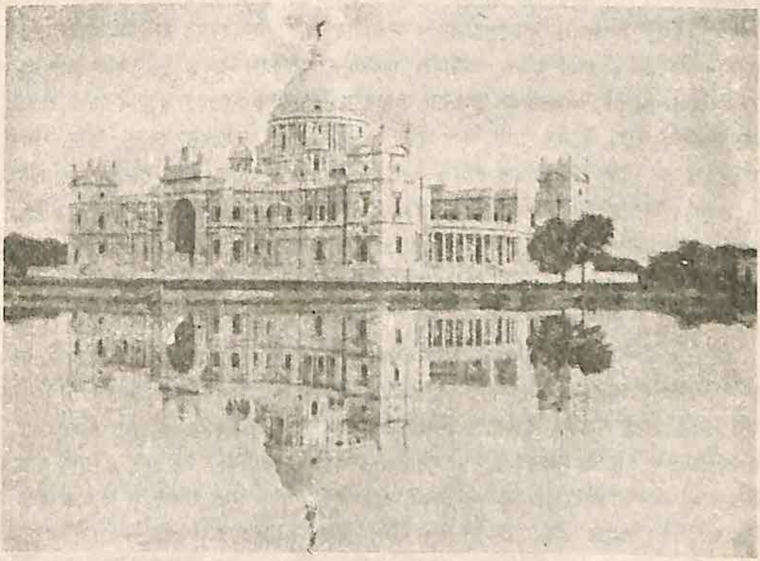
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে একদিক দিয়া কিন্তু কোম্পানীরও লোকসান হয়। রাজস্ব স্থায়িভাবে নির্দিষ্ট হওয়ায় জমির উন্নতি বা উর্বরাশক্তিবৃদ্ধি ঘটিলেও তাহার সুফল কোম্পানী পাইল না। হোমস্ তাই ইহাকে 'এক দুঃখজনক ভুল' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করিবার পশ্চাতে কর্নওয়ালিশের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ক্রিয়াশীল ছিল। তিনি কোম্পানীর উপর নির্ভরশীল এবং কোম্পানীর স্বার্থের অনুকূল একটি শক্তিশালী সামাজিক শ্রেণী গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব ঘটিয়াছিল, উহা কর্নওয়ালিশের এই পরিকল্পনার সার্থক সৃষ্টি। ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন স্মরণীয় জমিদারদের আলাদা করিয়া রাখিয়া বলা যায়, তাহারা ছিলেন ব্রিটিশ প্রভুদের অনুগত সহচর। দ্বিতীয়তঃ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হইবার ফলে, বিনা আয়াসে অর্থ উপার্জনের আশায় অর্থবান ভারতীয়গণ জমিতে অর্থ লগ্নী করিতে থাকেন। শিল্প, বা ব্যবসা-বাণিজ্যে মূলধন নিয়োগ করিবার ঝুঁকি তাঁহারা গ্রহণ করিলেন না। ভারতীয়দের উৎসাহ-উদ্যোগ জমিতেই কেন্দ্রীভূত হইতে থাকিল। ইংরেজরা ইহাই চাহিয়াছিলেন। ইংল্যান্ডের শিল্প অর্থনীতির লেজুড় হিসাবে তাহারা ভারতের অর্থনীতিকে কৃষিমুখী করিয়া রাখিতে প্রয়াসী হইলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এই ঔপনিবেশিক অর্থনীতিই প্রবর্তন করিল।

● **রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত ঃ** ১৭৯৯ সালে মহীশূর শক্তি এবং ১৮১৮ সালে মারাঠা শক্তির পতন ঘটিলে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে ইংরেজ শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নূতন অধিকৃত অঞ্চলে কোম্পানী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিবর্তে ভিন্নতর ভূমি ব্যবস্থা চালু করে যাহা রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির রেভিনিউ বোর্ডের তরফ হইতে আলেকজান্ডার রীড ও টমাস মুন্‌রো সরাসরি কৃষকদের সহিত জমি বন্দোবস্তের প্রস্তাব করেন। যুক্তি হিসাবে তাঁহারা বলেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রাজস্ব নির্দিষ্ট হওয়ায় জমি হইতে সরকারের নূতন কোন আয়ের সম্ভাবনা নাই। অথচ নিষ্কর পতিত জমি উদ্ধার করিয়া জমিদার তাঁহার আয় বাড়াইয়া চলিতেছেন। রায়তদের উপর জমিদারদের অত্যাচারের প্রসঙ্গ তুলিয়াও তাঁহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধিতা করেন। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ রীড্ ও মুন্‌রোর প্রস্তাব গ্রহণ করিলে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে মাদ্রাজে এবং পরে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে, রায়তদের সহিত জমি বন্দোবস্তের প্রথা চালু হয়। ইহাই রায়তওয়ারি প্রথা। এই প্রথায় নির্দিষ্ট রাজস্বের বিনিময়ে রায়ত বা কৃষক জমির স্বত্ব লাভ করেন। বিশ বা ত্রিশ বৎসর অন্তর রাজস্ব পুনঃনির্ধারিত হইত। এই ব্যবস্থায়ও কিন্তু চাষীর দুর্গতি হ্রাস পায় নাই। প্রথমত রাজস্বের হার অত্যন্ত অধিক মাত্রায়—উৎপন্য শস্যের ৪৫ হইতে ৫৫ শতাংশ—ধার্য হইয়াছিল। পুনর্নির্ধারণের সময় স্বাভাবিকভাবেই রাজস্বের পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া হইত। দ্বিতীয়তঃ, প্রাকৃতিক দুর্দৈব—বন্যা, খরা, বা দুর্ভিক্ষ ঘটিলেও কৃষককে নির্দিষ্ট খাজনা দিতে হইত। তৃতীয়তঃ, যে স্বল্প বেতনের সরকারী কর্মচারীরা রাজস্ব আদায় করিতেন তাহারা প্রায়শঃই অবৈধ পন্থা গ্রহণ করিয়া বেতনের ঘাটতি পোষাইয়া নিতেন। ফলে কৃষকের জীবনে চরম অভিশাপ নামিয়া আসিল। অধিকাংশ কৃষকই উচ্চহারে খাজনা দিতে অপারগ হইয়া কৃষিবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অন্য জীবিকায় যুক্ত হইলেন। যাহারা জমিতে টিকিয়া থাকিলেন, তাহারা মহাজনদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া রাজস্ব পরিশোধ করিতেন বটে, কিন্তু কার্যতঃ তাহাদের "অর্ধভুক্ত, অর্ধ নগ্ন জীবন" যাপন করিতে হইত। "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অনেক জমিদারদের বদলে রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের এলাকাতে চাষীর ঘাড়ে চেপে বসল এক সর্বশক্তিমান জমিদার—বিদেশী ইংরেজ সরকার।"

● **মহ্‌লওয়ারি বন্দোবস্ত ঃ** উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, মধ্য ভারতের অংশ বিশেষে এবং পাঞ্জাবে প্রতিটি কৃষকের পরিবর্তে প্রতিটি 'মহল' অর্থাৎ গ্রাম সমাজগুলির সহিত রাজস্ব বন্দোবস্ত করা হয়। এই প্রথম মহ্‌লওয়ারি বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। বন্দোবস্ত হয় ৩০ বৎসরের মেয়াদে। পুনর্নির্ধারণের সময় যথারীতি রাজস্বের হার বাড়িয়া যাইত। এই প্রথায় প্রতিটি গ্রামের রাজস্বের পরিমাণ মোট হিসবে স্থির হয় এবং গ্রামের দায়িত্বশীল কর্মচারীদের (মুকাদম ও পাটোয়ারি প্রভৃতি) মাধ্যমে তাহা আদায় করা হইত। এখানেও রাজস্বের হার উর্ধ্বে রাখা হইয়াছিল।

এইভাবে সাম্রাজ্যবাদী ভূমিনীতি—চিরস্থায়ী, রায়তওয়ারি এবং মহ্‌লওয়ারি—ভারতের কৃষক কুলের জীবনে চরম দুর্গতি বহন করিয়া আনিয়াছিল। ভূমিরাজস্ব নীতি এইরূপ হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। "ভারতের কৃষক কুলকে দরিদ্রতম অবস্থায় রেখে তাদের উৎপন্ন কাঁচামাল সস্তায় কিনতে পারলেই শোষণের পাল্লা ভারী হতে পারে। আবার এদেশকে কৃষিজীবী রাখলেই বিলেতী শিল্পপণ্যের বাজার সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।"



তৃতীয় পরিচ্ছেদ □ বাণিজ্য ও শিল্পনীতি

• কোম্পানীর আমলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য •

মধ্যযুগে ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি অগ্রসর দেশ ছিল। উৎকর্ষতায় ও পরিমাণগতভাবে সমকালীন ভারতের শিল্পজাত দ্রব্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। বস্তুতঃ, এদেশের আর্থিক সমৃদ্ধি ও সম্পদের আকর্ষণে প্রলুব্ধ হইয়াই ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়—পর্তুগীজ হইতে ইংরেজ—ভারতে ব্যবসায় করিতে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সর্বপ্রথম সুরাটে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করে। তবে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ এবং ফরাসী প্রতিযোগীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাভূত করিয়া তাঁহারা ভারতের বহির্বাণিজ্যে আধিপত্য স্থাপন করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের বণিক সম্প্রদায় আরব বণিকদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা করিতেন। যাহা হউক, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বৈদেশিক বাণিজ্য ভারতের অনুকূলেই ছিল, অর্থাৎ আমদানির তুলনায় ভারতীয় শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানি ছিল অনেক বেশী। পণ্যজাত দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সূতী ও রেশম বস্ত্র, মসলিন, সোরা, চিনি, লবণ, আফিম ইত্যাদি। ইংরেজ কোম্পানী ভারত হইতে পণ্যক্রয় করিয়া ইংল্যান্ড এবং ইউরোপের অন্যত্র রপ্তানি করিত। রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় কোম্পানীকে ইংল্যান্ড হইতে প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য আমদানি করিতে হইত। আমেরিকায় দাস-ব্যবসা করিয়া যে বিপুল ঐশ্বর্য তাঁহারা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, ভারতীয় পণ্য ক্রয় করিবার জন্য তাহার এক বিরাট অংশ তাহাদের ব্যয় করিতে হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে প্লিনী যেমন আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, রোমান স্বর্ণমুদ্রা ভারতে চলিয়া যাইতেছে, তেমনিভাবে অষ্টাদশ শতকেও ইংল্যান্ডের বণিকগণও ভারতে স্বর্ণ-রৌপ্যের আমদানিতে গভীর ভাবে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু যতদিন ইংল্যান্ড শিল্প উৎপাদনে প্রাধান্য অর্জন করিতে পারে নাই, ততদিন ইংরেজ বণিকদের ভারতে মূলতঃ রপ্তানি বাণিজ্য করিতে হইয়াছিল। 'ভারতে পাওয়া যায় না, কিম্বা উৎপন্ন হয় না অথবা ভারতের জিনিস নিকৃষ্ট বলে ইউরোপ থেকে আমদানি করতে হত অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এমন জিনিস খুব কমই ছিল।' ইহার অর্থ এই নয় যে, রপ্তানি বাণিজ্য ইংরেজদের নিকট লাভজনক ছিল না। বস্তুতঃ ব্রিটিশ বণিকরা প্রথম হইতেই বৈধ ও অবৈধ উপায়ে যথাসম্ভব কম দামে উৎপাদকদের নিকট হইতে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করিতেন এবং মোগল সম্রাটের নিকট হইতে প্রাপ্ত ফারমানের জোরে তাহা নিঃশুল্ক রপ্তানি করিতেন। সুতরাং কোম্পানীর লাভ বেশ উচ্চ মাত্রায়ই ছিল এবং অংশীদারগণ কোন কোন বৎসর শতকরা ১০০ হইতে ২৫০ টাকা লভ্যাংশ (dividend) অর্জন করিতেন। ভারতের সূতী ও রেশম বস্ত্রের চাহিদা ও রপ্তানি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ইংল্যান্ডের ব্যবসায়ীদের একাংশ আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল। ১৭০০ এবং ১৭৪০ সালে তাঁহারা সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগ করিয়া ইংল্যান্ডে ভারতীয় শিল্পের প্রবেশ বন্ধ করিবার চেষ্টা চালাইয়াছিলেন। ইউরোপের বাজারে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের চাহিদা প্রবল থাকায় তাঁহাদের প্রচেষ্টা অবশ্য সফল হয় নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতের অনুকূল বৈদেশিক বাণিজ্য

রপ্তানি বাণিজ্যের কারণে প্লিনীর আক্ষেপ

বৈধ ও অবৈধ উপায়ে ব্যবসা

যাহা হউক পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধের ফলে, প্রথমে বাংলায় এবং ক্রমে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজদের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। ১৭৬৫ সালে কোম্পানী দেওয়ানীর অধিকার লাভ করে। অতঃপর ইংল্যান্ড হইতে ভারতীয় পণ্য ক্রয় করিবার জন্য রৌপ্য ও অর্থ প্রেরণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ভূমি-রাজস্ব বাবদ যে বিপুল অর্থ সংগৃহীত হইল, তাহার একাংশ ভারতের বাণিজ্যে মূলধন হিসাবে প্রযুক্ত হইল। এই অর্থের অপর এক ভাগ চীন দেশে ব্যবসার ক্ষেত্র বাড়াইবার জন্য রপ্তানি হইতে থাকিল এবং অবশিষ্ট অর্থ ইংল্যান্ডে প্রেরিত হইত। একটি হিসাব হইতে জানা যায়, ১৭৬৫ হইতে ১৭৭০-এর মধ্যে কোম্পানী যে ৪০ লক্ষ পাউন্ড মূল্যের সামগ্রী ভারত হইতে ইংল্যান্ডে রপ্তানি করিয়াছিল, সেই অর্থ ছিল বাংলার রাজস্বের মাত্র শতকরা তেত্রিশ ভাগ। এইভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হইয়া গেল ভারতের সম্পদের উপর নির্লজ্জ লুণ্ঠন ও শোষণ। জলস্রোতের ন্যায় ভারতের সম্পদ দেশের বাহিরে চলিয়া যাইতে থাকে। মোগল আমল পর্যন্ত ভারতের অর্থ ভারতবর্ষেই ব্যয়িত হইত। অর্থনীতির পরিভাষায় ইহাকে বলা হয়, "অর্থসম্পদের নির্গম" (economic drain)। ঐতিহাসিকদের লেখা হইতে জানা যায়, ১৭৫৭ হইতে ১৭৮০ সালের মধ্যে, বর্তমান হিসাব অনুযায়ী দেড় হাজার কোটি টাকারও বেশী অর্থ ইংল্যান্ডে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

বৈদেশিক বাণিজ্যের পণ্য দ্রব্যের স্থান পরিবর্তন

ইতিমধ্যে ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লব শুরু হইয়া যায়। শিল্প বিপ্লবের প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রযুক্ত হইতে থাকে। ১৭৪০ সালে ব্রিটেনে ভারতীয় সূতীবস্ত্র, রেশম বস্ত্র ও পশম-জাত বস্ত্রের উপর আমদানি শুল্ক ধার্য হইয়াছিল যথাক্রমে শতকরা ১০ ভাগ, ২০ ভাগ ও ৩০ ভাগ। ক্রমে ক্রমে শুল্কের হার বাড়িয়া যাইতে থাকে। ১৮২৪ সালে ভারতীয় সূতীবস্ত্রের উপর ৬৭$^{১}/_{২}$% এবং মসলিনের উপর ৩৭$^{১}/_{২}$% আমদানি শুল্ক ধার্য করা হইয়াছিল। চিনির উপর ক্রয়মূল্যের তিনগুণ শুল্ক চাপাইয়া দেওয়া হইল। কোন কোন শিল্পের ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক শতকরা ৪০০ ভাগও বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। একদিকে যন্ত্রচালিত উৎপাদনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার স্বাভাবিক অক্ষমতা, অন্যদিকে চরম সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগজনিত প্রতিকূলতার ফলে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের দ্রুত পতন ঘটিতে থাকে। ইংরেজ ঐতিহাসিক উইলসন মন্তব্য করিয়াছেন, "ভারতীয় দ্রব্যাদির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রযুক্ত না হইলে ম্যাঞ্চেষ্টার প্রভৃতি স্থানের কলকারখানা আরম্ভ হইতে যাইয়াই বন্ধ হইয়া যাইত, বাষ্পের জোরেও তাহাকে আবার চালিত করা সম্ভব হইত না।" অতঃপর ইংল্যান্ডের শিল্প বিকাশের স্বার্থে ইংরেজ বণিকগণ পণ্যদ্রব্যের পরিবর্তে ভারতবর্ষ হইতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল রপ্তানি করিতে আরম্ভ করেন। অন্যদিকে, ইংল্যান্ডের শিল্পজাত সামগ্রী ব্যাপকভাবে ভারতে আমদানি হইতে থাকে। ইতিমধ্যে, ১৮১৩ সালের সনদ আইনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার লোপ পায়। এই সময় হইতে নূতন কলকারখানার মালিক ধনিকশ্রেণী ভারতে ব্যবসায় করিবার সুযোগ লাভ করেন। অন্যদিকে, ভারতে ইংল্যান্ড হইতে পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে আমদানি-শুল্ক হ্রাস করিয়া দেওয়া হইল। ১৭৪০ সালে ইংল্যান্ডের সূতী ও রেশম বস্ত্রের জন্য শুল্ক দিতে হইত মাত্র শতকরা সাড়ে তিন ভাগ এবং পশমজাত সামগ্রীর জন্য শতকরা মাত্র দুই ভাগ। এইভাবে রাষ্ট্রশক্তির জোরে ভারতীয় শিল্পকে ধ্বংস করিয়া ভারতকে ইংল্যান্ডের বাজারে পরিণত করা হইল। যে সব পণ্যের সহিত ইংল্যান্ডের কারখানার প্রস্তুত সামগ্রীর প্রতিযোগিতা হইবার আশংকা থাকিত, সেই সব শিল্পে তীব্র আঘাত হানা হইল। সূতীবস্ত্রের শিল্পের উপর আঘাত ছিল সর্বাপেক্ষা চরম। উনিশ শতক শুরু হইতেই ভারত হইতে সূতী ও রেশম বস্ত্রের রপ্তানির পরিমাণ অভাবনীয় ভাবে হ্রাস পায়। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ডাইরেক্টর সভার নির্দেশে চারি বৎসরের জন্য ভারত হইতে রঙীন সূতীবস্ত্রের রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয়। এমন কি, বিলাসী মানুষদের প্রিয় মসলিনেরও রপ্তানি ১৮১৭ সাল নাগাদ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়া যায়। অন্যদিকে, ইংল্যান্ডে প্রস্তুত বস্ত্র

ভারতের পণ্যজাত সামগ্রীর রপ্তানী হ্রাস

ভারত ইংল্যান্ডের বাজারে পরিণত

ব্যাপকভাবে আমদানি করা হইতে থাকে। একটি হিসাব হইতে জানা যায়, ১৭৯৪ সালে ইংল্যান্ড হইতে আমদানীকৃত সূতীবস্ত্রের মূল্য ছিল ১৫৬ পাউন্ড। ১৮১৩ সালে উহা হইয়াছিল ১ লক্ষ ১০ হাজার পাউন্ড। ১৮৫৬ সালে উহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইল ৬৩ লক্ষ পাউন্ড। অন্যদিকে ঐ ১৮৫৬ সালে ভারত হইতে রপ্তানীকৃত সূতীবস্ত্রের মূল্য হইল মাত্র ৮ লক্ষ ১০ হাজার পাউন্ড। প্রস্তুত দ্রব্যের রপ্তানি বন্ধ হইলেও, তূলা, চামড়া, রং, নীল, পাট ইত্যাদি সর্বরকম কাঁচামাল কিন্তু ইংল্যান্ডের কারখানার রসদ হিসাবে প্রেরিত হইতে থাকে। ১৮১৩ সালে ভারত হইতে ইংল্যান্ডে তূলা রপ্তানি হইয়াছিল ৯০ লক্ষ পাউন্ড। ১৮৪৪ সালে তাহার পরিমাণ বাড়িয়া দাঁড়াইল ৮ কোটি ৮০ লক্ষ পাউন্ড। অন্যান্য কাঁচামালের ক্ষেত্রেও একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ভারত হইতে ব্যাপকভাবে খাদ্য-ফসলের রপ্তানিও বাড়িতে থাকে। একইভাবে বাড়িয়া চলিয়াছিল দুর্ভিক্ষে মৃত মানুষের সংখ্যা। যাহা হউক, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পণ্য সামগ্রীর স্থানের এই পরিবর্তনের ফলে বাণিজ্য আর ভারতের অনুকূলে থাকিল না। এইভাবে ধীরে ধীরে ভারতের একদা সমৃদ্ধ রপ্তানি বাণিজ্য (শিল্পজাত দ্রব্যের) মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সমগ্র ব্রিটিশ শাসনে ইহাই ছিল সাধারণ চিত্র।

● ভারতীয় শিল্পের ধ্বংসসাধন ●

উনিশ শতকের সূচনা হইতে ইংল্যান্ডে নূতন অর্থনীতির পদধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক ইংরেজ বিজ্ঞানী 'ফ্লাইং শাটল' নামে এমন এক ধরনের মাকু আবিষ্কার করেন যাহার সাহায্যে দ্রুতগতিতে বয়ন সম্ভব হইল। কিন্তু পরবর্তী প্রায় ৩০ বৎসর অপর কোন নূতন যন্ত্রের আর্বিভাব ঘটিল না। অতঃপর ১৭৬৪ সালে হারগ্রীভসের 'স্পিনীং জেনি' এবং ১৭৬৫ সালে জেমস ওয়াটের বাষ্পশক্তি আবিষ্কারের সূত্র ধরিয়া ব্যাপকভাবে নূতন নূতন উদ্ভাবনী শক্তি আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। বিজ্ঞানের এই নবতম আবিষ্কারগুলিকে কেন্দ্র করিয়া ইংল্যান্ডের উৎপাদন ব্যবস্থায় গভীর এবং মৌলিক পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। যন্ত্রচালিত বৃহৎ বৃহৎ কারখানায় পূর্বাপেক্ষা অনেক অল্প সময়ে অনেক বেশী জিনিস উৎপাদিত হইতে থাকে। উৎপাদন ব্যবস্থার এই মৌলিক পরিবর্তনকে 'শিল্প বিপ্লব' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। লক্ষণীয় বিষয়, ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তার এবং ইংল্যান্ডের শিল্পায়ন সমকালে এবং সমানতালে চলিয়াছিল। বস্তুতঃ বক্সারের যুদ্ধের পরবর্তিকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতে যে ব্যাপক লুণ্ঠন চালায় সেই শোষণ-লব্ধ অর্থেই ইংল্যান্ডের শিল্প-বিপ্লবের আর্থিক ভিত্তি রচিত হয়। জনৈক ইংরেজ লেখকের কথায়, 'ওয়াট (বাষ্পযন্ত্রের আবিষ্কারক) যদি পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে জন্মাতেন তো তাঁর উদ্ভাবন নিষ্ফল হত। বলা যায় যে, জগৎ সৃষ্টির সময় থেকে ভারতবর্ষের লুণ্ঠনে ইংল্যান্ডের যত বেশী লাভ হয় তার তুলনা নেই।' শিল্পবিস্তারের সাফল্যের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক শর্ত হইল, প্রয়োজনীয় কাঁচামালের পর্যাপ্ত ও নিয়ত সরবরাহ এবং শিল্পজাত পণ্য সামগ্রীর বিক্রয়ের উপযুক্ত প্রতিযোগিহীন বাজার। ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের এই অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার স্বার্থে ভারতের শিল্প-বাণিজ্যকে যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হইল। রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া বিদেশী বণিক-শাসক ভারতীয় শিল্পকে সংকুচিত ও শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিলেন। অপরদিকে ভারতবর্ষকে পরিণত করা হইল ইংরেজ পুঁজির অবারিত শোষণ-ক্ষেত্রে।

ইংল্যাণ্ডের বয়ন শিল্পে সর্বাগ্রে এই পরিবর্তন সূচিত হওয়ায় ভারতীয় বস্ত্র শিল্প সর্বপ্রথম বিপর্যয়ের সন্মুখীন হয়। এক সময় বস্ত্রশিল্পে ভারতবর্ষ ছিল বিশ্বের অন্যতম অগ্রণী রাষ্ট্র। বিশ্ববিশ্রুত ঢাকাই মসলিন ছিল সারা দুনিয়ার ধনী বিলাসীদের পরম আকর্ষণের বস্তু। ম্যাঞ্চেষ্টারের কারখানার স্বার্থে ভারতবর্ষের এই প্রতিষ্ঠিত শিল্পের উৎপাদন বিঘ্নিত করিয়া কাঁচা তুলা ইংল্যাণ্ডে রপ্তানী হইতে থাকিল। ১৮৫৬ সালে ভারত হইতে ৪৩ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের তূলা ইংল্যাণ্ডে চালান হয়। অন্যদিকে, ইংল্যাণ্ডের কারখানাজাত সামগ্রীর আমদানী ক্রমশঃ বিপুলবেগে বাড়িয়া চলিল। ১৮৩৭ সালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ কার্পাসদ্রব্যের চালান আসে ৬ কোটি ১০ লক্ষ গজ, অথচ ১৮২৪ সালেও উহার পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ

গজেরও কম। অন্যদিকে, ১৮১৪ সালে ভারত হইতে ইংল্যাণ্ডে কাপড় রপ্তানী হইয়াছিল ১ কোটি ২ লক্ষ ৫০ হাজার গজ, ১৮৩৫ সালে উহা কমিয়া দাঁড়াইয়াছিল ৩ লক্ষ ৬ হাজার গজ এবং ১৮৪৪ সালে মাত্র ৬৩ হাজার গজে। এইভাবে "তূলার মাতৃভূমি ভারতবর্ষকেই কার্পাসবস্ত্র চালান দিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হয়।" যন্ত্রশক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতের শিল্প-কারিগরগণ পিছু হটিতে বাধ্য হইলেন। চরকা তাঁতকে কেন্দ্র করিয়া যে কুটির শিল্পগুলি দীর্ঘদিন ধরিয়া ভারতের প্রয়োজন মিটাইয়া বিদেশে বস্ত্র রপ্তানী করিত, শিল্প বিপ্লবের প্রতিঘাতে সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত কুটির শিল্পগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। এই অসম প্রতিযোগিতার হাত হইতে ভারতীয় শিল্পকে বাঁচাইবার জন্য ব্রিটিশ পণ্যের আমদানী বন্ধ করিয়া ব্রিটিশ শ্রম-স্বার্থের বিরোধিতা করিবার সাহস কোম্পানীর ছিল না। অন্যদিকে, পুরাতন শিল্প-ব্যবস্থার পরিবর্তে নূতন কোন পরিপূরক শিল্প গড়িয়া তুলিতেও তাঁহারা আগ্রহী ছিলেন না। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, ভারতে কোম্পানীর আমলে যতটুকু শিল্পায়ণ ঘটিয়াছিল (যেমন রিষড়াতে ভারতের প্রথম চটকল স্থাপিত হয় ১৮৫৫ সালে এবং কাছাড়ে প্রথম চা-বাগিচার প্রতিষ্ঠাও ঘটে ওই একই সালে, অন্যদিকে ভারতে রেলপথ সুরু হয় ১৮৫৩ সালে) তাহার উদ্দেশ্য ব্রিটিশ পুঁজির শোষণকে দৃঢ়প্রোথিত করা, ভারতীয়দের কল্যাণ-সাধন নয়। এই ঔপনিবেশিক শোষণের মাত্রা বাড়াইবার জন্য ভারতীয় পণ্যের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইতে থাকিল নূতন নূতন গুরুতর করভার। ফলে, ভারতের বিখ্যাত বয়ন-শিল্প প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গেল। তন্তুজীবিগণ বাধ্য হইলেন পৈতৃক ব্যবসা পরিত্যাগ করিতে। তাঁতীদের আঙ্গুল কাটার কাহিনীতে অতিরঞ্জন থাকিলেও শিল্প ধ্বংসের করুণ ইতিবৃত্তই এখানে বিবৃত হইয়াছে। সুরাট, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ এবং অন্য যে সমস্ত স্থানে ভারতীয় শিল্পোৎপাদন প্রচলিত ছিল—সেই সমস্ত সমৃদ্ধ বয়ন শিল্পকেন্দ্রগুলি জনহীন ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। ঢাকার লোকসংখ্যা দেড় লক্ষ হইতে বিশ হাজারে নামিয়া আসিল। সমসাময়িক ইংরেজ লোকদের লেখায় এই বিপর্যয়ের সাক্ষ্য মেলে। শুধু সূতী বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রেই নয়, রেশম ও পশমবস্ত্র, কাচ, কাগজ, ধাতুশিল্প প্রভৃতি সমগ্র ভারতীয় শিল্পেই সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির আঘাত পরিলক্ষিত হয়। শুধু ব্রিটিশ শ্রমশিল্প সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (তূলা, রেশম তন্তু, নীল ইত্যাদি) উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া হইতে থাকিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠিত নৌ-পরিবহন শিল্পও এই সময় বিলুপ্ত হইয়া যায়। ১৭৪৫-৯৬ সালেও কলিকাতায় তৈয়ারী হইয়াছিল ৬ খানি জাহাজ। কিন্তু শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই কলিকাতা হইতে জাহাজ তৈয়ারীর কাজ একেবারেই উঠিয়া যায়। এইভাবে ভারতীয় শিল্পের ব্যাপক ধ্বংস সাধন করিয়া ইংল্যাণ্ড তাহার সমুন্নত অর্থনীতি গড়িয়া তুলিল। যে শিল্পবিপ্লব ইংল্যাণ্ডকে করিয়া তুলিল পৃথিবীর পুরোধা শক্তি, তাহারই প্রতিঘাতে বিপর্যস্ত হইয়া গেল একদা-সমৃদ্ধ ভারতীয় অর্থনীতি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ □ কোম্পানীর আমলে ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতির রূপরেখা

এক □ পুরানো শিক্ষা পদ্ধতির আলোচনা

● **প্রাক-ইংরেজ আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ** ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে বাংলার শিক্ষা-ব্যবস্থা তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। (১) টোল ও চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃতের মাধ্যমে হিন্দু শাস্ত্র ও নীতি শিক্ষা, (২) মাদ্রাসা মক্তবে আরবী ও ফারসী ভাষার মারফৎ ইসলামীয় ধর্ম ও আইন শিক্ষা, এবং (৩) হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রদের জন্য বাংলার মাধ্যমে পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা।

তিন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

প্রতিটি হিন্দু জমিদারিতে টোল ও চতুষ্পাঠী স্থাপিত ছিল। চতুষ্পাঠীতে বেদান্ত ও ষড়দর্শন সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হইত। টোল ছিল উচ্চতর প্রতিষ্ঠান। সেখানে বেদ-পুরাণ, কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন, আইন ইত্যাদি অধীত হইত।

মুসলিম ছাত্রদের জন্য ছিল মাদ্রাসা ও মক্তব। মক্তবে শিক্ষা দেওয়া হইত আরবী-ফারসী বর্ণমালা এবং প্রাথমিক গণিত। ইহা ব্যতীত, আরবী ও ফারসী সাহিত্য এবং ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত প্রাথমিক জ্ঞানও এখানে পরিবেশিত হইত। মক্তবের মেধাবী ছাত্ররা উচ্চতর শিক্ষার জন্য আসিতেন মাদ্রাসায়। মাদ্রাসাগুলি সাধারণতঃ মসজিদ ও ইমামবাড়ার সহিত যুক্ত থাকিত। এখানে শিক্ষার্থীদের অধীত বিষয় ছিল ইসলামীয় ধর্মগ্রন্থ ; আইন এবং নীতিসমূহ; আরবী ও ফারসী সাহিত্য।

বিভিন্ন ভাষায় শিক্ষাদান

পাঁচ হইতে এগার বৎসরের সাধারণ পরিবারের ছাত্রদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ছিল বাংলা মাধ্যম পাঠশালা। সাধারণতঃ তিন-চারিটি গ্রামের জন্য একটি করিয়া পাঠশালা থাকিত। বেন্টিঙ্কের আমলে নিযুক্ত এ্যাডামের রিপোর্ট হইতে জানা যায়, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলা ও বিহারের ৪ কোটি জনগণের জন্য এক লক্ষ গ্রাম্য পাঠশালা ছিল। এই বিদ্যালয়গুলির কোন নির্দিষ্ট গৃহ ছিল না। চণ্ডীমণ্ডপ, নাটমন্দির বা গুরুর আবাস শিক্ষার স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হইত। কৃষি ও ব্যবসার হিসাব রাখিবার ও চিঠি লিখিবার কৌশল আয়ত্ত করাইবার জন্য পাঠশালায় বাংলা এবং প্রাথমিক গণিতের শিক্ষাদান করা হইত। এই সময় মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার তেমন প্রচলন ছিল না।

সাধারণ মানুষের জন্য পাঠশালা

প্রাক-ব্রিটিশ যুগের এই শিক্ষা ব্যবস্থায় একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের জন্য উচ্চশিক্ষা উন্মুক্ত ছিল না, অপরদিকে তেমনি উচ্চশিক্ষার বিষয়বস্তুও কালোপযোগী ছিল না। ইউরোপ যখন যুক্তিগ্রাহ্য, মানবতাবাদী, বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিক্ষানীতি অনুসরণ করিয়া প্রগতির পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছিল, তখনও ভারতের সনাতনী শিক্ষানীতি 'প্রার্থনা ও নমাজে'র মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখিয়া পশ্চাদগামিতাকে আরও প্রসারিত করিয়া চলিল। চিন্তা ও মননের এই অবক্ষয়ের মুহূর্তে ভারতে ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা ঘটে।

ভারতের প্রচলিত অযুগোপযোগী শিক্ষা

● **নূতন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন ঃ** ১৬৯০ সালে কলিকাতা প্রতিষ্ঠিত হইবার পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ব্রিটিশ বাণিজ্যের কৃপায় উহা উন্নয়নশীল নগর হিসাবে গড়িয়া উঠে। অর্থ ও সুযোগের আকর্ষণে বাংলার অন্যান্য বাণিজ্য-কেন্দ্র হইতে অসংখ্য মানুষ কলিকাতায় বসবাস করিতে আসেন। ইহারা সকলেই

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ বাণিজ্যের সহিত যুক্ত ছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে কলিকাতার গুরুত্ব আরও বাড়িয়া যাইতে থাকে। অতঃপর ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে কলিকাতা বাংলা তথা ভারতের বাণিজ্যের ও শাসনের প্রধানতম কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। ইতিমধ্যে প্রশাসনিক কাজের (নিম্নপর্যায়ের) সঙ্গেও বহু ভারতীয় জড়াইয়া পড়িলেন। এইভাবে ব্যবসা (ইংরেজ বণিকদের সহিত বা অধীনে) এবং চাকুরিকে (ইংরেজ প্রশাসনে) কেন্দ্র করিয়া কলিকাতার সমাজজীবনে নূতন এক সামাজিক শক্তির—মধ্যশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটিল। ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা এবং মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব—এই দুই ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সামাজিক ক্ষেত্রের অন্যান্য পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থারও রূপান্তর ঘটে।

অষ্টাদশ শতকে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে যেমন ইংরেজ বণিকদের ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করিতে হইয়াছিল, তেমনি দেওয়ান, মুন্‌শী, বেনিয়ান, সরকার প্রমুখ ভারতীয় 'বাবু'দের মধ্যেও ইংরেজি শিক্ষার গভীর আগ্রহ দেখা দেয়। প্রথম দিকে অবশ্য, বাণিজ্য সংক্রান্ত কয়েকটি ব্যবহারিক শব্দ ও বাক্য (অনেক সময়ই ভ্রান্ত) শিক্ষার মধ্যে সীমিত থাকে। পরে যখন 'বণিকের ভাষা' 'রাজভাষায়' পরিণত হইল, তখন বিশেষ করিয়া ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টের প্রতিষ্ঠার পর, বাঙ্গালী মধ্যশ্রেণীর মানুষের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন আরও বেশী অনুভূত হইল। ফলে, ১৭৮০ হইতে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে কলিকাতা শহরে কমপক্ষে কুড়িটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। জোড়াসাঁকোর শেরবাণ সাহেবের বিদ্যালয়ে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকর, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ উনিশ শতকের নায়কগণ তাঁহাদের ইংরেজী ভাষার প্রথম পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমড়াতলার মার্কিন বৌলের বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন মতিলাল শীল। কিন্তু এইসব বিদ্যালয়ের কোন পাঠ্যসূচী ছিল না। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ড্রামণ্ডের 'ধর্মতলা এ্যাকাডেমি'। এই বিদ্যালয়েরই ছাত্র ছিলেন উনিশ শতকের নবজাগরণের অন্যতম প্রধান পুরুষ হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও ইংরেজ মিশনারীদের শিক্ষা বিস্তার

মধ্যশ্রেণীর মানুষের ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ প্রবল হইলেও, কোম্পানী কিন্তু গোড়ার দিকে এদেশের শিক্ষা সম্পর্কে উদাসীন থাকে। বস্তুতঃ কোম্পানী শাসনের প্রথম পর্বে যে সব ইংরেজ এদেশে আসিয়াছিলেন, তাহাদের অধিকাংশই ছিলেন অশিক্ষিত ও অর্থলোভী মানুষ। তাই তাহারা শিক্ষা বিস্তারে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেন নাই। শুধুমাত্র স্থানীয় ব্যক্তিদের সাহায্যে প্রচলিত রীতি-নীতির সহিত পরিচিত হইবার উদ্দেশ্যে ইংরেজ কোম্পানী কলিকাতায় একটি মাদ্রাসা (১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রচেষ্টায়) এবং বারাণসীতে একটি সংস্কৃত কলেজ (১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীর রেসিডেন্ট জোনাথন ডানকানের উদ্যোগে) প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তিকালে প্রশাসনিক স্বার্থে ইংরেজ কর্মচারীদের এতদ্দেশীয় ভাষা ও আইন শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইল। ইহারই ফলস্বরূপ, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা মে তারিখে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজে আরবী, ফারসী সংস্কৃত, বাংলা প্রভৃতি ভারতীয় ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অন্যদিকে বেসরকারীভাবে খ্রীষ্টীয় মিশনারীগণ শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হইলেন। 'নেটিভ'দের মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার করিয়া ভারতে ইংরেজ রাজত্ব স্থায়ী ও দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যেই ইহারা শিক্ষাপ্রচারে আগ্রহী হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন উইলিয়ম কেরী ও মার্শম্যান। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের প্রতিষ্ঠাতা এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক উইলিয়ম কেরী শ্রীরামপুরে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ বিদ্বজ্জনের সাহায্যে বাংলা ভাষায় বাইবেলের অনুবাদসহ পাঠ্যপুস্তক, ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা

খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ব্যাপটিস্ট মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

করেন। এইভাবে মিশনারীগণ দেশীয়ভাষায় শিক্ষাচর্চার ব্যবস্থা করেন।

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, এই সময় দেশীয় জ্ঞানচর্চার একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই বিশিষ্ট বিদ্যা-কেন্দ্রের নাম হইল 'এশিয়াটিক সোসাইটি'। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যার উইলিয়ম জোনস্ নামে একজন প্রাচ্য ভাষাবিদ মনীষী কলিকাতায় এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সভ্যতা সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য আহরিত করিয়া এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে স্মরণীয় অবদান রাখিয়া গিয়াছেন।

এশিয়াটিক সোসাইটি

ইতিমধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হইল। কোম্পানীর পরিচালকগণ সস্তায় রাজ্য পরিচালনার জন্য ইংরেজী আদব-কায়দা দুরস্ত ও ইংরেজী শিক্ষিত একদল ভারতীয় কর্মচারী গড়িয়া তুলিবার কথা ভাবিতে শুরু করেন। কিন্তু বিষয়টি লইয়া কর্তৃপক্ষের মধ্যে ঘোর মতভেদ থাকায় দীর্ঘদিন পর্যন্ত সরকারী ভাবে ইংরেজী শিক্ষা দান রীতি চালু করা হয় নাই। অপরদিকে বাঙালী নবসৃষ্ট মধ্যশ্রেণী আপন শ্রেণীগত বিকাশের তাগিদে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে অধিকতর উৎসুক হইলেন। ইতিমধ্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রচারকগণও ভারতীয় ভাষায় শিক্ষাদানের পরিবর্তে ইংরেজীতে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে উৎসাহী হইলেন। ভারতবর্ষের মূল স্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন, ইংরেজ শাসনের অনুগত ও ভক্ত একটি ভারতীয় সম্প্রদায় সৃষ্টি করাই ছিল ইঁহাদের পাশ্চাত্য পন্থা গ্রহণের উদ্দেশ্য। ইঁহাদের চেষ্টায় কলিকাতা এবং মফঃস্বলে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যেই কয়েকটি ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল উইলিয়ম কেরী প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুরের ইংরেজী বিদ্যালয় (১৮১৮ খ্রীঃ)। বর্তমানে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নাম শ্রীরামপুর কলেজ। ১৮২০ সালে কলিকাতায় স্থাপিত হইল বিশপস্ কলেজ। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে ধর্মযাজকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন আলেকজান্ডার ডাফ্ নামে জনৈক স্কচ মিশনারী। ১৮৩০ সালে তিনি জেনারেল এ্যাসেম্বলীস্ ইনষ্টিটিউসন নামে কলিকাতায় একটি কলেজ স্থাপন করেন যাহার বর্তমান নাম স্কটিশচার্চ কলেজ। ১৮৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও লরেটো কলেজ। এইভাবে মিশনারীদের চেষ্টায় পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা ও অগ্রগতি ঘটিল। কিন্তু বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে যিনি প্রাথমিক ভাবে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাঁহার নাম ডেভিড হেয়ার। ঘড়ি ব্যবসায়ী হেয়ার কলিকাতায় একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় (বর্তমানের হেয়ার স্কুল) এবং স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপন করেন। ইহা ব্যতীত হেয়ার সাহেবের চেষ্টায় এবং সমকালীন ভারতীয়দের বিশেষ করিয়া রামমোহন রায়ের সক্রিয় সহযোগিতায় (যদিও তিনি অন্তরালে ছিলেন) ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আধুনিককালের শ্রেষ্ঠতম বিদ্যালয়—হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। শতাব্দীব্যাপী এই বিদ্যালয়টি পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল ভাবধারা প্রচারে প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু কলেজ পরবর্তিকালে প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয় (বিদ্যালয় বিভাগ বর্তমানে হিন্দুস্কুল নামে পরিচিত)। স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপারেও খ্রীষ্টান মিশনারীগণ উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতার প্রাথসর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল বেথুন প্রতিষ্ঠিত হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়। বর্তমানে বিদ্যালয়টি বেথুন স্কুল নামে পরিচিত।

পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে হেয়ার ও উডের অবদান হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা (১৮১৭ খ্রী ঃ)

ভারতীয়দের শিক্ষার ব্যাপারে কোম্পানীর পক্ষে আর উদাসীন থাকা সম্ভব হইল না। ১৮১৩ সালের সনদ আইনে নির্দেশ দেওয়া হইল, ভারতীয়দের জ্ঞান বিস্তারের জন্য বৎসরে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ধরন এবং ভাষা মাধ্যম লইয়া তীব্র মতবিরোধের সৃষ্টি হইল। একদল প্রাচ্যভাষার মাধ্যমে সনাতনী শিক্ষা প্রসারের পক্ষপাতী ছিলেন। ইঁহাদের বলা হইত প্রাচ্য পন্থী। অপর দল, ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় সাহিত্য-বিজ্ঞান শিক্ষার সপক্ষে ছিলেন। শেষোক্ত দল প্রতীচ্যবাদী বলিয়া পরিচিত।

ভারতীয়দের মধ্যে যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের দাবি জানাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান 'পুরোহিত' ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ১৮২৩ সালে যখন নূতন সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের আয়োজন করা হয়, তখন তিনি তৎকালীন বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে ভারতে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান প্রবর্তনের জন্য এক ঐতিহাসিক পত্র লিখিয়াছিলেন। ইহাই ছিল 'নূতন জগৎকে জানিবার জন্য নব্যবঙ্গের প্রথম আবেদন'। তাহার এই আবেদন অগ্রাহ্য হইলেও, রামমোহন নিরলসভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকূলে আন্দোলন চালাইয়া যাইতে থাকেন। ইতিমধ্যে (১৮৩৩ সালের সনদ আইন অনুযায়ী গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলে পঞ্চম সদস্য—আইন-সচিব হিসাবে মেকলে ভারতে আসেন এবং জনশিক্ষা সমিতি বা কমিটি অফ পাবলিক ইনষ্ট্রাকশনের (১৮২৩ সালে গঠিত জনশিক্ষা সমিতিই শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ নির্দিষ্ট করিবার অধিকারী) সভাপতি নিযুক্ত হন। এই সময় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যপন্থীদের বিতর্ক চরমে উঠে। এই বিতর্কের পটভূমিকায় ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে মেকলে শিক্ষানীতি সংক্রান্ত এক ঐতিহাসিক স্মারকলিপি প্রস্তুত করেন। মেকলের সুপারিশ অনুযায়ীই গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক সরকারের তরফে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অবশ্য এই সিদ্ধান্তের মধ্যে তাহাদের কোন উচ্চ আদর্শবোধ ছিল না। শাসন চালাইবার বাস্তব প্রয়োজনে একদল কেরানী তৈয়ারি করাই ছিল তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। মেকলের কথায়, "এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা হবে রক্তে ও রঙে ভারতীয় আর রুচিতে, মতে, নীতিতে ও বুদ্ধিতে ইংরেজ। যাহা হউক, বেন্টিঙ্কের উৎসাহ ও চেষ্টায় কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ এবং বোম্বাইতে এলফিনস্টোন ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, রাজা রামমোহন রায়ের পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা সমর্থন করিবার উদ্দেশ্য ছিল মধ্যযুগীয় স্থবিরতা হইতে মুক্ত করিয়া ভারতের জনজীবনে নূতন গতিবেগ সঞ্চার করা।

উডের ডেস্‌প্যাচ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস উড ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে একটি অগ্রসর পরিকল্পনার সুপারিশ করেন। এই সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষা সংক্রান্ত একটি স্বতন্ত্র বিভাগের প্রতিষ্ঠা এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি ও নারী শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু উডের পরিকল্পনার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সুপারিশ ছিল প্রেসিডেন্সি শহরগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা। তদনুযায়ী ১৮৫৭ সালের ২৪শে জানুয়ারী প্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অনতিবিলম্বে বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

নূতন শিক্ষা নীতির ফল

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ব্যাপকভাবে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ঘটিতে থাকে। প্রায় প্রতিটি জেলায় সরকারী স্কুল স্থাপিত হয়। ইতিপূর্বেই মেকলে সুপারিশ করিয়াছিলেন সরকারের তরফে নূতন কোন ভারতীয় ভাষা-মাধ্যম বিদ্যালয়ের জন্য অর্থব্যয় করা হইবে না। ১৮৩৯ সাল হইতে স্থির হইল সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের মাধ্যম হইবে ইংরেজী। ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করেন, অতঃপর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারী চাকুরিতে নিয়োগ করা হইবে এবং এই পরীক্ষায় প্রার্থীর ইংরেজীর যোগ্যতা বিশেষ মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করা হইবে। ক্রমে সর্বক্ষেত্রেই ইংরেজীকে সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করা হইল। স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজী শিক্ষার প্রতি প্রবল আগ্রহ বাড়ে। 'ইংরেজী ভাষা শিক্ষার এই দমকা হাওয়ায়' ভারতীয় ভাষার বিদ্যালয়গুলির নাভিশ্বাস উপস্থিত হইল। বিদেশী মিশনারীগণও মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বিদ্যালয়গুলি তুলিয়া দিয়া ইংরেজী-মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন। অথচ লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলেই ইংরেজ পাদ্রী এ্যাডাম দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার (বাংলাদেশের) ব্যাপক তথ্যসংগ্রহ করিয়া সুপারিশ করিয়াছিলেন—প্রাথমিক পাঠশালাসমূহে শিক্ষাদানের মানোন্নয়ন এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষাদানের নীতিকে কার্যকর করিতে হইবে। ইতিপূর্বে ১৮২৩ সালেও জনশিক্ষা কমিটিতে অনুরূপ প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু অর্থাভাবের অজুহাতে তাহা নামঞ্জুর হইয়া যায়। উডের ঘোষণায় মাতৃভাষায়

প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের কথা বলা হইলেও, সরকারের তরফে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হয় নাই। এই ভাবে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত হইবার প্রবণতা দেখা দেওয়ায় বাংলা বিদ্যালয়গুলি অবহেলিত হইতে থাকে। ফলে, জনগণের ব্যাপকতম অংশ শিক্ষার আলোক হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকিলেন। সরকারী নীতির সমর্থকগণ অবশ্য বলিয়াছিলেন, অভিজাত শিক্ষিত শ্রেণীর মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা নিম্নগামী হইয়া দরিদ্র শ্রেণীর নিকটও পৌছাইবে। বাস্তবে এই নিম্নমুখী পরিস্থিতি-তত্ত্ব বিপুলভাবে ব্যর্থ হইয়াছিল।

'ছকে বাঁধা সংকীর্ণ উদ্দেশ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন হইলেও, পাশ্চাত্য ভাবধারা ভারতীয়দের মনকে গভীরভাবে অভিভূত করিয়াছিল। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই তরুণ ছাত্রগণ ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ফরাসী বিপ্লব প্রভৃতির ভাবধারা এবং যুক্তিবাদী, উদারনৈতিক ও মানবিক দর্শন ও বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এই সব ভারতীয় মনীষীদের নেতৃত্বেই ভারতবর্ষের 'নবজাগরণের সূচনা হইয়াছিল। পাশ্চাত্যের উন্নত চিন্তাধারার সংস্পর্শে ভারতীয় ধর্ম ও সমাজের প্রগতিশীল রূপান্তর ঘটে। রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্র প্রমুখের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজ ও ডিরোজিওর ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলন বাংলা দেশে এবং স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর নেতৃত্বে আর্যসমাজ আন্দোলন পশ্চিমভারতে সামাজিক পুনর্গঠন ও শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসারে নূতন উদ্যম সঞ্চার করিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার ভাবতরঙ্গে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ভারতীয় মনীষার বিকাশ ঘটিয়াছিল। ভারতবর্ষের জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ সাধনেও পাশ্চাত্য শিক্ষানীতির সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

বাংলায় নবজাগরণের সূচনা

● কোম্পানীর আমলে ভারতের সামাজিক ও সংস্কৃতির আন্দোলনের সূচনা ও বিকাশ ●

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে মোগল শাসনের সূচনায়, বিশেষ করিয়া আকবরের রাজত্বকাল হইতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে যে অগ্রগামী চিন্তা ও কর্মের চর্চা শুরু হয়, আওরঙ্গজেবের প্রগতি-বিরোধী শাসনের প্রতিক্রিয়ায় তাহার স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হইয়াছিল। অতঃপর মোগল রাজত্বের শেষ পর্বে সূচিত হয় এক সর্বাত্মক অবক্ষয়। ধর্মাচরণ পরিণত হয় অন্তঃসারহীন বাহ্যিক অনুষ্ঠানে, শাস্ত্রালোচনা সীমাবদ্ধ থাকে বন্ধ্যা ধ্যান-ধারণার ক্লান্তিকর অনুশীলনে, অন্যদিকে সমাজপতিদের অ-মানবিক অনুশাসনে নারীজীবনে নামিয়া আসে সতীদাহ, বাল্য ও বহুবিবাহ এবং অকাল বৈধব্য-জনিত সামাজিক নিপীড়নের নিষ্ঠুর অভিশাপ। এইভাবে অষ্টাদশ শতকে, রক্ষণশীলতা ও ধর্মান্ধতা, অশিক্ষা ও কুসংস্কার সমাজকে করিয়া তুলে স্থবির ও নিষ্ফল এক জড় শক্তিতে। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক হইতেই, ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের দ্বারা অনুপ্রাণিত নবোদ্ভূত মধ্যশ্রেণী যুক্তিবাদ ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে ভারতীয় নীতি ও ধর্মশাস্ত্রের নূতন মূল্যায়ন শুরু করিয়া দেন। জীবন জিজ্ঞাসায় উদ্দীপ্ত এই মধ্যশ্রেণীর নেতৃত্বেই ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আধুনিক মননশীল নূতন চেতনার প্রকাশ দেখা দেয়। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হওয়ায় কলিকাতা হইল এই নবজাগৃতির প্রাণকেন্দ্র।

দুই □ ধর্মান্ধতা ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন

অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও কুৎসিত লোকাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রথম এবং প্রধান নায়ক ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। অগাধ পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ বিচারবোধ, উদার মানবিকতা এবং সংস্কারমুক্ত মননের অধিকারী রাজা রামমোহন রায় ছিলেন, কবিগুরুর কথায়, ভারতের প্রথম আধুনিক মানব। প্রাচ্য ও

প্রতীচ্য উভয় মহাদেশের জ্ঞান সাধনায় তিনি ছিলেন সমৃদ্ধ। বেদ-উপনিষদের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি যে জীবনাদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, বেকন-লক- নিউটন-হিউম-ভলটেয়ার-পেইন প্রমুখ যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী ইউরোপীয় দার্শনিক-সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানীদের নিকট হইতে আহৃত জ্ঞান দ্বারা তিনি তাহার পরিপুষ্টি সাধন করেন। অন্যদিকে সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, উর্দু, বাংলা, গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষাতেও তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। হিন্দুধর্ম ব্যতীত বৌদ্ধ ধর্ম এবং ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মতত্ত্বেও তাঁহার গভীর অনুপ্রবেশ ছিল। বিভিন্ন ধর্মের সারবস্তুর সহিত পরিচিত হইয়া রামমোহন পৌত্তলিকতা, বহু-ঈশ্বরবাদ, অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান ও কুসংস্কার হইতে হিন্দুধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থাকে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন। আন্দোলন সংগঠিত করিবার উদ্দেশ্যে ১৮১৫ সালে একদল সুশিক্ষিত আদর্শবান, সংস্কারমুক্ত যুবকদের লইয়া রামমোহন স্থাপন করেন 'আত্মীয় সভা' নামে এক সংগঠন। এই সভায় বেদান্ত ধর্মের বিচার ও ব্যাখ্যা হইত বেদ ও উপনিষদের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার ধর্মচেতনা গড়িয়া উঠিলেও প্রাচীনপন্থীদের সহিত তাঁহার এক মৌলিক পার্থক্য ছিল। সমস্ত কিছুই অভ্যস্ত ধর্মবোধ ও প্রচলিত রীতি-নীতি সমূহ তিনি যুক্তিতর্কের দ্বারা বিচার না করিয়া গ্রহণ করিতে রাজী ছিলেন না। যাহা হউক, আত্মীয় সভার মাধ্যমে তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করেন। ১৮১৫-১৮১৭ সালের মধ্যে বেদান্ত ও পাঁচটি প্রধান উপনিষদের (কঠ, কেন, ঈশ, মণ্ডুক ও মাণ্ডুক্য) বঙ্গানুবাদ করিয়া তিনি সর্বসাধারণের মধ্যে বৈদিক ঐতিহ্যের—নিরাকার একেশ্বরবাদ—আদর্শ প্রচার করেন। প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের বিজ্ঞানসম্মত বিচার করিয়া তিনি বলেন, স্বার্থদুষ্ট পুরোহিততন্ত্র বৈদিক আদর্শ বিচ্যুত হইয়া ক্রিয়াকাণ্ডবহুল পূজাপদ্ধতি, লোকাচার ও অন্ধ বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দিয়া সাধারণ মানুষের জীবনে এক দুর্বিষহ বোঝা চাপাইয়া দিয়াছেন। এই নৈতিক অধঃপতন ও অজ্ঞতার হাত হইতে আপন দেশবাসীকে রক্ষা করাই ছিল তাঁহার জীবনের সাধনা। ইউরোপীয় মানবতাবাদী এরাসমাসের ন্যায় তিনিও বলেন শাস্ত্রের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই শাস্ত্র। অতঃপর উপনিষদের আলোকে বিশ্বজনীন ধর্মবোধ প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে তিনি আত্মীয় সভাকে আরও সুসংবদ্ধ করিয়া 'ব্রাহ্মসভা' প্রতিষ্ঠা করেন (১৮২৮ খ্রীঃ)। ১৮৩০ সালে ব্রহ্মসভা 'ব্রাহ্মসমাজে' রূপান্তরিত হয়। নিরাকার একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী সকল মানুষের নিকট ব্রাহ্ম সমাজের দ্বার উন্মুক্ত করা হইল।

রামমোহনের ধর্ম ও সমাজসংস্কার মূলক প্রচেষ্টা



রাজা রামমোহন

আত্মীয় সভা, ব্রাহ্মসমাজ

রামমোহনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৩৯ সালে দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভায় ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন এবং সমকালীন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হইত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ সংস্কারকামী বাঙালী বুদ্ধিজীবিগণ এইসব আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতেন। অতঃপর সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হইল। এই পত্রিকার মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ে নূতন আদর্শের ভিত্তিতে ভারতকে গড়িয়া তুলিবার আহ্বান জানান হয়। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন মূলতঃ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। সামাজিক সংস্কারের প্রতি তাঁহার অনুরাগ তুলনামূলকভাবে অল্প ছিল। ফলে যুক্তিবাদী অক্ষয় কুমার দত্ত এবং নবীন ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখের সহিত তাঁহার মতবিরোধ হয়। তাহা

সত্ত্বেও, দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে গঠিত ব্রাহ্ম সমাজ সামাজিক প্রগতিশীল দাবির প্রতি নিরলস আন্দোলন চালাইয়া গিয়াছিল। আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রামমোহন ও ব্রাহ্মসমাজের অপেক্ষাও অধিক প্রগতিশীল ও অগ্রণী সমাজচেতনতার পরিচয় দিয়াছিলেন নব্যবঙ্গ বা Young Bengal নামে পরিচিত হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্র সম্প্রদায়। ইঁহাদের নেতা ছিলেন ওই কলেজেরই তরুণ অধ্যাপক হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। বাংলার নবজাগৃতির ইতিহাসে তিনি অবিস্মরণীয় পুরুষ। তিনি ছিলেন একাধারে কবি ও সাংবাদিক।


ডিরোজিও

ছাত্র থাকাকালীন অবস্থায়ই উদার ও যুক্তিবাদী শিক্ষক ড্রামণ্ডের প্রভাবে ডিরোজিওর মধ্যে (জন্ম ১৮ এপ্রিল ১৮০৯ খ্রীঃ) স্বাধীন ও সংস্কারমুক্ত চিন্তাধারার বিকাশ দেখা যায়। ১৮২৬ সালে ১৭ বৎসর বয়সে তিনি হিন্দুকলেজের ইতিহাস ও ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

ডিরোজিওর শিক্ষা প্রণালীর ভিত্তি ছিল সত্যানুসিদ্ধৎসা এবং অন্যায় ও পাপের প্রতি আপোষ-বিরোধী মনোভাব। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে তিনি এই আদর্শবোধই জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার বিশিষ্ট অধ্যাপনরীতি ও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা ছাত্রদের মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ১৮২৮ সালে হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ তাঁহার নেতৃত্বে 'এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন নামে একটি বিতর্ক সভা গঠন করিয়া সমস্ত প্রকারের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণা করেন। এই সভায় "পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, আস্তিকতা, অদৃষ্টবাদ সাহিত্য, স্বদেশ প্রেম প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে আলোচনা হইত।" ১৮৩০ সালে ডিরোজিওর অনুপ্রেরণায় তাঁহার শিষ্যগণ 'দি পার্টিশন' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া সামাজিক ও ধর্মীয় কুরীতির সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক দুর্নীতির বিরুদ্ধেও কঠোর সমালোচনা শুরু করিয়া দেন। হিন্দু কলেজের পরিচালকবৃন্দ ছাত্রদের এই 'বিদ্রোহাত্মক' ভাবধারা দমন করিবার উদ্দেশ্যে পত্রিকাটির দ্বিতীয় সংখ্যার প্রকাশ এবং ছাত্র ও শিক্ষকগণের ধর্ম ও রাজনীতি সংক্রান্ত আলোচনামূলক সভাসমিতিতে যোগদান নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। ডিরোজিওর বিরুদ্ধেও নানারকম অসত্য ও ভিত্তিহীন অভিযোগ আনিয়া তাঁহাকে কলেজ হইতে বিতাড়িত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল। কিন্তু ডিরোজিও স্বয়ং পদত্যাগ করেন (২৫শে এপ্রিল ১৮৩১ খ্রীঃ)। অতঃপর তিনি সাহিত্য চর্চা ও সাংবাদিকতায় মনোনিবেশ করেন। অল্পকাল পরেই মাত্র ২২ বৎসর বয়সে (২৬শে ডিসেম্বর ১৮৩১ খ্রীঃ) এই প্রতিভাময়, উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের জীবনাবসান হয়।

ডিরোজিওর মৃত্যুর পর তাঁহার ছাত্রগণ তাঁহার নির্দেশিত পথ অনুসরণ করিয়া বাংলার ভাবজগতে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহারা একদিকে যেমন জাতিভেদ, কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা প্রভৃতি সর্বপ্রকার অন্যায় ও কুরীতির বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা, অন্যদিকে তেমনি সত্য, ন্যায় স্বাধীন চিন্তা, স্বদেশপ্রেম এবং প্রগতিমূলক সংস্কার প্রবর্তনের দাবিতে আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন। ইয়ংবঙ্গেল গোষ্ঠীভুক্ত রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার প্রমুখ বুদ্ধিজীবিগণ সংবাদপত্র, সাহিত্য ও সংগঠনের মাধ্যমে যুক্তিনিষ্ঠ ও প্রগতিশীল মতবাদ প্রসারে এক ঐতিহাসিক মহাকর্তব্য পালন করিয়াছিলেন। তাঁহারা রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে যে বিদ্রোহের ঝড় তুলেন।

আন্দোলনের প্রভাবের মূল্যায়ন

তাহার আঘাতে কুসংস্কার ভাঙিয়া গড়িয়া সমাজে আধুনিকতার সূচনা ঘটে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধর্মান্তরিত হইলেও ধর্মবিশ্বাসে ইঁহারা ছিলেন উদারমতাবলম্বী, গোমাংস ভক্ষণ ও সুরাপান ইত্যাদির মধ্য দিয়া তাঁহারা অভ্যস্ত আচার ও ধর্মমতকে আঘাত করেন কারণ ইহা ছিল সংকীর্ণ ও গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন। কোন কোন

ঐতিহাসিক অবশ্য মনে করেন, ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলন বাংলার বৃহত্তর সমাজে কোন আলোড়ন সৃষ্টি করিতে পারে নাই। নব্যবাংলা গোষ্ঠীভুক্ত বুদ্ধিজীবিগণ ছিলেন নিতান্তই 'তাত্ত্বিক'। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে বলা যায়—"যে তরুণ সংস্কারকামী গোষ্ঠী হিন্দু কলেজে বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন, কাঞ্চনজংঘার চূড়ার মত তাঁহারাই প্রথম উষার সূর্যকিরণের স্পর্শ লাভ করিয়াছিলেন" (কিশোরী চাঁদ মিত্র।

● নারীমুক্তির আন্দোলন ●

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত বাংলার নারীগণ ছিলেন অন্তঃপুরবাসিনী, নিরক্ষর এবং সামাজিক অনুশাসনে নিপীড়িত। এই অপ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রবল বলিষ্ঠ আন্দোলন গড়িয়া তুলেন রাজা রামমোহন রায়। নারীমুক্তির আন্দোলনে অপর স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হইলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

সতীদাহ প্রথার অবসানে রামমোহনের ভূমিকা

সমকালীন বাংলা তথা ভারতের সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর ও অমানবিক প্রথা ছিল সতীদাহ। এই কুপ্রথা অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যুর পর সদ্য বিধবাকে স্বামীর সহিত একই চিতায় জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ করিয়া মারা হইত। 'সহমরণ' নামে পরিচিত এই নিষ্ঠুর কাণ্ড শাস্ত্রের দোহাই দিয়া সতীত্বের পরীক্ষা বলিয়া প্রচার করা হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে সদ্য বিধবা সহমরণ বরণ করিয়া লইলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংস্কারবশতঃ অথবা সম্পত্তির লোভে বিধবাকে স্বামীর সহিত জীবন্ত দাহ করা হইত। ১৮১৭ সালে বাংলাদেশেই ৭০০ হিন্দু রমণীকে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিতে হইয়াছিল। এই নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করিবার জন্য রামমোহন বদ্ধপরিকর হইলেন। শাস্ত্র পর্যালোচনা করিয়া তিনি প্রমাণ করেন, ইহা শাস্ত্রসম্মত নহে। বাংলা ও ইংরেজী পুস্তিকা এবং 'সংবাদ কৌমুদী' পত্রিকা মাধ্যমে তিনি প্রচার করেন—শাস্ত্রানুসারে সহমরণ হিন্দু বিধবার অবশ্য কর্তব্য নয়। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ রামমোহনের বিরুদ্ধাচারণ করিলেন। ফলে তিনি সরকারী আইনের সাহায্য লইবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাঁহারই অক্লান্ত সহযোগিতা ও সমর্থনে বেন্টিঙ্কের শাসনকালে এই ঘৃণ্য ও অমানবিক সতীদাহ প্রথার অবসান ঘটে (১৮২৯ খ্রীঃ) বাল্য ও বহু বিবাহের বিরুদ্ধে এবং বিধবা বিবাহের সমর্থনেও রামমোহন তীব্র আন্দোলন চালাইয়াছিলেন।

বিধবা বিবাহ আন্দোলন ও বিদ্যাসাগর

নির্যাতিত নারী শ্রেণীর মুক্তির আন্দোলনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক অনন্যসাধারণ পুরুষ। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হইলেও ইউরোপীয় রেনেশাঁসের যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদী ভাবধারায় তিনি ছিলেন অনুপ্রাণিত। এই সময় কৌলিন্য প্রথা, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুরীতি বাঙালী হিন্দু মহিলাদের জীবনকে করিয়া তুলিয়াছিল চরম বিপন্ন। কুলীন ব্রাহ্মণগণ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বহু পত্নী গ্রহণ করিতেন। জাতিচ্যুত হইবার আশংকায় অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাদের বৃদ্ধ ব্যক্তির সহিত বিবাহ দেওয়া হইত। এই সব বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে অল্প বয়স্কা বিধবাগণ ভরণ-পোষণহীন নিরাশ্রয় হইয়া পড়িতেন। মৃত্যুবরণ করা ব্যতীত অসহায় বিধবাদের সম্মুখে অপর কোন পথ ছিল না। ইতিপূর্বে রাজা রাজবল্লভ অল্পবয়স্কা বিধবাদের পুনর্বিবাহ দিবার চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছিলেন। কিন্তু সতীদাহ প্রথা রহিত হইবার ফলে বিধবা বিবাহের পক্ষে আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছিল। ইতিমধ্যে বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের পক্ষে জনমত গঠন করিবার জন্য সচেষ্ট হন। রক্ষণশীল সমাজের সমস্ত বাধা, আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া তিনি প্রমাণ করিলেন, হিন্দু শাস্ত্রে বিধবা বিবাহের অনুমোদন দেওয়া আছে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে তিনি এ সম্পর্কে দীর্ঘ প্রবন্ধাদি রচনা করেন। ব্রাহ্মগণ এবং ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী বিদ্যাসাগরকে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করিলেও, রক্ষণশীল নেতৃবর্গ বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কুৎসা প্রচার সমেত



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

প্রতিবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। এমন কি, তাঁহার জীবনও বিপন্ন করিয়া তোলা হইয়াছিল। কিন্তু অকুতোভয় বিদ্যাসাগর অবিচলিত থাকিয়া আপনার অভীপ্সিত আন্দোলন পরিচালিত করিলেন। তাঁহার নিরলস প্রচেষ্টার ফলে ১৮৫৬ সালে হিন্দু বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হয়। বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর কৌলিন্য ও বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধেও আন্দোলন সংগঠিত করেন।

স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও ডিরোজিওর ভূমিকা

স্ত্রী শিক্ষার যথার্থ প্রসার না ঘটিলে নারীমুক্তি অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়। বিভিন্ন সমাজ-সংস্কারের পথিকৃৎ রামমোহনের নেতৃত্বেই নারীশিক্ষার প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিশেষ উল্লেখ্য, রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নেতা রাজা রাধাকৃষ্ণ দেবও এই ব্যাপারে রামমোহনকে সক্রিয় সহযোগিতা করেন। রামমোহনের প্রচেষ্টায় এবং মিশনারীদের আনুকূল্যে ১৮২১ সালেই বাংলাদেশে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে ইংল্যান্ডের উদারনৈতিক ব্যক্তিরাও স্বদেশে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের আন্দোলন শুরু করিয়া দেন এবং তাহার প্রভাব ভারতে দেখা যায়। কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ সরকারী কর্মচারীদের সহায়তায় কলিকাতায় নারীশিক্ষার ব্যাপারে ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে মহিলাদের মধ্য হইতে অবরোধ বা পর্দাপ্রথার অবসান ঘটে এবং তাঁহারা বিদ্যালয় ও সভাসমিতিতে যোগদান করিতে শুরু করেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অবদানও অপরিসীম। রামগোপাল ঘোষ, তাঁরাচাদ চক্রবর্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত বুদ্ধিজীবিগণও নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তির আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে সর্বাপেক্ষা প্রোজ্জ্বল ভূমিকা ছিল বিদ্যাসাগরের। বাংলার বিভিন্ন জেলায় বিশেষ করিয়া মেদিনীপুর, বর্ধমান ও হুগলীতে তিনি ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন যাহার মধ্যে অনেকগুলির ব্যয় তিনি স্বয়ং নির্বাহ করিতেন। তাঁহারই সহায়তায় বেথুন ১৮৪৯ সালে কলিকাতায় বিখ্যাত হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে ইহা বেথুন স্কুল নামে পরিচিত। উডের ডেসপ্যাচেও স্ত্রী-শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকৃত হয় এবং বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে সরকারী অনুদান দেওয়া শুরু হয়।

● **সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঃ** রামমোহন শুধু সমাজ সংস্কারকই ছিলেন না। তাঁহাকে বাংলা গদ্যরীতির স্রষ্টা বলা যায়। বাংলা গদ্য রচনার যে ধারার সূত্রপাত তিনি করেন পরবর্তিকালে দেবেন্দ্রনাথ-অক্ষয়কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর তাঁহার পরিপুষ্টি সাধন করেন। বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি গ্রন্থের মাধ্যমে বাংলা গদ্য সাহিত্যের 'মুক্তি' সূচিত হইয়াছিল। সাহিত্য সাধনায় ডিরোজিও পন্থীরাও বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। টেকচাঁদ ঠাকুরের (প্যারিচাঁদ মিত্রের ছদ্ম নাম) 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। মধুসূদন ও দীনবন্ধু এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র-রঙ্গলালের সাহিত্য সাধনার ভিত্তি এই সময়েই রচিত হয়।

বাংলার আন্দোলনের প্রভাবে মহারাষ্ট্রেও সামাজিক-সাংস্কৃকি আন্দোলন গড়িয়া উঠে। ১৮৪৯ সালে মহারাষ্ট্রে 'পরমহংস সমাজ' নামে একটি সংস্থার উদ্ভব হয়। এই সংগঠনের সদস্যগণ ছিলেন একেশ্বরবাদী এবং জাতিভেদ প্রথার বিরোধী। সভার অধিবেশনে তথাকথিত নিম্নবর্ণের প্রস্তুত খাদ্যাদি গ্রহণ করা হইত। ১৮৪৮ সালে মহরাষ্ট্রের তরুণ সম্প্রদায় মারাঠী ও গুজরাটী ভাষায় সাহিত্য ও প্রাকৃতিক এবং সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞানচর্চার জন্য Students' Literary and Scientific Society নামে একটি সংস্থা গঠন করেন।

এই সংস্থা মহারাষ্ট্রে নারী শিক্ষা প্রসারেও অগ্রণী হয়। ১৮৫১ সালে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী কুলে এবং তাঁহার পত্নীর উদ্যোগে সর্বপ্রথম পুণাতে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অনতিবিলম্বে রাজ্যের সর্বত্র অনুরূপ বিদ্যালয় গড়িয়া উঠে। স্ত্রী শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে জগন্নাথ শংকর শেঠ এবং ভাই দাজীর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শুধু স্ত্রী শিক্ষার প্রসারেই নয়, সর্বপ্রকার সমাজ সংস্কার মূলক

কার্যাবলীর সহিত ফুলে'র (Phule) নাম স্মরণীয় ভাবে যুক্ত। তিনি অস্পৃশ্যতার এবং ব্রাহ্মণ ও অপরাপর উচ্চবর্গের সামাজিক নিপীড়নের হাত হইতে নিম্নবর্ণের মানুষকে রক্ষার জন্য আজীবন সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন। তাঁহারই নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রে 'বিধবা বিবাহ সমিতি' গড়িয়া উঠে (১৮৫০ খ্রীঃ)। বিধবা বিবাহ আন্দোলনে গুজরাটী ভাষায় প্রকাশিত (১৮৫২ খ্রীঃ) 'সত্যপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক কার্সনদাস মূলজীর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গোপাল হরি এবং দাদাভাই নৌরজী

মহারাষ্ট্রে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী শিক্ষা প্রবর্তনে এবং সমাজ সংস্কারমূলক ও ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারা প্রসারে অবিস্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বময় পুরুষ। তাঁহার নাম গোপালহরি দেশমুখ। কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁহাকে 'লোকহিতবাদী' আখ্যা দিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মহারাষ্ট্রের অপর এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হইলেন দাদাভাই নৌরজী। পার্শী সমাজে তিনি সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন। জোরোস্থ্রিয়ান ধর্মের মধ্যকার কুসংস্কার দূরীকরণের সঙ্গে সঙ্গে নারীর সামাজিক ও অর্থনীতি অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যও তিনি সক্রিয় প্রচেষ্টা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এইভাবে বাংলা ও মহারাষ্ট্রে নূতন যুগের সূচনা হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ □ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

এক □ ফরাজি ও ওয়াহাবি আন্দোলন

● **ফরাজি ও ওয়াহাবি আন্দোলন ঃ** বক্সারের যুদ্ধের পর বাংলায় সার্বভৌম ক্ষমতা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হস্তগত হয়। কালক্রমে বাংলা হইতে অযোধ্যা হইয়া দিল্লী ও পাঞ্জাব পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এদেশে ব্রিটিশ আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা খুব সহজে ঘটে নাই। অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাজ্য ব্যতিরেকে (যেমন নিজাম) মুখ্য ভারতীয় রাজন্যগণ বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহীশূর রাজ্য অধিকার করিতে ইংরেজদের ৪টি যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, মারাঠা ও শিখ শক্তিকে পরাভূত করিতেও তাঁহাদের যথাক্রমে ৩টি ও ২টি যুদ্ধের প্রয়োজন হয়। আসাম ও সিন্ধুদেশও বিনাযুদ্ধে অধিকৃত হয় নাই।

রাজন্যবর্গের ইংরেজ বিরোধী সংগ্রাম

ভারতের সাধারণ মানুষও বিনা প্রতিবাদে বিদেশী আধিপত্য মানিয়া লন নাই। বস্তুতঃ, কোম্পানী-শাসনের প্রারম্ভিক পর্বেই কৃষক ও উপজাতি-গোষ্ঠীভুক্ত সাধারণ মানুষ ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামের সূচনা করেন। নূতন ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা, শিল্প ও বাণিজ্য নীতির মাধ্যমে কোম্পানী যে সাম্রাজ্যবাদী শোষণনীতি কায়েম করে, এই অভ্যুত্থানগুলি ছিল তাহারই বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। সন্ন্যাসী ও চোঁয়াড় বিদ্রোহ হইতে শুরু করিয়া কোল, ভীল, সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ এবং নাগা, খাসি, গারো প্রভৃতি তথাকথিত অন্ত্যজ মানুষের এই বিদ্রোহ ও সংগ্রাম শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হইলেও, গণ আন্দোলনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

কৃষক ও উপজাতি অভ্যুত্থান

ইহারই পাশাপাশি ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এক ধর্মকেন্দ্রিক প্রতিবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়। ধর্মীয় আবেগ মিশ্রিত থাকিলেও এই আন্দোলন ছিল মূলতঃ কৃষক তাঁতী এবং অন্যান্য শোষিত মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিদ্রোহ। ফরাজি ও ওয়াহাবি আন্দোলন ছিল এই ধরনের উত্থান।

ওয়াহাবি আন্দোলন

● **ফরাজি আন্দোলন ঃ** ১৮০৪ সালে হাজী শরিয়ৎ উল্লাহ নামে এক ধর্মপ্রাণ মুসলিম কৃষক নেতা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার বাহাদুরপুর গ্রামে 'ফরাজি' নামে এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। শরিয়ৎউল্লাহ মক্কায় হজ করিতে যাইয়া আরবের ওয়াহাবি নেতাদের সংস্পর্শে আসেন। অতঃপর ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি আপন মাতৃভূমিতে ওয়াহাবি আদর্শ অনুযায়ী ইসলাম শুদ্ধিকরণ আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। হাজী শরিয়ৎউল্লাহ মুসলিম জনগণকে পবিত্র কোরাণের আদর্শ নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করিবার নির্দেশ দেন। কিন্তু শুধু ধর্মসংস্কারের মধ্যেই তিনি তাঁহার আন্দোলনকে সীমিত করিয়া রাখিলেন না। তিনি এই ধর্মীয় আন্দোলনকে মুসলমান সম্প্রদায়ের আর্থনৈতিক সমস্যা-সমাধানে নিয়োজিত করেন। ইসলামের আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন, ধনসম্পদ ও বংশমর্যাদা নির্বিশেষে আল্লার নিকট সব মানুষই সমান। ইসলামের এই গণতান্ত্রিক ব্যাখ্যা শোষণ-জর্জরিত মুসলিম কৃষক ও তাঁতীদের মধ্যে অভাবনীয় প্রভাব বিস্তার করে। দলে দলে বেকার তাঁতী এবং জমিচ্যুত কৃষক তাঁহার চারিপাশে সমবেত হইলেন। এই অনুগামিগণই 'ফরাজি' নামে পরিচিত। শরিয়ৎ উল্লাহ তাঁহার অনুচরদের অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানান। তিনি ঘোষণা করেন, জমি আল্লার সম্পত্তি। বিদেশী শাসকের সমর্থনে ও প্রশ্রয়ে জমিদার শ্রেণী কোরাণের নির্দেশ অমান্য করিয়া বে-আইনীভাবে জমি ভোগ করিয়া চলিয়াছে। তাঁহার এই বিদ্রোহের বাণী গোঁড়া মৌলভী, অভিজাত জমিদার এবং শাসক ইংরেজদের আতঙ্কিত করিয়া তুলিল। কিন্তু কোনো আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার পূর্বেই হাজী শরিয়ৎউল্লাহর মৃত্যু হয় (১৮৩৭ খ্রীঃ)। অতঃপর আন্দোলনের নেতা হইলেন তাঁহার পুত্র মহম্মদ মহসীন। গ্রামবাংলার মানুষের নিকট তিনি দুদু

হাজী শরিয়ৎ উল্লাহের নেতৃত্বে আন্দোলন

মিঞা নামেই অধিক পরিচিত। তাঁহার নেতৃত্বে আন্দোলন যথার্থ ও জঙ্গী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে রূপান্তরিত হইল।

দুদু মিঞা পূর্ববাংলার শোষিত কৃষক এবং নির্যাতিত নীল চাষীদের সংগঠিত করেন। অতঃপর তিনি সমগ্র পূর্ববাংলাকে কয়েকটি 'হলকা' বা অঞ্চলে ভাগ করিয়া প্রতিটি এলাকার জন্য একজন করিয়া 'খলিফা' নিযুক্ত করেন। "প্রচার করা, গণঐক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করাই হইল খলিফাদের দায়িত্ব।" পিতার মত তিনিও ঘোষণা করেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ যখন সমস্ত ভূসম্পত্তির মালিক, তখন জমিদারগণ আর খাজনা পাইবার অধিকারী নন ; নীলকরদের দাবিও বে-আইনী। দুদু মিঞার নির্দেশে কৃষকগণ জমিতে নীল চাষ করা এবং খাজনা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। ক্রমে সমগ্র পূর্ব বাংলায় এই আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িল। সরকারী রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, বাংলার প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ অঞ্চলে ফরাজি আন্দোলন বিস্তৃত হইয়াছিল। দুদু মিঞা আপন প্রভাবাধীন অঞ্চলে পঞ্চায়েৎ শাসন প্রবর্তন করেন। ইহার ফলে, পল্লীবাসীদের আর ইংরেজদের আদালতে যাইতে হইল না। সমস্ত বিবাদ-বিসম্বাদ, দাবি-দাওয়া এই স্বাধীন আদালতেই মীমাংসিত হইত। স্বভাবতঃই তাঁহার এই 'বিপ্লবাত্মক' বাণী ও কার্যক্রম জমিদার ও নীলকরদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করিল। ইঁহাদের চাপে পড়িয়া ইংরেজ সরকার দুদু মিঞাকে গ্রেপ্তার করিয়া আলিপুর জেলে বন্দী করে (১৮৫৭ খ্রীঃ)। তিন বৎসরের বন্দী জীবনে স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তি লাভ করিবার অল্পদিনের মধ্যেই স্বগ্রামে তাঁহার মৃত্যু হয় (১৮৬০ খ্রীঃ)। দুদু মিঞার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নোয়া মিঞার নেতৃত্বে ফরাজি আন্দোলন আরও কিছুকাল চলিয়াছিল। কিন্তু নোয়া মিঞা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের পরিবর্তে ধর্মীয় গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়া আন্দোলনকে স্তিমিত করিয়া দিলেন।

দুদু মিঞার নেতৃত্বে জঙ্গী কৃষক আন্দোলন

● **ওয়াহাবি আন্দোলন ঃ** ফরাজি আন্দোলনের সমসাময়িক কালে সমগোত্রীয় অপর একটি আন্দোলন বাংলা হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিকে কাঁপাইয়া দিয়াছিল। ভারতীয় মুসলিম সমাজের মধ্যকার এই আন্দোলন ইতিহাসে ওয়াহবি আন্দোলন নামে পরিচিত।

ওয়াহাবি আন্দোলনের সূত্রপাত হয় আরব দেশে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবদুল ওয়াহাব নামে এক ধর্মপ্রাণ আরব ইসলাম ধর্মের শূচিতা ও পবিত্রতা রক্ষা করিবার মানসে এই সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন। তাঁহার অনুগামীদেরই ওয়াহাবি আখ্যা দেওয়া হয়। ইসলাম ধর্মকে পুনরায় পূর্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল ওয়াহাবি আন্দোলনের মূল লক্ষ্য।

ওয়াহাবি আন্দোলনের জন্ম আরব দেশে

ভারতবর্ষে এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করেন উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলীর অধিবাসী সৈয়দ আহমেদ নামে এক ব্যক্তি। মক্কায় হজ করিতে যাইয়া তিনি ওয়াহাবি ভাবধারার সহিত পরিচিত হন। ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া তিনি এদেশেও অনুরূপ আন্দোলনের সূচনা করেন। তাঁহার প্রচারিত আদর্শের মূল কথা ছিল, ইসলাম ধর্মের নীতি ও পবিত্রতা হইতে বিচ্যুত হইবার ফলেই ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক ও বৈষয়িক অবনতি দেখা দিয়াছে। পয়গম্বরের বাণী নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করিয়া আদর্শ মুসলমানের জীবন যাপন করিতে পারিলেই মুসলিম সমাজের পুনরুজ্জীবন সম্ভব হইবে। পাটনায় কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সৈয়দ আহমেদ তাঁহার আদর্শ প্রচার করিতে শুরু করেন। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে তাঁহার বাণী গভীর উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল। স্বল্পকালের মধ্যে বহু মানুষ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তিনি ৪ জন খলিফা বা সহচর মনোনীত করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে এক শক্তিশালী সংগঠন গড়িয়া তুলিলেন। ইতিমধ্যে ওয়াহাবি আন্দোলনের চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটিল। ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষকে 'দার-উল-হারব' বা 'বিধর্মীর দেশ' বলিয়া অভিহিত করিয়া তিনি মুসলিম জনগণকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। তিনি প্রচার করিলেন, বিদেশী ইংরেজগণই হইতেছেন ভারতের মুসলমানদের প্রধানতম শত্রু। অতএব বিদেশী বিধর্মীদের বিতাড়িত করিয়া ভারতবর্ষকে একটি আদর্শ ইসলামীয় রাষ্ট্র অর্থাৎ 'দার-উল-ইসলামে' পরিণত করাই হইবে সৎ

ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলনের জন্মদাতা সৈয়দ আহমদ

ওয়াহাবিদের একমাত্র কর্তব্য। প্রচারের মাধ্যমে এবং সংগঠনকে বিস্তৃত করিয়া তিনি আপন অনুগামীদের ঐক্যবদ্ধ হইবার আহ্বান জানান। এইভাবে ধর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্যে গড়িয়া উঠিলেও ওয়াহাবি আন্দোলন ক্রমশঃ একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হইল।

ইংরেজী বিরোধী সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসাবে সৈয়দ আহমদ ওয়াহাবিদের ইউরোপীয় কায়দায় সামরিক প্রশিক্ষণ দিবার ব্যবস্থা করেন। অন্যদিকে, বিলায়েৎ খাঁ, এনায়েৎ খাঁ প্রমুখ অনুচরদের সাহায্যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে রায়বেরেলী, দিল্লী, মীরাট, মহীশূর, আগ্রা, জয়পুর, পাটনা প্রভৃতি স্থানে ওয়াহাবি সংগঠন গড়িয়া তোলেন। ইতিমধ্যে সৈয়দ আহমদ তাঁহার অনুগামীদের বিধর্মী ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া পাঠান অধ্যুষিত অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিবার আহ্বান জানান। অতঃপর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলই হইল ওয়াহাবি আন্দোলনের মুখ্য কেন্দ্রস্থল। কিন্তু ১৮৩০ সালে আফগান উপজাতিদের সাহায্যে ওয়াহাবিরা পেশোয়ার অধিকার করিয়া লইলে পাঞ্জাবের শিখশক্তি বিচলিত হয়। শিখ সম্প্রদায় বলপূর্বক ওয়াহাবিদের সীমান্ত হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যায়। যুদ্ধে শের সিং-এর হাতে সৈয়দ আহমদ নিহত হন (১৮৩১ খ্রীঃ)। পরবর্তিকালে পাঞ্জাবে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্রিটিশ শক্তি ওয়াহাবিদের মুখোমুখি হয় এবং উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এই দ্বন্দ্বের সূচনা হইলেও কালক্রমে সমগ্র উত্তর ভারতে আন্দোলন পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য ইংরেজ সরকারকে ৩৫ হাজার সৈন্য নিয়োগ করিতে হইয়াছিল। ১৮৫০ হইতে ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত কমপক্ষে ২০টি সামরিক অভিযান করিয়া এই আন্দোলন দমন করা সম্ভব হইয়াছিল। সামরিক অভিযানের পরেও চলিয়াছিল বিচারালয়ের মাধ্যমে নির্যাতন—দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড অথবা প্রাণদণ্ড। তথাপি ওয়াহাবিদের ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবের বিন্দুমাত্র হ্রাস ঘটে নাই। ১৮৭২ সালে শের আলী নামে এক নির্বাসিত ওয়াহাবি কর্মী আন্দামানে পরিদর্শনরত গভর্নর জেনারেল লর্ড মেয়োকে হত্যা করিয়া ব্রিটিশ নৃশংসতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আন্দোলনের রূপান্তর-ধর্মীয় হইতে রাজনৈতিক

ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম

ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। গবেষক ড়ঃ কুয়েমুদ্দিন আহমদ মনে করেন, প্রথমদিকে ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন হিসাবে শুরু হইলেও শেষপর্যন্ত ইহা ইংরেজ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়। ডঃ আহমদ এই আন্দোলনকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অঙ্গীভূত করিবার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার কিন্তু ইহাকে জাতীয় আন্দোলনের পর্যায়ভুক্ত করিতে রাজী নন। তাঁহার মতে, ওয়াহাবি আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল, মুসলিম আধিপত্যের পুনঃস্থাপন। তিনি অবশ্য, এই আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক বলিয়া চিত্রিত করিতে চাহেন না। ডঃ মজুমদার বলেন, ওয়াহাবিদের সহিত সাধারণ হিন্দুদের কোনও সংঘর্ষ হয় নাই। বরং, বহু হিন্দুরই ওয়াহাবিদের প্রতি সমর্থন এবং সহমর্মিতা ছিল। ডঃ স্মিথও একই মত পোষণ করেন। অতএব বলা যাইতে পারে, শিখ সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধ প্রধানতঃ রাজনৈতিক, ধর্মীয় নয়। ঐতিহাসিক হান্টার মন্তব্য করিয়াছেন, বাংলাদেশে এই আন্দোলন শ্রেণী সংঘাতের রূপ ধারণ করে। সেখানে এই আন্দোলন চালিত হয় অত্যাচারী জমিদার ও মহাজনী শ্রেণীর বিরুদ্ধে। মুসলিম জমিদার বা মহাজনেরাও ওয়াহাবি আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় নাই। এই কারণেই কায়েমী স্বার্থবাহী জমিদার ও মৌলভীরা ওয়াহাবি আন্দোলনের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী করিয়াছিল। যাহা হউক, ঐস্লামিক চরিত্র থাকিলেও, ওয়াহাবি আন্দোলন 'সাম্রাজ্যবাদী-সামন্তবাদ-বিরোধী' আন্দোলন হিসাবেই ইতিহাসে পরিচিত হইয়া থাকিবে।

আন্দোলনের চরিত্র। ঐতিহাসিকদের মতবিরোধ

● **তীতুমীরের আন্দোলন ঃ** বাংলাদেশে ওয়াহাবি আন্দোলনের নেতা ছিলেন তিতু মিঞা বা তীতুমীর। তাঁহার আসল নাম ছিল মীর নাসির আলী। ১৮২২ সালে মক্কায় হজ করিতে যাইয়া তিনি ওয়াহাবি ভাবধারার সহিত পরিচিত হন। বাংলায় ফিরিয়া তিনি একদিকে যেমন ওয়াহাবি মতে ধর্মসংস্কার করিবার জন্য প্রচার করিতে থাকেন, অন্যদিকে তেমনি জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার হইতে কৃষক

ও তাঁতীদের বাঁচাইবার জন্য শক্তিশালী সংগঠন গড়িয়া তোলেন। সুতরাং তীতুর চিন্তাধারায় ফরাজি প্রভাবও দেখা যায়। তাঁহার আন্দোলনের প্রধান ক্ষেত্র ছিল উত্তর ২৪ পরগণা, নদীয়া, যশোহর ও ফরিদপুর জেলা। দরিদ্র চাষী ও বেকার তাঁতীদের তিনি অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার আহ্বান জানান। তাঁহার নিকট হিন্দু ও মুসলিম জমিদারদের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। এই সময় বারাসত অঞ্চলের জমিদার কৃষ্ণ রায় ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রভাব দমন করিবার জন্য কৃষকদের উপর একটি বিশেষ ট্যাক্স বা জরিমানা ধার্য করিলে তীতুমীর তাঁহার অনুচরদের লইয়া জমিদারের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করিয়া দেন। তীতু বুঝিতে পারেন, নীলকর ও জমিদারগণের ক্ষমতার উৎস বিদেশী শাসকদের সামরিক সাহায্য। সুতরাং তিনি একই সাথে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। বাংলার কৃষকদের নিকট



তিতুমীর

তিনি প্রচার করেন, ইংরেজ রাজত্বের অবসান হইয়া মুসলিম শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। যাহা ২৪ পরগণার নারিকেলবেড়িয়া গ্রামকে সদর ঘাঁটি করিয়া তীতুমীর তাঁহার সশস্ত্র সংগ্রাম চালাইলেন একই সঙ্গে জমিদার-মহাজন, নীলকর এবং ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার তীতুর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। ইংরেজ গোলন্দাজ বাহিনীর কামানের আঘাতে তীতুর বিখ্যাত "বাঁশের কেল্লা" বিধ্বস্ত হইল। বীরের মত লড়াই করিতে করিতে তীতু যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদের মৃত্যু বরণ করেন। ৩৫০ জন অনুচর সহ তীতুর সহচর গোলাম রসুল বন্দী হন। রসুলকে ফাঁসী এবং ৩৫০ জন বিদ্রোহীকে বিভিন্ন মেয়াদের দ্বীপান্তর ও কারাদণ্ড দেওয়া হইল। এইভাবে তীতুমীরের আন্দোলনকে দমন করা হয়।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ শশীভূষণ চৌধুরী মনে করেন, জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হইলেও, তীতুর আন্দোলন ক্রমশঃ সাম্প্রদায়িক চরিত্র ধারণ করে। গবেষক এ· আর· মালিকের মতে, তীতুর আন্দোলন ছিল দরিদ্র কৃষকের স্বার্থে। বাংলার জমিদারগণ বেশির ভাগ হিন্দু ধর্মাবলম্বী থাকায় এই জমিদার বিরোধী আন্দোলন অনেক সময় সাম্প্রদায়িক বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। ঐতিহাসিক হান্টারও বলিয়াছেন, জমিদারদের সহিত লড়াই করিবার সময় তীতু হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ মানিতেন না। হান্টার তীতুর আন্দোলনে 'লাল বা সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্রী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যাহা হউক, সাম্প্রদায়িকতা হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত না হইলেও তীতুমীর নির্যাতিত হিন্দু-মুসলিম কৃষক ও তাঁতীদের লইয়া ইংরেজ-বিরোধী এক যথার্থ গণ-ভিত্তিক শ্রেণী আন্দোলনের সূচনা করিয়াছিলেন।

দুই □ কোল ও সাঁওতাল বিদ্রোহ

● **উপজাতি অভ্যুত্থান ঃ কোল বিদ্রোহ (১৮৩১-৩২ খ্রীঃ) ঃ** ভারতের গণ-আন্দোলনের ইতিহাসে কোল বিদ্রোহ এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচনা করিয়াছে। বিহার রাজ্যের ছোটনাগপুর ও রাঁচি অঞ্চলে কোলদের বসতি ছিল। কোল সমাজে একটা গণতান্ত্রিক রীতি প্রচলিত ছিল। যে জমি কোলগণ সকলে মিলিয়া জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার মালিক রাজা বা জমিদার হইবেন না (কোলদের মধ্যেও রাজা ও জমিদার ছিল), সমগ্র সমাজই হইবেন এই জমির অধিকারী। কিন্তু ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রাচীন প্রথার অবসান ঘটিল। কোম্পানী কোলদের উচ্ছেদ করিয়া নূতন জমিদার শ্রেণীর হস্তে সমস্ত জমি তুলিয়া দিল। শুধু তাই নয়, সরকারের নির্দেশে জমিদারগণ কোলদের ফসলের পরিবর্তে নগদ টাকায় খাজনা দিবার আদেশ জারী করেন। এতদিন

কোল সমাজে বিনিময় ব্যবস্থা চালু ছিল। ফসল বিক্রয় করিয়া খাজনার অর্থসংগ্রহ করা তাহাদের পক্ষে অসুবিধাজনক হওয়ায় কোলগণ খাজনা দিতে অপরাগ হন। জমিদারগণ তখন হিন্দু-মুসলিম-শিখ মহাজনদের রাজস্ব আদায়ের ঠিকাদারি দেন। কোল ভাষায় ইহাদের বলা হইত 'ডিকু'। এই নয়া মহাজন-জমিদারের দল ইচ্ছামত খাজনা ধার্য করিয়া এবং বেগার খাটাইয়া কোলদের উপর চরম নির্যাতন শুরু করিয়া দিলে তাহারা ইংরেজদের আদালতে প্রতিকারের প্রার্থনা জানান। কোম্পানীর সরকার জমিদারদের পক্ষে যাওয়ায় হো, মুণ্ডা, ওঁড়াই প্রভৃতি সর্বশ্রেণীর কোল সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে অগ্রসর হন। ১৮২০-২১ সালে ঘটিল হো সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ। ব্রিটিশ শাসকদের সমর্থনে ও সহযোগিতায় জোরহাটের ইংরেজ করদ রাজ্য কোল অঞ্চল অধিকার করিবার চেষ্টা করিলে এই বিদ্রোহ ঘটে। কামান ও সেনাবাহিনীর সাহায্যে বিদেশী শাসক ইহাদের আন্দোলন দমন করেন। পরবর্তিকালে ইংরেজরা অঞ্চলটি দখল করিয়া সেখানে স্থায়িভাবে একটি সৈন্যদল স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে খাজনার হার অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং নূতন নূতন অর্থনৈতিক শোষণের ফলে রাঁচি জেলার মুণ্ডা, ওঁড়াই সম্প্রদায়ের সমস্ত কৃষক একযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন (১৮৩১ খ্রীঃ)। রাঁচি হইতে সিংভূম হইয়া আন্দোলন মানভূম, হাজারিবাগ, পালামৌ জেলায়ও বিস্তৃত হইল। তীর, ধনুক, টাঙি আর বল্লম লইয়া বিদ্রোহীরা ডিকুদের আক্রমণ করিয়া তাহাদের শস্যক্ষেত্র এবং কাছারী বাড়ি বিধ্বস্ত করিয়া দিল। অত্যাচারী মহাজন এবং তাহাদের সাগরেদদের হত্যা করিয়া কোলগণ উৎপীড়ন-শোষণের প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ইংরেজ কোম্পানী বিদ্রোহদমন করিবার জন্য ২০০০ পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য এবং গোলন্দাজ বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইলেন। একমাস ধরিয়া খণ্ডযুদ্ধ চলিবার পর কোলগণ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। বিদ্রোহের অবসানের পরেও সরকারী তাণ্ডব শেষ হইল না। ইংরেজদের প্রশ্রয়ে নূতন 'ডিকু'র দল আসিয়া কোলদের উপর পূর্বাপেক্ষা অধিক শোষণ নীতি চাপাইয়া দিল। কিন্তু কোলদের বিদ্রোহী চেতনা সম্পূর্ণভাবে স্তিমিত হইল না। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় কুয়র সিং-এর নেতৃত্বে এবং পরবর্তিকালে (১৮৯৩-১৯০০ সালে) বিরশার নেতৃত্বের কোলগণ (মুণ্ডা বিদ্রোহ) নূতন করিয়া সংগ্রামের আয়োজন করিয়াছিলেন।

● **সাঁওতাল বিদ্রোহ ঃ** বিহার এবং বাংলার মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্ত অঞ্চল ছিল সাঁওতালদের আদি বাসস্থান। ইহারা ছিলেন সরল ও শান্তিপ্রিয় কিন্তু কষ্টসহিষ্ণু মানুষ। কঠোর পরিশ্রমের সাহায্যে ইঁহারা নিজেদের বাসভূমি সংলগ্ন উষর জমি কৃষির উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত-সৃষ্ট লোভী জমিদারদের দল কোম্পানীর সাহায্যে সাঁওতালদের জমি হইতে উচ্ছেদ করিয়া দেন। তখন তাঁহারা রাজমহলের পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করিতে শুরু করেন। সেখানেই তাঁহারা জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া উর্বর শস্যক্ষেত্র গঠন করেন। অর্থলোলুপ জমিদারশ্রেণী সরকারের সহযোগিতায় এই নূতন কৃষিক্ষেত্রও আত্মসাৎ করিয়া লইলেন। সাঁওতালদের পরিশ্রম-জাত জমিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করা হইল। এইভাবে তাঁহারা দ্বিতীয়বার জমিচ্যুত হইলেন। ইহার সহিত যুক্ত হইল কোম্পানী ও জমিদার আরোপিত বাড়তি করের বোঝা। বর্ধিত খাজনা পরিশোধ করিতে যাইয়া সাঁওতালদের দ্বারস্থ হইতে হইল ভাটিয়া ও ভোজপুরী সুদখোর মহাজনদের নিকট। ঋণের উপর এমনকি ৫০০% সুদও দিতে হইল। এইভাবে জমিদার ও মহাজন শ্রেণীর অত্যাচার ও শোষণে সরল সাঁওতালগণ শোষিত হইতে থাকিলেন। তাঁহাদের পারিবারিক জীবন এবং নারীর ইজ্জৎও বিপর্যস্ত হইতে থাকিল। এই আর্থিক শোষণ ও সামাজিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধেই ১৮৫৫-৫৬ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ দেখা দেয়। অভ্যুত্থান মূলতঃ ছিল অত্যাচারী জমিদার ও মহাজন শ্রেণীর বিরুদ্ধে। কিন্তু কোম্পানীর শাসন শোষকদের সমর্থন করায় বিদ্রোহ পরিণত হইল সমস্ত ধরনের অত্যাচার ও বিদেশী অপশাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভ্যুত্থানে।

১৮৫৫ সালের মধ্যভাগে সিধু ও কানহু নামে দুই দলপতির নেতৃত্বে দশ হাজার সাঁওতাল

'ভাগনাডিহির' মাঠে সমবেত হইয়া স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্যের জন্ম ঘোষণা করেন। ভাগলপুর ও রাজমহলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ইংরেজ শাসনমুক্ত এই 'সাঁওতাল সুবা' প্রতিষ্ঠিত হইল। জমিদারের



ভাগনাডিহির মাঠ

কাছারী, মহাজনের আড়ত, সরকারী দপ্তর, এমন কি পুলিস চৌকী আক্রমণ ও দখল করিয়া সাঁওতালগণ আপনাদের স্বাধীন ক্ষমতা স্থাপন করেন। প্রথম দিকে, ইংরেজরা ভাবিয়াছিলেন, সহজেই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভবপর হইবে। কিন্তু মেজর বুরাফ নামে এক সেনাপতি পরাজিত এবং বেশ কিছু সংখ্যক ইংরেজ সৈন্য নিহত হইলে সামরিক বাহিনীকে তলব করা হয়। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত তুমুল যুদ্ধ হয়। ব্রিটিশ আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে তীর-ধনুক ও কুঠার লইয়া সাঁওতালগণ বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করিয়াও শেষপর্যন্ত পরাজিত হইলেন। এই সংগ্রামে প্রায় পঁচিশ হাজার সাঁওতাল যুবক প্রাণ বিসর্জন দেন। বিদ্রোহ দমনের পরেও চলিয়াছিল সাঁওতালদের উপর অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ □ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ, ১৮৫৭

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিং ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল পদে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তাঁহার শাসনকালে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ। ইংরেজ সরকারের নথিপত্রে ঘটনাটিকে 'সিপাহী বিদ্রোহ' হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, ভারতীয় ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক নেতাদের একটি বিরাট অংশ মনে করেন, ইহা ছিল "ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জাতীয় গণ-অভ্যুত্থান"। ১৮৫৭ সালের এই ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের যথার্থ চরিত্র লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতদ্বৈধতা থাকায় ইহাকে 'মহাবিদ্রোহ' আখ্যা দেওয়াই সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা সঙ্গত।

ভূমিকা

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। বরং বলা যাইতে পারে ইহা ছিল অনেকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার পুঞ্জীভূত ফল। ১৭৫৭ হইতে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত একশত বৎসর ধরিয়া ইংরেজগণ একদিকে যেমন ভারতীয় রাজশক্তিকে পর্যুদস্ত করিয়া সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি ঔপনিবেশিক শোষণ ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। অঠারোশো সাতান্ন সালের মহাবিদ্রোহ ঘটিয়াছিল এইসব 'সুদূরপ্রসারী জাতীয় কারণবশতঃ'।

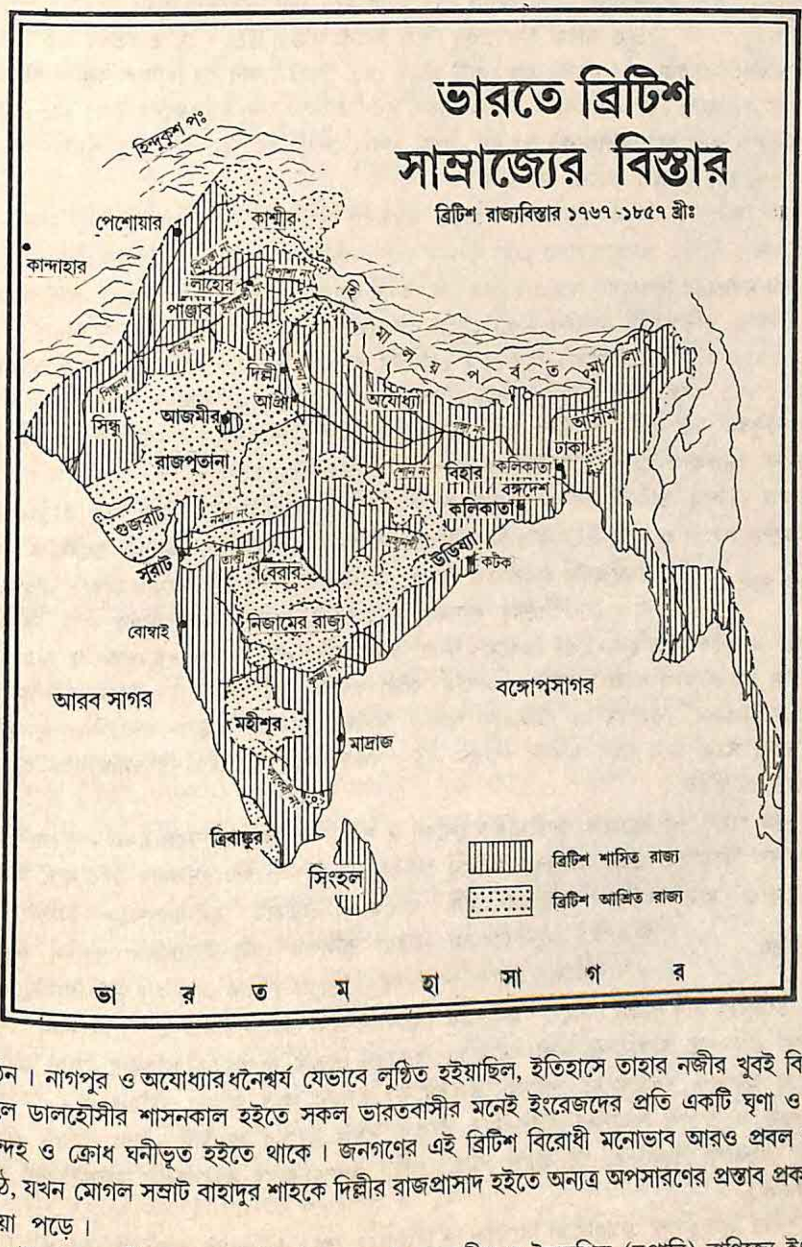
মহাবিদ্রোহের বহুপূর্ব হইতেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর বিক্ষোভ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। ফরাজি ও ওয়াহাবি আন্দোলন, কোল ও সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতি গণজাগরণের মধ্য দিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীদের অসন্তোষ প্রকাশ পাইয়াছিল। এই ক্রমবর্ধমান অসন্তোষই ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে বিস্ফোরণের আকারে ফাটিয়া পড়িল।

● **মহাবিদ্রোহের কারণ ঃ** ১৮৫৭ সালের সিপাহী-অভ্যুত্থানের পশ্চাতে নানাবিধ কারণ আছে। প্রকৃতির দিক দিয়া বিচার করিয়া এই কারণগুলিকে যথাক্রমে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, সামরিক প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

রাজ্যবিস্তার ব্যাপারে ইংরেজ শাসকগণ পূর্ব প্রতিশ্রুতি ও মৈত্রী বা সন্ধিপত্রের প্রতি কোনো সম্মান বা মূল্য আরোপ করেন নাই। নানা অছিলায় ও অজুহাতে তাঁহারা একের পর এক ভারতীয় অঞ্চল আপনাদের সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী লর্ড ডালহৌসীর 'স্বত্বলোপ নীতি' ব্রিটিশ বিশ্বাসঘাতকতার নগ্ন নিদর্শন। এই নীতি প্রয়োগ করিয়া সাতরা, ঝাঁসী, নাগপুর, সম্বলপুর প্রভৃতি রাজ্যগুলি ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করা হয়। অরাজকতার অভিযোগেও দখল করিয়া লওয়া হইল অযোধ্যা প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বক্সারের যুদ্ধের পর হইতেই অযোধ্যা বিশ্বস্ততার সহিত ইংরেজ আনুগত্য মানিয়া চলিত। দেশীয় রাজ্যগুলি গ্রাস করিবার ফলে অসংখ্য মানুষের-রাজ পরিবারের আশ্রিত ব্যক্তিগণ, কর্মচারী ও সেনাদলের জীবিকার সংকট দেখা দেয়। অভিজাত পরিবারের মহিলাদের পর্যন্ত সাহায্যের জন্য অন্যের কাছে হাত পাতিতে হইয়াছিল। নূতন অধিকৃত রাজ্যসমূহে কোম্পানী যে বিশেষ ভূমি-ব্যবস্থা চালু করিল তাহার প্রতিঘাতে, বিশেষ করিয়া অযোধ্যার, জমিদার ও তালুকদারগণকেও জমির মালিকানা স্বত্ব হারাইতে হইয়াছিল। অযোধ্যার সেনাবাহিনীও ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ফলস্বরূপ সেখানকার সৈনিকরাও হইয়া পড়িলেন নিরাশ্রয় বেকার। শুধু অযোধ্যাতেই নয়, অধিকারভুক্ত সব কয়টি দেশীয় রাজ্যে এই একই চিত্র দেখিতে পাওয়া গেল। ফলে জমিদার ও অভিজাতশ্রেণী হইতে কৃষক ও সেনাবাহিনী সকলেরই মনে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব প্রবল হইয়া

উঠিতে থাকে। স্বত্বলোপ নীতি প্রয়োগ করিয়া পেশোয়া ২য় বাজীরাও-এর দত্তকপুত্র নানা সাহেবের এবং কর্ণাটকের নবাবদের ভাতাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে রাজ্যচ্যুত ঝাঁসির রানী এবং বৃত্তি হইতে বঞ্চিত নানাসাহেব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। অতঃপর শুরু হইল রাজপ্রাসাদ ও কোষাগারগুলির নির্লজ্জ

রাজনৈতিক কারণ



লুণ্ঠন। নাগপুর ও অযোধ্যার ধনৈশ্বর্য যেভাবে লুণ্ঠিত হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার নজীর খুবই বিরল। ফলে ডালহৌসীর শাসনকাল হইতে সকল ভারতবাসীর মনেই ইংরেজদের প্রতি একটি ঘৃণা ও ভয়, সন্দেহ ও ক্রোধ ঘনীভূত হইতে থাকে। জনগণের এই ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব আরও প্রবল হইয়া উঠে, যখন মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহকে দিল্লীর রাজপ্রাসাদ হইতে অন্যত্র অপসারণের প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই ভারতের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক (রপ্তানি) বাণিজ্যে ইংরেজ

কোম্পানীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। সিরাজউদ্দৌল্লা এবং মীরকাশিমের পরাজয়ের পর বাংলার রাজস্বের উপরও তাহাদের কর্তৃত্ব কায়েম হয়। অতঃপর রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হইল বাংলা তথা ভারতের সম্পদ লুণ্ঠন ও অত্যাচার। নূতন ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা, শিল্প ও বাণিজ্য নীতি একদা সমৃদ্ধ ভারতীয় অর্থনীতিকে চরমভাবে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিল। কালক্রমে ঔপনিবেশিক শোষণের মাত্রা আরও তীব্র হইয়া উঠে এবং ভারতের লুণ্ঠিত সম্পদের উপর ভিত্তি করিয়া ইংল্যান্ডের 'শিল্প বিপ্লব' গড়িয়া উঠে। যে ভারতবর্ষ এক সময় নিজের চাহিদা মিটাইয়া প্রতি বৎসর এক কোটি হইতে দেড় কোটি টাকার বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি করিত, ১৮০০ সালের মধ্যে সেই ভারতবর্ষেই আপন চাহিদা পূরণ করিবার জন্য ইংরেজদের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িল। ভারতের বস্ত্রশিল্পকেই শুধু নয়, রেশম, পশম, লোহা, কাচ, কাগজ ও ধাতু শিল্পগুলিকেও ইংরেজ কোম্পানী ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল।

অর্থনৈতিক কারণ

ইংরেজ শাসনের নিষ্ঠুর শোষণে ও প্রচণ্ড করভারে সর্বস্তরের ভারতীয় জনগণই জর্জরিত হইয়াছিলেন। পীড়িত জনসাধারণের মধ্যে কৃষককুলের শোচনীয় অবস্থা ছিল অবর্ণনীয়। আপন-সৃষ্ট ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বিপর্যয়ের পরেও ইংরেজ শোষকগণ কৃষকদের খাজনা এক পয়সাও মকুব করেন নাই। উপরন্তু, দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট মানুষের নিকট হইতে বলপ্রয়োগে পূর্বাপেক্ষা বর্ধিত খাজনা আদায় করা হইল। ১৭৬৫-৬৬ সালে যেখানে আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৪ লক্ষ ৭০ হাজার পাউন্ড, সেখানে ১৭৭১ সালে (দুর্ভিক্ষের পরবৎসর) রাজস্ব সংগ্রহ করা হইল ২৩ লক্ষ ৪১ হাজার পাউন্ড। শুধু কৃষককুলই নয়, ব্রিটিশ শাসনের প্রচণ্ড আঘাতে অধিকৃত দেশীয় রাজ্যের সামরিক কর্মচারী ও বেসামরিক অভিজাত শ্রেণীও অর্থনৈতিক দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন।

ইংরেজ রাজত্বে ভারতবাসীর নানা প্রকারের অপমান ও লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। ইংরেজগণ ভারতীয়দের অসভ্য ও বর্বর ছাড়া অন্য কিছু ভাবিতে পারিত না। এমন কি, সমাজের উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চশ্রেণীর মানুষকেও তাঁহারা কোনো দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ করিতে চাহিতেন না। (বেন্টিংকের শাসনকালে ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের প্রতি কিঞ্চিৎ 'উদারতা' প্রদর্শিত হইয়াছিল।) এই বৈষম্যের ফলে, ভারতবাসীর মনে, ইংরেজদের, এমন কি তাঁহাদের সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ সম্পর্কেও, অত্যন্ত বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার প্রচলন, রেলপথ ও টেলিগ্রাফ স্থাপন, সতীদাহ নিবারণ প্রভৃতি প্রগতিশীল ব্যবস্থাও ভারতীয়গণ সহজ মনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই—সমস্ত কিছুই তাঁহাদের দুরভিসন্ধিমূলক বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল।

সামাজিক কারণ

ইংরেজ শাসকদের স্বৈরাচার, অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক বৈষম্যের ফলে যখন ভারতবাসিগণ বিশেষভাবে উত্তেজিত তখন বলপূর্বক খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তনের আশংকা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল ভারতীয়দের মনে গভীর আতঙ্কের সৃষ্টি করিল। ভারতীয় জনসাধারণকে বিধর্মী ও বিজাতীয় মনোভাবাপন্ন করিয়া তুলিবার চেষ্টা ইংরেজগণ বহুদিন ধরিয়া করিতেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই জাতিচ্যুত হইবার আশংকায় ভারতবাসীর মনে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করিল। ফলে গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন এবং সতীদাহ প্রথার অবসান, বিধবা বিবাহকে আইনগত স্বীকৃতিদান এবং ধর্মান্তরিত হিন্দুদের পিতার সম্পত্তিতে অধিকার প্রদান প্রভৃতি উদার ও মানবিক সংস্কারসমূহ সাধারণ ভারতবাসীর সমর্থন লাভ করিতে পারিল না। প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাস ও অভ্যস্ত সামাজিক রীতি-নীতি বিরোধী সমস্ত সংস্কার প্রচেষ্টাই মূলতঃ খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে প্রণোদিত, এই ধারণা সমস্ত শ্রেণীর জনসাধারণের মনে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল।

ধর্মীয় কারণ

ভারতীয় সিপাহীদের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের ক্ষেত্র এইভাবেই প্রস্তুত করিয়াছিল। নানা কারণে সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রথমতঃ ইউরোপীয়দের তুলনায় ভারতীয়দের

বেতনের স্বল্পতা সৈনিকদের মনে বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় সামরিক অফিসার বা সিপাহীদের পদোন্নতির সুযোগ ছিল সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। তৃতীয়তঃ, শ্বেতাঙ্গ সামরিক কর্মচারিগণ প্রায়ই ভারতীয়দের প্রতি অপমানজনক আচরণ করিতেন। চতুর্থতঃ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সৈনিকদের দূরদেশে প্রেরণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। গোঁড়া হিন্দু সৈনিকগণ 'ধর্ম বিরুদ্ধ' সমুদ্রযাত্রা অমান্য করিতে থাকিলে, লর্ড ক্যানিং General Services Enlistment Act নামে এক আইন জারী করিয়া সৈনিকদের যে কোনো স্থানে পাঠাইবার সংকল্প ঘোষণা করিলেন। অন্যদিকে, দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থান করার জন্য তাহারা অতিরিক্ত ভাতা দাবি করিলে তাহাও নাকচ করা হয়। এইসব কারণে সৈনিকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা হ্রাস পাইল এবং উত্তেজনাও বাড়িয়া গেল। ঠিক এই সময় ইউরোপে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শুরু হইল। ফলে ইউরোপীয় সৈনিকদের এক বিরাট অংশকে ইউরোপে যাইতে হইল। প্রথম হইতেই সংখ্যার দিক হইতে ভারতীয় সিপাহীরা ছিলেন গরিষ্ঠ। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দেশীয় সৈনিকগণ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সেনানিবাসেই সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন। এই অনুকূল পরিবেশে আঘাত হানিতে পারিলে শতাব্দব্যাপী বিদেশী শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটিতে পারে—এইরূপ একটা ধারণা সমস্ত সিপাহীদের মধ্যে প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল।


লর্ড ক্যানিং

ঠিক এই সময় যখন সিপাহীদের মন নানা কারণে উত্তপ্ত, তখন এনফিল্ড রাইফেলের প্রবর্তন করা হইল। এই বন্দুকের কার্তুজ দাঁতে কাটিয়া বন্দুকে পুরিতে হইত। চতুর্দিকে রটিয়া গেল, এই কার্তুজে গরু এবং শূকরের চর্বি মিশ্রিত আছে যাহা হিন্দু ও মুসলমানের নিকট ছিল যথাক্রমে নিষিদ্ধ। এই রটনা যেন বারুদের স্তূপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের কার্য করিল। বাংলাদেশের ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডে এবং তাঁহার সমর্থক ঈশ্বরী পাণ্ডে প্রকাশ্যভাবে সর্বপ্রথম বিদ্রোহ করেন। নেতাদের মৃত্যুদণ্ড ও অপরাপরের উপর অমানুষিক অত্যাচারের সাহায্যে ব্যারাকপুরের বিদ্রোহ দমন করা হইলেও বিদ্রোহের আগুন ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল।

এনফিল্ড রাইফেলের প্রবর্তন-মহাবিদ্রোহের সূচনা

ব্যারাকপুরের পর মীরাটে এবং মীরাট হইতে দিল্লীতে বিদ্রোহ বিস্তারলাভ করিল। দিল্লীর সিপাহীগণ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে হিন্দুস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কালক্রমে ফিরোজপুর, মুজাফ্‌ফরপুর, কানপুর, বেরেলী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, এটোয়া, রুড়কী, আলীগড় প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বহুস্থানেই জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ বিদ্রোহী সিপাহীদের সহিত যোগ দিয়াছিল। অনেক স্থানে, বেসামরিক জনগণ নিজেরাই বিদ্রোহ ও বিক্ষোভের আয়োজন করিয়াছিলেন। অযোধ্যা ও রোহিলাখণ্ডে বিদ্রোহ জাতীয় জাগরণে পরিণত হইয়াছিল। তথায় সম্পত্তিচ্যুত তালুকদার ও পূর্বতন সর্দারগণের সহিত কৃষকগণও ব্যাপকভাবে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, কানপুরের নানা সাহেব ও তাঁতিয়া টোপী, ঝাঁসীতে রানী লক্ষ্মীবাঈ এবং বিহারের অন্তর্গত জগদীশপুরের কুঁয়র সিং প্রমুখ অধিকারচ্যুত অভিজাতবর্গও মহাবিদ্রোহে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।


তাঁতিয়া টোপী

মহাবিদ্রোহের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল যে, ভারতবর্ষের এক বিস্তৃত অঞ্চলের ব্যাপক

সংখ্যক মানুষ—সামরিক এবং বেসামরিক জনগণ—এই অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেসামরিক জনগণ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না হইয়া গোপনে বিদ্রোহীদের সমর্থন ও সহযোগিতা করিয়াছিলেন। এই জনসমর্থন ছিল জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে। মনীষী কার্লমার্ক্সের কথায়, "বিদ্রোহ শুধু বিভিন্ন ধর্মের (হিন্দু-মুসলমান) এবং বিভিন্ন জাতের (ব্রাহ্মণ, রাজপুত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিখ) লোককে নয়, বিভিন্ন সামাজিক পঙক্তির লোককেও একত্র করেছিল। এই প্রথম মুসলমান ও হিন্দুরা তাদের পারস্পরিক বিদ্বেষ পরিহার করে মিলিত হয়েছে সাধারণ মনিবদের বিরুদ্ধে ; হিন্দুদের মধ্য থেকে হাঙ্গামা শুরু হয়ে আসলে তা শেষ হয়েছে দিল্লীর সিংহাসনে এক মুসলমান সম্রাটকে বসিয়ে।"

মহাবিদ্রোহের নেতৃবৃন্দ ঃ মহাবিদ্রোহের প্রথম নায়ক ছিলেন ব্যারাকপুরের বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক মঙ্গল পান্ডে। তাঁহার প্রতিবাদই ছিল 'বিদ্রোহের ঘণ্টাধ্বনি'। মঙ্গল পান্ডে এন্‌ফিল্ড রাইফেলের টোটা সম্পর্কে গুজবের সত্যতা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করিলে ইংরেজ সামরিক অফিসার তাঁহাকে অপমানজনক উত্তর দেন। পান্ডে অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ওই ইংরেজ অফিসারকে গুলিবিদ্ধ করেন। তাঁহার এই প্রতিবাদে সহকর্মীদেরও সামিল হইবার আহ্বান জানাইয়া তিনি আত্মহত্যার চেষ্টায় নিজেকেও গুলিবিদ্ধ করেন। আহত মঙ্গল পাণ্ডেকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচার করা হয়। বিচারে মৃত্যুদণ্ড সাব্যস্ত হইল। ১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ এই অসমসাহসী, দেশপ্রেমিক তরুণ সিপাহীকে ফাঁসী দেওয়া হয়। তাহার সহচর ঈশ্বরী পান্ডেকেও প্রাণদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল।


মঙ্গলপাণ্ডে

বিদ্রোহীগণ মোগল ঐতিহ্যের প্রতীক হিসাবে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে জাতীয় সম্রাট হিসাবে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু আন্দোলনে নেতৃত্ব দিবার মত উপযুক্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী তিনি ছিলেন না। চারিত্রিক দুর্বলতা এবং বার্ধক্যের জন্য তিনি প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করিয়াছেন, বাহাদুর শাহ গোপনে ইংরেজদের সহিত যোগাযোগ রাখিতেন। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক এই অভিযোগ অমূলক বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মহিষী জিন্নৎ মহল সম্ভবতঃ ইংরেজদের সহিত সংযোগ রক্ষা করিতেন। যাহা হউক, দিল্লী উদ্ধার করিবার পর ইংরেজগণ বাহাদুর শাহকে বন্দী করিয়া রেঙ্গুনে নির্বাসিত করেন। সেখানেই ১৮৬২ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। অপরদিকে তাঁহার দুই পুত্র এবং এক পৌত্রকেও গুলি করিয়া হত্যা করা হয়। তাঁহাদের মৃতদেহ যেস্থানে ঝুলাইয়া রাখা হয়, দিল্লীর সেই অঞ্চল 'খুনী দরওয়াজা' নামে পরিচিত।

দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ

মহাবিদ্রোহের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন নানা ধুন্দুপন্থ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তিনি নানাসাহেব নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন শেষতম পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের দত্তক পুত্র। কোম্পানী তাঁহার ভাতা বন্ধ করিয়া দিলে তিনি বিদ্রোহে যোগদান করিয়া কানপুরে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। গেরিলা যুদ্ধের আয়োজন করিয়া নানা ইংরেজদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু দিল্লীর পতনের পর তিনি পলাইয়া যান। তাঁহার শেষ জীবনের কাহিনী জানা যায় না। ঐতিহাসিকগণ অবশ্য মনে করেন, তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া নেপালে বসবাস করিতে

নানাসাহেব ও তাঁতিয়া টোপী

থাকেন এবং সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। নানার বিশ্বস্ত অনুচর তাঁতীয়া টোপী (আসল নাম রামচন্দ্র পাণ্ডুরঙ্গ) ছিলেন সুদক্ষ সেনাপতি। তিনি এক সময় গোয়ালিয়র দুর্গ দখল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নানা সাহেব ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলে তিনি মধ্য প্রদেশের জঙ্গলে অবস্থান করিয়া দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইংরেজ বিরোধী গেরিলাযুদ্ধ পরিচালনা করেন। অবশেষে এক জমিদার বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি ইংরেজদের হাতে ধরা পড়েন। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ফাঁসী দেন।

ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ ছিলেন আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেত্রী, স্বত্বলোপ নীতি প্রয়োগ করিয়া ঝাঁসী রাজ্য ইংরেজ কোম্পানী দখল করিয়া লইলে লক্ষ্মীবাঈ বিদ্রোহীদের সহিত যুক্ত হন এবং যুদ্ধে অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন। তিনি তাঁতীয়া টোপীর সাহায্যে গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। ইংরেজরা গোয়ালিয়র পুনর্দখল করিবার জন্য আক্রমণ করিলে লক্ষ্মীবাঈ উন্মুক্ত তরবারি হস্তে মোকাবিলা করেন। পুরুষের বেশে বীরের মত সংগ্রাম করিয়া তিনি মৃত্যু বরণ করেন (১৭ই জুন, ১৮৫৮ খ্রীঃ)। স্যার হিউরোজ তাঁহাকে বিদ্রোহীদের মধ্যে "সর্বোত্তমা ও সর্বাপেক্ষা সাহসিনী" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ফৈজাবাদের মৌলভী আহমদ্দৌলাহ রোহিলাখণ্ড অঞ্চলে বিদ্রোহী সেনাদের নেতৃত্ব দান করেন। তাঁহাকে ধরিবার অথবা হত্যার জন্য কোম্পানী ৫০,০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত, ইংরেজদের বশম্বদ জনৈক রাজা এই বিখ্যাত দেশপ্রেমিককে হত্যা করে। বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক ছিলেন বিহারের জগদীশপুরের জমিদার কুমার সিং (কুঁয়র সিং)। ইংরেজ সেনার সহিত সম্মুখ যুদ্ধে তিনি প্রাণ দেন। মহাবিদ্রোহের অন্যতম বুদ্ধিদীপ্ত নায়ক আজিমুল্লা খান "পয়গম-ই-আজাদী" নামে এক পত্রিকা পেশ করিয়া স্বাধীনতার উদ্দীপ্ত আহ্বান প্রচার করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এইসব বীর নায়কগণ চির স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।


ঝাঁন্সির রাণী লক্ষ্মীবাঈ

● **মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ ঃ** ইংরেজ বিরোধী এই মহাবিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইবে ইহা প্রায় সুনিশ্চিত ছিল। এই ব্যর্থতার পশ্চাতে বহুবিধ কারণ ছিল। প্রথমতঃ, এই মহাবিদ্রোহ ছিল একান্তভাবেই পরিকল্পনাহীন। বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্রে একই সময়ে একই কর্মপন্থা অনুসৃত হইলে ইংরেজগণ যথার্থই বিপদে পড়িতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সংহতির অভাবে বিদ্রোহ বিচ্ছিন্ন অভ্যুত্থানে পরিণত হইল। দ্বিতীয়তঃ, নেতৃবর্গের মধ্যে আদর্শ ও স্বার্থের সংঘাতে এই আন্দোলন কোনদিনই ঐক্যবদ্ধভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। যখন বাহাদুর শাহ স্বপ্ন দেখিতেন মোগল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, তখন নানাসাহেব মারাঠা শক্তি পুনরুদ্ধার করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ, উত্তর প্রদেশের এক ব্যাপক অঞ্চলে এবং বাংলা ও বিহারের কিছু কিছু স্থানে বিদ্রোহ প্রসারিত হইলেও, এই আন্দোলন সর্বভারতীয় ব্যাপ্তি লাভ করিতে পারে নাই। চতুর্থতঃ, রানী লক্ষ্মীবাঈ, নানাসাহেব, তাঁতীয়া টোপী প্রমুখ বিদ্রোহের নেতাগণ ব্যক্তিগত দক্ষতা প্রদর্শন করিলেও, সমগ্রভাবে বিদ্রোহ পরিচালনা করিবার মত সাংগঠনিক নেতৃত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। এমনকি, বাহাদুর শাহরও নেতৃত্বসুলভ ব্যক্তিত্বের অভাব ছিল। পঞ্চমতঃ, তদানীন্তন দেশীয় রাজ্যগুলির প্রায় সবকয়টিই ইংরেজ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের প্রভাবশালী জমিদারগণও ইংরেজদের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিলেন। ষষ্ঠতঃ, এই আন্দোলনের পশ্চাতে

সংহতির অভাব

দুই-একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ব্যতীত, সাধারণত মধ্যশ্রেণীর সমর্থন ছিল না। সিপাহীদের লুণ্ঠতরাজ ও অত্যাচার এবং আপন শ্রেণীগত স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যশ্রেণী এই আন্দোলনের সামিল হন নাই। সপ্তমতঃ, প্রতিপক্ষ হিসাবে ইংরেজগণ ছিলেন সংগঠিত ও আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত। হ্যাভলক, নীল, আউটরাম, হিউরোজ প্রভৃতি সেনাপতিগণের দক্ষতা ইংরেজদের জয়ের পথ তৈয়ারি করিয়া দিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, রেল ও তার বিভাগের সাহায্যে তাঁহারা দ্রুততার সহিত সংবাদ আদান-প্রদান ও যোগাযোগ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফলে, একদিকে যেমন, পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতিরক্ষা সহজতর হইয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি বিদ্রোহীদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিয়া আঘাত হানা সম্ভব হইয়াছিল।

মধ্যশ্রেণীর সমর্থনের অভাব

উপরিউক্ত কারণগুলির ফলে, ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণা ও বিক্ষোভ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল।

● **মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি :** ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ জাতীয় আন্দোলন অথবা সীমাবদ্ধ বিক্ষোভ এই প্রশ্ন সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী মত রহিয়াছে। ইংরেজ ঐতিহাসিক নর্টন, ডাফ প্রমুখের মতে, প্রথমে সিপাহীদের মধ্যে শুরু হইলেও, কালক্রমে ইহা জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইয়াছিল। জেমস আউটরাম মনে করেন, "ইহা হইল একটি সুপরিকল্পিত ইংরেজ-বিরোধী ষড়যন্ত্র এবং ইহার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারত হইতে ইংরেজ বিতাড়ন।" বিখ্যাত ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিবিদ ডিসরেলী ইহাকে 'জাতীয় বিক্ষোভ' আখ্যা দিয়াছেন। অপরদিকে, ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জন কে রবার্টস, স্যার জন লরেন্স এবং ভারতীয় নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ এবং জনৈক বাঙ্গালী সামরিক কর্মচারী দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মতে, ইহা ছিল পরিপূর্ণভাবে 'মিউটিনি' অর্থাৎ সিপাহীদের বিদ্রোহ। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ পার্সিভ্যাল স্পীয়র ইহাকে "ব্রিটিশ শাসনের নবসৃষ্ট নূতন ভারতের বিরুদ্ধে পুরাতন সংরক্ষণশীল ভারতের বাধাদানের শেষ প্রচেষ্টা" রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আধুনিক ভারতীয় ঐতিহাসিকগণও ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের চরিত্র বিশ্লেষণে দ্বিধাবিভক্ত। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁহার "The Sepoy Mutiny and the Revot of 1857" গ্রন্থে মন্তব্য করিয়াছেন, এই বিদ্রোহের কোন একটি বিশেষ রূপ ছিল না, ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ইহা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছিল। কোথাও কোথাও কৃষকগণ সক্রিয়ভাবে বিদ্রোহের সহিত যুক্ত থাকিলেও, এই আন্দোলন ছিল মূলতঃ সিপাহী বিদ্রোহ। আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিদের সামাজিক অবস্থান এবং আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে উঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করিয়া তিনি আবার ইহাকে প্রগতি-বিরোধী সামন্ত বিদ্রোহ আখ্যা দিয়াছেন। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনও তাঁহার 'Eighteen Fifty Seven' গ্রন্থে প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন, "... অযোধ্যা ও সাহাবাদ ভিন্ন অন্যত্র বিদ্রোহীদের প্রতি জনসাধারণের সমর্থন এমন কিছু ছিল না, যাহার দ্বারা ইহাকে জাতীয় সংগ্রামের পর্যায়ে উন্নীত করা যাইতে পারে।" ডঃ সেনও মনে করেন, বিদ্রোহের নেতাদের উদ্দেশ্য ছিল 'প্রতিবিপ্লব ঘটান'। অন্যদিকে, বিখ্যাত স্বাধীনতা-সংগ্রামী বীর সাভারকর ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় সংগ্রাম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ডঃ তারাচাঁদও ইহাকে সিপাহী বিদ্রোহ আখ্যা দেওয়া অসঙ্গত মনে করেন। কোন কোন আধুনিক লেখক (যেমন 'ভারতীয় মহাবিদ্রোহ' গ্রন্থের লেখক প্রমোদ সেনগুপ্ত) বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের আলোকে অভ্যুত্থানের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই বিদ্রোহ ছিল জনসাধাণের জাতীয় বিদ্রোহ।

বীর সাভারকারের অভিমত

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এই বিদ্রোহের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, শুধুমাত্র সেনাবাহিনীভুক্ত মানুষদের নয়, এই আন্দোলন ছিল জনসাধারণের এক ব্যাপক অংশের গভীর

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। সমাজের প্রায় সকল শ্রেণীই—সম্রাট ও নবাব, রাজা ও জমিদার, সৈনিক ও কৃষক—এই আন্দোলনের শরিক ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে—পশ্চিম বিহার হইতে পাঞ্জাবের প্রান্ত পর্যন্ত এই অভ্যুত্থান পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। বিদ্রোহের সর্বোচ্চ পর্বে, একলক্ষ বর্গমাইল এলাকার তিন কোটি আশী লক্ষ মানুষ বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে আসিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল বেসামরিক জনগণ। এই আন্দোলনের অপর বৈশিষ্ট্য হইল হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যকার ঐক্যবোধ। মৌলানা আবুলকালাম আজাদ বলিয়াছেন, "হিন্দু-মুসলমানের এই ঐক্য ও সংহতি বিস্ময়কর'। অবশ্য একথা সত্য, আধুনিক কালের ধারণা অনুযায়ী কোন সার্বিক জাতীয় চেতনা বোধ তখনও ভারতবর্ষে গড়িয়া উঠে নাই। বলা বাহুল্য, এইরূপ চেতনার বিকাশের অনুরূপ বাস্তব পরিস্থিতিও তখন ছিল না। ফলে, বিদ্রোহের প্রকাশে সামগ্রিকভাবে স্বদেশের প্রতি আনুগত্যের পরিবর্তে বিদ্রোহীদের আনুগত্য ছিল ব্যক্তি বিশেষের প্রতি। এই 'ব্যক্তিবিশেষ' বলিতে সামন্ত নেতৃবর্গকেই বুঝায়। কিন্তু কালক্রমে বিদ্রোহীদের মধ্যে সাধারণ ঐক্যবোধ গড়িয়া উঠে এবং বিদ্রোহও সামন্ত শ্রেণীর হাত হইতে সাধারণ মানুষের হাতে চলিয়া আসিতে থাকে। বিদ্রোহের সমকালীন রণধ্বনি ও শ্লোগান, ইস্তাহার ও ঘোষণা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য ছিল, বিদেশী শাসনের অবসান এবং জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, পৃথিবীর কোন দেশের কোন আন্দোলনেই সমাজের জনসমষ্টির সকল অংশই যুক্ত থাকেন না। অন্যদিকে, ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মানুষ শ্রেণীগত ভাবে এই বিদ্রোহে সামিল না হইলেও, ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন বুদ্ধিজীবী এই অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানাইয়াছিলেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক, সাংবাদিক-শ্রেষ্ঠ হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহাকে উনিশ শতকের "বিরাট বিপ্লব (Great Revolution) বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয়, তৎকালীন ভারতবর্ষে যাহারা ছিলেন সর্বাপেক্ষা সংগঠিত শক্তি—সেই ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর সিপাহীরাই ঐতিহাসিকভাবে ছিলেন আন্দোলনের পুরোভাগে। অবশ্য, আন্দোলনের প্রধান চালিকা শক্তি ছিলেন ভারতীয় জনগণ, বিশেষ করিয়া কৃষককুল। সিপাহীদের বলা যাইতে পারে "যোদ্ধার পোশাক-পরা চাষীর দল"। সুতরাং এই বিদ্রোহ যথার্থ গণ-অভ্যুত্থানের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রাম আখ্যা দিবার ক্ষেত্রে মতদ্বৈধতা থাকিলেও, এই বিদ্রোহের মধ্যে "জাতীয় চেতনার অস্পষ্ট ভ্রূণ মূর্তি" দেখিতে পাওয়া যায়।

নেতৃবৃন্দের আদর্শ

বিদ্রোহের বিস্তৃতি

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অভিমত

অনুশীলনী

প্রথম অধ্যায়

১। ভারতবর্ষের প্রধান ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করিয়া উহাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব পরিমাপ কর।
২। ভারতের ইতিহাসে হিমালয়ের প্রভাব আলোচনা কর।
৩। বিন্ধ্য পর্বত ভারত-ইতিহাসের গতিকে কি ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে?
৪। 'আর্যাবর্ত' বলিতে কোন্ অঞ্চলটি বুঝায়? ভারতের ইতিহাসে অঞ্চলটির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।
৫। ভারতের জাতিগত, ভাষাগত ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।
৬। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূলগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কর।
৭। "ভারতবর্ষের চিরদিন একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা" (রবীন্দ্রনাথ)। উক্তিটির তাৎপর্য আলোচনা কর।
৮। ইতিহাসের উপাদান কাহাকে বলে? প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার যে কোন একটি উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা কর।
৯। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান কাহাকে বলে? প্রাচীন ভারতের ক্ষেত্রে এই উপাদানের গুরুত্ব বিচার কর।
১০। ইতিহাসের সূত্র হিসাবে (ক) সাহিত্য, (খ) মুদ্রা, (গ) শিলালিপি এবং (ঘ) বৈদেশিক বিবরণের গুরুত্বের মূল্যায়ন কর।
১১। **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ**—(ক) সুদূর দক্ষিণের উপদ্বীপ অঞ্চল, (খ) ভারতের জাতি গোষ্ঠীর উপাদান, (গ) অর্থশাস্ত্র ও রাজতরঙ্গিণী, (ঘ) এলাহাবাদ প্রশস্তি ও আইহোল প্রশস্তি।
১২। **এক কথায় উত্তর দাও**—(ক) ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুইটি গিরিপথের নাম লিখ;
(খ) ভারতের কোন্ কোন্ দিক সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত?
(গ) আর্যাবর্তের দুইটি ঐতিহাসিক রণক্ষেত্রের নাম উল্লেখ কর।
(ঘ) কোন্ ভাষাকে উত্তর ভারতীয় ভাষাসমূহের 'জননী' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে?
(ঙ) ভারতের প্রধান প্রধান মুখ্য ভাষার সংখ্যা কয়টি?
(চ) ভারতের অভ্যন্তরে প্রাচীনতম শিলালিপি কোন্ সম্রাটের আমলে লিখিত হইয়াছিল?
(ছ) ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রাচীনতম শিলালিপি কোনটি?
(জ) 'হাতিগুম্ফা', 'গিরণার' এবং 'নাসিক' লিপি হইতে যথাক্রমে কোন্ কোন্ শাসকের রাজত্বকাল সম্পর্কে জানা যায়?
(ঝ) বিহ্লন কৃত রচনাটির নাম কি?
(ঞ) 'রামচরিতের' রচয়িতা কে?
(ট) মেগাস্থিনীসের বিবরণীটির নাম কি?
(ঠ) গুপ্ত যুগে কোন্ চীনা পর্যটক ভারতের আসেন?
(ড) হর্ষবর্ধনের শাসনকালে আগত চৈনিক পরিব্রাজকের নাম কি?
(ঢ) কোন্ চৈনিক পরিব্রাজকের রচনায় প্রাচীন বাংলাদেশের উল্লেখ আছে?
(ণ) খালিমপুর তাম্রশাসনে কোন্ শাসকের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে?

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। প্রাচীন প্রস্তর যুগ হইতে ধাতু যুগে উত্তরণের ইতিবৃত্ত লেখ।
২। সিন্ধু সভ্যতার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। ভারতের ইতিহাসে ইহার গুরুত্ব নির্ণয় কর।
৩। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা লিখ।
৪। সিন্ধু সভ্যতার সহিত বৈদিক সভ্যতার তুলনা কর।
৫। সিন্ধু সভ্যতার সহিত সমকালীন সভ্যতাগুলির কিরূপ যোগাযোগ ছিল ?
৬। **সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখ**—(ক) সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা কাহারা ? (খ) কি কি কারণে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয় ?
৭। **এক কথায় উত্তর দাও**—(ক) সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কারক কে ছিলেন ?
(খ) কত খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কৃত হইয়াছিল ?
(গ) সিন্ধু সভ্যতার উদ্ভব কাল কি ?
(ঘ) সিন্ধু সভ্যতার চরিত্র কি ?
(ঙ) সিন্ধু সভ্যতার ঐরূপ নামকরণ করা হইয়াছিল কেন ?

তৃতীয় অধ্যায়

১। আর্যদের বাসভূমি, ভারতবর্ষে তাঁহাদের প্রথম বসতি এবং ক্রমবিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা কর।
২। বৈদিক সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ কর।
৩। প্রাচীন বৈদিক যুগের সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং ধর্মজীবনের পরিচয় দাও।
৪। পরবর্তী বৈদিক যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৫। বৈদিক সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।
৬। আর্যগণ কিভাবে ভারতে রাজনৈতিক ঐক্যবোধের পরিচয় দিয়াছেন ? বৈদিক যুগে রাজার ক্ষমতা কিরূপ ছিল ?
৭। **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ**—(ক) বৈদিক সভ্যতা নাম হয় কেন ? (খ) 'শ্রুতি' বলিতে কি বুঝায় ? (গ) বৈদিক সাহিত্য, (ঘ) বেদাঙ্গ ও যড়দর্শন কি ? (ঙ) সূত্র-সাহিত্য, (চ) বৈদিক সমাজে নারীর স্থান, (ছ) চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রম, (জ) সভা ও সমিতি কাহাকে বলে ? (ঝ) ভারতীয় সভ্যতায় আর্যদের অবদান, (ঞ) লৌহ যুগ।
৮। **এক কথায় উত্তর দাও**—(ক) 'আর্য' কথাটির অর্থ কি ?
(খ) আর্যদের প্রাচীনতম গ্রন্থটির নাম কি ?
(গ) বৈদিক সভ্যতার উদ্ভব কাল কি ?
(ঘ) 'সংহিতা' কাহাকে বলে ?
(ঙ) 'ব্রাহ্মণ' ও 'আরণ্যক' বলিতে কি বুঝ ?
(চ) উপনিষদকে বেদান্ত বলা হয় কেন ?
(ছ) হিন্দু দর্শন কয় ভাগে বিভক্ত ? উহাদের নাম কি ?
(জ) বৈদিক যুগের সভ্যতার চরিত্র কি ছিল ?
(ঝ) বৈদিক যুগের আর্যগণ নূতন কি ধাতু ব্যবহার করিতেন ?
(ঞ) আনুমানিক কোন্ সময়ে ভারতে লৌহের প্রচলন শুরু হয় ?

চতুর্থ অধ্যায়

১। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভবের পটভূমিকা বিশ্লেষণ কর।
২। মহাবীরের জীবনী ও ধর্মমত আলোচনা কর।
৩। জৈন ধর্মের মূল নীতিগুলি ব্যাখ্যা কর। জৈনধর্মের বিকাশে ও প্রচারে মহাবীরের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।
৪। গৌতম বুদ্ধের জীবনী ও ধর্ম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত রচনা লিখ।
৫। বৌদ্ধধর্মের মূলনীতিসমূহ বিশ্লেষণ কর। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বুদ্ধদেবের মতবাদের প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

৬। **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ**—(ক) চতুর্যাম, (খ) ত্রিরত্ন, (গ) আর্যসত্য কি ? (ঘ) পঞ্চশীল, (ঙ) অষ্টাঙ্গিক মার্গ, (চ) ত্রিপিটক কি ? (ছ) 'নির্বাণ' বলিতে কি বুঝ ? (জ) বৌদ্ধ সঙ্গীতি কি ? (ঝ) হীনযান ও মহাযান, (ঞ) জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মে সাদৃশ্য ও পার্থক্য।

৭। **এক কথায় উত্তর দাও**—(ক) জৈন মতে কয়জন 'তীর্থংকর' ছিলেন ?
(খ) শেষ দুই জন তীর্থংকরের নাম কি ?
(গ) মহাবীরের জন্ম ও প্রয়াণ স্থান যথাক্রমে কি কি ?
(ঘ) জৈন নামের উৎপত্তি কেন হয় ?
(ঙ) শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর কাহাদের বলে ?
(চ) গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান কোথায় ?
(ছ) 'বুদ্ধ' নামকরণের অর্থ কী ?
(জ) 'বোধিত্ব' লাভ কোথায় ঘটিয়াছিল ?
(ঝ) বুদ্ধদেব প্রথম কোথায় তাঁহার ধর্মমত প্রচার করেন ?
(ঞ) বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ কোথায় ঘটে ?

পঞ্চম অধ্যায়

১। বিম্বিসার হইতে মহাপদ্ম নন্দের শাসনকাল পর্যন্ত মগধ সাম্রাজ্যের বিস্তার সংক্ষেপে আলোচনা কর।
২। সাম্রাজ্য স্থাপনে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কৃতিত্ব বিচার কর।
৩। মৌর্যবংশের উৎপত্তি এবং কলিঙ্গ যুদ্ধ পর্যন্ত মৌর্য সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৪। 'ধর্ম্ম' সম্বন্ধে অশোকের ধারণা ব্যাখ্যা কর। 'ধর্ম্ম' প্রচারে তিনি যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৫। ইতিহাসে অশোকের স্থান নির্ণয় কর।
৬। আলেকজান্ডারের ভারত-আক্রমণের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লিখ।
৭। আলেকজান্ডারের ভারত-অভিযানের ফলাফল বিশ্লেষণ কর।
৮। ব্যাকট্রীয় গ্রীক আক্রমণ, শক (সিরীয়) আধিপত্য, পার্থিয়ান বা পহ্লব অনুপ্রবেশ এবং হূণ আক্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।
৯। মৌর্য যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা কর।
১০। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থায় বিদেশী জাতিসমূহের প্রভাব ব্যাখ্যা কর।
১১। সাম্রাজ্য সংগঠক ও শাসক হিসাবে কণিষ্কের পরিচয় দাও। বৌদ্ধধর্ম প্রচারে তাঁহার ভূমিকা কি ?
১২। ভারতের ইতিহাসে কুষাণ শাসনের গুরুত্ব আলোচনা কর।
১৩। ভারতীয় সংস্কৃতিতে কুষাণদের অবদানের বিবরণ দাও।
১৪। সাতবাহন বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা কর।
১৫। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত হইতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পর্যন্ত সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
১৬। সাম্রাজ্য-স্রষ্টা হিসাবে সমুদ্রগুপ্তের কৃতিত্ব আলোচনা কর।
১৭। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা কর।
১৮। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে কেন 'শকারি' বলা হয় ? শিল্প ও সাহিত্যে তাঁহার অবদান আলোচনা কর।
১৯। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি নির্দেশ কর।
২০। গুপ্ত যুগকে 'সুবর্ণ যুগ' বলা হয় কেন উদাহরণ সহ আলোচনা কর।
২১। "গুপ্ত যুগ সংস্কৃত সাহিত্যের ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনর্বিকাশের যুগ নয়, পূর্ণ বিকাশের যুগ"—উক্তিটির তাৎপর্য আলোচনা কর।
২২। গুপ্ত যুগের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
২৩। গুপ্ত যুগের সাহিত্য ও শিল্পকলার বিকাশের ইতিহাস লিখ।

২৪। **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ**—(ক) ষোড়শ মহাজনপদ, (খ) মহাপদ্মনন্দ, (গ) সেলুকশ্, (ঘ) মেগাস্থিনীসের বিবরণী, (ঙ) অশোকের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, (চ) কলিঙ্গ যুদ্ধের গুরুত্ব, (ছ) অশোকের শিলালিপি, (জ) মৌর্য শিল্পকলা, (ঝ) হিদাসপীসের যুদ্ধ, (ঞ) ভারতে ইন্দো-গ্রীক অভিযান, (ট) মিনান্ডার, (ঠ) হেলিওডোরাস (ড) গন্ডোফার্নিস, (ঢ) রুদ্রদামন, (ণ) কুষাণ জাতির উৎপত্তি, (ত) গান্ধার শিল্প, (থ) হূণ আক্রমণ, (দ) স্কন্দগুপ্ত, (ধ) ফা-হিয়েনের বিবরণী, (ন) গুপ্তযুগের বিজ্ঞান চর্চা, (প) গুপ্ত শাসনব্যবস্থা।

২৫। **এক কথায় উত্তর দাও**—(ক) খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে উত্তর ভারতে ষোলটি কোন্ কোন্ রাজ্য ছিল ?

(খ) মগধে কোন্ কোন্ রাজবংশ রাজত্ব করেন ?

(গ) বিম্বিসার কোন্ রাজ বংশজাত ছিলেন ?

(ঘ) পাটলীপুত্র নগরীর প্রতিষ্ঠাতা কে ?

(ঙ) অজাতশত্রুর রাজধানী কোথায় ছিল ?

(চ) নন্দ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজার নাম কি ?

(ছ) নন্দ বংশের শেষতম রাজা কে ছিলেন ?

(জ) নন্দ বংশকে কে উচ্ছেদ করেন ?

(ঝ) পাটলীপুত্রের বর্তমান নাম কি ?

(ঞ) চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালের আনুমানিক সময় কি ?

(ট) সেলুকস্ কে ছিলেন ?

(ঠ) মেগাস্থিনীস্ কে ছিলেন ?

(ড) কাহার রাজত্বকালে মেগাস্থিনীস ভারতে আসেন ?

(ঢ) কলিঙ্গ যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল ?

(ণ) ধর্মমহামাত্র কাহাকে বলে ?

(ত) আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ কত খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল ?

(থ) হিদাসপীস বা ঝিলমের যুদ্ধ কাহাদের মধ্যে সংঘটিত হয় ?

(দ) আলেকজান্ডার প্রতিষ্ঠিত একটি শহরের নাম লিখ।

(ধ) মিলিন্দ পন্‌হো কি ?

(ন) 'ক্ষত্রপ' বলিতে কি বুঝ ?

(প) কুষাণগণ কোন্ জাতিভুক্ত ?

(ফ) কুষাণ বংশের প্রথম দুইজন রাজার নাম লিখ।

(ব) শকাব্দ কত খ্রীষ্টাব্দে কে প্রচলন করেন ?

(ভ) দুইজন বিখ্যাত হূণ আক্রমণকারীর নাম কর।

(ম) গুপ্ত বংশের আদি বাসস্থান কোথায় ?

(য) গুপ্ত বংশের আদি রাজা কে ছিলেন ?

(র) গুপ্ত বংশের কোন্ শাসক প্রথম 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন ?

(ল) গুপ্ত সাম্রাজ্য কত খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয় ?

(ব) ডঃ স্মিথ কোন্ ভারতীয় সম্রাটকে 'ভারতের নেপোলিয়ন' আখ্যা দিয়াছেন ?

(শ) সমুদ্রগুপ্ত কি উপাধি গ্রহণ করেন ?

(ষ) নবরত্ন সভা কাহার সময় ছিল ?

(স) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কি উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন ?

(হ) গুপ্তযুগের চৈনিক পরিব্রাজকের নাম কি ?

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। বাংলার প্রথম সার্বভৌম নরপতি কাহাকে বলা হয় ? তাঁহার চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর।
২। গৌড় রাজ্যের উত্থানে শশাংকর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।
৩। সাম্রাজ্য সংগঠক ও শাসক হিসাবে হর্ষবর্ধনের কৃতিত্ব আলোচনা কর।
৪। সপ্তম শতাব্দীতে গৌড়-থানেশ্বর সংগ্রামের বিবরণ দাও।
৫। পাল বংশের উদ্ভব কিভাবে ঘটিয়াছিল ? পাল বংশের কৃতিত্ব আলোচনা কর।
৬। শাসক ও সম্রাট হিসাবে ধর্মপালের পরিচয় দাও।
৭। ধর্মপাল ও দেবপালের নেতৃত্বে বাংলার ক্ষমতা বিকাশের বিবরণ লিখ।
৮। পাল-রাষ্ট্রকূট-প্রতিহারদের মধ্যে ত্রিশক্তি সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৯। বাংলার ইতিহাসে সেন বংশের কৃতিত্ব আলোচনা কর।
১০। চালুক্য বংশের রাজনৈতিক ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
১১। রাষ্ট্রকূট শাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ।
১২। কাঞ্চীর পল্লব বংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। দক্ষিণ-ভারতে প্রভুত্ব স্থাপনের প্রশ্নে পল্লব ও চালুক্যদের সংগ্রাম সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
১৩। দক্ষিণ-ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পল্লবদের অবদান পরিমাপ কর।
১৪। চোল বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ।
১৫। **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ**—(ক) যশোধর্মন, (খ) হিউয়েন সাঙের বিবরণী, (গ) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, (ঘ) মাৎস্যন্যায়, (ঙ) মহীপাল, (চ) কৈবর্ত-বিদ্রোহ, (ছ) বল্লাল সেন, (জ) লক্ষ্মণ সেন, (ঝ) দ্বিতীয় পুলকেশী, (ঞ) তৃতীয় গোবিন্দ, (ট) তৃতীয় কৃষ্ণ, (ঠ) প্রথম নরসিংহ বর্মণ, (ড) প্রথম রাজরাজা, (ঢ) প্রথম রাজেন্দ্র, (ণ) চোলগণের সামুদ্রিক ক্রিয়াকলাপ।

১৬। **এক কথায় উত্তর দাও**—(ক) শশাংক কোন্ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন ?
(খ) শশাংকের রাজধানীর নাম কি ছিল ?
(গ) হর্ষবর্ধন কোন্ রাজবংশভুক্ত ?
(ঘ) কত খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন কনৌজের সিংহাসনে আরোহণ করেন ?
(ঙ) কোন্ খ্রীষ্টাব্দ হইতে 'হর্ষাব্দের' প্রচলন হয় ?
(চ) হর্ষবর্ধনের সভাকবির নাম কি ?
(ছ) হর্ষবর্ধনের শাসনকালে কোন্ চৈনিক পরিব্রাজক ভারতে আসেন ?
(জ) কাদম্বরী কাহার রচনা ?
(ঝ) দক্ষিণ-ভারতে হর্ষবর্ধনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কে ছিলেন ?
(ঞ) বাংলার মাৎস্যন্যায় কে দূর করেন ?
(ট) ধর্মপালের দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম কর।
(ঠ) বিক্রমশীলা বিহারের প্রতিষ্ঠাতা কে ?
(ড) বাল পুত্রদেব কে ?
(ঢ) কোন্ পর্যটকের লেখায় দেবপালের সামরিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় ?
(ণ) সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ?
(ত) কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তক কে ?
(থ) লক্ষ্মণ সেনের আমলে কোন্ তুর্কী বীর বাংলাদেশ আক্রমণ করেন ?
(দ) চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক কে ?
(ধ) হর্ষবর্ধনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পুলকেশীর সাফল্য কোন্ শিলালিপিতে উৎকর্ণ আছে ?
(ম) রাষ্ট্রকূট বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিপতি কে ?
(প) কোন্ চোল রাজা 'গঙ্গাইকোণ্ড' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন ?

(ফ) কোন্ চোল রাজা পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন ?
(ব) পল্লবদের রাজধানী কোথায় ছিল ?
(ভ) পল্লবদের শ্রেষ্ঠ রাজার নাম কি ?
(ম) চোলদের রাজধানী কোথায় ছিল ?

সপ্তম অধ্যায়

১। পাল ও সেন যুগের বাংলার শিল্পকলা ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
২। পল্লবদের সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
৩। রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের শাসন প্রণালী বর্ণনা কর।
৪। চোলদের স্থানীয় শাসনব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৫। প্রাচীন ভারতের ধর্মজীবন ও চিন্তার ক্ষেত্রে দক্ষিণ-ভারতের অবদানের মূল্যায়ন কর।
৬। "দক্ষিণ ভারত প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের পীঠস্থান রূপে গণ্য হইতে পারে" উক্তিটি আলোচনা কর।
৭। পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ।
৮। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যগুলির সহিত প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের বিশদ বিবরণ লিখ।
৯। বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রসারে শৈলেন্দ্র রাজবংশের ভূমিকা নির্ণয় কর।
১০। **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ**—(ক) অতীশ দীপঙ্কর, (খ) শীলভদ্র, (গ) সন্ধ্যাকর নন্দী, (ঘ) পাল শিল্প, (ঙ) জয়দেব, (চ) চর্যাপদ, (ছ) পল্লব শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য, (জ) রাষ্ট্রকূট স্থাপত্য, (ঝ) চোল শিল্পের বৈশিষ্ট্য।
১১। **এক কথায় উত্তর দাও**—(ক) তিব্বতে কে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন ?
(খ) পাল আমলের দুইটি মহাবিহারের নাম লিখ।
(গ) কোন্ বাঙালী পবিত্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন ?
(ঘ) পালযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থটির নাম কি ? উহা কাহার রচনা ?
(ঙ) পালযুগের দুইজন বিখ্যাত শিল্পীর নাম লিখ।
(চ) চক্রপাণি দত্ত কে ছিলেন ?
(ছ) বল্লাল সেন রচিত গ্রন্থ দুইটির নাম কি ?
(জ) সেনযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবির নাম কি ? তাঁহার রচিত কাব্যটির নাম কি ?
(ঝ) কবি জয়দেবের জন্মস্থান কোথায় ?
(ঞ) 'পবন দূতম' কাহার এবং কোন্ যুগের রচনা ?
(ট) 'চর্যাপদ' কোন যুগে রচিত হয় ?
(ঠ) 'দায়ভাগ' গ্রন্থ কি বিষয়ে লিখিত এবং কে ইহার রচনা করেন ?
(ড) 'মত্তবিলাসপ্রহসনম্' কে রচনা করেন ?
(ঢ) মহাবলীপুরমের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প কোন্ রাজবংশের কীর্তি ?
(ণ) তাঞ্জোরের একটি বিখ্যাত চোল মন্দিরের নাম কর।
(ত) আইহোলের বিষ্ণুমন্দির কোন্ রাজবংশের কীর্তি ?
(থ) ইলোরার বিখ্যাত শিবমন্দিরটি কে নির্মাণ করেন ?
(দ) রাজ রাজেশ্বরের মন্দির কে নির্মাণ করেন ?
(ধ) আঙ্কোরভাট কি, কোথায় এবং কাহার দ্বারা নির্মিত ?
(ন) বরবুদুর স্তূপ কোন্ রাজবংশের কীর্তি ?

অষ্টম অধ্যায় ঃ প্রথম পর্ব—সুলতানী যুগ

১। মধ্যযুগকে 'মুসলিম যুগ' ব্যাখ্যা দেওয়া কতখানি অসঙ্গত ?
২। মধ্যযুগের (সুলতানী আমলেব) ভারতের ইতিহাস রচনার মূল উপাদান কি কি ?
৩। আরবদের সিন্ধু অভিযানের বর্ণনা দাও।
৪। ভারতে আরব শাসনের ফলাফল পরিমাপ কর।
৫। সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৬। মহম্মদ ঘোরীর ভারত-অভিযান সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৭। সুলতান মামুদ ও মহম্মদ ঘুরীর কৃতিত্বের তুলনামূলক আলোচনা কর।
৮। অলবেরুণী কে ছিলেন ? তাঁহার রচনা হইতে ভারতবর্ষের কি পরিচয় পাওয়া যায় ?
৯। কুতুবউদ্দিন ও ইলতুৎমিসের রাজত্বকালের বিবরণ দাও।
১০। সুলতানী শাসন অক্ষুণ্ণ রাখিতে বলবন কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন ? তাঁহার প্রচেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছিল ?
১১। তথাকথিত 'দাস' বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান কে ? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।
১২। আলাউদ্দিন খলজীর রাজ্যবিস্তার বর্ণনা কর।
১৩। শাসক হিসাবে আলাউদ্দিনের কৃতিত্ব আলোচনা কর।
১৪। আলাউদ্দিন খলজীর শাসনব্যবস্থার মৌলিকতা বিশ্লেষণ কর।
১৫। সম্রাটের সার্বভৌম ক্ষমতার বিকাশ সাধনে গিয়াসুদ্দিন বলবন এবং আলাউদ্দিন খলজীর ভূমিকা নির্ণয় কর।
১৬। মহম্মদ বিন তুঘলকের নীতি ও পরিকল্পনাসমূহের ব্যাখ্যা কর। তাঁহার ব্যর্থতার কারণ এবং উহার ফলাফলের মূল্যায়ন কর।
১৭। মহম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্র ও কৃতিত্বের মূল্যায়ন কর।
১৮। ফিরোজ তুঘলকের চরিত্র ও কার্যক্রমের আলোচনা কর।
১৯। সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের জন্য মহম্মদ বিন তুঘলক ও ফিরোজ তুঘলকের দায়িত্ব পরিমাপ কর।
২০। সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের কারণ বিশ্লেষণ কর।
২১। তৈমুরের ভারত অভিযান ও উহার ফলাফল বর্ণনা কর।
২২। বাংলার ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠা কিভাবে হইয়াছিল ? এই বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতানের কৃতিত্ব আলোচনা কর।
২৩। বাংলার হুসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠা কিভাবে হইয়াছিল ? এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান কাহাকে বলা হয় ? তাঁহার রাজত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
২৪। ইলিয়াস শাহী ও হুসেন শাহী বংশের কৃতিত্বের মূল্যায়ন কর।
২৫। বাহমনী রাজ্যের উত্থান ও পতনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা কর।
২৬। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক সাফল্য বিশ্লেষণ কর।
২৭। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির চিত্র অঙ্কন কর।
২৮। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
২৯। বাহমনী ও বিজয়নগর সাম্রাজ্যের মধ্যে সংঘাতের বিবরণ দাও।
৩০। **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ**—(ক) সুলতান মামুদের ভারত অভিযানের স্বরূপ, (খ) তরাইনের যুদ্ধ, (গ) বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে জয়পাল, আনন্দপাল ও পৃথ্বীরাজ চৌহানের ভূমিকা, (ঘ) ত্রয়োদশ শতকের দিল্লীর সুলতানদের 'দাসবংশ' বলিয়া অভিহিত করিবার যৌক্তিকতা বিচার কর, (ঙ) সুলতানা রাজিয়া, (চ) চল্লিশের চক্র, (ছ) মোঙ্গল আক্রমণ, (জ) বলবনের নরপতিত্বের আদর্শ, (ঝ) 'নব মুসলমান', (ঞ) মালিক কাফুর, (ট) আলাউদ্দিন খলজীর দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, (ঠ) মহম্মদ বিন তুঘলককে 'উন্মাদ রাজা' বলা হয় কেন ? (ড) ইবন বতুতা, (ঢ) ফিরোজ তুঘলকের ধর্মনীতি, (ণ) তৈমুরলঙের ভারত আক্রমণ, (ত) সৈয়দ বংশ, (থ) লোদী বংশ, (দ) বখতিয়ার খলজীর নদীয়া আক্রমণ, (ধ) রাজা গণেশ, (ন) আদিনা মসজিদ, (প) হুসেন শাহী আমলে বাংলা সাহিত্য, (ফ) হুসেন

শাহর কয়েকজন হিন্দু কর্মচারীদের নাম লিখ, (ব) বাংলায় হুসেন শাহী বংশের কৃতিত্ব কি ? (ভ) বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, (ম) বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্যের বিরোধের মূল কারণ কি কি ছিল ? (য) মামুদ গাওয়ান, (র) বাহমনী রাজ্য কয় ভাগে বিভক্ত হয় ? (ল) বিজয়নগর রাজ্যের উদ্ভব, (ব) তালিকোটার যুদ্ধ, (শ) বিজয়নগর রাজ্যের সাহিত্য, (ষ) বিজয়নগর সাম্রাজ্যের স্থাপত্য শিল্প কীর্তি, (স) বিজয়নগর রাজ্যের গুরুত্ব, (হ) বিজয়নগর রাজ্যে উপস্থিত বিদেশী পর্যটনকারী।

৩১। **এক কথায় উত্তর দাও ঃ**—(ক) আলবেরুণীর ঐতিহাসিক রচনার নাম কি ?

(খ) তবকৎ-ই-নাসিরা কাহার রচনা ?

(গ) জিয়াউদ্দিন বরণীর রচনার নাম কি ?

(ঘ) তুঘলক বংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে কোন্ পুস্তকে ?

(ঙ) ইবন বতুতার পুস্তকের নাম কি ?

(চ) আরবদের সিন্ধু বিজয় কত খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল ?

(ছ) সিন্ধু অভিযানের নায়ক কে ছিলেন ?

(জ) সুলতান মামুদ কতবার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন ?

(ঝ) সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠিত হয় কত সালে ?

(ঞ) তরাইনের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ যথাক্রমে কত খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল ?

(ট) তরাইনের যুদ্ধ কাহাদের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল ?

(ঠ) পৃথ্বিরাজ চৌহানের প্রতিদ্বন্দী কনৌজ অধিপতির নাম কি ?

(ড) ভারতে তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে কত খ্রীষ্টাব্দে, প্রতিষ্ঠাতা কে ?

(ঢ) বাংলাদেশে তুর্কী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন কে ?

(ণ) ইলতুৎমিস কাহাকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন ?

(ত) বলবনের রাজত্বের সময়কাল কি ?

(থ) কোন্ সুলতান সর্বপ্রথম দাক্ষিণাত্য জয় করেন ?

(দ) মালিক কাফুর কে ছিলেন ?

(ধ) কোন্ সুলতান বাজার দর নিয়ন্ত্রণ করেন ?

(ন) কোন্ সুলতান দিল্লী হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন ?

(প) কোন্ সুলতান তামার নোট প্রবর্তনের চেষ্টা করেন ?

(ফ) কোন্ সুলতানকে 'সুলতানী যুগের আকবর' বলা হয় ?

(ব) তৈমুর লঙ কত সালে ভারত আক্রমণ করেন ?

(ভ) ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

(ম) হুসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

(য) কোন্ বিদেশী পর্যটকের রচনা হইতে বাহমনী রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায় ?

(র) বিজয়নগর রাজ্যে মোট কয়টি রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন ?

(ল) বিজয়নগর রাজ্য পর্যটনকারী কয়েকজন বিদেশীর নাম লিখ।

অষ্টম অধ্যায় ঃ দ্বিতীয় পর্ব—তুর্কী-আফগান যুগে ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি

১। ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব নিরূপণ কর।

২। সুলতানী আমলে ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩। সুলতানী আমলের শিল্প ও সাহিত্যের বিবরণ লিখ।

৪। সুলতানী আমলে ভারতের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ও সমন্বয়ের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

৫। ইন্দো-পারসিক স্থাপত্য বলিতে কি বুঝায় ? সুলতানী যুগে এই স্থাপত্যের বিকাশ কি ভাবে ঘটে ?

৬। সুলতানী যুগে প্রাদেশিক সাহিত্যের বিকাশের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৭। চতুর্দশ ও একাদশ শতাব্দীর ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ।

৮। **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ**—(ক) রামানন্দ, (খ) কবীর, (গ) নানক, (ঘ) শ্রীচৈতন্য, (ঙ) ভক্তিবাদ, (চ) সুফীবাদ।
৯। **এক কথায় উত্তর দাও ঃ**—(ক) 'সর্ববিদ্যাপারঙ্গম' আখ্যা কাহাকে দেওয়া হইয়াছিল ?
(খ) কোন্ কোন্ ভাষার সমন্বয়ে উর্দু ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল ?
(গ) 'কাশ্মীরের আকবর' আখ্যা কাহাকে দেওয়া হইয়াছিল ?
(ঘ) বিজাপুরের কোন্ সুলতানকে 'জগদ্‌গুরু' আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল ?
(ঙ) বাংলার কোন্ সুলতান মহাভারতের অনুবাদ করেন ?
(চ) 'গুণরাজ খাঁ' কে ? কি জন্য তিনি এই উপাধি পাইয়াছিলেন ?
(ছ) কুতুবমিনার কাহার শিল্পকীর্তি ?
(জ) 'আলাই দরওয়াজা' কে নির্মাণ করেন ?
(ঝ) চাঁদ মিনার কোথায় অবস্থিত ?
(ঞ) মীরার ভজন কি ভাষায় রচিত ?
(ট) কবীর কোন্ ভাষায় তাঁহার দোঁহা রচনা করিয়াছিলেন ?
(ঠ) নামদেব কোন্ ভাষায় ধর্ম সাহিত্য রচনা করেন ?
(ড) বাংলায় প্রথম রামায়ণ রচনা কে করেন ?
(ঢ) শিখধর্মের পবিত্র গ্রন্থের নাম কি ?
(ণ) শ্রীচৈতন্য কত সালে জন্মগ্রহণ করেন ?
(ত) দুইজন সুফী ধর্মজ্ঞানীর নাম লিখ।

নবম অধ্যায় ঃ প্রথম পর্ব

১। মোগল ইতিহাসের সূত্র সমূহ আলোচনা কর।
২। মোগল শাসনস্থাপনে বাবরের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।
৩। হুমায়ুনের রাজত্বকালে মোগল-আফগান রাজনৈতিক সংঘর্ষের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৪। আফগান সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে শের শাহর কৃতিত্বের পরিমাপ কর।
৫। "কোন শাসক, এমন কি ব্রিটিশ সরকারও এই শাসকের (শের শাহের) ন্যায় শাসন দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই"—উক্তিটির যথার্থতা আলোচনা কর।
৬। সাম্রাজ্য সংগঠক হিসাবে আকবরের পরিচয় দাও।
৭। আকবরের রাজপুত নীতি ব্যাখ্যা কর।
৮। আকবরের ধর্মমত বিশ্লেষণ কর। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি স্থাপনে আকবরের ভূমিকা নিরূপণ কর।
৯। আকবরের কৃতিত্বের পরিমাপ কর।
১০। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজ্য বিস্তারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
১১। শাহজাহানের রাজত্বকালকে কি মোগল আমলের 'সুবর্ণ যুগ' আখ্যা দেওয়া যায় ?
১২। আওরঙ্গজেবের রাজপুত ও ধর্মনীতি আলোচনা কর। আকবরের অনুসৃত নীতির সহিত ইহার পার্থক্য কোথায় ?
১৩। আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি কি ছিল ? ইহার ফলাফল বিশ্লেষণ কর।
১৪। আওরঙ্গজেবের চরিত্র ও কৃতিত্ব আলোচনা কর।
১৫। মারাঠা জাতির জাতীয় জাগরণে শিবাজীর অবদান পরিমাপ কর।
১৬। শিবাজীর জীবনী ও ধর্মপ্রণালী আলোচনা কর। ভারতের ইতিহাসে তাঁহার স্থান নির্ণয় কর।
১৭। মারাঠা-মোগল সংঘর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
১৮। আকবরের শাসনব্যবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
১৯। আওরঙ্গজেবের শাসনব্যবস্থার সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখ।
২০। শিবাজীর শাসনব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণী দাও।

২১। **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ** (ক) পানিপথের প্রথম যুদ্ধ, (খ) রাণা সাঙ্ (গ) শেরশাহর রাজস্বনীতি, (ঘ) আকবরের শাসনকালে শিল্প সাহিত্যের অগ্রগতি, (ঙ) মনসবদারী প্রথা, (চ) দীন-ই-ইলাহী, (ছ) শাহজাহানের দাক্ষিণাত্য নীতি, (জ) শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া দ্বন্দ্ব, (ঝ) আওরঙ্গজেবের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি, (ঞ) সৎনামী বিদ্রোহ, (ট) শিবাজীর সামরিক ব্যবস্থা, (ঠ) শিবাজীর বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা।

২২। **এক কথায় উত্তর দাও**—(ক) 'হুমায়ুন নামা' কাহার লেখা ?

(খ) আইন-ই-আকবরী ও আকবরনামার রচয়িতা কে ?

(গ) বাদাউনীর রচনার নাম কি ?

(ঘ) কোন্ কোন্ মোগল সম্রাট আত্মজীবনী রচনা করিয়াছেন ?

(ঙ) মোগল যুগে আগত দুইজন ফরাসী পর্যটকের নাম লিখ।

(চ) বাবরের পৈত্রিক রাজ্য কোথায় ছিল ?

(ছ) বাবরের প্রকৃত নাম কি ?

(জ) পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে কাহাদের মধ্যে ঘটিয়াছিল ?

(ঝ) খানুয়ার যুদ্ধ কাহাদের মধ্যে কত খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল ?

(ঞ) শের শাহর পূর্ব নাম কি ছিল ?

(ট) গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড কে নির্মাণ করেন ?

(ঠ) কে প্রথম অশ্ববাহিত ডাক ব্যবস্থার প্রচলন করেন ?

(ড) পাট্টা ও কবুলিয়ত প্রথা কে প্রথমে চালু করেন ?

(ঢ) শের শাহর হিন্দু সেনাপতির নাম লিখ।

(ণ) পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কবে কাহাদের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল ?

(ত) হিমু কে ছিলেন ?

(থ) বৈরাম খাঁ কে ছিলেন ?

(দ) রাণা প্রতাপ কোন্ রাজপুত রাজ্যের অধিপতি ছিলেন ?

(ধ) হলদিঘাটের যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে কাহাদের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল ?

(ন) 'দীন-ই-ইলাহী' কে প্রবর্তন করেন ?

(প) আকবরের দুইজন প্রধান হিন্দু কর্মচারীর নাম লিখ।

(ফ) আকবর কত খ্রীষ্টাব্দে মারা যান ?

(ব) জাহাঙ্গীরের পূর্ব নাম কি ছিল ?

(ভ) নূরজাহান শব্দটির অর্থ কি ?

(ম) শাহজাহানের আদি নাম কি ?

(য) শাহজাহানের চারি পুত্রের নাম লিখ

(র) আওরঙ্গজেব কত খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন ?

(ল) দুর্গাদাস কে ছিলেন ?

(ব) পুরন্দরের সন্ধি (১৬৬৫ খ্রীঃ) কাহাদের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল ?

(শ) শিবাজীর রাজ্যাভিষেক কোন্ দুর্গে কত খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল ?

(ষ) শিবাজীর মৃত্যু কোন্ সালে ঘটিয়াছিল ?

(স) আওরঙ্গজেব কোন্ কোন্ রাজপুত রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন ?

(হ) কোন্ মোগল সম্রাট কত খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ?

নবম অধ্যায় ঃ দ্বিতীয় পর্ব

(১) মোগল শাসনাধীনে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের চিত্র অংকিত কর।

(২) শিল্প ও সাহিত্য বিকাশের ক্ষেত্রে মোগল যুগের অবদান পরিমাপ কর।

(৩) শাহজাহানের স্থাপত্য শিল্পানুরাগের পরিচয় দাও।

(৪) সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ—(ক) মোগল স্থাপত্য ও চিত্রকলা, (খ) মোগল আমলে হিন্দু স্থাপত্য শিল্প, (গ) মোগলযুগে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ।

(৫) **এক কথায় উত্তর দাও**—(ক) শের শাহের সমাধি কোন্ স্থানে আছে ?
(খ) ফতেপুর সিক্রী কে নির্মাণ করেন ?
(গ) ভারতের সর্বাপেক্ষা উচ্চ দরওয়াজা কোন্‌টি ?
(ঘ) ইবাদাৎ খানা কে নির্মাণ করেন ?
(ঘ) হুমায়ুনের সমাধি কে কোথায় নির্মাণ করেন ?
(ঙ) আকবরের সমাধি কোথায় অবস্থিত, কে নির্মাণ করেন ?
(চ) শালিমার মোগল উদ্যান কাহার সৃষ্টি ?
(ছ) তাজমহল কে কাহার স্মৃতিতে নির্মাণ করেন ?
(জ) ময়ূর সিংহাসন কে তৈয়ারি করেন ?
(ঝ) আকবরের রাজসভার বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞের নাম কি ?
(ঞ) বীরবল কে ছিলেন ?
(ট) তুলসীদাস রচিত পুস্তকটির নাম কি ?
(ঠ) দারাশিকো কোন্ হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন ?
(ড) কোন দুইজন মোগল রাজকন্যা ফারসীভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছিলেন ?
(ঢ) আওরঙ্গজেবের আমলের একজন ঐতিহাসিকের নাম লিখ।

দশম অধ্যায়

(১) মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি বিশ্লেষণ কর।
(২) মোগল শাসনের পতনের জন্য আওরঙ্গজেব কতখানি দায়ী ছিলেন ?
(৩) **টীকা লিখ** : জায়গিরদারি-প্রথার সংকট।
(৪) **এক কথায় উত্তর দাও**—(ক) নাদির শাহ কত খ্রীষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করেন ? (খ) নাদির শাহর আক্রমণ কালে মোগল সম্রাট কে ছিলেন ? (গ) আহমদ শাহ আবদালী ক'বার ভারত আক্রমণ করেন ? (ঘ) সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম কি ? (ঙ) শেষ মোগল সম্রাটের নাম লিখ।

একাদশ অধ্যায়

(১) মোগল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে হায়দ্রাবাদ ও অযোধ্যা রাজ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
(২) বাংলায় নবাবী আমলের উৎপত্তি কিভাবে হয় ? ১৭১৩ হইতে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার নবাবদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা কর।
(৩) অষ্টাদশ শতকের শিখ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস বর্ণনা কর।
(৪) গুরুগোবিন্দ সিংহের সময় পর্যন্ত শিখজাতির অভ্যুত্থানের ইতিহাস আলোচনা কর।
(৫) পেশোয়াতন্ত্রের উৎপত্তি কিভাবে হইয়াছিল ? প্রথম তিনজন পেশোয়ার নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির বিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লিখ।
(৬) তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।
(৭) **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ** :—(ক) নিজাম উল মূলক, (খ) সাদাৎ খাঁ, (গ) মুর্শিদ্‌কুলি খাঁ, (ঘ) আলীবর্দী, (ঙ) তেগবাহাদুর, (চ) গুরু গোবিন্দ সিংহ, (ছ) বালাজী বিশ্বনাথ, (জ) 'হিন্দু-পাদ-পাদশাহী', (ঝ) প্রথম বাজীরাও, (ঞ) পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ।
(৮) **এক কথায় লিখ**—(ক) নিজামশাহী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ?
(খ) অযোধ্যার প্রথম নবাবের নাম কি ?
(গ) বাংলায় স্বাধীন নবাবী শাসনের সূত্রপাত কে করেন ?
(ঘ) আলীবর্দি খাঁ কিভাবে সিংহাসন দখল করেন ? কত খ্রীষ্টাব্দে ?

(ঙ) আলীবর্দি খাঁ কত খ্রীষ্টাব্দে মারা যান ?
(চ) গুরু অর্জুন কত সংখ্যক গুরু ছিলেন ?
(ছ) শিখদের পবিত্র মন্দির কোথায় অবস্থিত ? কোন্ গুরুর আমলে উহা নির্মিত হইয়াছিল ?
(জ) গুরু তেগবাহাদুরকে হত্যার আদেশ কে দিয়াছিলেন ?
(ঝ) শিখদের শেষতম যুদ্ধে গুরু কে ছিলেন ?
(ঞ) গুরু গোবিন্দর পর কে শিখদের নেতৃত্ব দেন ?
(ট) 'পেশোয়া' শব্দটির অর্থ কি ?
(ঠ) পেশোয়াতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা কে ?
(ড) চৌথ ও সরদেশমুখী কাহাকে বলে ?
(ঢ) দ্বিতীয় পেশোয়ার নাম কি ?
(ণ) তৃতীয় পোশোয়া কে ছিলেন ?
(ত) পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে মারাঠাদের নেতা কে ছিলেন ?
(থ) তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল ?
(দ) তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ কাহাদের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল ?
(ধ) তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের সময় কে পেশোয়া ছিলেন ?
(ন) বালাজী বাজীরাওয়ের পর কে পেশোয়া হন ?

দ্বাদশ অধ্যায়

(১) ভারতবর্ষে ইউরোপীয় বণিক প্রতিষ্ঠানগুলির পথিকৃৎ হিসাবে পর্তুগীজদের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।
(২) দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দাও।
(৩) ভারতে সাম্রাজ্যস্থাপনে ও বাণিজ্য প্রসারে ফরাসীদের ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ কর।
(৪) **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ** :—(ক) ভাস্কো দা গামা, (খ) ভারতে পর্তুগীজদের উত্থান ও পতন, (গ) ভারতবর্ষে ওলন্দাজ বাণিজ্য, (ঘ) ডুপ্লে, (ঙ) অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ এবং সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ এবং ভারতবর্ষে প্রতিক্রিয়া।
(৫) **এক কথায় উত্তর দাও**—(ক) ভাস্কো দা গামা কত খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন ?
(খ) কোন্ পর্তুগীজ নেতা, কত সালে গোয়া দখল করেন ?
(গ) ভারতে ওলন্দাজদের কয়েকটি বাণিজ্য কেন্দ্রের নাম লিখ।
(ঘ) কোন্ ফরাসী নেতা কত খ্রীষ্টাব্দে পন্ডিচেরী দখল করেন ?
(ঙ) ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ?
(চ) জাহাঙ্গীরের রাজসভায় আগত ইংরেজ রাষ্ট্রদূতের নাম কি ?
(ছ) ইংরেজ বণিকরা প্রথম কোথায়, কত খ্রীষ্টাব্দে ভারতে বাণিজ্য কুঠী নির্মাণ করেন ?
(জ) ইংরেজ কোম্পানী কত খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই লাভ করেন ?
(ঝ) দক্ষিণ ভারতে ইংরেজদের প্রথম এবং পরবর্তী (ও প্রধান) বাণিজ্য কেন্দ্রের নাম যথাক্রমে কি কি ?
(ঞ) কোন্ মোগল সম্রাটের নিকট হইতে কত খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানী বিনাশুল্কে ব্যবসা করিবার অধিকার লাভ করে ?
(ট) কত খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা মহানগরীর পত্তন ঘটে ?
(ঠ) কত খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধ শুরু হয় ? কোন্ সন্ধির দ্বারা যুদ্ধের অবসান ঘটে ?
(ড) দ্বিতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধের সময় পন্ডিচেরীর শাসনকর্তা কে ছিলেন ?
(ঢ) দ্বিতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের নেতৃত্ব দানকারী তরুণ সেনাধ্যক্ষের নাম কি ?
(ণ) মহম্মদ আলী কোথাকার নবাব ছিলেন ?
(ত) ফোর্ট সেন্ট জর্জ কোথায়, কাহাদের দ্বারা স্থাপিত হয় ?
(থ) চাঁদ সাহেব কে ?
(দ) হায়দ্রাবাদ নিজামের দরবারে ফরাসী রেসিডেন্টের নাম কি ?

(ধ) ইউরোপীয় কোন্ যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় তৃতীয় ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধের অবতারণা হয় ?
(ন) বন্দীবাসের যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে কাহাদের মধ্যে ঘটে ?
(প) বন্দীবাসের যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের সেনাপতি কে ছিলেন ?
(ফ) তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধে ফরাসী সেনাধ্যক্ষের নাম কি ?
(ব) তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয় ?
(ভ) কোন্ সন্ধি দ্বারা ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের অবসান হয় ?
(ম) প্যারিসের সন্ধি কত খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয় ?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলায় কোম্পানীর বাণিজ্য বিস্তারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
২। সিরাজউদ্দৌল্লার সহিত ইংরেজ বণিকদের বিরোধের কারণগুলি ব্যাখ্যা কর।
৩। পলাশীর যুদ্ধের পটভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ওই যুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব নির্ণয় কর।
৪। সিরাজউদ্দৌল্লার বিরুদ্ধে কোম্পানীর নীতি আলোচনা কর। পলাশীর যুদ্ধের দায়িত্ব কাহার ছিল ?
৫। মীরকাশিম ও ইংরেজ কোম্পানীর সংঘর্ষের কারণগুলি ব্যাখ্যা কর। বক্সারের যুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব পরিমাপ কর।

৬। ১৭৫৭ হইতে ১৭৬৫ খ্রীঃ পর্যন্ত বাংলাদেশে ইংরেজ শক্তি প্রসারের ইতিহাস লিখ।
৭। ভারতে ইংরেজ শক্তির সম্প্রসারণে ১৭৫৭, ১৭৬৪ ও ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের গুরুত্ব আলোচনা কর।
৮। পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধের তুলনামূলক গুরুত্ব বিচার কর।
৯। **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ** : (ক) বাংলার সিংহাসন লইয়া দ্বন্দ্ব, (খ) সিরাজ কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়ম দখল ও 'অন্ধকূপ হত্যা', (গ) আলীনগরের সন্ধি, (ঘ) মীরজাফর (ঙ) ১৭১৭ সালের বাদশাহী ফারমান।
১০। **এক কথায় উত্তর দাও**—(ক) সিরাজউদ্দৌল্লা কত খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন ?
(খ) সিরাজের সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বীদের নাম লিখ।
(গ) আলীনগরের সন্ধি কোন্ তারিখে সম্পাদিত হয় ?
(ঘ) ঘসেটি বেগমের দেওয়ানের নাম কি ?
(ঙ) সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের নাম লিখ।
(চ) সিরাজের প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন ? পলাশীর যুদ্ধ কোন্ তারিখে সংঘটিত হয় ?
(জ) পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের অধিনায়কের নাম কি ?
(ঝ) পলাশীর যুদ্ধে নবাব পক্ষের দুই জন সংগ্রামী সৈন্যাধ্যক্ষের নাম লিখ।
(ঞ) কাহার আদেশে কে সিরাজকে হত্যা করেন ?
(ট) মীরকাশিম কত খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন ?
(ঠ) বক্সারের যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হয় ?
(ড) বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিমের সহযোগীদের নাম লিখ।
(ঢ) বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের সেনাপতি কে ছিলেন ?
(ণ) বক্সারের যুদ্ধের সময় বাংলার নবাব কে ছিলেন ?

চতুর্দশ অধ্যায় ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ

১। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর মারাঠা শক্তির পুনরভ্যুত্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
২। প্রথম ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।
৩। তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।
৪। মারাঠা শক্তির পতনের কারণ নির্দেশ কর।

৫। হায়দর আলী ও টিপু সুলতানের নেতৃত্বে মহীশূর শক্তির বিকাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। কি ভাবে মহীশূর শক্তির পতন ঘটিল ?

৬। অষ্টাদশ শতকে ইঙ্গ-মহীশূর সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৭। লর্ড ওয়েলেসলীর সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে তিনি যে বিশেষ নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা আলোচনা কর।

৮। শিখ সাম্রাজ্য গঠনে রণজিৎ সিংহের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

৯। রণজিৎ সিংহের সহিত ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।

১০। বিজেতা, সংগঠক ও রাজনীতিবিদ হিসাবে রণজিৎ সিংহের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

১১। প্রথম ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের বিবরণ দাও।

১২। স্বত্বলোপ নীতি বলিতে কি বুঝায় ? লর্ড ডালহৌসি কিভাবে ইহা প্রয়োগ করেন ?

১৩। লর্ড ডালহৌসীর রাজ্য বিস্তার নীতি ব্যাখ্যা কর।

১৪। "ক্লাইভ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, ওয়ারেন হেস্টিংস তাহাকে ঝড় ঝাপটা হইতে রক্ষা করেন, ওয়েলেসলী তাহাকে এক বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করেন"—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

১৫। ক্লাইভ হইতে ডালহৌসী পর্যন্ত ব্রিটিশ শক্তি বিস্তারের বিবরণ লিখ।

১৬। **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ**—(ক) পেশোয়া মাধব রাও, (খ) নানা ফড়নবীশ, (গ) মহাদাজী সিন্ধিয়া, (ঘ) রঘুনাথ রাও, (ঙ) সলবাই-এর সন্ধি, (চ) বেসিনের সন্ধি, (ছ) ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি, (জ) শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি, (ঝ) অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি, (ঞ) সগৌলের সন্ধি, (ট) ইয়ান্দাবুর সন্ধি, (ঠ) অমৃতসরের চুক্তি, (ড) সিন্ধু বিজয় (ণ) স্বত্বলোপ নীতি।

১৭। **এক কথায় উত্তর দাও**—(ক) সুরাটের সন্ধি কত খ্রীষ্টাব্দে কাহাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ?

(খ) পুরন্দরের সন্ধির স্বাক্ষরকারী কাহারা ছিলেন ?

(গ) সলবাইয়ের সন্ধি কাহাদের মধ্যে কত খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয় ?

(ঘ) দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সময় পেশোয়া কে ছিলেন ?

(ঙ) বেসিনের সন্ধি কত খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয় ? কাহারা স্বাক্ষকারী ছিলেন ?

(চ) পুণার সন্ধিতে কে স্বাক্ষর করেন ? কবে ইহা সম্পাদিত হয় ?

(ছ) শেষতম পেশোয়া কে ছিলেন ?

(জ) ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি, কাহাদের মধ্যে কবে স্বাক্ষরিত হয় ?

(ঝ) হায়দর আলী কত খ্রীষ্টাব্দে মারা যান ?

(ঞ) শ্রীরঙ্গপত্তনের সন্ধি কত খ্রীষ্টাব্দে কাহাদের মধ্যে সম্পাদিত হয় ?

(ট) টিপু সুলতান কত খ্রীষ্টাব্দে মারা যান ?

(ঠ) মহীশূর শক্তির পতন কখন ঘটে ?

(ড) সগৌলের সন্ধি কাহাদের মধ্যে কবে স্বাক্ষরিত হয় ?

(ঢ) নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের অধিনায়ক কে ছিলেন ?

(ণ) ইয়ান্দাবুর সন্ধি কবে কাহাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ?

(ত) অমৃতসরের চুক্তি কাহাদের মধ্যে কত খ্রীষ্টোব্দে স্বাক্ষরিত হয় ?

(থ) রণজিৎ সিংহ কত খ্রীষ্টাব্দে মারা যান ?

(দ) লাহোরের সন্ধি কাহাদের মধ্যে কত খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয় ?

(ধ) কত খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব অধিকৃত হয় ?

(ন) কত খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধু অধিকৃত হয় ?

(প) অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি কে গ্রহণ করেন ?

(ফ) কত খ্রীষ্টাব্দে কোন্ গভর্নর জেনারেলের আমলে কোম্পানী ভারতের সার্বভৌম শক্তি রূপে স্থান পায় ?

(ব) কোন্ গভর্নর জেনারেলের আমলে মারাঠা শক্তির পতন ঘটে ?

(ভ) কোন্ গভর্নর জেনারেলের আমলে অযোধ্যা কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত হয় ?

(ম) স্বত্বলোপ নীতি কে গ্রহণ করেন ?

চতুর্দশ অধ্যায় ঃ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১। কিরূপ পরিস্থিতিতে দেওয়ানী অর্পণ করা হয়? ইহার ঐতিহাসিক তাৎপর্য নির্ণয় কর।
২। দ্বৈত শাসন বলিতে কি বুঝ? বাংলার শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ইহার প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।
৩। ওয়ারেন হেস্টিংস ও কর্নওয়ালিসের আমলের ইংরেজ শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয়করণনীতি ব্যাখ্যা কর।
৪। ওয়ারেন হেস্টিংস ও কর্নওয়ালিশের বিচার ব্যবস্থা আলোচনা কর।
৫। ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজস্বনীতি পর্যালোচনা কর।
৬। ওয়ারেন হেস্টিংসকে ভারতে ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার 'অগ্রদূত' কেন বলা হয় উদাহরণ ও যুক্তি সহ আলোচনা কর।
৭। বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের কারণ কি? ইহার ফলাফল কি হইয়াছিল?
৮। কর্নওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।
৯। **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ** (ক) ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, (খ) ১৭৭২ সালের গুরুত্ব, (গ) রেগুলেটিং এ্যাক্ট, (ঘ) কমিটি অফ্ সারকিট বা ভ্রাম্যমাণ কমিটি, (ঙ) আমিনী কমিশন, (চ) কর্নওয়ালিস কোড, (ছ) শোর-কর্নওয়ালিস বিতর্ক (জ) সূর্যাস্ত আইন।
১০। **এক কথায় উত্তর দাও ঃ**
(ক) ইংরেজ কোম্পানী কত খ্রীষ্টাব্দে কোন্ মোগল সম্রাটের নিকট হইতে দেওয়ানী লাভ করে?
(খ) দেওয়ানীর অর্থ কি?
(গ) দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা কে চালু করেন?
(ঘ) দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান কে কখন ঘটান?
(ঙ) ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ইংরেজী এবং বাংলা কত সালে ঘটিয়াছিল?
(চ) বাংলার প্রথম গর্ভনর জেনারেল কে?
(ছ) ওয়ারেন হেস্টিংসের কাউন্সিলের সদস্যদের নাম লিখ।
(জ) দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার সর্বোচ্চ আদালত দুইটির নাম কি?
(ঝ) হেস্টিংসের ও কর্নওয়ালিসের আমলে দেওয়ানী ও ফৌজদারী সর্বোচ্চ আদালত দুইটির বিচার যথাক্রমে কাহারা করিতেন?
(ঞ) কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট কবে স্থাপিত হয়?
(ট) সুপ্রীম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি কে ছিলেন?
(ঠ) পাঁচসালা বন্দোবস্ত কে চালু করেন?
(ড) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুপারিশ প্রথমে কে করিয়াছিলেন?
(ঢ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কাহার আমলে প্রচলিত হয়?
(ণ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কত তারিখে চালু করা হয়?

চতুর্দশ অধ্যায় ঃ তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
২। কোম্পানীর আমলে বাংলা তথা ভারতের বাণিজ্য ও শিল্পের ধ্বংস কিভাবে হইয়াছিল? ইহার ফলাফল কিরূপ হইয়াছিল?
৩। ইংরেজ কোম্পানীর শাসনাধীনে ভারতীয় অর্থনীতিক বিপর্যয় কিভাবে ঘটিয়াছিল?
৪। **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ** (ক) অর্থনৈতিক নির্গমন। (খ) ভারতের সূতীবস্ত্র শিল্প।

চতুর্দশ অধ্যায় ঃ চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১। ভারতে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজন কেন হইয়াছিল? এই বিষয়ে কাহারা অগ্রণী ছিলেন এবং তাঁহাদের ভূমিকা কি ছিল?
২। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন এবং ভারতীয় সমাজে তাহার প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা কর।

৩। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। এই প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকা নির্ণয় কর।

৪। রাজা রামমোহন রায়কে কি হিসাবে ভারতের প্রথম আধুনিক মানব বলিয়া অভিহিত করা যায় ?

৫। উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলনে 'নব্যবাংলা' গোষ্ঠীর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

৬। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অবদান পরিমাপ কর।

৭। উনিশ শতকের ভারতের নারীমুক্তি আন্দোলনে রামমোহন ও ব্রাহ্মসমাজ, নব্যবাংলাগোষ্ঠী এবং বিদ্যাসাগরের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

৮। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মহারাষ্ট্রের সমাজসংস্কার আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৯। **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ** (ক) প্রাক্ ইংরেজ আমলের ভারতের সনাতনী শিক্ষাব্যবস্থা, (খ) ভারতে শিক্ষা বিস্তারের খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের ভূমিকা, (গ) এশিয়াটিক সোসাইটি, (ঘ) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, (ঙ) ১৮১৩ সালের সনদ আইন (চ) মেকলের মিনিট্‌স (ছ) উডের প্রতিবেদন, (জ) 'আত্মীয়সভা' ও 'ব্রাহ্মসভা' (ঝ) তত্ত্ববোধিনীসভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, (ঞ) ব্রাহ্মসমাজ (ট) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঠ) ডিরোজিও, (ড) ডেভিড হেয়ার, (ঢ) সতীদাহ প্রথা নিবারণ ও বিধবা বিবাহ আইন।

১০। **এক কথায় উত্তর দাও—**

(ক) সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে পরিচালিত ভারতের সনাতনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম কি ?
(খ) আরবী ও ফারসী ভাষায় পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম লিখ।
(গ) কলিকাতা মাদ্রাসা কবে, কাহার দ্বারা স্থাপিত হয় ?
(ঘ) বারাণসীতে সংস্কৃত বিদ্যালয় কত খ্রীষ্টাব্দে কাহার উদ্যোগে স্থাপিত হয় ?
(ঙ) এশিয়াটিক সোসাইটি কাহার শাসনকালে কত খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ?
(চ) এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম পরিচালকের নাম লিখ।
(খ) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কোন্ গভর্নর জেনারেলের আমলে কত খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় ?
(ছ) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কি উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয় ? ইহার প্রথম অধ্যক্ষ কে ছিলেন ?
(ঝ) শ্রীরামপুর মিশনের পরিচালক ও তাঁহার দুইজন সহযোগীর নাম লিখ।
(ঞ) হিন্দু কলেজ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ? তাহার বর্তমান নাম কি ?
(ট) শ্রীরামপুর কলেজ কবে, কাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় ?
(ঠ) রেভারেন্ড ডাফ প্রতিষ্ঠিত কলেজটির পূর্ব এবং বর্তমান নাম কি ? কবে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় ?
(ড) ভারতে শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোম্পানী কত সালের সনদে কত টাকা বরাদ্দ করেন ?
(ঢ) রামমোহন রায় কাহাকে কিসের প্রতিবাদে চিঠি লিখেন ?
(ণ) মেকলে কে ছিলেন ?
(ত) মেকলে কত সালে কোন্ গভর্নর জেনারেলের নিকট তাঁহার শিক্ষা নীতি সম্পর্কে স্মারকলিপি পেশ করেন ?
(থ) ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ মেডিকেল কলেজ কোথায় এবং কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ?
(দ) উডস্ ডেসপ্যাচ কোন্ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় ?
(ধ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তারিখ কি ?
(ন) 'আত্মীয়সভা' কে কত সালে আহ্বান করেন ?
(প) 'তত্ত্ববোধিনী সভা' কবে কাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় ?
(ফ) ব্রাহ্মসমাজ কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ?
(ব) ডিরোজিওর ছাত্রগণ কি নামে পরিচিত ছিলেন ?
(ভ) নব্যবাংলা গোষ্ঠীভুক্ত কয়েকজন মনীষীর নাম লিখ।
(ম) সতীদাহ প্রথার অবসান (আইনের মাধ্যমে) কত সালে ঘটে ?
(য) বিধবা বিবাহ আইন কাহার আমলে কত সালে চালু হয় ?
(র) নারী শিক্ষা আন্দোলনের সহিত যুক্ত কয়েকজন মনীষীর নাম লিখ।
(ল) কাহার উদ্যোগে কত সালে হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ? উহার বর্তমান নাম কি ?
(ব) বিদ্যাসাগর রচিত কয়েকটি পুস্তকের নাম লিখ।

চতুর্দশ অধ্যায় ঃ পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(১) ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলন কিভাবে সংগঠিত হয় ? এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য, প্রকৃতি, সাফল্য ও ব্যর্থতা বিশ্লেষণ কর।

২। ফরাজি আন্দোলন কাহাকে বলে ? এই আন্দোলন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৩। তিতু মীর কে ছিলেন ? ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁহার সংগ্রামের পরিচয় দাও।

৪। সাঁওতালগণ কেন বিদ্রোহ করে ? এই বিদ্রোহ কিভাবে দমন করা হয় ?

৫। **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ** (ক) রায়বেরিলির সৈয়দ আমেদ্, (খ) দুদুমিয়া, (গ) কোল বিদ্রোহ।

৬। **এক কথায় উত্তর দাও ঃ**

(ক) বাংলায় ফরাজি আন্দোলন কত সালে কাহার নেতৃত্বে হয় ?
(খ) নিজেকে পূর্ববঙ্গের খলিফা বলিয়া কে প্রচার করেন ?
(গ) ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রবর্তক কে ? তিনি কোথাকার অধিবাসী ছিলেন ?
(ঘ) ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলন সূত্রপাত কে করেন ?
(ঙ) তিতুমীর কোথায় কিসের কেল্লা তৈয়ারি করেন ?
(চ) কোন্ ওয়াহাবি কর্মীর হাতে লর্ড মেয়ো কোথায় প্রাণ হারান ?
(ছ) সাঁওতাল বিদ্রোহ কত সালে শুরু হয় ?
(ছ) সাঁওতাল বিদ্রোহের দুই নেতার নাম কর।
(ঞ) যে বিখ্যাত ময়দানে সাঁওতালগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তাহার নাম কি ?

চতুর্দশ অধ্যায় ঃ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১। ভারতীয় মহাবিদ্রোহের কারণসমূহ আলোচনা কর।

২। ভারতীয় মহাবিদ্রোহের চরিত্র ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

৩। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র জাতীয় গণ-অভ্যুত্থান—উক্তিটির সহিত তুমি কি একমত ? ব্যাখ্যা সহ আলোচনা কর।

৪। **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ** (ক) নানাসাহেব, (খ) ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, (গ) তাঁতিয়া টোপী।

৫। **এক কথায় উত্তর দাও—**

(ক) কোন্ গর্ভনর জেনারেলের আমলে ভারতীয় মহাবিদ্রোহ ঘটে ?
(খ) মহাবিদ্রোহ প্রথম কোন্ স্থানে আরম্ভ হয় ?
(গ) কোন বন্দুকের কার্তুজ ব্যবহারের বিষয়টিকে কেন্দ্র করিয়া মহাবিদ্রোহ শুরু হয় ? কে ইহার প্রথম নেতৃত্ব দেন ?
(ঘ) বিদ্রোহীরা কাহাকে ভারত সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন ?
(ঙ) ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে কোন্ নারী ঐতিহাসিক নেতৃত্ব দান করেন ?
(ছ) নানাসাহেব কে ছিলেন ?
(জ) কুয়র সিং কে ছিলেন ?
(ঝ) তাঁতিয়া টোপী কে ছিলেন ?
(ঞ) মহাবিদ্রোহ দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণকারী দুজন ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষের নাম লিখ।

কুলপঞ্জী

মগধের রাজবংশ

হর্যঙ্ক বংশ

বিম্বিসার
|
অজাতশত্রু
|
উদয়ী

শিশুনাগ বংশ

শিশুনাগ
|
কালাশোক বা কাকবর্ণ

নন্দবংশ

মহাপদ্ম নন্দ
|
উগ্রসেন
|
ধননন্দ

মৌর্যবংশ

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
|
বিন্দুসার (অমিত্রঘাত)

- সুষীম (সুমন)
  - নিগ্রোধ
- প্রিয়দর্শী অশোক
  - মহেন্দ্র (?)
  - সংঘমিত্রা (?) (কন্যা)
  - চারুমতি
  - কুণাল
    - বন্ধুপালিত
    - সম্প্রাতি
      - শালিশুক
        - দেববর্মণ
          - শতধন্বা
            - বৃহদ্রথ
    - বিগতাশোক
  - জলৌক
  - তিবর
- বিগতাশোক

কুষাণ বংশ

কুজল কদফিসিস
|
বীম কদফিসিস
|
কণিষ্ক
|
বাশিষ্ক
|
হুবিষ্ক
|
২য় কণিষ্ক
|
বাসুদেব

সাতবাহন রাজবংশ

সিমুক
|
কৃষ্ণ
|
সাতকর্ণী
|
গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী
|
বশিষ্ঠীপুত্র পুলমায়ী
|
যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী

গুপ্ত বংশ

মহারাজ শ্রীগুপ্ত
|
ঘটোৎকচ গুপ্ত
|
১ম চন্দ্র গুপ্ত কুমার দেবী (লিচ্ছবি)
|
সমুদ্র গুপ্ত
|
২য় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য

- গোবিন্দগুপ্ত
- ১ম চন্দ্রগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য
  - স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য
  - পুরু গুপ্ত শ্রীবিক্রম
    - নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য | ২য় কুমার গুপ্ত | বিষ্ণু গুপ্ত
    - বুধ বা বুধগুপ্ত | তথাগত গুপ্ত | বালাদিত্য গুপ্ত
- প্রভাবতী কন্যা (বাকাটক বংশের রানী)

কুলপঞ্জী

পুষ্যভূতি বংশ

- প্রভাকর বর্ধন (থানেশ্বর)
  - রাজ্যবর্ধন
  - হর্ষবর্ধন (থানেশ্বর ও কনৌজ)
  - রাজ্যশ্রী (কন্যা) — মৌখরী রাজ গ্রহবর্মণ (কনৌজ)

প্রতিহার রাজবংশ

- ?
  - ১ম নাগভট্ট
  - ?
    - দেবরাজ
      - বৎসরাজ
        - ২য় নাগভট্ট
          - রামভদ্র
            - ১ম ভোজ (মিহিরভোজ)
              - ১ম মহেন্দ্রপাল
                - ১ম মহীপাল
                - ২য় ভোজ

পাল রাজবংশ

- দয়িতবিষ্ণু — শ্রী ব্যপট — গোপাল
  - ধর্মপাল
    - দেবপাল
      - ১ম রাজ্যপাল
  - বাকপাল
    - জয়পাল
      - ১ম বিগ্রহপাল
        - নারায়ণ পাল
          - ২য় রাজ্যপাল
            - ২য় গোপাল
              - ২য় বিগ্রহপাল
                - ১ম মহীপাল
                  - নয় পাল

- বিগ্রহপাল ৩য়
  - ২য় মহীপাল
  - শূরপাল ২য়
  - রামপাল
    - ৩য় রাজ্যপাল
    - বিত্তপাল
    - কুমারপাল
      - ৩য় গোপাল
    - মজনপাল

সেন রাজ বংশ

- বীর সেন
  - সামন্ত সেন
    - হেমন্ত সেন
      - বিজয় সেন
        - বল্লাল সেন
          - লক্ষ্মণ সেন
            - বিশ্বরূপ সেন
              - সূর্য সেন
              - পুরুষোত্তম সেন
            - কেশব সেন

বাতাপির চালুক্য বংশ

- ১ম জয়সিংহ
  - রণরাগ
    - ১ম পুলকেশী
      - ১ম কীর্তিবর্মণ
        - ২য় পুলকেশী
      - মঙ্গলেশ

কল্যাণের চালুক্যবংশ

বিজয়াদিত্য
|
ভীম (১ম) — কীর্তিবর্মণ (৩য়) — তৈলপ বা তৈল (১ম) — বিক্রমাদিত্য (৩য়)
|
২য় তৈল বা তৈলপ — বিক্রমাদিত্য (৪র্থ) — অয্যন (১ম) — ভীম (২য়)
|
সত্যাশ্রয় — ২য় জয় সিংহ — ১ম সোমেশ্বর

২য় সোমেশ্বর
ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য

রাষ্ট্রকূট রাজবংশ

১ম দন্তিবর্মণ
|
১ম ইন্দ্র
|
১ম গোপাল
|
১ম কক্ক

২য় ইন্দ্র
২য় দন্তিবর্মণ
(দন্তিদুর্গ)

১ম কৃষ্ণ

নন্ন

২য় গোবিন্দ

ধ্রুব
|
৩য় গোবিন্দ
|
১ম অমোঘ বর্ষ
|
২য় কৃষ্ণ
|
জগতুঙ্গ

৩য় ইন্দ্র
৩য় অমোঘবর্ষ

২য় অমোঘবর্ষ
৪র্থ গোবিন্দ

৩য় কৃষ্ণ
|
?
|
৪র্থ ইন্দ্র

ঘোট্টিগ

নিরুপম
|
৪র্থ অমোঘবর্ষ

পল্লব রাজবংশ

- বিষ্ণুগোপ
  - ২য় সিংহবর্মণ
    - সিংহবিষ্ণু
      - ১ম মহেন্দ্র বর্মণ
        - ১ম নরসিংহ বর্মণ
          - ২য় মহেন্দ্র বর্মণ
            - ১ম পরমেশ্বর বর্মণ
              - ২য় নরসিংহ বর্মণ
                - ২য় পরমেশ্বর বর্মণ
                - ৩য় মহেন্দ্র বর্মণ
                  [শেষ পল্লবরাজ অপরাজিত বর্মণ]
    - ভীম বর্মণ
      - বুদ্ধ বর্মণ
        - আদিত্য বর্মণ
          - গোবিন্দ বর্মণ
            - হিরণ্য বর্মণ
              - ২য় নন্দীবর্মণ
                - দন্তিবর্মণ
                  - ৩য় নন্দীবর্মণ
                    - নৃপতুঙ্গ
                    - বিজয় কম্প

চোল রাজবংশ

- বিজয়ালয়
  - ১ম আদিত্য
    - ১ম পরান্তক
      - ১ম রাজাদিত্য
      - গণ্ডরাদিত্য
        - মদুরান্তক উত্তম
      - অরিঞ্জয়
        - ২য় পরান্তক
          - ২য় আদিত্য
          - ১ম রাজরাজ
            - ১ম রাজেন্দ্র চোল
              - ১ম রাজাধিরাজ
              - ২য় রাজেন্দ্র দেব
                - রাজমহেন্দ্র
              - বীর রাজেন্দ্র
                - অধিরাজেন্দ্র

তথাকথিত দাস বংশ

- কুতুবউদ্দিন আইবক
  - আরাম শাহ
  - কন্যা : ইলতুৎমিস
    - সিরউদ্দিন মাহমুদ
    - রুকনউদ্দিন ফিরুজসাহ
      - আলাউদ্দিন মামুদ
    - রাজিয়া
    - মুহজউদ্দিন বহরম
    - নাসিরউদ্দিন মাহমুদ
    - গিয়াসউদ্দিন বলবন (ক্রীতদাস)
      - যুবরাজ মহম্মদ
        - কাইকোবাদ
      - বুগরা খাঁ (বাংলা)

খলজী বংশ

- জালালউদ্দিন ফিরুজ
  - ইব্রাহিম রুকণউদ্দিন
- সিয়াবউদ্দিন
  - আলাউদ্দিন
    - খিজির খাঁ
    - শাদী খাঁ
    - উমর শিয়াবউদ্দিন
    - কুতুবউদ্দিন মুবারক
      - নাসিরউদ্দিন খসরু

তুঘলক বংশ

- গিয়াসউদ্দিন তুঘলক শাহ
  - মহম্মদ বিন তুঘলক
- রজব
  - ফিরুজ শাহ
    - ফতে খাঁ
    - জাফর খাঁ
      - আবুবকর
        - গিয়াসউদ্দিন তুঘলক
        - নুসরৎ শাহ
    - নাসিরউদ্দিন মামুদ শাহ
      - আলাউদ্দিন সিকন্দর
      - মাহমুদ শাহ

সৈয়দ বংশ

- খিজীর খান
  - মুইজউদ্দিন মোবারক
  - ফরিদ খান
    - মহম্মদ শাহ
      - আলাউদ্দিন আলম শাহ

লোদী বংশ

- বহলুল লোদী
  - সিকন্দর লোদী
    - ইব্রাহিম লোদী

ইলিয়াস শাহী বংশ

- শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ
  - সিকন্দর শাহ
    - গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ
      - সইফউদ্দিন
        - ২য় শামসউদ্দিন
        - শিহাবউদ্দিন বায়জীদ
          - ফিরুজ
  - ১ম নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ
    - রুকনউদ্দিন বারবক শাহ
      - শামসউদ্দিন ইউসুফ শাহ
        - ২য় সিকন্দর শাহ
    - জালালউদ্দিন ফতে শাহ
      - ২য় নাসিরউদ্দিন মাহমুদ

হোসেনশাহী বংশ

- আলাউদ্দিন হোসেন শাহ
  - নসরৎ শাহ
    - আলাউদ্দিন ফিরুজ
  - গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ
    - কন্যা — খিজির খাঁ

বহমণী রাজবংশ

- আলাউদ্দিন বহমন শাহ
  - ১ম মহম্মদ শাহ
    - মুজাহিদ
    - ফতে খান
  - দায়ুদ
  - আহমদ খান
    - ফিরুজ শাহ
      - হাসান
      - মুবারক
        - কন্যা-হুমায়ুন
          - নিজাম শাহ
          - ৩য় মহম্মদ
            - মাহমুদ শাহ
              - আহম্মদ
              - আলাউদ্দিন
              - ওয়ালিউল্লা
              - কলিমউল্লা শাহ
          - জামসিদ
    - আহম্মদ শাহ
      - আলাউদ্দিন আহম্মদ
        - জালিম
        - হাসান খান
        - জয়া খান
      - দায়ুদ
      - মহম্মদ
      - মুহম্মদ
  - মহম্মদ খান
    - ২য় মহম্মদ
      - গিয়াসউদ্দিন
      - শামসউদ্দিন

বিজয়নগর রাজ্য

(ক) যাদব বংশ

- সঙ্গম
  - হরিহর
    - ২য় হরিহর
      - ১ম দেবরায়
        - বীর বিজয়
          - ২য় দেবরায়
            - মল্লিকার্জুন
            - ২য় বিরুপাক্ষ
  - বুক্ক

(খ) সালুভ বংশ

- নরসিংহ
  - ইম্মাদ নরসিংহ

(গ) তুলুভ বংশ

- নরস নায়ক
  - বীর নরসিংহ
  - কৃষ্ণদেব রায়
  - অচ্যুত
    - বেঙ্কট
  - রঙ্গ
    - সদাশিব
      - রামরায়

(ঘ) আরবিডু বংশ

তিরুমাল
- ২য় রঙ্গ
- রাম
  - ৩য় বেঙ্কট
- ২য় বেঙ্কট

মোগল বংশ

জহিরউদ্দিন বাবর
- হুমায়ুন
  - জালালউদ্দিন আকবর
    - সেলিম (জাহাঙ্গীর)
      - খসরু
      - পারভেজ
      - খুররম (শাহজাহান)
        - দারা শিকোহ
        - সুজা
        - আউরঙ্গজেব
          - মুহম্মদ সুলতান
          - মোয়াজ্জেম (১ম শাহ আলম/১ম বাহাদুর শাহ)
            - জাহীন্দার শাহ
              - ২য় আলমগীর
                - আলী গৌহর (২য় শাহ আলম)
                  - ২য় আকবর শাহ
                    - ২য় বাহাদুর শাহ
            - আজিম উসশান্
              - মহম্মদ ফররুকসিয়ার
            - রফি উসশান
              - মুহম্মদ ইব্রাহিম
              - রফি-উদ-দৌলা
              - রফিউদ দারাজাৎ
            - জাহান শাহ
              - মহম্মদ শাহ
                - আহম্মদ শাহ
          - মুহম্মদ আজম
          - আকবর
          - কামবক্স
        - মুরাদ
      - শাহরিয়ার
    - মুরাদ
    - দানিয়াল
  - মীর্জা হাকিম
- কামরান
- হিন্দাল
- আসকারি

ছত্রপতি বা ভোঁসলে বংশ

- মালোজী
  - শাহজী
    - শম্ভুজী
    - শিবাজী
      - শম্ভুজী
        - শাহু (২য় শিবাজী)
        - তারাবাঈ = রাজারাম = রাজস বাঈ
          - তৃতীয় শিবাজী
            - রামরাজা
              - ২য় শাহু
                - প্রতাপ সিংহ
                - শাহজী রাজা
          - ২য় শম্ভুজী

পেশোয়া বংশ

- বালাজী বিশ্বনাথ
  - ১ম বাজীরাও
    - বালাজী বাজীরাও
      - বিশ্বাস রাও
      - মাধব রাও
      - নারায়ণ রাও
        - মাধব রাও নারায়ণ
    - রঘুনাথ রাও (রাঘোবা)
      - অমৃত রাও (দত্তক)
      - ২য় বাজীরাও
        - নানা সাহেব (দত্তক)
      - চিমনজী আন্দা
  - আপ্পা রাও চিমানজী
    - সদাশিব রাও ভাও

কোম্পানীর আমলে ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল

১৭৭৪-১৭৮৫—ওয়ারেন হেস্টিংস

১৭৮৫-৮৬—স্যার জন ম্যাকফরসন (অস্থায়ী)

১৭৮৬-৯৩—লর্ড কর্ণওয়ালিস

১৭৯৩-৯৮—স্যার জন শোর

১৭৯৮-১৮০৫—লর্ড ওয়েলেসলী

১৮০৫—লর্ড কর্ণওয়ালিশ (২য় বার)

১৮০৫-০৭—স্যার জন বার্লো (অস্থায়ী)

১৮০৭-১৮১৩—১ম লর্ড মিন্টো

১৮১৩-২৩—লর্ড হেস্টিংস (লর্ড ময়রা)

১৮২৩— জন অ্যাডাম (অস্থায়ী)

১৮২৩-২৮—লর্ড আমহার্স্ট

১৮২৮-৩৫—লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক

১৮৩৫-৩৬—চার্লস মেটকাফ (অস্থায়ী)

১৮৩৬-৪২—লর্ড অকল্যাণ্ড

১৮৪২-৪৪—লর্ড এলেনবরা

১৮৪৪-৪৮—লর্ড হার্ডিং (১ম)

১৮৪৮-৫৬—লর্ড ডালহৌসী

১৮৫৬-৫৮—লর্ড ক্যানিং

সময়	ঘটনা
খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দেরও পূর্ববর্তী (আনুমানিক)	সিন্ধু সভ্যতা
” ২৫০০-২০০০ অব্দ (আনুমানিক)	বৈদিক (আর্য) সভ্যতা
” ষষ্ঠ শতক	মগধের অভ্যুদয়, ইরানীয় বা পারসিক অভিযান
” ৫৪০	মহাবীরের আবির্ভাব
” ৫৬৭	বুদ্ধের আবির্ভাব
” ৪৮৬	বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ
” ৩২৭-৩২৬	আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ
” ৩২৪	মৌর্যবংশের অভ্যুদয়ে (চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য)
” ২৭৩-২৩২	অশোকের রাজত্বকাল
” তৃতীয় শতক	রাষ্ট্রীয় গ্রীক আক্রমণ
” দ্বিতীয় শতক	শক অনুপ্রবেশ
” প্রথম শতক	পার্থিয়ান বা পহ্লবগণ কর্তৃক সিন্ধু উপত্যকায় শাসন প্রতিষ্ঠা
৭৮ খ্রীষ্টাব্দ	শকাব্দের প্রবর্তন ; কনিষ্কের সিংহাসনে আরোহণ
৩২০ ”	গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান ; প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনে আরোহণ
৩৩০-৩৭৩/৮০	সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকাল
৩৮০-৪১২/১৩	২য় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল
৪১৩-৪৫৫	১ম কুমারগুপ্তের শাসনকাল
৪৫৫-৪৬৭	স্কন্দগুপ্তর রাজত্বকাল- হূণ আক্রমণ প্রতিহত
৬০৬	হর্ষাব্দের প্রবর্তন ; হর্ষবর্ধনের সিংহাসনে আরোহণ ; এর কিছু পূর্বে শশাঙ্ক কর্তৃক স্বাধীন গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা
৬৩০-৬৪৪	হিউয়েন সাংয়ের ভারতে অবস্থিতি
৬৩৭	শশাঙ্কর মৃত্যু
৭১৩	মহম্মদ বিন কাশিম কর্তৃক সিন্ধুদেশে শাসন প্রতিষ্ঠা
৭৭০-৮১০	ধর্মপালের রাজত্বকাল
৮১০-৮৫০	দেবপালের রাজত্বকাল
৯৮৫-১০১৮	চোলরাজ রাজরাজের রাজত্বকাল
৯৯৮-১০৩০	সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণ
১০১৮-৪৩	১ম রাজেন্দ্রচোলের রাজত্বকাল
১১৫৮	বল্লালসেনের সিংহাসন আরোহণ
১১৭৫	মহম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযান

১১৯০-৯১	তরাইনের ১ম যুদ্ধ
১১৯২	তরাইনের ২য় যুদ্ধ
১২০৬	সুলতানী শাসনের সূচনা
১২১১-৩৬	ইলতুৎমিসের রাজত্বকাল
১২৬৬-৮৭	গিয়াসউদ্দিন বলবনের রাজত্বকাল
১২৯৬-১৩১৬	আলাউদ্দিন খলজীর শাসনকাল
১৩২৫-১৩৫১	মহম্মদ বিন্ তুঘলকের রাজত্বকাল
১৩৯৮	তৈমুরলঙের ভারত আক্রমণ
১৪৯৮	ভাস্কো-ডা-গামার ভারতে আগমন
১৫১০	পর্তুগীজ কর্তৃক গোয়া অধিকার
১৫২৬	পাণিপথের ১ম যুদ্ধ, বাবর কর্তৃক মোগল শাসনের প্রতিষ্ঠা
১৫৩০	বাবরের মৃত্যু ; হুমায়ুনের শাসন সুরু
১৫৪০-৪৫	শেরশাহের শাসনকাল
১৫৫৬	২য় পাণিপথের যুদ্ধ ; আকবরের রাজত্বের সূচনা : মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন
১৬০০	ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা
১৬০৫	আকবরের মৃত্যু ; জাহাঙ্গীরের সিংহাসন আরোহণ
১৬০৫-২৭	জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল
১৬২৭-৩৮	শাহজাহানের রাজত্বকাল
১৬২৭ (মতান্তরে ১৬৩০)	শিবাজীর জন্ম
১৬৫৮-১৭০৭	আউরঙ্গজেবের শাসনকাল
১৬৭৪	রায়গড় দুর্গে শিবাজীর রাজ্যাভিষেক ও ছত্রপতি উপাধি ধারণ ; ফ্রাঁসেয়া মার্টিনের পণ্ডিচেরী প্রতিষ্ঠা
১৬৮০	শিবাজীর মৃত্যু
১৬৯০	কলিকাতা মহানগরীর প্রতিষ্ঠা
১৭০৭	আউরঙ্গজেবের মৃত্যু
১৭০৮	গুরু গোবিন্দর মৃত্যু
১৭১৭	বাদশাহী ফরমানের জোরে ইংরেজ কোম্পানীর বিনা শুল্কে বাণিজ্যাধিকার লাভ
১৭৩৯	নাদির শাহর ভারত আক্রমণ
১৭৪০-৪৮	১ম কর্ণাটকের যুদ্ধ
১৭৫১-৫৫	২য় কর্ণাটকের যুদ্ধ
১৭৫৬	আলীবর্দি খাঁর মৃত্যু, সিরাজউদ্দৌল্লার বাংলার সিংহাসনে আরোহণ

১৭৫৭	পলাশীর যুদ্ধ
১৭৬০	মীরকাশিমের সিংহাসনে আরোহণ, বন্দীবাসের যুদ্ধ
১৭৫৬-৬৩	৩য় কর্ণাটকের যুদ্ধ
১৭৬৪	বক্সারের যুদ্ধ
১৭৬৫	ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাংলার দেওয়ানী অধিকার লাভ ; দ্বৈত শাসন
১৭৬৭-৬৯	১ম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ
১৭৭২-৭৪	ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্নর
১৭৭২	রাজা রামমোহনের জন্ম
১৭৭৩	রেগুলেটিং এ্যাক্ট
১৭৭৪-৮০	ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর জেনারেল
১৭৭৫-৮২	১ম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ
১৭৮০-৮৪	২য় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ
১৭৮২	সলবাই-এর সন্ধি
১৭৮৪	এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা
১৭৮৬-৯৩	লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকাল
১৭৯০-৯২	৩য় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ
১৭৯৩	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
১৭৯৮-১৮০৫	লর্ড ওয়েলেসলীর শাসনকাল
১৭৯৯	৪র্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ—টিপুর মৃত্যু
১৮০০	ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা
১৮০০	নিজাম কর্তৃক অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর
১৮০২	বেসিনের সন্ধি—পেশোয়া কর্তৃক অধীনতামূলক চুক্তি স্বাক্ষর
১৮০৩-০৫	২য় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ
১৮০৫	রণজিৎ সিংহের অমৃতসর অধিকার
১৮০৯	অমৃতসরের সন্ধি, ডিরোজিওর জন্ম
১৮১৬	গোর্খাদের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ—সিমলা-মুসৌরী, নৈনিতাল, আলমোড়া দখল
১৮১৭	হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা
১৮১৭-১৮১৮	তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ
১৮২০	বিদ্যাসাগরের জন্ম
১৮২৮	ব্রাহ্মসভার প্রতিষ্ঠা
১৮২৯	সতীদাহ প্রথা বেআইনী বলিয়া ঘোষণা
১৮৩১	ওয়াহাবি আন্দোলনের সুরু

	ঘটনা
১৮৩৩	রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু
১৮৩৫	পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা
১৮৪৫-৪৮	১ম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ
১৮৪৬	লাহোরের সন্ধি
১৮৪৮-৪৯	২য় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ
১৮৪৮-৫৬	লর্ড ডালহৌসির শাসনকাল
১৮৫৩	বোম্বাই হইতে থানা পর্যন্ত ভারতের প্রথম রেলপথ প্রতিষ্ঠা
১৮৫৫-৫৬	সাঁওতাল বিদ্রোহ
১৮৫৭	মহাবিদ্রোহ